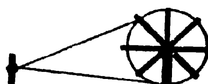
গান্ধী-রচনাসম্ভার

তৃতীয় খণ্ড

[হিন্দ স্বরাজ, স্বাস্থ্য-নির্দেশিকা, আমার অহিংসা, য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা, নারী ও সামাজিক অবিচার, পত্র-চয়ন এবং অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি]

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী



সম্পাদনা

শান্তিকুমার মিত্র

গান্ধী বিচার পর্ষদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা-৩২

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক, রেজিস্ট্রার,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ, ১৯৬০

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬ থেকে
শ্রীপরেশ চন্দ্র বসু কর্তৃক মুদ্রিত

সম্পাদকের নিবেদন

. মহাত্মা গান্ধী জীবনশিল্পী। সিন্ধু স্বাদ তাঁর জীবন অনুধ্যানে। কী নন তিনি? জীবন-সাধক, অধিনায়ক, সেবক, জাতির জনক—মহিমান্বিত শত অভিধায়। সমুদ্র-সন্নিভ মহানদীর পৃথক সত্তা নিশ্চিহ্নপ্রায়। গান্ধীজীও তেমনি—একাল, এযুগ, এযুগের মানুষের সঙ্গে একাধারে একাত্ম. শতাব্দীর বিস্ময়, আবার ব্যাপ্তিতে মহাসঙ্গম। রবীন্দ্রনাথের বিচারে 'যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা'। কিন্তু আল্লা হরি খৃষ্ট যে নামেই ডাকি না কেন, ঈশ্বর ঈশ্বরই। গান্ধী পরিচয়ও তাই গান্ধী নামেই। সত্যান্বেষী গান্ধীজীর পরম সত্যভাষণ 'আমার জীবনই আমার বাণী'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো" এই শেষ কথা ব'লে যাব আমি চলে।' গান্ধীজীর জীবনে মৃত্যু অপ্রমাণ হয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি যথার্থই মৃত্যুঞ্জয়।

অবশ্যই গান্ধীজী তর্কাতীত নন। তাঁর সত্যকার অনুবর্তী স্বল্প। কিন্তু একথাও বলে রাখা ভালো. গুরুবাদ তাঁর আদৌ কাম্য ছিল না। তাঁর নিজের উক্তি: 'গান্ধীবাদ' বলে কোন মতবাদ নেই এবং আমার মৃত্যুর পর ঐ নামে কোন সম্প্রদায় থাকবে, তা আমি চাই না। কোন নতুন নীতি বা মতবাদ আবিষ্কার করেছি—এ দাবি আমি করি না। আমার নিজস্ব উপায়ে দৈনন্দিন জীবনে এবং বিবিধ সমস্যায় আমি শাশ্বত সত্যের প্রয়োগ করেছি মাত্র। পৃথিবীকে নতুন করে শেখাবার মত আমার কিছু নেই। সত্য এবং অহিংসা আদিম পর্বতের মতই পুরাতন। যতদূর সম্ভব বিস্তৃতভাবে আমি এই দুটি সত্যের প্রয়োগ করেছি মাত্র।' এই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণ রাখলে জীবনশিল্পী গান্ধীজীর জীবনচর্যার ধারা. সার্থকতা সম্যক উপলব্ধ হবে। সে অধ্যায় যুগপৎ আত্মোপলব্ধি ও আত্মগঠনের। গান্ধী-রচনাসম্ভারে সেই সত্যনিষ্ঠ পরিচয় বিধৃত।

রচনাসম্ভারের বর্তমান খণ্ডের সূচনা 'হিন্দ স্বরাজ' দিয়ে। হিন্দ সরাজ ১৯০৮ সালে যখন লেখা হয়, গান্ধীজী তখনো দক্ষিণ আফ্রিকায়ই সত্যাগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত। তখনো তিনি ভারতাত্মা নন। কিন্তু সে সময়ই তাঁর সত্য-দৃষ্টিতে ভারতের মুক্তি-পথের দিক-নির্দেশ মিলেছিল। আজকের পাঠক এ বইয়ে তাঁর বহু অভিমত চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, আর তা স্বাভাবিকই; তবু নিদ্বির্ধায় বলতে পারি, উপলব্ধির গভীরতায়, আন্তরিকতার মহিমায়, সর্বোপরি প্রজ্ঞাদৃষ্টির স্বচ্ছতায় ও সততায় হিন্দ স্বরাজ ভাস্বর। পুস্তকটি মূলতঃ গুজরাটিতে লিখিত; গান্ধীজী এর ইংরাজি অনুবাদ করেন। বিশ বছর পরে সুপ্রসিদ্ধ গঠনকর্মী শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। সশ্রদ্ধ চিত্তে তা পরিমার্জিত করে এ সঙ্কলনে সংযোজিত করা হয়েছে।

কী টু হেলথ বা স্বাস্থ্য-নির্দেশিকা দ্বিতীয় পুস্তক। গান্ধী মননের এ একটি ভিন্ন পরিচ্ছেদ। স্বাস্থ্য সন্ধান গান্ধীজীর বহুমুখী প্রয়াসের অন্যতম। কীরূপে নিষ্ঠায় ও কত খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি এক্ষেত্রেও চিন্তা করার যত্ন নিয়েছেন,

পুস্তকটি না পড়লে বিশ্বাস করাই কঠিন হয়। আসলে গান্ধীজী আজীবন মূল অন্বেষণ করে গিয়েছেন। হেন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন নি।

'য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা'—নামেই প্রকাশ কারা কাহিনী এটি। কিন্তু এখানেও গান্ধীজীর স্বকীয়ত্ব। কারান্তরালেও চলেছে তাঁর জীবনচর্যা, সম্প্রীতি প্রচার, কারা সংস্কার চিন্তা। সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমীক্ষা, আত্মসংযম অনুশীলনও।

'আমার অহিংসা' এবং 'অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি' সত্য ও অহিংসা সম্বন্ধে গান্ধীজীর প্রত্যয় ও উপলব্ধির স্বাক্ষর-চিহ্নিত। নানা পর্যায়ে ও পরিস্থিতিতে অহিংসার প্রয়োগ সম্বন্ধে গান্ধীজী যে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, তারই সঙ্কলন এ দুটি গ্রন্থে বা গ্রন্থ-খণ্ডে।

'নারী ও সামাজিক অবিচার' গান্ধী রচনার এক বিশিষ্ট নিদর্শন। নারীদের সমস্যা, তাঁদের প্রতি অবিচার—কত দিক নিয়েই না তিনি ভেবেছেন। নারীজাতির প্রতি কী সুগভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই না তিনি পোষণ করতেন। আজকের যুগের মেয়েরাও এ গ্রন্থে তাঁদের বহু সমস্যার প্রতিকার পথের সন্ধান পাবেন, বোধ হয় এ বিশ্বাসও অহেতুক নয়।

পত্র-চয়ন গান্ধীজীর নির্বাচিত পত্রাবলীর সংকলন। পত্ররচনায় গান্ধীজীর মুন্সিয়ানা লক্ষণীয়। শব্দ ব্যবহারে তাঁর বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিশেষ অর্থদ্যোতক সেই শব্দগুলি অনুধাবন না করলে স্বতঃই তাঁর বক্তব্যও অস্পষ্ট থেকে যাবে। যথাসম্ভব সেদিকে লক্ষ্য রেখে অনুবাদ করার চেষ্টা হয়েছে।

গান্ধীজীর সার কথা : প্রয়োগের মাধ্যমেই অভিব্যক্তি; পরীক্ষার মধ্য দিয়েই বিবর্তন। ভ্রম ও তা সংশোধনের পথেই প্রগতি। কোন মঙ্গলই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ঈশ্বরের হাত থেকে আসে না, পরন্তু পুনঃপুনঃ চেষ্টার দ্বারা বহু বিফলতার মধ্য দিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করে নিতে হয়। ব্যক্তির বিকাশের এটাই নীতি। সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিব্যক্তি এই নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শতবার্ষিকী সমিতি রচনাসম্ভারের বর্তমান খণ্ডটি সম্পাদনার ভার দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। জানি না, এ গুরুদায়িত্ব পালনে কতদূর কৃতকার্য হয়েছি। তবে নিঃসঙ্কোচে বলবো, অনুবাদিকা, অনুবাদকগণ, বিশেষ করে গান্ধী-সাহিত্য-প্রেমী ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানির শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক, সমিতির কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ উৎসাহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে সর্বদা সাহায্য করেছেন। পরিশেষে বলি, পুরোনো অনুবাদে পুরোনো বানান ও নতুন অনুবাদে নতুন—এ তারতম্য সময় স্বল্পতার জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিল। রচনাসম্ভারের পাঠকগণ এ ত্রুটি মার্জনা করবেন।

শান্তিকুমার মিত্র

সূচীপত্র



জন্মদিনে (১৯৪৪)

হিন্দ স্বরাজ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

হিন্দ স্বরাজ

প্রথম অধ্যায়

কংগ্রেস ও উহার কর্মকর্তাগণ

পাঠক—বর্তমানে হিন্দুস্থানে স্বরাজের হাওয়া বহিতেছে। সারা হিন্দুস্থান মুক্তি পাইবার জন্য ছটফট করিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও একই ঢেউ জাগিয়াছে। হিন্দুস্থানীরা স্বাধিকার পাওয়ার জন্য খুব উৎসুক। আপনি কি এই বিষয়ে আপনার বিচার দয়া করিয়া জানাইবেন?

সম্পাদক—আপনি প্রশ্নটি বেশ করিয়াছেন, কিন্তু জবাব দেওয়া সোজা নয়। খবরের কাগজের প্রথম কাজ হইতেছে, লোকের মনোভাব বুঝিয়া উহা প্রকাশ করা; দ্বিতীয়, লোকের মধ্যে কতকগুলি প্রার্থিত ভাব, প্রবণতা জাগানো; তৃতীয়, কোনও কারণেই ভয় না করিয়া জনপ্রিয় মত বা কাজের ভিতর যে সব ত্রুটি আছে তাহা প্রকাশ করা। আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে হইলে ঐ তিন কাজই করিতে হয়। জনগণের কতকটা অভীপ্সা প্রকাশ করিতে হইবে, কতকগুলি প্রবণতাকে উৎসাহ দিতে হইবে, যে দোষ আছে তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। সে যাহাই হউক, আপনি যখন প্রশ্ন করিয়াছেন তখন উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্য।

পাঠক—আপনার বিচার অনুসারে ভারতবর্ষে স্বরাজের ভাব কি জাগ্রত হইয়াছে?

সম্পাদক—ঐ অভীপ্সা থেকেই ত জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। 'জাতীয়'—এই শব্দ বাছাইয়ের মধ্যেই ঐ ভাব নিহিত রহিয়াছে।

পাঠক—নিশ্চয়ই ব্যাপারটি তাহা নয়। নবীন ভারত ত কংগ্রেসকে অগ্রাহ্য করে বলিয়াই মনে হয়। উঁহারা কংগ্রেসকে ইংরেজ শাসন স্থায়ী করার অস্ত্র বলিয়া মনে করেন।

সম্পাদক—এ বিচার যুক্তিযুক্ত নয়। হিন্দুস্থানের দাদা মহাশয় দাদাভাই নৌরজী যদি জমি না তৈরি করিতেন, আমাদের তরুণেরা হোমরুলের কথা বলিতেই পারিতেন না। হিউম সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তিনি যেভাবে কশাঘাত করিয়া আমাদের সক্রিয় করিয়াছেন, যেরকম চেষ্টা করিয়া আমাদের জাগাইয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া ভোলা যাইবে? সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ ঐ একই উদ্দেশ্য সাধনে নিজের শরীর, মন ও টাকা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা আজও পড়িবার উপযুক্ত। গোখলে জাতিকে প্রস্তুত করার জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং জীবনের বিশটি বৎসর এজন্য দিয়াছেন। এমন কি আজও তিনি দারিদ্র্যের মধ্যেই দিন কাটাইতেছেন। কংগ্রেসের মধ্য দিয়া স্বরাজ-বীজ যাঁহারা বুনিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বদরুদ্দীন তায়েবজী অন্যতম। এমনি বাংলা, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে অনেক হিন্দুস্থানী

ও ইংরেজ আছেন যাঁহারা ভারতকেও ভালবাসেন এবং কংগ্রেসেরও সভ্য।

পাঠক—থামুন, থামুন, আপনি ত অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। আমি এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আর আপনি অন্য কথার জবাব দিতেছেন। আমি স্বরাজের কথা বলিতেছিলাম, আপনি বিদেশী শাসনের কথা বলিয়া যাইতেছেন। আমার ইংরেজের নাম শুনিতেও ভাল লাগে না, আর আপনি তাদের নামের ফিরিস্তি দিতেছেন। এক্ষেত্রে আমাদের কখনও মতৈক্য ঘটিবে বলিয়া আমার মনে হয় না। আপনি যদি স্বরাজ লইয়াই আপনার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন আমি খুশী হইব। অন্য কোন কথায় আমার সন্তোষ হইবে না।

সম্পাদক—আপনি অধৈর্য্য। আমার তাহা হইলে তো চলিবে না। একটু সবুর করুন, দেখিবেন আপনি যাহা চাহেন সেই কথাই আসিতেছে। গাছ একদিনে বাড়ে না, এই পুরাতন প্রবাদবাক্য স্মরণ রাখিবেন। আমার কথার মধ্যে বাধা দেওয়াতে, আর হিন্দুস্থানের যাঁহারা উপকার করিয়াছেন তাঁহাদের আলোচনা যে আপনার ভাল লাগিতেছে না তাহাতে আমার মনে হয় আপনার নিকট হইতে স্বরাজ এখনও অনেক দূরে। আপনার ধরনের লোক যদি বেশী থাকে আমরা কখনো অগ্রসর হইতে পারিব না। আমার কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

পাঠক—আপনার এই সকল গোলমেলে কথায় তো বোঝা যাইতেছে যে, আপনি আমার কথাই উড়াইয়া দিতে চাহেন। আপনি যাঁহাদিগকে ভারতের শুভার্থী মনে করেন, তাঁহাদিগকে আমি হিতকারী বলিয়া মানি না। কাজেই এই সব ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনার আলোচনা কি শোনা উচিত? যাঁহাকে আপনি হিন্দুস্থানের পিতামহ দাদাভাই নৌরজী বলিতেছেন তিনি হিন্দুস্থানের কি এমন উপকার করিয়াছেন? তিনি তো বলেন, ইংরেজ গভর্নররা সুবিচার করিবেন এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত।

সম্পাদক—আমি আপনাকে সবিনয়ে নিশ্চয়ই বলিব যে, এই রকম মহাপুরুষ সম্বন্ধে আপনি যে অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলিতেছেন তাহা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। কেবল তাঁহার কাজের দিকেই তাকান তো। তিনি তাঁহার জীবন হিন্দুস্থানের সেবায় সমর্পণ করিয়াছেন। ইংরেজরা হিন্দুস্থানের রক্ত শুষিয়া লইতেছে একথা দাদাভাই-ই আমাদের শিখাইয়াছেন। ইংরেজ জাতির প্রতি তাঁহার আস্থা যদি এখনও থাকে, তাহাতে কী আসিয়া যায় আজ? যেহেতু, আমাদের যৌবনের উচ্ছ্বাসে আমরা আর এক ধাপ আগাইয়া যাইতে প্রস্তুত, সেজন্য কি দাদাভাইকে আমরা কম সম্মান করিব? তাহাতেই কি তাঁহার অপেক্ষা আমরা অধিক বুদ্ধিমান হইয়া যাইব? যে সিঁড়ির সাহায্যে আমরা উঠিয়াছি সেই সিঁড়ির ধাপ ফেলিয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সিঁড়ির কোন ধাপ ফেলিয়া দিলে সমস্ত সিঁড়িটাই পড়িয়া যাইবে। আমরা আগে বালক থাকি, তারপর আমরা জোয়ান হই—তাই বলিয়া আমরা বাল্যকালকে ঘৃণা করি না, বরং সেই সকল দিনের কথা প্রেমের সহিত স্মরণ করি। অনেক দিন ধরিয়া শিখাইয়া বুঝাইয়া যে গুরু আমাকে পড়াইয়াছেন আজ যদি আমি তাঁহার অপেক্ষা কিছু বেশী শিখি, তাহা হইলেই আমি কিছু বেশী বুদ্ধিমান হইয়া যাইব না। আমার ত গুরুকে বরাবরই সম্মান করিতে হইবে। এই কথা মহা-

পুরুষ দাদাভাই সম্বন্ধেও বলা চলে। আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে তিনিই আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের স্রষ্টা।

পাঠক—ভাল বলিয়াছেন। বুঝিলাম, দাদাভাইকে সম্মান করা চাই। তাঁহাদের মত লোক ছাড়া এই জাগরণ দেখা দিত না। কিন্তু গোখলে মহাশয়কে ইঁহাদের মধ্যে একজন কেমন করিয়া বলা যায়? তিনি নিজেকে ইংরেজের একজন বড় বন্ধু বলিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইংরেজের কাছে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে; হোম রুল বা স্বরাজের কথা বলিবার আগে তাঁহাদের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা শিখিতে হইবে আমাদের। তাঁহার বক্তৃতাগুলি পড়িয়া আমি ক্লান্তি বোধ করি।

সম্পাদক—আপনি যে ক্লান্ত হইয়া পড়েন তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আপনার ধৈর্য্য নাই। পিতামাতা ধীরে চলেন এবং ছেলেদের সঙ্গে সমান পাল্লায় দৌড়াইতে পারেন না বলিয়া যাঁহারা রাগারাগি করেন, তাঁহারা পিতামাতার প্রতি অসম্মান দেখান। অধ্যাপক গোখলেও আমাদের পিতামাতার মত। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে না দৌড়াইতে পারেন তাহাতে কী হইয়াছে? যে জাতি স্বরাজ অর্জন করিতে চায়, সে পূর্বসূরীদের তাচ্ছিল্য করাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। সম্মান করার প্রথা যদি উঠাইয়া দেওয়া হয়, আমরা ব্যর্থ হইয়া যাইব। কেবল পরিণতবুদ্ধির মানুষই নিজেদের শাসন করিতে পারে—রগচটা লোকরা নয়। আরো দেখুন, যখন গোখলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিজের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন সে সময় ঐ রকমের কয়জন লোক ছিলেন? আমার বিশ্বাস যে, তিনি যাহা কিছু করেন তাহা মনের শুদ্ধভাব হইতেই করেন এবং হিন্দুস্থানের যাহাতে হিত হয় সেই বিবেচনা করিয়াই করেন। মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার অনুরাগ এতই প্রবল যে, যখনই আবশ্যক হইবে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছাইবেন না। আমি তোষামোদ করিয়া একথা বলিতেছি না, যাহা উচিত মনে করি তাহাই বলিতেছি। এজন্যই তাঁহার প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা থ.কা উচিত।

পাঠক—তাহা হইলে কি তাঁহার সকল কর্মেই আমাদের তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হইবে?

সম্পাদক—আমি এমন কথা কখনও বলিতে চাই না। আপনি শুদ্ধ শান্ত মনে বিচার করিয়া যাহা ঠিক করেন সেই অনুসারেই চলিবেন। গোখলেও সেই কথাই বলিবেন। তাঁহার কাজের নিন্দা না করি ইহাই আমাদের দেখিতে হইবে। বরং একথাই মনে রাখিতে হইবে যে তিনি আমাদের চেয়ে অনেকগুণ বড়, মহত্তর এবং ভারতের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, আমাদের কাজ সে তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। যে সকল কাগজ তাঁহার সম্বন্ধে অসম্মানজনক কথা লেখে তাহার প্রতিবাদ করা চাই। গোখলের মত মানুষদের স্বরাজের দৃঢ় স্তম্ভ বলিয়া মনে করা চাই। অন্যের বিচার মন্দ আর আমার বিচারটা ভাল, আমার ইচ্ছামত যে না চলে সে শত্রু—এরূপ মনে করা বড় খারাপ।

পাঠক—এখন আপনার কথা কিছু কিছু বুঝিতেছি। আমাকে নতুন করিয়া ভাবিতে হইবে। কিন্তু হিউম বা স্যার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ প্রমুখ সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা এখনো ঠিক বুঝিতেছি না।

সম্পাদক—ভারতীয়দের সম্বন্ধে বিচারের যে নিয়ম, ইংরেজদের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম খাটে। আমি সকল ইংরেজকেই খারাপ মনে করি না। হিন্দুস্থানে যাহাতে স্বরাজ আসে অনেক ইংরেজ তাহার পক্ষপাতী। একথা ঠিক যে, ইংরেজ জাতির মধ্যে স্বার্থের মাত্রা অধিক। কিন্তু তাহা হইতে একথা প্রমাণ হয় না যে, সকল ইংরেজই মন্দ। যিনি ন্যায় ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে অপরের সঙ্গেও ন্যায্য আচরণ করিতে হইবে। স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ আমাদের অমঙ্গল যাচ্ঞা করেন না—ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এই বিষয়টি লইয়া আরো বিচার করিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা ন্যায়ের উপর যত নির্ভর করিব তত শীঘ্র শীঘ্র হিন্দুস্থান মুক্তিলাভ করিবে। আপনি ইহাও বুঝিবেন যে, আমরা যদি প্রত্যেক ইংরেজকেই শত্রু মনে করি, স্বরাজ বিলম্বিত হইবে। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হই, আমাদের লক্ষ্য সাধনের পথে তাঁহাদের সমর্থন পাইব।

পাঠক—ইংরেজরা স্বরাজ-লাভে আমাদের সাহায্য করিবে, ইহা নিছক বাজে কথা বলিয়াই মনে হয়। ইংরেজের সাহায্য এবং আমাদের স্বরাজ-লাভ—এই দুটি পরস্পর বিপরীত। ইংরেজরা কী করে আমাদের স্বরাজ বরদাস্ত করবে? কিন্তু এ সব কথা তুলিয়া আমি সময় নষ্ট করিব না। যখন আপনি স্বরাজ পাওয়ার উপায় বিচার করিবেন, তখন হয়তো এ বিষয়ে আপনার কথা বুঝিতে পারিব। কথাবার্তার মাঝখানে ইংরেজের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার কথা তুলিয়া আপনি আমাকে ভুল পথে লইয়া গিয়াছেন। সুতরাং ওকথা এইখানেই শেষ করা ভাল।

সম্পাদক—আমি ইংরেজের কথা লইয়া বেশী আলোচনা করিতে চাই না—আর আপনাকে ভুল পথে লইবার ইচ্ছাও নাই। তিক্ত ঔষধ প্রথম হইতে খাওয়াইয়া দেওয়াই ভাল। ধীরে ধীরে আপনার ভুল দূর করাই আমার কাজ।

পাঠক—আপনার একথা আমার ঠিক মনে হয়, আর নিজের নিকট যে কথা ঠিক বোধ হয় সে কথা বলিতে সাহসও বাড়ে। আর একটা সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে উহাও জিজ্ঞাসা করিব। আপনি বলিতেছেন যে কংগ্রেসের আরম্ভ হইতে স্বরাজের গোড়া পত্তন হইয়াছে—ইহার মানে কী?

সম্পাদক—দেখুন, কংগ্রেস হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোককে একত্র করিয়া উহাদের মধ্যে স্বরাজ-ভাবনা জাগাইয়া দিয়াছে। কংগ্রেসের উপর সরকারের কড়া নজর আছে। কংগ্রেস বরাবরই এই দাবি জানাইয়া আসিয়াছে যে, যাহারা খাজনা দেয়, টাকা কেমন ভাবে ব্যয় হইবে তাহা বলিয়া দেওয়ার অধিকারও সেই প্রজার আছে। ঐ অধিকার পাওয়া যাইবে কিনা, উহা উচিত কি অনুচিত, উহা অপেক্ষা আরও ভাল কিছু আছে কিনা, সে কথা আলাদা। আসল কথা হইতেছে এই যে, কংগ্রেস দেশের লোককে স্বরাজের অগ্রিম আস্বাদ দিয়াছে। কংগ্রেসের এই কাজের জন্য বাহাদুরি অপর কাহারও লওয়া অন্যায়। আর আমরা যদি তাহা করি, অকৃতজ্ঞতা হইবে। তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা আমাদের লক্ষ্য পূরণ বিঘ্নিতই হইবে। জাতি হিসাবে আমাদের পুষ্টির পক্ষে কংগ্রেসকে যদি আমরা পরিপন্থী বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগাইতে আমরা অক্ষম হইব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গ-ভঙ্গ

পাঠক—আপনি যেভাবে সব বিষয়টি তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহাতে এ কথা বলাই ঠিক মনে হয় যে কংগ্রেসই স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু একথাও তো আপনাকে মানিতে হইবে যে, উহা সত্যকার জাগরণ নহে। তাহা হইলে সত্যকার জাগরণ কখন ও কেমন করিয়া হইয়াছে সেই কথা বলুন।

সম্পাদক—বীজ তো সর্বদা চোখে দেখা যায় না—মাটির নীচে থাকিয়াই ভিতরে ভিতরে নিজের কাজ করিয়া শেষে মাটির সহিত মিশিয়া যায়। উহার প্রভাবে মাটির ভিতর হইতে বড় গাছ গজাইয়া উঠে। কংগ্রেসকেও এই রকম জানিবেন। যাহাকে আপনি সত্যকার জাগরণ বলেন উহা বঙ্গ-ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এজন্য লর্ড কার্জনকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বাংলা দেশ দুই টুকরা করা হইলে বাঙ্গালীরা কার্জন সাহেবের সহিত অনেক যুক্তিতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতার দম্ভে তাঁদের সে সব প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। তিনি ধরিয়াই লইলেন যে, ভারতীয়রা কেবল আবলতাবল বকবকই করিতে পারে, তাহারা কখনো কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারে না। তিনি অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করিলেন এবং সব রকম বিরোধিতা নস্যাৎ করিয়া বাঙ্গলাকে বিভক্ত করিলেন। জানিবেন, ঐ দিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ দ্বারাই ইংরেজ শক্তি সব চেয়ে বড় ধাক্কা খাইয়াছে। কিন্তু একথা মনে করিবেন না যে, বঙ্গ-ভঙ্গ করিয়াই সর্বাপেক্ষা বড় অন্যায় করা হইয়াছিল। লবণ-কর আদৌ সামান্য অবিচার নয়। এসব কথার আলোচনা পরে করিব। জনসাধারণ বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিহত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সময় প্রবল আলোড়ন জাগিয়াছিল। বাংলার অনেক নেতা সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস ছিল। আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুন নিভিবার নয়। বঙ্গ-ভঙ্গ তো রদ হইবেই—বাংলা আবার এক তো হইবেই * কিন্তু ইংরেজের জাহাজে যে ছিদ্র হইয়াছে তাহা আর বন্ধ হইবে না। ঐ ছিদ্র দিন দিন বাড়িতেই থাকিবে। হিন্দুস্থান একবার যে জাগিয়াছে আবার তাহার ঘুমাইয়া পড়া অসম্ভব। বঙ্গ-ভঙ্গ রদের দাবি স্বরাজের দাবির সামিল। বাংলার নেতারা একথা খুব বোঝেন। ইংরেজ অফিসারদের নিকটও একথা গোপন নাই। আর সেইজন্য বঙ্গ-ভঙ্গ এতদিন রদ হয় নাই। দিনে দিনে জাতি তৈয়ারী হইতেছে; একদিনে জাতি গড়িয়া উঠে না—বহু বৎসর লাগে।

পাঠক—আপনার মতে বঙ্গ-ভঙ্গের ফল কী হইয়াছে?

সম্পাদক—এতদিন আমরা এই কথাই মনে করিয়া আসিয়াছি যে, অভিযোগের প্রতিকারের জন্য রাজার নিকট আমাদের দরবার করিতে হইবে; আর যদি প্রতিকার না হয়, আমাদের নীরবে বসিয়া থাকিতে হইবে, কেবল তখনও আমরা দরখাস্ত

* ১৯০৮ সালে একথা লেখা হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে এই কথা যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়—বাংলা আবার জোড়া লাগে।

পাঠাইয়া যাইতে পারি। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পর লোকে বুঝিয়াছে যে, চাওয়ার পিছনে বল থাকা দরকার, কষ্ট স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। এই নতুন চিন্তা-ধারা বঙ্গ-ভঙ্গের প্রধান ফল। সংবাদপত্রাদিতে স্পষ্ট ভাষণে এই ভাবই প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে কথা গোপনে আর ভয়ে ভয়ে বলা হইত, প্রকাশ্যে সেই কথা শোনানো হইতে লাগিল। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইল। ইংরেজ দেখিয়া ছোট বড় সবাইয়ের ভয় পাওয়া বন্ধ হইল। এমন কি মারধোর হাঙ্গামা বা জেলে যাওয়ার ভয়ও কাটিয়া গেল। ভারত-মাতার অনেক সুসন্তান বর্তমানে দেশ থেকে নির্বাসিত। নিছক আবেদন, দরখাস্ত করা থেকে পৃথক কিছু এটি। এইভাবে জনগণের মধ্যে আলোড়ন জাগিল। বাংলায় যে আবেগ উদ্দীপনার সৃষ্টি তাহা উত্তরে পাঞ্জাব আর দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল।

পাঠক—ইহা ছাড়া আর কী কী বিশেষ ফল আপনি দেখিতেছেন?

সম্পাদক—বঙ্গ-ভঙ্গে যেমন ইংরেজের জাহাজে ছিদ্র হয়, তেমনি আবার আমাদেরও এক হানি হয়। বড় বড় ঘটনা সংঘটনে সর্বদাই বড় ফল ফলে। আমাদের নেতাদের মধ্যে দুই দল হইয়া গেল। এক মডারেট, অপর একস্ট্রীমিস্ট। আমরা নরম ও গরম দল বলিয়া থাকি। কেহ কেহ মডারেটকে ভীরু আর একস্ট্রীমিস্টকে সাহসী বলিয়া থাকেন। যাঁহার যেমন বিচার তিনি সেই রকম অর্থ করিয়া থাকেন। সে যাহাই হউক, একথা ঠিক যে এই দুই দলের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হইয়াছে। একপক্ষ অপরকে অবিশ্বাস করেন; পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিসন্ধিপরায়ণতার দোষারোপ করেন। সুরাট কংগ্রেসের সময় প্রায় মারপিট পর্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। আমার মত, এরূপ ভাগের দ্বারা দেশের লাভ হয় না। তবে আমি একথাও মনে করি যে এই বিভেদ বেশী দিন থাকিবে না। কতদিন থাকিবে, তাহা আমাদের নেতাদেরই উপর নির্ভর করে।

তৃতীয় অধ্যায়

অশান্তি ও অসন্তোষ

পাঠক—আপনি বঙ্গ-ভঙ্গকে জাগরণের কারণ বলিলেন, কিন্তু উহা হইতে যে অশান্তি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে কি আপনি স্বাগত জানান?

সম্পাদক—কেউ যখন ঘুম হইতে উঠে তখন যেমন আলস্যে গা-মোড়া দেয়, একটু অস্বস্তি বোধ করে, ঘুমঘোর সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে সময় লাগে, তেমনি বঙ্গ-ভঙ্গের ফলে যদিও জাগরণ ঘটিয়াছে তবু পুরা জাগৃতি আসে নাই। এখনো একটা অস্বস্তির অবস্থায় আমরা আছি। নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থাটাকেও যেমন আবশ্যকীয় অবস্থা বলা যায়, তেমনি ভারতে বর্তমানের এই অশান্তি স্বাভাবিক বলিয়াই ধরিতে হইবে। অশান্তি ঘটিতেছে, আমরা যে তাহা উপলব্ধি করিতেছি, ইহার ফলেই খুব সম্ভব আমরা ঐ পর্যায় কাটাইয়া উঠিব। জাগিয়া

উঠিলে কেহ বরাবরই গা-মোড়া দিতে থাকে না, তেমনি এই অশান্তিও অবশ্যই আমাদের দূর হইবে। অশান্তি কাহারও ভাল লাগে না।

পাঠক—কিরূপ অশান্তি আপনি দেখিতেছেন?

সম্পাদক—আসলে এই অশান্তি হইল অসন্তোষ। আজকাল ঐ অসন্তোষকে আমরা অশান্তি বলিয়া থাকি। হিউম সাহেব সর্বদা বলিতেন, ভারতে অসন্তোষ প্রচার প্রসার দরকার। এই অসন্তোষ খুব ফলপ্রদ। যে ব্যক্তি নিজের দশায় সন্তুষ্ট, তাহাকে সেই অবস্থা হইতে বাহির হইতে রাজি করানো কঠিন। সেইজন্য প্রত্যেক সংস্কার, পরিবর্তনের পূর্বেই অসন্তোষ সৃষ্টি আবশ্যিক। আমরা যখন কোন কিছু অপছন্দ করিতে শুরু করি, তখনই তা দূরে ছুঁড়িয়া দিই। ভারতীয় ও ইংরেজদের মহৎ গ্রন্থ, রচনা পাঠে আমাদের মধ্যে এইরূপ অসন্তোষ জাগিয়াছে। অসন্তোষ থেকে অশান্তির আগুন জ্বলিয়াছে; ফলে কত জীবনহানি ঘটিয়াছে; কতজন জেলে পচিতেছে, অথবা দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। এখনো আরো কিছু বাকি আছে। এই অশান্তি মঙ্গলের চিহ্ন, কিন্তু তাহা মন্দ ফলও প্রসব করে।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বরাজ কী?

পাঠক—এতক্ষণে বুঝিলাম, হিন্দুস্থানে ঐক্য আনিতে কংগ্রেস কী করিয়াছেন, বঙ্গ-ভঙ্গ দ্বারা কীভাবে জাগরণ ঘটিল, অশান্তি আর অসন্তোষ কেমন করিয়া দেশে ছড়াইতেছে। এখন স্বরাজ সম্বন্ধে আপনার মত কী জানিতে চাই। অবশ্য এ সম্পর্কে আপনার ও আমাদের ব্যাখ্যা এক হইবে না বলিয়াই আমার আশঙ্কা।

সম্পাদক—মতের তফাত ত হইতেই পারে। স্বরাজের জন্য আমরা সকলেই ত অধৈর্য্য। কিন্তু এখনো স্থির করা হয় নাই যে, স্বরাজ কী? অনেকে মনে করেন, ইংরেজকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ার নামই স্বরাজ। কিন্তু মনে হয় যে, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে আসা হয় নাই। আচ্ছা, আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি যে, যদি আমরা যাহা চাই, ধরা যাক, ইংরেজরা তাহাই দিল, তবুও কি ইংরেজদের তাড়াইয়া দিতে হইবে?

পাঠক—আমি ইংরেজদের একটি কথাই বলিব যে, দয়া করিয়া আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাও। তাঁহারা এই অনুরোধ রক্ষা করিবার পরও যদি ভারতবর্ষ থেকে তাঁহাদের বিদায়ের অর্থ এই হয় যে তাঁহারা তখনও এ দেশে রহিয়া গিয়াছেন, আমার কোন আপত্তি থাকিবে না। তখন আমরা বুঝিয়া লইব যে, তাঁহাদের ভাষায় 'চলিয়া গিয়াছে' শব্দটি 'থাকিয়া গেল'-র সমার্থক।

সম্পাদক—আচ্ছা ধরিয়া নিন, ইংরেজ রাজকার্য ছাড়িয়া দিল তাহা হইলে আপনারা কী করিবেন?

পাঠক—এ কথার এখন কী জবাব দিব? ইংরেজ চলিয়া গেলে কী অবস্থা

দাঁড়াইবে তাহা প্রধানতঃ প্রস্থানের প্রকৃতিরই উপর নির্ভর করে। আপনি যে-রকম ধরিয়া লইতেছেন, সেইমত তাঁহারা যদি প্রস্থানই করেন, আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে আমরা তখনও তাঁহাদের সংবিধানই বজায় রাখিব ও সরকার পরিচালনা করিতে থাকিব। আর যদি বলার ফলে তাহারা কেবল চলিয়াই যায়, আমাদের হাতের কাছে ত সেনাবাহিনী প্রভৃতি থাকিয়াই যাইবে; সরকার চালাইতে আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না।

সম্পাদক—আপনি ঐরকম ভাবিতে পারেন; আমি তাহা ভাবি না। যাহা হোক এখন এ বিষয় লইয়া আলোচনা করিব না। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হইবে। আপনার নিকট আরও দুই একটি প্রশ্ন করিয়া এই কাজ সহজ করিয়া লইব। আপনি ইংরেজদের তাড়াইয়া দিতে চাহেন কেন?

পাঠক—ইংরেজ রাজত্ব করার জন্য দেশ গরিব হইয়া যাইতেছে ইহাই কারণ। তাহারা বছরের পর বছর এ দেশ হইতে ধন লইয়া যাইতেছে। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি তাঁহারা নিজেদের জন্য সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের গোলাম করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করেন ও আমাদের আবেগ অনুভূতির অমর্য্যাদা করেন।

সম্পাদক—যদি উহারা দেশের সম্পদ লইয়া যাওয়া বন্ধ করে, ভদ্র হইয়া যায়, আমাদের উচ্চ পদ দেয়, তাহা হইলে উহাদের থাকিতে কোনও দোষ আছে বলিয়া কি আপনি মনে করেন?

পাঠক—এ কেবল বাজে আলোচনা। বাঘ যদি তাহার নিজের স্বভাব বদলায় তবে তাহার সহিত মেলামেশা করিতে ক্ষতি কী, জিজ্ঞাসা করাও যেমন, আপনার কথাও তেমনি। বাঘ যদি নিজের ব্যবহার বদলাইতে পারে তাহা হইলে ইংরেজরাও পারে। ইহা সম্ভব নয়; ইহা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করাও মানুষের অভিজ্ঞতার বিপরীত।

সম্পাদক—আচ্ছা ধরুন, কানাডাবাসী ও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের ধরনে স্বশাসিত সরকার যদি আমরা পাই, তাহা হইলে কি খুব ভাল হইবে?

পাঠক—ইহাও অহেতুক প্রশ্ন। আমাদের যখন একই রকম ক্ষমতা হইবে, আমরা ইহা পাইব। তখন আমরা নিজেদের পতাকা উড়াইব। জাপান যেমন, ভারতবর্ষও সেই রকম হইবে। আমাদের নিজেদের নৌবহর থাকিবে, সেনা থাকিবে এবং আমাদের নিজস্ব জাঁকজমকও এবং তখনই বিশ্বে ভারতের কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিবে।

সম্পাদক—আপনি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। কার্যতঃ ইহার মানে ত এই যে, আপনার ইংরেজ শাসন চাই, ইংরেজ চাই না। বাঘের স্বভাব চান, বাঘটি চান না। অর্থাৎ আপনি হিন্দুস্থানকে ইংরেজি তৈরি করতে চান। কিন্তু তাহা হইলে আর হিন্দুস্থান থাকিবে না, ইংলিশস্থান হইবে। আমি যে স্বরাজ চাহি, এটি তাহা নয়।

পাঠক—আমি যেমন বুঝি স্বারজের সেই রকম রূপ বর্ণনা করিয়াছি। আমরা যাহা শিখিয়াছি তাহার যদি কিছু মূল্য থাকে, স্পেনসর, মিল ইত্যাদির লেখার যদি

কোনও গুরুত্ব থাকে, আর ইংরেজের পার্লামেণ্ট সকল পার্লামেণ্টের মাতৃস্বরূপা একথা যদি ঠিক হয়, তবে ত আমার মতে অবশ্যই ইংরেজের নকল করা চাই; আর এতটা নকল করা চাই যে, ওরা যেমন নিজের দেশে আর কাহাকেও পা গাড়িতে দেয় না, তেমনি আমরাও তাহাদের বা অন্যদের আমাদের দেশে গাড়িয়া বসিতে দিব না। উহারা নিজের দেশের যে অবস্থা করিয়াছে তেমন ত আর কোথাও দেখিতে পাই না। কাজেই তাহাদের সরকারী কাঠামোর ধাঁচ-ধরন আমদানি করাই আমাদের পক্ষে ঠিক। কিন্তু এখন আপনার অভিমত শুনিতে চাই।

সম্পাদক—ধৈর্য্য ধরুন। এই চর্চা-আলোচনার মধ্য দিয়াই আমার মত ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। স্বরাজের রূপ আপনি যেমন সহজ মনে করিয়াছেন আমি তেমনি কঠিন মনে করি। এইজন্য এখন আপনাকে কেবল এইটুকুই বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, আপনি যাহাকে স্বরাজ বলেন আসলে উহা প্রকৃত স্বরাজ নয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ইংলণ্ডের অবস্থা

পাঠক—তাহা হইলে আপনার কথা থেকে আমার এই ধারণাই হইল যে, ইংলণ্ডে যেভাবে সরকার চলে তাহা বাঞ্ছনীয় নয় এবং আমাদের অনুকরণের উপযুক্তও নয়।

সম্পাদক—আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন। ইংলণ্ডের আজকাল যে অবস্থা তাহা দেখিয়া, সত্য বলিতে কি, দয়া হয়। আর আমি ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন হিন্দুস্থানের ঐ অবস্থা কখনো না হয়। যাকে আপনি পার্লামেণ্টগুলির 'মা' বলিতেছেন উহা ত বন্ধ্যা ও দেহপসারিণী বা বেশ্যা।* কথা দুইটি কড়া হইলেও এক্ষেত্রে পুরাপুরিই খাটে। বন্ধ্যা এই হিসাবে বলা যায় যে, আজ পর্যন্ত পার্লামেণ্ট আপনা হইতে কোনও ভালো কাজ করে নাই। উহার স্বভাবই এমন যে, বাহিরের চাপ না পড়িলে কোন কাজই করিতে পারে না। আর দেহপসারিণীর মত এই অর্থে যে মন্ত্রীমণ্ডল, যাঁহারা মাঝে মাঝেই বদলাইতেছেন, এই পার্লামেণ্ট তাঁহাদেরই নিয়ন্ত্রণে। আজ এ মিঃ এসকুইথের দখলে; কাল হয়ত মিঃ ব্যালফোরের দখলে যাইবে।

পাঠক—আপনি ব্যঙ্গ করিয়াই এরূপ বলিতেছেন। বন্ধ্যা বিশেষণটি খাটে না। পার্লামেণ্ট জনগণের দ্বারা নির্বাচিত; কাজেই নিশ্চয়ই জনসাধারণের চাপেই কাজ করিবে। ইহা ত পার্লামেণ্টের গুণ।

সম্পাদক—সম্পূর্ণ ভুল বিচার। আসুন, আরো কিছু গভীরভাবে পরীক্ষা

* পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে এই 'বেশ্যা' বিশেষণটি গান্ধীজী বদলেছিলেন পরে। 'এই বইয়ে কেবলমাত্র একটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই বদলাইতে চাই না। এবং তাহাও বদলাইতে চাই একজন ইংরেজ মহিলার অনুরোধে।' ১৯২১ সালে ইয়ং ইণ্ডিয়ায় গান্ধীজী ঐকথা লেখেন। —সম্পাদক

করি। ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে, সবচেয়ে ভালো লোক জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সদস্যগণ বিনা বেতনে কাজ করেন; কাজেই ইহাই অনুমান করিতে হয় যে তাঁহারা জনহিতের জন্যই সেখানে যান। যাঁহারা নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহারা শিক্ষিত বলিয়াই গণ্য হন। সেইজন্য আমাদের ধরিয়া লওয়া উচিত যে, তাঁহারা ভুল করিতেছেন না। এই রকম যে পার্লামেণ্ট তাহার প্রার্থনা-পত্র বা তাহাকে ঠিক রাখিবার জন্য চাপ দেওয়ার আবশ্যক হয় না। এই রকম পার্লামেণ্টের কাজ এমন হওয়া চাই যে, দিন দিন উহার শক্তি বর্ধিত হয় ও লোকের উপর উহার প্রভাব বাড়ে। কিন্তু এইরূপ না হইয়া কার্যতঃ কী হয়? সকলেই ইহা স্বীকার করেন যে, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ কপটাচারী ও স্বার্থপর। সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ-পূরণের চেষ্টাই করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্ট কেবল মাত্র ভয়েই যাহা কিছু কাজ করে। আজ যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে কাল তাহা রদ করিতে হয়। আজ পর্যন্ত পার্লামেণ্ট এমন কোন কাজই করিতে পারে নাই যাহাতে বলা যায় যে, সে উক্ত কাজের শেষ অবধি পেঁাছিতে পারিয়াছে। বড় বড় বিষয় আলোচনার সময় কোন কোন সদস্য ঘুমাইয়া পড়ে, কখনও বা বসিয়া বসিয়া ঝিমায়। আবার কখনও বা এমন সোরগোল করে যে, যাহারা শুনিতে চায় তাহাদের আর বসিয়া শুনিবার সাহস থাকে না।

কারলাইল পার্লামেণ্টকে বিশ্বের কথা-বলার দোকান ('টকিং শপ') বলিয়াছেন। পার্লামেণ্টে যিনি যে-পক্ষের সদস্য সেই পক্ষে চক্ষু বুজিয়া মত দিয়া থাকেন এবং ঐরকম মত দিতে তাঁহাকে বাধ্যও করা হয়। পার্লামেণ্টে কোনও সদস্য যদি নিজের দলের সহিত ভোট না দেন তবে তাঁহাকে বিশ্বাসহন্তা বলিয়া ধরা হয়। যে সময় ও অর্থ পার্লামেণ্ট হইতে নষ্ট করা হয় ঐ সময় ও অর্থ অল্প কয়েকজন কাজের লোকের হাতে পড়িলে ইংরেজ জাতি আজ অনেক উচ্চ আসন পাইতে পারিত। পার্লামেণ্ট জাতির কাছে নিছক দামী খেলনা। এ সব আমার একার কথা মনে করিবেন না। বড় বড় বুদ্ধিমান ইংরেজরাও এইরূপ বলেন। একজন সদস্য ত এতদূর পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, খাঁটি খৃষ্টান পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে পারেন না। অপর একজন বলিয়াছেন যে, পার্লামেণ্ট একটি অসহায় খোকা। আজ সাত-শত বৎসর পরেও যদি পার্লামেণ্ট খোকাই থাকিয়া যায়, তবে না জানি কবে বড় হইবে?

পাঠক—আপনি আমাকে চিন্তায় ফেলিয়া দিলেন। আশা করি, আপনি আমাকে আপনার সব কথাই একেবারে মানিয়া লইতে বলিবেন না। আপনি সম্পূর্ণ নতুন সব অভিমত দিলেন। আমাকে ঐগুলি পরিপাক করিতে হইবে। এখন আপনি আমাকে বুঝাইয়া দিন, 'দেহপসারিণী' শব্দটি কেন ব্যবহার করিলেন।

সম্পাদক—আমি একথা স্বীকার করি যে, আমি যাহা বলিয়াছি আপনি সে সকলই মানিয়া লইতে পারেন না। সময় পাইলে যদি কখনও আপনি ঐ বিষয়ে যে সব পুস্তকপুস্তিকা আছে তাহা পড়েন তবে কিছু বুঝিবেন। পার্লামেণ্টকে 'বেশ্যা' বা দেহপসারিণী পদবী মিছামিছি দেওয়া হয় নাই। উহার সত্যকার মালিক বলিয়া কেহ নাই। প্রধানমন্ত্রীর অধীনেও উহার চালচলন এক ধরনের থাকে না;

দেহপসারিণীর মতই উহাকে ঘোরানো ফেরানো হয়। পার্লামেন্টের কল্যাণের জন্য যত না, তার চেয়ে অনেক বেশী নিজ ক্ষমতার জন্য প্রধানমন্ত্রী উদ্বিগ্ন। তিনি সব সময়ই নিজের পক্ষ যাহাতে জয়ী হয় সেই চেষ্টাই করেন। পার্লামেন্ট যাহাতে উচিত কাজ করে সে দিকে তাঁহার খুব কমই খেয়াল থাকে। ইহা জানা কথা যে, প্রধানমন্ত্রী কেবল দলীয় সুবিধার জন্য পার্লামেন্টকে দিয়া কাজ করাইয়া লন। ইহার উদাহরণ যত ইচ্ছা দেওয়া যায়। এই সব বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

পাঠক—যাহাদের আমরা আজ পর্যন্ত দেশভক্ত ও খাঁটী লোক বলিয়া মানিতাম, আপনি ত তাঁহাদের উপরই আক্রমণ করিতেছেন।

সম্পাদক—হাঁ, সে কথা ঠিক। প্রধানমন্ত্রীদের সহিত আমার কোনও শত্রুতা নাই। কিন্তু আমি যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমার ইহাই মনে হইয়াছে যে, তাঁহাদের খাঁটি দেশভক্ত বলা যায় না। ঠিক যাহাকে ঘুষ বলে সে জিনিসটার লেন-দেন তাঁহারা করেন না, সেজন্য ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের সৎ লোক বলিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা চাতুরির কবলে পড়েন। নিজেদের উদ্দেশ্য হাঁসিলের জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই উপাধি, খেতাবের ঘুষ দেন। আমি একথা বলিতে দ্বিধা বোধ করি না যে তাঁহাদের না আছে সত্যকার সততা, না সজাগ বিবেক।

পাঠক—পার্লামেন্ট সম্বন্ধেই যখন আপনি এই অভিমত জানাইলেন, তখন ইংরেজদের সম্বন্ধে আপনার মত কী, তাহাও শুনিতে চাই, যাহাতে তাঁহাদের সরকার সম্বন্ধে আপনার অভিমত আমি বুঝিতে পারি।

সম্পাদক—ইংরেজ ভোটারদিগের নিকট আজকাল ত সংবাদপত্রই হইতেছে বাইবেল। খবরের কাগজ দেখিয়াই উহারা নিজের মত স্থির করে। কিন্তু খবরের কাগজের কথার ত কোনই মূল্য নাই; কেননা কাগজ নিজেই অসদাচারী। একই জিনিস খবরের কাগজে দুই রকম রূপে দেখা দেয়। একদল উহাকে পর্বত প্রমাণ করিয়া তোলে, অপর দল উহাকেই সরিষা প্রমাণ দেখে। এক খবরের কাগজ এক নেতাকে যদি ভাল বলে, অপর কাগজ তাহাকে মন্দ বলিবে। এমন খবরের কাগজ যে দেশে, সে দেশের লোকের অবস্থা আর কী হইবে।

পাঠক—আপনিই বলুন।

সম্পাদক—এই সব লোক ঘন ঘন মত বদলায়। ইংরেজদের ভিতর একটা কথা চলিত আছে যে, সাত বৎসর পর পর তাহারা নিজেদের বদলাইয়া ফেলে। তাহাদের মতামত ঘড়ির পেন্ডুলামের মত এদিক ওদিক দোলে, কখনো স্থির হয় না। লোকে শক্তিশালী বক্তাকে অনুসরণ করে কিংবা যে ব্যক্তি তাঁহাদের পার্টি দেন, অভ্যর্থনা জানায় তাঁহাকেই। যেমন মানুষ, তেমনি তাঁহাদের পার্লামেন্টও। তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদের মধ্যে একটি গুণ খুব দৃঢ়ভাবে প্রোথিত। তাহা হইল যে, তাহারা কখনই নিজেদের দেশকে অন্যের হাতে যাইতে দিবে না। ওদিকে কেহ চোখ দিলে চোখ কানা করিয়া দিবে। কিন্তু ইহাতেই এমন কথা বলা যায় না যে, ইংরেজদের ভিতর সব গুণই রহিয়াছে এবং সেইজন্য উহাদের নকল করা চাই। আমার বিশ্বাস যে, হিন্দুস্থান যদি ইংরেজদের নকল করে তবে সে সত্য সত্যই ধ্বংস হইবে।

পাঠক—ইংলণ্ডের এমন অবস্থা হওয়ার হেতু অপানি কী মনে করেন?

সম্পাদক—ইংরেজদের কোন বিশেষ ত্রুটির জন্য যে এমন ঘটিয়াছে, তাহা নয়; ইহা হইল আধুনিক সভ্যতার ফল। এই সভ্যতা নামেই। এই সভ্যতায় ইউরোপের সব জাতিই দিন দিন নামিয়া যাইতেছে, ধ্বংস হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সভ্যতা

পাঠক—এখন আপনাকে সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে। আপনি ত সভ্যতাকেই অসভ্যতা বলিয়া মনে করিতেছেন।

সম্পাদক—কেবল আমি নহি কয়েকজন ইংরেজ লেখকও এই সভ্যতাকে অসভ্যতা বলিয়াছেন। এ বিষয়ে অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। সভ্যতার অপগুণ থেকে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছে। একজন বড় ইংরেজ লেখক একখানা বই লিখিয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন "সভ্যতা : হেতু ও নিরাময়ের উপায়"। ঐ পুস্তকে সভ্যতাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

পাঠক—এ সকল সংবাদ ত কই আমরা পাই না।

সম্পাদক—ইহার কারণ ত সহজেই বোঝা যায়। কে নিজের কথার উল্টা প্রমাণ করিতে চায়? যাঁহারা এই সভ্যতায় বুদ হইয়া আছেন তাঁহাদের এই সভ্যতা সমর্থনের জন্যই সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে দেখা যায়, এই সভ্যতার বিরোধী প্রমাণ তাঁহারা প্রচার করেন না। তাঁহারা যে জানিয়া বুঝিয়া এমন করিতেছেন তাহা নহে, তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারেই ঐ কাজ করেন। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নকেই সত্য মনে হয়, চোখ খুলিলে তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারা যায়। সভ্যতার বিপাকে পড়িলে মানুষেরও ঐ দশা হয়। আমরা সকল সময়েই এই সভ্যতার প্রশংসার কথা পড়িতেছি। বড় বড় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মানুষও ইহার প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহাদের লেখা আমাদের মোহাচ্ছন্ন করে। এবং এইভাবে, একের পর এক আমরা এই আবর্তে নিমজ্জিত হইয়া পড়ি।

পাঠক—আপনার কথা ঠিক বলিয়া মনে হইতেছে। এই সভ্যতা সম্বন্ধে আপনি যাহা পড়িয়াছেন বা ভাবিয়াছেন, তাহা বলুন।

সম্পাদক—আসুন, আমরা প্রথমেই বিচার করিয়া দেখি, 'সভ্যতা' এই শব্দটি দ্বারা কী ধরনের অবস্থা বোঝায়। আধুনিক সভ্যতার সব চেয়ে খাঁটী লক্ষণ এই যে, যাঁহারা নিজেদের সভ্য বলেন, তাঁহারা নিজেদের শরীরের সুখ, আরাম সাধনাকেই সর্বাপেক্ষা বড় পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। এক শ বছর আগে ইউরোপের মানুষরা যেরূপ বাড়ি ঘরে থাকিত এখন তাহা অপেক্ষা ভাল বাড়ি ঘরে থাকে। ইহাই সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া মানা হয়, আর ইহাতে শারীরিক সুখও বাড়ে। আগেকার লোকেরা জানোয়ারের চামড়া পরিতেন ও বল্লম সড়কি চালাইতেন। এখন লম্বা পাজামা পরা হয়, নানারকমের পরিচ্ছদ দিয়া দেহ আবরণ করা হয়,

আর ভল্ল সড়কির বদলে রিভলবর ব্যবহার করা হয়। কোনও দেশের লোক, যাহারা পূর্বে কোট বুট পরে নাই, আজ যদি তাহারা কোট বুট পরিতে আরম্ভ করে তবে একথা বলা হয় যে, পূর্বে তাহারা জংলী ছিল, আজ সভ্য হইয়া গিয়াছে। আগের দিনে, ইউরোপের মানুষ নিজ হাতেই কাজ করিত ও ক্ষেতের চাষে নিজের শরীর খাটাইত। আজ ইঞ্জিনের সাহায্যে একশ বিঘা জমি একজন লোকের দ্বারাই চাষ হইতেছে, আর ঐ উপায়ে অনেক টাকা রোজগার হইতেছে। ইহাই সভ্যতার চিহ্ন। আগেকার কালে খুব অল্প লোকে মূল্যবান বই লিখিতেন। আজ যাহার ইচ্ছা বই লিখিয়া ছাপাইয়া লইতেছে, যাহা খুশি তাহাই লিখিতেছে, আর লোকের মন বিষাক্ত করিয়া দিতেছে। আগে লোকে গরুর গাড়িতে যাতায়াত করিত, আজ সেখানে ট্রেনে দিনে চার শত বা তাহারও বেশী মাইল পাড়ি দিতেছে। ইহাই সভ্যতার চরম উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। এমন কথাও বলা হয় যে, ক্রমে ক্রমে এরূপ দিনও আসিবে যখন আকাশ পথে সওয়ার হইয়া স্বল্প কয়েক ঘণ্টায় যে কোনও দেশে পৌঁছান যাইবে। লোকের হাত পা চালাইবার দরকার হইবে না। একটা বোতাম টিপিলেই কাপড় কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবে, আর একটা ঘণ্টা টিপিলেই নতুন খবরের কাগজ সামনে আসিয়া হাজির হইবে, আর একটা বোতাম টিপিলেই মোটর গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইবে—সুস্বাদু নানা ধরনের খাদ্য পরিবেশন করা হইবে। এ সবই যন্ত্রে হইবে। পূর্বে লোকে যখন একে অন্যের সহিত যুদ্ধ করিত তখন হাতাহাতি যুদ্ধ হইত। আজ পাহাড়ের আড়ালে তোপের পিছনে থাকিয়া একজন মাত্র লোক পলকের মধ্যেই হাজার লোকের প্রাণনাশ করিতে পারে। ইহারই নাম সভ্যতা! আগে লোকেরা খোলা মাঠে যতক্ষণ ইচ্ছা মজুরি করিত। এখন হাজার হাজার লোক পেটের জন্য দিনরাত কল কারখানায়, খনিতে গহ্বরে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে। উহাদের অবস্থা পশু হইতেও হীন। হাতের মুঠায় প্রাণ লইয়া বিপজ্জনক কাজে উহাদিগকে পিষ্ট হইয়া থাকিতে হয়; ক্রোড়পতির টাকা আরো বেশী সঞ্চয় হয়। আগে লোকেরা মারপিট করিয়া, জবরদস্তি করিয়া দাস বানাইত। আর এখন লোকে নিজে নিজেই শিকল পরিয়া লয়। এ সবই কেবল ধনের লোভে করে, অথবা ধন দিয়া কেনা যায় এমন আয়েস আরামের লোভে করে। আজকাল মানুষের এমন সব রোগ দেখা দিয়াছে যাহার নাম স্বপ্নেও জানা ছিল না। ঐ রোগ প্রতিকারের জন্য চিকিৎসক বাহিনী নিয়োগ করা হইতেছে ও হাসপাতালও বাড়িতেছে। ইহাও সভ্যতার এক পরিচয়। আগে চিঠি পাঠাইতে নিজের লোক বা হরকরা রাখিতে হইত, তাহাতে অনেক খরচ হইত। আর আজ এক পয়সার কার্ডে ঘরে বসিয়া শত শত ক্রোশ দূরের আত্মীয়ের নিকট সংবাদ পাঠানো যায়, যাহাকে ইচ্ছা গালি দেওয়া যায় ও আশীর্বাদও করা যায়। আগেকার লোকেরা হাতে গড়া রুটি ও সব্জি দিনে দুই তিনবার খাইত। এখন ত লোকের দুই ঘণ্টা পর পর কিছু না কিছু খাওয়া চাই। সুতরাং অন্য কাজের আর অবকাশ থাকে কোথায়? বেশী আর কী বলিব! কতকগুলি প্রামাণ্য বই থেকেই আপনি এই সব তথ্য পাইবেন। এগুলিই হইল সভ্যতার সত্যকার পরীক্ষা। যদি কেহ এ সত্য অস্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে অজ্ঞান, অশিক্ষিত বলিয়া মনে করা হয়।

এই সভ্যতা ধর্মের বিচার করে না, নীতি মানে না। ইহার উপাসকরা এই কথাই বলিয়া থাকেন যে, ধর্ম শিক্ষা দেওয়া তাঁহাদের কাজ নহে। কোনও কোনও লোক ত ধর্মকে একটা ঢং বা কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন, আবার অনেকে ধর্মের ভেক লইয়া বসিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা নীতি সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা একান্তই অসার। বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমার নিকট এই কথাই স্পষ্ট হইয়াছে যে, নীতির নামে লোককে দুর্নীতিই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। একটা ছোট ছেলেও একথা বুঝিতে পারে যে, আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাতে উহার সহিত নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। সভ্যতা শরীরের সুখ বাড়াইতে চায়, কিন্তু কই সুখ ত বাড়াইতে পারে না।

এই সভ্যতা অধর্ম। কিন্তু ইহা ইউরোপের মানুষের মন এমনভাবে দখল করিয়াছে যে তাহাদের অর্ধোন্মাদ দেখায়। শরীরে সত্যিকার বল নাই, হৃদয়ে সত্যিকার সাহস নাই। নেশা করিয়া জোর বজায় রাখে তাহারা। নির্জনে থাকিয়া তাহারা সুখ পায় না। যে নারীকে ঘরের রাণী করিয়া রাখা কর্তব্য, সেই নারী আজ গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, অথবা কারখানায় কঠিন পরিশ্রম করিতেছে। এক ইংলণ্ডে শুকনা রুটির জন্য ৪০ লক্ষ স্ত্রীলোক কারখানায় বা অমনি আর কোনও স্থানে নোংরা কাজ লইয়া কষ্টে কাল কাটাইতেছে। ওখানে যে নারীদের অধিকারের জন্য আন্দোলন দিন দিন বাড়িতেছে, এই ভয়ংকর অবস্থা তাহারও কারণ।

এই সভ্যতা এমন যে, যদি নীরবে ধৈর্যের সঙ্গে আমরা ইহাকে দেখিতে থাকি তবে দেখিতে পাইব যে, এই সভ্যতার আগুন যাহারা জ্বালাইয়া রাখিতেছে পরিণামে তাহারাই পুড়িয়া মরিবে। মহম্মদ পয়গম্বরের শিক্ষা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এই সভ্যতার রাজ্যকে শয়তানী রাজ্য বলিতে হয়। হিন্দুধর্ম ইহাকেই ঘোর কলিকাল বলিয়াছে। এই সভ্যতার ঠিক চিত্র আমি আঁকিতে পারিব না। এই সভ্যতাই ইংরেজ জাতির যাহা মৌল গুণ, তাহাকে নষ্ট করিতেছে। ইহার নাগাল হইতে বাহির হইতেই হইবে। পার্লামেণ্ট যথার্থই দাসত্বের নিদর্শন। আপনি এ বিষয়ে পড়াশুনা করিলে ও বিচার করিলে আপনার ভুল ধারণা দূর হইবে। ইহার জন্য ইংরেজদিগকে দোষী সাব্যস্ত না করিয়া কৃপা করাই দরকার। আমার মনে হয় যে, তাঁহারা সতর্ক জাত, কালক্রমে এই অবস্থা হইতে মুক্ত হইবেন। তাঁহাদের সাহস আছে, পরিশ্রমীও বটেন, তাঁহাদের চিন্তাধারা মূলতঃ দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। কিংবা তাঁহারা মন্দমনাও নন। এজন্যই আমি তাঁহাদের শ্রদ্ধা করি। তাহা ছাড়া, সভ্যতারূপ ব্যাধি দুরারোগ্য নয়। তবে একথা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে ইংরেজ জাতি বর্তমানে এই ব্যাধি-ক্লিষ্ট।



সত্যাগ্রহী

সপ্তম অধ্যায়

হিন্দুস্থান কেন পরাজিত হইল?

পাঠক—সভ্যতা সম্বন্ধে ত আপনি কথা বলিলেন। আমার ভাবিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট। ইউরোপীয়দের নিকট হইতে কী লওয়া যায়, আর কীই বা ত্যাগ করা দরকার, তাহাই ঠিক করিতে পারিতেছি না। তবে এই সঙ্গেই আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, এই সভ্যতা যদি ব্যাধি হয়, তাহা হইলে এমন রোগে ভুগিতে থাকিয়াও ইংরেজরা কী করিয়া হিন্দুস্থানকে মুঠার ভিতরে লইল—আর আজ পর্যন্ত কেমন করিয়াই বা তাহাকে দাবাইয়া রাখিয়াছে?

সম্পাদক—এখন আপনার এ প্রশ্নের উত্তর সহজ হইয়া গিয়াছে। এখন আমরা কিছুক্ষণ স্বরাজ সম্বন্ধেও বিচার করিতে পারিব। আপনার আগেকার প্রশ্ন আমি ভুলি নাই। কিন্তু আগে আপনার শেষের প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করি। ইংরেজরা হিন্দুস্থান লয় নাই। বরঞ্চ, একথা বলা যায় যে আমরা উহাদের হিন্দুস্থান দিয়া দিয়াছি। হিন্দুস্থানে উহারা নিজের বলে টিকিয়া নাই, আমরা টিকাইয়া রাখিয়াছি বলিয়াই টিকিয়া আছে। কেমন করিয়া ইহা ঘটিয়াছে সে কথা তবে শুনুন। সেই দিনের কথা মনে করুন, কোম্পানী বাহাদুরের কল্পনা করুন, যখন উহারা ব্যাপারী হইয়া এদেশে আসিয়াছিল। উহাদিগকে বাহাদুর কাহারা করিয়াছিল। এই সময় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাহাদের ছিল না। কাহারা কোম্পানীর অফিসারদের সহযোগিতা করিয়াছিল? তাহাদের রৌপ্য দর্শনে কে প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কাহারা তাহাদের মাল কিনিত? ইতিহাসই সাক্ষী যে আমরাই এই সব করিয়াছি। রাতারাতি ধনী হইবার জন্য আমরাই দুই হাত বাড়াইয়া কোম্পানীর অফিসারদের স্বাগত জানাইয়াছিলাম। আমরাই তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলাম।

ভাঙ্গ খাওয়ার অভ্যাস আমাদের, আর আমরা কিনা দোষ দিই যে ভাঙ্গ বেচে তাহাকে! উহাদিগকে দোষ দিলেই কি আমরা মুক্ত হইয়া যাইব! এক ভাঙ্গ বিক্রেতাকে তাড়াইয়া দিলে আর এক ভাঙ্গ বিক্রিওয়ালা আসিয়া জুটিবে। খাঁটী দেশভক্তের কাজ শেষ পর্যন্ত বিচার করিয়া কাজ করা। যদি ঠাসিয়া ঠুসিয়া খাওয়ার পর অজীর্ণ হয়, তারপর জলের দোষ দিলেই কি অজীর্ণ দূর হইবে? চিকিৎসক ত তিনিই যিনি ব্যাধির গোড়া ধরিতে পারেন। আপনি হিন্দুস্থানের রোগের যদি বৈদ্য হইতে চান তবে রোগের মূল দূর করা দরকার জানিবেন।

পাঠক—আপনি ঠিকই বলিতেছেন। আর আমাকে বুঝাইবার জন্য প্রমাণের দরকার নাই। আপনার অন্য আলোচনা শুনিবার জন্য আমি উৎসুক। আমরা এখন সবচেয়ে চমৎকার বিষয়ের আলোচনায় আসিয়া পড়িয়াছি। আপনি বলিয়া যান, আমার যেখানে সন্দেহ হইবে জিজ্ঞাসা করিব।

সম্পাদক—ঠিক কথা। তবে আমার আশঙ্কা হয়, আপনার উৎসাহ সত্ত্বেও, আমরা আলোচনায় আরো যত অগ্রসর হইব, আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটিবে। তাহা হউক, যখন সন্দেহ হইবে তখন প্রমাণ উপস্থিত করা যাইবে। আপনি ত একথা

শুনিয়াছেন যে, ইংরেজ ব্যাপারী আমাদের সাহায্যেই আমাদের দেশে পা ফেলিতে পারিয়াছে। দেশীয় রাজারা যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, তাহারা কোম্পানী বাহাদুরের সাহায্য চায়। কোম্পানী ব্যবসার কাজে যেমন কুশল, লড়াইতেও তেমনি কুশল ছিল। নীতি আর দুর্নীতির জন্য মাথা ঘামাইত না। ব্যবসা বাড়ানো আর টাকা জমানো—এই কেবল ছিল কোম্পানীর উদ্দেশ্য। এই বিষয়ে আমরা উহাদিগকে সাহায্য করি, আর উহারাও আমাদের সাহায্য লয়, কুঠি খুলিতে থাকে। কুঠি রক্ষার জন্য উহারা সৈন্য রাখিত। তাহাদিগকে আমরা আমাদের কাজে লাগাইতাম। সুতরাং এখন উহাদের উপর দোষারোপ করা মিথ্যা। ঐ সময় হিন্দুমুসলমানেও ঝগড়া চলিতেছিল। ইহাতেও কোম্পানী সুযোগ পায়। এই রকম করিয়া আমরা নিজেরাই কোম্পানীর হাতে হিন্দুস্থান তুলিয়া দেওয়ার সমস্ত সরঞ্জাম জোগাইয়াছি। এইজন্য হিন্দুস্থান কী করিয়া পরাজিত হইল তাহা না বলিয়া, আমরা কী করিয়া অপরের হাতে হিন্দুস্থান সমর্পণ করিয়া দিলাম সেই কথা বলাই ঠিক।

পাঠক—আচ্ছা এখন বলুন ত ইংরেজ কীভাবে ভারতকে আপন অধিকারে রাখিয়াছে?

সম্পাদক—আমাদেরই কৃপায়। যেমন আমরাই নিজের দেশ উহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছি, তেমনি এই দেশ উহাদের হাতে টিকাইয়া রাখিবার জিম্মাদারীও আমরাই করিতেছি। অনেক ইংরেজ বলিয়া থাকে—"আমরা তলোয়ারের জোরে হিন্দুস্থান লইয়াছি আর তলোয়ারের জোরেই শাসন করিতেছি।" কিন্তু এই কথা দুইটী একেবারে ভুল। হিন্দুস্থানকে দখল করিয়া রাখার মধ্যে তলোয়ারের কোনও স্থান নাই। যাহাদের জোরে উহারা টিকিয়া আছে সে হইতেছি আমরা নিজেরা।

নেপোলিয়ন ইংরেজদিগকে বেনে (দোকানদারের জাতি) বলিয়া একটুকুও ভুল করেন নাই। যেখানে তাহারা রাজত্ব করিতেছে সেখানেই ব্যবসার জন্য করিতেছে। উহাদের সৈন্য আর সিপাহী ব্যবসা-রক্ষার জন্যই। যখন ট্রান্সভালে উহাদের ব্যবসার অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না, তখন গ্লাডস্টোন বলিয়াছিলেন যে, ট্রান্সভাল হাতে রাখার দরকার নাই। ব্যবসার অবস্থা লাভজনক হওয়াতেই বাধা সৃষ্টি হয় এবং তাহা হইতেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চেম্বারলেন শীঘ্র আবিষ্কার করেন যে, ট্রান্সভালের উপর ইংরেজের সার্বভৌম অধিকার রহিয়াছে। কথিত আছে, স্বর্গীয় প্রেসিডেন্ট ক্রুগারকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"চাঁদে সোনা আছে কিনা।" তিনি জবাব দিয়াছিলেন,—চাঁদে সোনা থাকিতে পারে না, কেন না থাকিলে ইংরেজ উহা দখল না করিয়া থাকিতে পারিত না।—পয়সাই ইংরেজের পরমেশ্বর। এই তত্ত্বটা ভাল করিয়া বুঝিয়া নিন, তাহা হইলে সমস্ত কথাই বুঝিতে পারিবেন। আমরা ইংরেজদিগকে নিজের গরজে হিন্দুস্থানে বসাইয়া রাখিয়াছি। উহাদের ব্যবসার আমরা সুবিধা করিয়া দিতেছি। উহারা আপনাদের ছলাকলা দেখাইয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া পয়সা লুটিতেছে। ইহার পরও আমরা যদি উহাদিগকেই মিথ্যা দোষ দিই, তাহা হইলে উহাদের রাজত্বের শিকড় এখানে গাড়িয়া বসিবে। আমাদের পরস্পরের লড়াই ঝগড়াও উহাদেরই শক্তি বৃদ্ধি করে। আমি এতক্ষণ যে সকল কথা বলিলাম তাহা যদি সত্য মনে করেন, তবে একথাও মানিতে হইবে যে, ইংরেজরা ব্যবসার

জন্যই এখানে আছে এবং ইহাও ঠিক যে, আমরাই ইংরেজদিগকে এদেশে রাখিয়াছি। এখানে থাকার মূলে উহাদের অস্ত্রবল নাই, আছে আমাদেরই সহায়তা। আজ একথাও আপনাকে বলিব যে, জাপানে জাপানীরা নিজ নিশান উড়াইতেছে না, ইংরেজ ব্যাপারীরা ব্রিটিশ পতাকাই সেখানে ব্যবসার জোরে উড়াইতেছে। ইংরেজ জাপানের সহিত যে চুক্তি করিয়াছে, তাহা তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যই। আপনি দেখিবেন, তাহারা যদি সামলাইতে পারে, ঐ দেশে তাহাদের ব্যবসা প্রচুর বাড়িবে। ইংরেজ সারা দুনিয়াকে নিজের মালের বাজারে পরিণত করিতে চায়, যদিও তাহা হইতে পারে না। কিন্তু ইহার জন্য তাহাদের দোষও দেওয়া যায় না। তাহারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য হেন করণীয় নাই, যাহা করিবে না।

অষ্টম অধ্যায়

হিন্দুস্থানের অবস্থা

পাঠক—ইংরেজ কী ভাবে ভারতবর্ষকে দখল করিয়া রাখিয়াছে তাহা এখন বুঝিলাম। আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আপনার অভিমত অতঃপর জানিতে চাই।

সম্পাদক—এ এক দুঃখজনক অবস্থা। সে কথা ভাবিতে গেলে আমার চোখে জল আসে, কথা বলার শক্তি লোপ পাইয়া যায়। আপনাকে পুরাপুরি বুঝাইতে পারিব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, ইংরেজের গোড়ালির তলায় থাকিয়া নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার কবলে পড়িয়া ভারত ডুবিয়া যাইতেছে। দৈত্যের ভয়ংকর চাপে সে আর্তনাদ করিতেছে। এখনো তাহাকে উদ্ধার করার সময় আছে। কিন্তু দিন দিন তাহা আরো কঠিন হইয়া পড়িতেছে। আমার নিকট ধর্ম প্রিয়। আমার প্রথম দুঃখ এই যে হিন্দুস্থান অধার্মিক হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম বলিতে এখানে আমি হিন্দু মুসলমান বা পারসীর ধর্মের কথা বলিতেছি না, এই সকল ধর্মের সার যে ধর্ম তাহার কথাই ভাবিতেছি। আমরা ঈশ্বরে বিমুখ হইয়া পড়িতেছি।

পাঠক—ইহা কী করিয়া বলা যায়?

সম্পাদক—আমাদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ হইল আমরা অলস, আর ইউরোপীয়রা কর্মঠ ও উৎসাহী। এ কথাটা আমরা মানিয়া লইয়াছি। আর এইজন্য আমাদের নিজেদের অবস্থা বদলাইতে চাই। হিন্দু মুসলমান পারসী খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্মই এই শিক্ষা দেয় যে, পার্থিব বিষয়ে বেশী মন না দিয়া ধর্মীয় বিষয়েই বেশী মন দেওয়া কর্তব্য। আমাদের পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষার একটি সীমা থাকা দরকার, কিন্তু ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা অসীম হওয়াই কাম্য। শেষোক্তের জন্যই আমাদের যাহা কিছু কাজকর্ম চালিত হওয়া উচিত।

পাঠক—বুঝিলাম আপনি ধর্মের ভান চালাইতে চাহেন। অনেক ধূর্ত এই রকম

ছলনা করিয়া মানুষের সর্বনাশ করিয়াছে।

সম্পাদক—আপনি ধর্মের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছেন। কপট লোক সকল ধর্মের মধ্যেই আছে। যেখানে আলো সেখানে ছায়া আছেই। তবুও যাহারা ধর্মের ছল করে তাহারা, যাহারা সাংসারিক বিষয়ে ছল করে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা বলিতেও আমি দ্বিধা করি না। সভ্যতার ছায়ায় যত পাষণ্ড দেখা যায়, ধর্মের মধ্যে তত কখনও দেখা যায় না।

পাঠক—কেমন করে আপনি তা বলতে পারেন? ধর্মের জন্য হিন্দু মুসলমান মাথা ফাটাফাটি করে। ধর্মের জন্যই খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। ধর্মের জন্য নিরপরাধ হাজার হাজার লোক নিহত হইয়াছে; ধর্মের নামেই হাজার হাজার লোককে পুড়াইয়া মারা হইয়াছে, অত্যাচার করা হইয়াছে। নিশ্চয়ই যে কোন সভ্যতার চেয়ে এ আরো খারাপ।

সম্পাদক—আমার বক্তব্য হইল কপট ধর্মের দুঃখ যদি বা সহ্য করা যায়, সভ্যতার ক্লেশ অসহ্য। প্রত্যেকেই বোঝেন, আপনি যে সব নিষ্ঠুরতার কথা বলিলেন, সেগুলি ধর্মের অঙ্গ নয়, যদিও ধর্মের নামে চলিয়া আসিতেছে। কাজেই এইসব নিষ্ঠুরতার পরিণাম বলিয়া কিছু নাই। যতদিন অনভিজ্ঞ, সরল বিশ্বাসী মানুষ থাকিবে, সব সময়ই এই সব ঘটিবে। কিন্তু সভ্যতার আগুনে পড়িয়া মরার আর শেষ নাই। এই সভ্যতার মারাত্মক ফল হইল কী, মানুষ এই সব ভালো বিশ্বাস করিয়া ইহার আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহারা পুরাপুরি অধার্মিক হইয়া পড়ে এবং কার্যতঃ এই পৃথিবীর নিকট হইতে অল্পই সুবিধা আদায় করে। সভ্যতা মুষিকের মত—একদিকে যখন সব কিছু কাটিয়া নষ্ট করিতেছে, তখনই আবার আমাদের তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। অনিষ্ট করার শক্তি সভ্যতার ভিতর কত বেশী রহিয়াছে তাহা জানিলে, ধর্মের নামে কৃত পাপ সভ্যতার চাইতে বরং ভাল বলিয়াই মনে হইবে। একথা আমি বলি না যে, ধর্মের নামে কুসংস্কার স্থায়ী করিয়া রাখিতে হইবে। উহাকে দূর করিতেই হইবে। কিন্তু তাহাও ধর্ম ভুলিলে হইবে না, সত্যকার ধর্মমার্গে চলিলেই তবে তাহা সম্ভব হইবে।

পাঠক—আপনি ত ইহাও বলিবেন যে, ইংরেজরা যে শান্তির সুখ ভারতবর্ষকে দিয়াছে উহাও কোন কাজের নহে।

সম্পাদক—আপনি শান্তির মুখ যদি দেখিতে পাইয়া থাকেন তবে ভাল। কিন্তু আমি ত দেখিতে পাই না।

পাঠক—তাহা হইলে ঠগীরা, লুণ্ঠনকারীরা ও কোল ভীল* প্রভৃতি লোকরা যে অনিষ্ট করিতেছিল, আপনার কথায় বুঝিতে হইবে যে, তাহাতে ক্ষতি ছিল না?

সম্পাদক—আপনি একটু চিন্তা করিলেই বুঝিবেন যে, সেই আতঙ্ক কোন মতেই এমন একটি বিরাট ব্যাপার ছিল না। যদি খুব উল্লেখযোগ্য হইত, তাহা হইলে ত ইংরেজ আসিবার আগেই আর সব লোক মরিয়া যাইত। তাহা ছাড়া, বর্তমানে যাহাকে শান্তি বলা হয়, তাহা নামমাত্রই, কারণ ইহার ফলে আমরা

* কোল ভীল সম্বন্ধে মহাত্মাজী পরে বলিয়াছেন যে, সত্য সত্য তাহারা কী প্রকারের লোক ছিল তাহা জানিতেন না বলিয়াই তাহাদের সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছিলেন।

কাপুরুষ, ভীরু হইয়া পড়িয়াছি। একথা বলা যায় না যে, ভীল, পিণ্ডারীদের স্বভাব ইংরেজরা বদলাইয়া দিয়াছেন। আমরা ঐ প্রকার ভীল, পিণ্ডারীদের অত্যাচার সহ্য করিতে বরং স্বীকৃত আছি, কিন্তু আর কেহ আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে, আর আমাদের কাপুরুষ বানাইবে, সেই লজ্জা চাইনা। কাপুরুষের মত আত্মরক্ষা করিতে চাওয়ার চেয়ে আমি ভীলদের তীরে বা তোপের মুখে মরাও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। সেকালের ভারতে এই রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকিলেও, সে ভারতে বীরত্ব ছিল। ম্যাকলে ভারতীয়দের কার্যত ভীরু বলিয়া দোষারোপ করিয়া নিজের চরম অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়াছেন। ভারতীয়রা কখনোই ঐ দোষে দুষ্ট ছিল না। যে দেশে দুর্গম পাহাড় পর্বত বিরাজ করিতেছে, যেখানে বাঘ নেকড়ের বাস, সে দেশের মানুষ ভীরু হইলে কবেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। আপনি কখনো চাষের মাঠে গিয়াছেন? আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, ক্ষেতে কৃষাণরা আজও নির্ভয় হইয়া শুইয়া থাকে। আপনার অথবা কোনও ইংরেজের সেখানে শুইবার সাহস হইবে না। নির্ভয় হওয়াই ত বলবান হওয়া। শরীরের মাংসপেশী বাড়িলেই তাহাকে বল বলে না। সামান্য বিচারেই আপনি একথা বুঝিতে পারিবেন। আর আপনি ত স্বরাজ চাহেন, আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যাহাই হউক, ভীল পিণ্ডারী, ঠগ—ইহারা ত আমার নিজের দেশেরই ভাই। উহাদের হৃদয় জয় করিয়া লওয়াই ত আপনার আমার কাজ। যতদিন আমরা আমাদের নিজেদের ভাইদেরই ভয় করিব, আমরা লক্ষ্য সাধনের অনুপযুক্তই থাকিব।

নবম অধ্যায়

রেলপথ

পাঠক—হিন্দুস্থানের শান্তি সম্বন্ধে আমার মোহ আপনি দূর করিয়া দিলেন। আমার কিছুই আর জমা-পুঁজি রাখিতে দিলেন না।

সম্পাদক—আমি ত এতক্ষণ দেশের ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধেই আপনাকে বলিতেছিলাম। কিন্তু যখন আমি আপনাকে হিন্দুস্থানের দারিদ্র্যের বিষয় শুনাইব, তখন আপনি হয় ত আমাকে অপছন্দই করিতে আরম্ভ করিবেন। কারণ আপনি ও আমি এতদিন যে সব জিনিসকে ভারতের পক্ষে উপকারী বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছি, সে সব এখন আর আমার কাছে সে রকম মনে হয় না।

পাঠক—সে কী?

সম্পাদক—রেলপথ, উকিল, ডাক্তার—এরা সব আমাদের দেশকে এত দরিদ্র করিয়াছে যে সময়ে যদি আমরা না জাগিয়া উঠি, আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব।

পাঠক—এইখানে আপনার ও আমার ভিতর মতভেদ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

যে সকল জিনিস খুব ভাল বলিয়া বোধ হয় আপনি তাহারই উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। আর তবে বাকি রহিল কী?

সম্পাদক—ধৈর্য্য ধরিয়া শুনুন। এই সভ্যতার দোষ চোখে পড়া কিছু মুশকিল বটে। ডাক্তাররা শুনাইয়া থাকেন যে, ক্ষয়রোগী যতক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিবার আশা রাখে। বাহিরের চেহারায় ক্ষয়রোগ কোন হানি প্রকাশ পাইতে দেয় না, বরং কখনো কখনো মুখের চেহারায় একটা মায়াময় লাবণ্য আনিয়া দেয়। ইহাতেই, সব ঠিক আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে মানুষ প্রলুব্ধ হয়। সভ্যতাও এই ধরনের রোগ এবং আমাদের এজন্য সতর্ক থাকা দরকার।

পাঠক—ঠিক বটে, আচ্ছা এখন রেলের কথা বলুন।

সম্পাদক—ইহা নিশ্চয়ই আপনার কাছে ধরা পড়িয়াছে যে, যদি রেল না থাকিত তাহা হইলে হিন্দুস্থানে ইংরেজের আজ যে দখল তাহা থাকিত না। রেলে প্লেগের বিস্তার হয়। রেল না থাকিলে লোকের এদিকে সেদিকে যাতায়াত কমিয়া যাইত, আর ছোঁয়াচে রোগ দেশময় বিস্তৃত হইতে পারিত না। আগেকার দিনে আমরা স্বাভাবিকভাবেই বিচ্ছিন্ন, পৃথক হইয়া থাকিতাম। রেল হওয়ার জন্য দুর্ভিক্ষও বাড়িয়াছে। সুবিধা পাইলেই লোক নিজেদের উৎপন্ন শস্য বিক্রয় করিয়া দেয়—যেখানে আক্রা সেইখানেই সব দ্রব্যের টান পড়ে, লোক বিচারশূন্য হইয়া যায় এবং দুর্ভিক্ষের কষ্ট বাড়িতে থাকে। রেলের জন্য দুষ্কর্মও বাড়িয়া চলে। দুষ্ট লোক দ্রুত দুষ্কার্য করিতে পারে। হিন্দুস্থানের তীর্থস্থান সকল অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। পূর্বে লোকে প্রচণ্ড ক্লেশ স্বীকার করিয়া তীর্থে যাইতেন। কাজেই, সাধারণতঃ সত্যকার ভক্ত অনুরাগীরাই তীর্থ পরিদর্শন করিতেন। আজকাল দুষ্ট লোকরাও অনাচার করার জন্য সেখানে যায়।

পাঠক—আপনি এক দিকের কথাই বলিয়া গেলেন। রেলে যেমন দুষ্ট লোক যাইতে পারে, ভাল লোকও ত তেমনি যাইয়া থাকেন। তাঁহারা কেন রেলপথের পুরো সুযোগ নেন না?

সম্পাদক—ভালোর শম্বুকগতি। কাজেই রেলপথের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা ভালো হইতে চান, তাঁহারা স্বার্থপর নন। তাঁহাদের তাড়া নাই। তাঁহারা জানেন, মানুষের মধ্যে ভালোত্ব জাগাইতে দীর্ঘ সময় লাগে। মন্দটা সহজেই হইতে পারে। গৃহ গড়িতে সময় লাগে, কিন্তু ভাঙিতে সময় লাগে না।

কাজেই রেল আগাগোড়া মন্দ, দুষ্টভাব বহন করিবার, ছড়াইয়া দিবার মাধ্যম হইতে পারে। রেল দুর্ভিক্ষ ছড়াইয়াছে কিনা তাহা বিতর্কের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে পাপ ছড়ায়, সে বিষয়ে কোন মতবিরোধ নাই।

পাঠক—কিন্তু রেলের যাহা সব চেয়ে বড় লাভ তাহা উহার সকল হানি ছাপাইয়া উঠে। আজ আমাদের দেশে যে নতুন জাগরণ দেখিতেছি উহা রেলের জন্যই। ইহা হইতে আমার মনে হয় যে মোটের উপর রেল দ্বারা ভালই হইয়াছে।

সম্পাদক—ইহাও আপনার ভুল। ইংরেজরাই আমাদের মধ্যে এই ভুল ধারণা প্রচার করিয়াছে যে, আমরা কখনও এক ছিলাম না এবং এক হইতে শত শত বৎসর লাগিবে। ইহা সম্পূর্ণ অসার কথা। যখন ইংরেজরা হিন্দুস্থানে ছিল না তখন

আমরা সকলেই এক ছিলাম। আমাদের এক বিচার ছিল, একই আচার ছিল। আমরা এক জাতি ছিলাম বলিয়াই ত উহারা এক রাজ্য স্থান করিতে পারিয়াছে। পরে উহারাই আমাদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

পাঠক—এ বিষয় একটু বেশী করিয়া বোঝানো দরকার।

সম্পাদক—আমি এ কথা বলিতে চাহিনা যে আমরা এক জাতি ছিলাম বলিয়া আমাদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না; তবে বক্তব্য হইল যে আমাদের পুরোধাগণ পায়ে হাঁটিয়া বা গো-যানে সারা ভারত ভ্রমণ করিতেন। তাঁহারা একে অন্যের ভাষা জানিতেন এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন দূরত্ব ছিল না। যাঁহারা দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্বে জগন্নাথ পুরী, উত্তরে হরিদ্বার তীর্থ গড়িয়াছিলেন সেই সকল জ্ঞানী পুরুষদের একটা অবশ্যই উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা নির্বোধ ছিলেন না। তাঁহারা জানিতেন যে, ঈশ্বর-ভজন ঘরে বসিয়াও হয়। তাঁহারা আমাদের শিখাইয়াছিলেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণ সাধুতার আলোকে ভাস্বর, তাঁহাদের নিজেদের ঘরেই গঙ্গা অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, প্রকৃতিই ভারতবর্ষকে অবিভাজ্য করিয়া গড়িয়াছে। কাজেই তাঁহাদের যুক্তিও হইল, ভারতবাসীরাও এক জাতি। এই যুক্তি দিয়া তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তীর্থস্থান গড়িলেন এবং দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ এভাবে জাগাইয়া তুলিলেন, পৃথিবীর অন্যত্র যাহার তুলনা নাই।

আমরা হিন্দুস্থানীরা যতটা এক, দুইজন ইংরেজ ততটা এক নহে। কেবল আপনি ও আমি—এবং অন্য যাঁহারা—নিজেদের সভ্য মনে করি, উন্নততর জ্ঞান করি, সেই আমরাই নিজেদের বহু জাতি মনে করি। রেলপথ আসিবার পর থেকেই আমরা এই পার্থক্যে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করি। আপনি যদি মনে করেন যে, রেল দ্বারা ঐক্য ভাব বাড়িয়াছে তাহা হইলে আর আপনাকে কী বলিব? আফিমখোরও বলিতে পারে যে, আফিম-এ কী দোষ আছে আফিম খাওয়াতে আমি তাহা বুঝিতেছি, সেইজন্যই আফিম ভাল জিনিস। কথাগুলি আপনি বেশ ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিবেন। এখন আপনার মনে খট্‌কা উপস্থিত হইবে। কিন্তু আপনি নিজে নিজেই সে সকলের সমাধান করিতে পারিবেন।

পাঠক—আপনার কথা লইয়া বিচার অবশ্যই করিব, কিন্তু মনে ত এখনই প্রশ্ন জাগিতেছে। আপনি যে হিন্দুস্থানের কথা বলিলেন তাহা মুসলমানদের আসিবার পূর্বেকার হিন্দুস্থান। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে মুসলমান, পারসী, খৃষ্টান রহিয়াছে। কেমনভাবে তাহারা এক জাতি হইতে পারে? হিন্দু মুসলমান একে অন্যের পুরোনো শত্রু। কথাই আছে, মিঞা ও মহাদেবে বনে না। হিন্দু যদি পূর্বমুখে পূজা করে, তবে মুসলমান পশ্চিমমুখে পূজা করে। মুসলমান হিন্দুদিগকে মূর্তি-পূজক বলিয়া নিন্দা করে। হিন্দু গো-মাতার পূজা করে, আর মুসলমান গরু মারে। হিন্দুরা জীবহত্যা না করার নীতিতে বিশ্বাসী; মুসলমানরা তাহা বিশ্বাস করে না। পদে পদে আমাদের পার্থক্য। ভারতবর্ষ কেমন করিয়া এক জাতি হইতে পারে?

দশম অধ্যায়

হিন্দু মুসলমান

সম্পাদক—আপনার শেষ প্রশ্ন বড় গম্ভীর। কিন্তু বিচার করিলে উহাও সহজ হইয়া যাইবে। এই প্রশ্ন উঠিবার কারণও রেল, উকিল ও ডাক্তার। উকিল ও ডাক্তারের বিষয় এখন পরীক্ষা করা যাক। রেলের কথা ত আগেই হইয়াছে। এখন শুনুন। ঈশ্বর মানুষকে এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে, সামর্থ্য মত হাত পায়ের কাজ করা সকলের পক্ষেই দরকার। আমরা যদি রেল ইত্যাদি নানা যানের ব্যবহার না করি তবে অনেক ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচিতে পারি। আমরা ইচ্ছা করিয়া নিজের অসুবিধা ডাকিয়া আনি। ঈশ্বর মানুষের দেহ গড়ার কালেই তাহার স্থানান্তরে গমনাগমনের ইচ্ছার একটা সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মানুষ সঙ্গে সঙ্গে সেই সীমা অতিক্রম করিবার জন্য উপায় আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল।

ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন এজন্য যে, সে যেন বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে পারে, কিন্তু মানুষ ঈশ্বরকে ভুলিবার জন্যই সেই বুদ্ধি ব্যবহার করিতেছে। আমার গঠনই এমন, যাতে আমি কেবল আমার নিকট প্রতিবেশীদেরই সেবা করিতে পারি। কিন্তু আমার অহংকারে আমি এমন ভান করি যেন আমি আমার এই দেহ দিয়া বিশ্বের সবাইয়েরই সেবা করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছি। এইভাবে অসম্ভব সাধন করিতে যাইয়া মানুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সংস্পর্শে আসে। এবং সম্পূর্ণ বিহ্বল হইয়া পড়ে। এই যুক্তি থেকে নিশ্চয়ই ইহা আপনার কাছে প্রতীয়মান হইবে যে রেলপথ বড় সাংঘাতিক সংস্থা। রেলপথের জন্যেই মানুষ তাহার স্রষ্টার কাছ থেকে আরো দূরে সরিয়া গিয়াছে।

পাঠক—কিন্তু এখন আমি আমার প্রশ্নের জবাব শুনিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেছি। মুসলমান আসায় এদেশে এক জাতি আর কী করিয়া রহিল?

সম্পাদক—যেহেতু বিভিন্ন ধর্মের লোকে এখানে বাস করে, সেজন্য ভারতীয়দের এক জাতি হওয়া আটকায় না। যাহারা নতুন আসে তাহারাও ইহার জাতীয়তা বিনাশ করিতে পারে না; তাহারাও এই জাতির মধ্যেই মিশিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় এক দেশে একই জাতির বাস বলিতে হয়। দেশের মধ্যে বিদেশী লোককে গ্রহণ করিয়া লওয়ার শক্তি থাকা চাই। ঐ শক্তি হিন্দুস্থানের ছিল ও আছেই। বস্তুতঃ এদেশে যত লোক তত ধর্ম। কিন্তু যাঁহারা জাতীয়তার ভাবে অনুপ্রাণিত, বিভিন্ন ধর্মের জন্য তাঁহাদের ভিতর বিরোধের সৃষ্টি হয় না। যদি একে অন্যের ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে আর তাহারা এক জাতি বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য থাকে না। হিন্দু যদি একথা মনে করে যে, সারা ভারতবর্ষে কেবল হিন্দুই থাকিবে, তাহা হইলে বলিতে হইবে তাহারা স্বপ্নের জগতে বাস করিতেছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃীষ্টান, পারসী প্রভৃতি যাহারা এই দেশকে স্বদেশ করিয়া লইয়াছে, তাহারা সকলেই স্বদেশীয়। তাহাদের পরস্পরের স্বার্থের জন্যও এক হইয়াই থাকা চাই। পৃথিবীর কোনও দেশেই এক জাতির অর্থ এক ধর্মের লোক বলিয়া বিবেচিত

হয় নাই; ভারতবর্ষেও এমন কখনও ছিল না।

পাঠক—কিন্তু হিন্দু মুসলমানের স্বাভাবিক শত্রুতা সম্বন্ধে আপনি কী বলেন।

সম্পাদক—স্বাভাবিক শত্রু এই কথাটাই উভয়ের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করিয়াছে। যখন হিন্দু মুসলমান পরস্পর লড়াই করিতেছিল, তাহারা নিশ্চয়ই তখন ঐ ভাবে বলিত। কিন্তু সে লড়াই কবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং স্বাভাবিক শত্রুতার কথা আর কীরূপে উঠিতে পারে? একথা স্মরণ রাখিবেন, আমরা যে ইংরেজের আসিবার পর লড়াই বন্ধ করিয়াছি এমন নহে। হিন্দু মুসলমানের রাজ্যে আর মুসলমান হিন্দুর রাজ্যে বাস করিয়া আসিতেছিল। দুই পক্ষেরই কিছুদিন বাদে একথা মনে হইয়াছিল যে, লড়াই করিয়া কাহারও লাভ নাই। লড়াই আত্মহত্যার পথ এবং অস্ত্রের জোরে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যুত করিতে পারিবে না। এই হেতু উভয়েই মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে স্থির করিয়া লইয়াছিল। এই ঝগড়া পুনরায় ইংরেজরাই আরম্ভ করাইয়া দিয়াছে। মিঞা ও মহাদেবে বনে না একথাও অসত্য জানিবেন। কত রকমেরই প্রবাদ শিকড় গাড়িয়া বসে আর দেশের হানি করে। আমরা প্রবাদের মোহে একথাও ভুলিয়া যাই যে, অনেক হিন্দুমুসলমানের বাপ দাদা একই ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের রক্ত যেখানে এক, সেখানে ধর্ম বদলাইলেই কি মানুষ শত্রু হইয়া যায়? উভয়ের ঈশ্বর কি ভিন্ন? ধর্ম ত একই স্থানে পৌঁছাইবার ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা। দুইজনে যদি দুই রাস্তায় চলে তবে হানি কী? ইহাতে দুঃখ করারই বা কী আছে? আর ঐ ধরনের প্রবাদ ত শৈব বৈষ্ণবের ভিতরেও চলিত আছে। কিন্তু ঐ রকম প্রবাদের বলেও কেহ এ সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না যে, ইহারা দুইটি ভিন্ন জাতি। বৈদিক ধর্মী ও জৈনদের মধ্যে খুব মতভেদ আছে। কিন্তু তবুও উহারা দুইজাতি নহে। আমরা দাসত্বে ডুবিয়া গিয়াছি, সেই জন্যই নিজের ঘরের ঝগড়া অপরের কাছে মিটাইবার জন্য লইয়া যাই। যেমন প্রতিমানাশক হিন্দু আছে, তেমনি মুসলমানও রহিয়াছে।

আমাদের সভ্যতার জ্ঞান যত বাড়িতে থাকিবে, ততই আমরা বুঝিতে থাকিব যে, আমাদের প্রতিবেশীরা যে ধর্ম পালন করেন তাহা যদি আমাদের পছন্দ নাও হয় তাহা হইলেও বৈরী ভাব রাখিবার আবশ্যক নাই।

পাঠক—এখন গোরক্ষা সম্পর্কে আমি আপনার বিচার শুনিতে চাই।

সম্পাদক—আমি নিজে গো জাতিকে শ্রদ্ধা করি। গরু হিন্দুস্থানের রক্ষাকারী, কেননা গো-জাতির উপর হিন্দুস্থানের চাষ নির্ভর করে। শত রকমেই গরু আমাদের হিতসাধক। গরু যে হিতকারী, মুসলমান ভাইরাও তাহা স্বীকার করিবেন।

কিন্তু আমি যেমন গো-জাতিকে শ্রদ্ধা করি, তেমনি আমার স্বদেশবাসীদেরও শ্রদ্ধা করি। যেমন গরু উপকারী জীব তেমনি মানুষও। হিন্দু, মুসলমান বা অন্য যে কোনও ধর্মাবলম্বী হোক, তাহাদেরও প্রয়োজন আছে। তাহা হইলে আমি কি গরুকে বাঁচাইবার জন্য মুসলমানের সঙ্গে লড়াই করিব, মুসলমানকে মারিব? এমন করিলে ত আমি মুসলমান ও গরু উভয়েরই শত্রু হইব। এই জন্য আমার নিজের বুদ্ধিমত বলিতে পারি যে, গরুকে বাঁচাইবার একটি উপায়—মুসলিম ভাইদের

বোঝানো যে, গরুর দ্বারা সকলেরই লাভ হয়, অতএব গো-রক্ষা করা দরকার। যদি তাঁহারা ইহা না বুঝেন তাহা হইলে গরুকে মারিতে দেওয়াই আমার উচিত; সহজ কারণ হইল তাহাকে বাঁচানো আমার হাতের বশ নহে। আমার যদি গরুর জন্য করুণায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইত তাহা হইলে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমার নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া উচিত, কিন্তু ভাইয়ের জীবন নেওয়া কখনোই প্রার্থিত নয়। আমার মতে, আমাদের ধর্মের ইহাই বিধি।

মানুষ জেদী হইয়া পড়িলে ব্যাপারটি কঠিন হইয়া পড়ে। আমি যদি একদিকে টলি, আমার মুসলিম ভাই অন্যদিকে টলিবে। আমি যদি শ্রেষ্ঠত্বের ভান করি, সেও তাহার সমুচিত উত্তর দেবে। আমি যদি ধীরভাবে মাথা নত করি, সে সেক্ষেত্রে আরও নত হইবে। আর যদি তাঁহারা মাথা নত নাও করেন তবু আমার মাথা নত করা কিছু খারাপ হইবে না। হিন্দুরা যখন জেদ করে, তখনই গো-হত্যা বাড়ে। আমার মতে গো-রক্ষা-প্রচারিণী সমিতিগুলিকে গো-হত্যা সমিতি বলা উচিত। যখন হইতে আমরা গো-রক্ষা করা ভুলিয়া গিয়াছি তখন হইতেই গো-রক্ষিণী-সভার আবশ্যক হইয়াছে। আমার ভাই যদি গরু মারিতে উদ্যত হয় তবে আমার কী করা উচিত? তাহাকে মারা চাই, না তাহার পায়ে পড়া চাই? যদি পায়ে পড়াই ঠিক হয়, তবে ত হিন্দুদেরও মুসলমান ভাইদের পায়ে পড়া দরকার।

গরুর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া, অত্যাচার করিয়া যখন হিন্দুরা উহাকে বধ করিয়া থাকে, তখন উহাদিগকে কে রক্ষা করে? গো-জাতির মধ্যে বলদকে হিন্দুরা যখন চাবুক মারে তখন কে তাহাকে বুঝাইতে যায়? কিন্তু ইহা আমাদের এক জাতি হইতে বাধা দেয় নাই।

সবশেষে, যদি ইহাই সত্য হয় যে হিন্দুরা গরুকে হত্যা না করার নীতিতে বিশ্বাসী এবং মুসলমানরা নয়, বলুন ত তাহা হইলে প্রথমোক্তদের কর্তব্য কী? অহিংস যে সে প্রতিবেশীকে হত্যা করিবে এমন ত কোনও শাস্ত্রে নাই। অহিংসের সিধা রাস্তা। সে একজনকে বাঁচাইবার জন্য অপরের উপর হিংসা করিতে পারে না। বিনয়ী হওয়াই অহিংসের কর্তব্য ও পুরুষার্থ। কিন্তু ইহাও কি ঠিক যে সকল হিন্দুই অহিংস? বাস্তবিক সত্যকার অহিংস কেহই নাই। জীব-হিংসা ত আমরা হিন্দুরাও করিতেছি। কিন্তু উহা হইতে মুক্তি চাই। আর সেই জন্যই নিজদিগকে অহিংস বলি। সাধারণভাবে যদি দেখেন, তবে দেখিবেন অনেক হিন্দু মাংসাহার করে। সুতরাং তাহাদের কোনও রূপেই অহিংস বলা যায় না। জানিয়া শুনিয়া যদি মাংসাহারের অন্য অর্থ করা যায় তবে নাচার। সুতরাং হিংসাশ্রয়ী ও অহিংস বলিয়াই যে আমাদের বনে না ইহা বলা ভুল।

স্বার্থপর, ভণ্ড ধর্ম শিক্ষক ও প্রচারকরাই আমাদের মনে এই চিন্তা ঢোকাইয়াছেন। আর ইংরেজরা শেষ মার মারিয়াছে। ইংরেজদের ইতিহাস লেখার অভ্যাস আছে। সকল লোকের আচার নীতি জানার ভান করারও সখ আছে। অথচ ভগবান আমাদের দিয়াছেন পরিমিত শক্তি। কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরত্বই দাবি করিয়া বসিয়াছেন এবং নতুন নতুন পরীক্ষা চালাইতেছেন। তাঁহারা নিজেদের পরীক্ষা গবেষণা সম্পর্কে খুব সুখ্যাতি করিয়া লিখিতেছেন এবং সেগুলি বিশ্বাস করিতে

আমাদের মোহাচ্ছন্ন করিতেছেন। আর আমরা আমাদের অজ্ঞানতায় তাহাদের পদতলে লুটাইতেছি।

যাহারা চোখ মেলিয়া দেখিতে চায় তাহারা দেখিতে পারে যে, কোরাণ-শরিফে এমন শত শত বচন আছে যাহা হিন্দু মানিতে পারে। ভগবদ্‌গীতায় এমন সকল কথা আছে যাহার বিরুদ্ধে মুসলমান কিছুই বলিতে পারে না। কোরাণ-শরিফের কতকগুলি কথা আমার বুদ্ধিতে আসে না, অথবা আমার পছন্দ হয় না বলিয়াই কি যাঁহারা উহা মানেন তাঁহাদের তিরস্কার করিতে হইবে? দুইজনে ইচ্ছা করিলেই তবে ঝগড়া হয়। আমার যদি ঝগড়া না করাই সংকল্প হয়, তবে মুসলমান কী করিতে পারে, আর মুসলমানেরা যদি ঝগড়া না করিতে চায় তবে আমি কী করিতে পারি? হাওয়ার গলায় দাঁড় দিয়া ত ঝগড়া করা যায় না। যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্মের মূল রূপ বুঝিয়া তাহাতেই দৃঢ় থাকে, ভণ্ড শিক্ষকদের মাথা গলাইতে না দেয়, তাহা হইলে ঝগড়ার কোন অবকাশই থাকে না।

পাঠক—কিন্তু ইংরেজ কি দুই পক্ষকে মিলিতে দিবে?

সম্পাদক—এ প্রশ্নের মূলে রহিয়াছে নিজের দুর্বলতা। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্রতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দুই ভাইয়ে যদি পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চায় তবে কি কেহ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? যদি তৃতীয় ব্যক্তি উহাদের মধ্যে বিদ্বেষ আনিয়া দিতে পারে তবে আমি বলি, উহারা নির্বোধ। সেইভাবেই. ইংরেজদের আমরা যদি আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতে দিই, তাহার জন্য ইংরেজদের দোষ না দিয়া আমাদের নিজেদের নির্বুদ্ধিতাকেই দায়ী করা উচিত। মাটির কলস অতি সহজেই ফুটা হইয়া ভাঙিয়া যায়। কলসটি বাঁচাইবার উপায় এ নয় যে, ধাক্কা যাহাতে না লাগে তাহার চেষ্টা করা, পরন্তু তাহাকে পোড়াইয়া পাকা করিয়া ফেলাই তাহার উপায়। তাহা হইলে আর ভাঙিবার ভয় থাকিবে না। এই রকমই আমাদের মন মজবুত হওয়া চাই—তাহা হইলে আমরা সকল বিপদের মুখে কঠিন ইস্পাতের মত দাঁড়াইতে পারিব। হিন্দুরা সহজেই তাহা করিতে পারেন। তাঁহারা সংখ্যায় বেশী; তাঁহারা এই ভানও করিয়া থাকেন যে তাঁহারা বেশী শিক্ষিত। কাজেই, মুসলমান ও তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করিতে তাঁহারাই বেশী সক্ষম।

দুই সম্প্রদায়ে পারস্পরিক বিশ্বাস নাই। মুসলমানরা এইজন্য লর্ড মর্লির নিকট কতকগুলি বিশেষ অধিকার চাহিয়াছিলেন। হিন্দু ইহাতে আপত্তি কেন করে? হিন্দু যদি বিরোধিতা করা থেকে নিবৃত্ত থাকিত. ইংরেজ তাহা লক্ষ্য করিত—মুসলমানরা ক্রমশঃ হিন্দুদের বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিত, পরিণামে ভ্রাতৃভাব জাগিত। আমাদের নিজেদের ঝগড়ার কথা ইংরেজের নিকট বলিতে লজ্জা পাওয়া উচিত। প্রত্যেকে নিজেই দেখিতে পাইবেন, যাহা বলিয়াছি অর্থাৎ আপত্তি না করিলে হিন্দুরা কিছুই খোয়ায় না। বেশ করিয়া হিসাব করিয়া দেখিবেন. যাঁহারা অপরের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়াছেন তাঁহাদের আজ পর্যন্ত কখনো হানি হয় নাই।

আমি একথা বলি না যে, হিন্দু বা মুসলমান কখনো লড়াই করিবে না। দুই ভাই একসঙ্গে থাকিলে ঝগড়া ত হইবেই। কখনও কখনও হয়ত অনাবশ্যক মাথাও

ফাটিবে। সকলে এক রকম হয় না; আর উত্তেজনার মুখে অনেকে দুষ্কার্য করিয়া ফেলে। উহা আমাদিগকে সহিতে হইবে; সেইজন্য আমাদের উকিল রাখা ও আদালতে যাওয়া উচিত নহে। দুই জনের ঝগড়ায় এক জনের বা দুই জনেরই মাথা ফাটিতে পারে। ইহার মধ্যে তৃতীয় পক্ষ কী বিচার করিবে? লড়াই করিলেই আঘাত লাগার আশঙ্কা থাকে।

একাদশ অধ্যায়

উকিল

পাঠক—আপনি বলিতেছিলেন যে, যদি লোকে ঝগড়া করে তাহার বিচার করাইও না। ইহা ত একটা অদ্ভুত কথা।

সম্পাদক—অদ্ভুত বলুন আর যাহাই বলুন, কিন্তু কথা ঠিক। আপনার প্রশ্ন আমাকে উকিল ডাক্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ দিয়াছে। আমার মতে উকিলরা হিন্দুস্থানকে গোলামিতে ডুবাইয়াছেন, হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া বাড়াইয়াছেন এবং তাঁহারা ইংরেজেরও শক্তি বাড়াইতেছেন।

পাঠক—দোষ দেওয়া ত সহজ, কিন্তু প্রমাণ করায় মুশকিল আছে। উকিল না থাকিলে কে আপনাকে মুক্তির পথ বলিয়া দিত? তাঁহারা ব্যতীত গরীবকে রক্ষাই বা কে করিত? তাঁহারা ছাড়া কেই বা ন্যায় বিচার আদায় করিয়া দিতে পারিত? দেখুন, স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ কত লোককে বাঁচাইয়াছেন। নিজের জন্য তিনি ঐ কাজে এক পয়সাও লন নাই। যে কংগ্রেসের প্রশংসা আপনি করিতেছিলেন তাহাও উকিলদের দ্বারাই চলে, তাঁহাদের সাহায্যেই কংগ্রেস বাঁচিয়া আছে। আপনি ইঁহাদের ব্যবসার নিন্দা করিয়া অন্যায় করিতেছেন। আপনার হাতে সংবাদপত্র পরিচালনার সুবিধা আছে, আর সেই জন্যই যাহা মনে আসে তাহাই বলিবার সুবিধা পাইতেছেন।

সম্পাদক—আমিও পূর্বে আপনার মত ভাবিতাম। আমি আপনাকে এমন কথা বলি নাই যে, উকিলরা কোনও দিন কোনও ভাল কাজ করেন নাই। মনোমোহন ঘোষের উপর আমার শ্রদ্ধা আছে। তিনি গরীবদের সাহায্য করিতেন, এ কথা ঠিক। কংগ্রেসকেও যে উকিলরা সেবা দিয়াছেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। উকিলরা ত মানুষ বটে, আর মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু ভাল পাওয়া যাইবেই। কিন্তু যে সকল উকিল পরোপকার করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নামের তালিকা খুঁজিলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহারা উকিল একথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমি আপনাকে কেবল ইহাই বুঝাইতে চাই যে, উকিলের ব্যবসাই তাঁহাদিগকে নীতি-বিরুদ্ধ কাজ করায়। ভুল করিয়াই তাঁহারা লোভের পথে চলিতেছেন। আর উহা হইতে মুক্তি পাইতে পারেন এমন লোক কম আছেন।

হিন্দু মুসলমান লড়াই করিতেছে। সাধারণ মানুষ বলিবে, ঝগড়ার কথা

ভুলিয়া যাও। দুইজনেরই হয়ত দোষ আছে, ভবিষ্যতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিও। তাহারা ধরুন, উকিলের নিকট গেল। উকিল কর্তব্য বুঝিলেন, মক্কেলের পক্ষই লইতে হইবে। মক্কেল যে দলিলের কথা জানিতেন না তাহা খোঁজ করিয়া বাহির করা তখন উকিলের কাজ। যদি তাহা না করা হয়, তবে ব্যবসায়ে কলঙ্ক হইবে। এমনি করিয়া যাহাতে লড়াই বেশী বাড়িয়া উঠে উকিল ত তাহারই পরামর্শ দেন।

তা'ছাড়া যাঁহারা উকিল, তাঁহারা অপরের দুঃখ দূর করার জন্য ওকালতি ব্যবসা গ্রহণ করেন না। টাকা রোজগার করিবার জন্যই লোকে উকিল হয়। রোজগার করার উহা একটা পথ। আমি নিজেই দেখিয়াছি যে, ঝগড়া হইলে উকিলরা খুশি হয়। যেখানে ঝগড়া নাই, ছোট উকিলরা সেখানেও ঝগড়া ঘটান। তাঁদের দালালরা জোঁকের মত গরীবদের গায়ে আঁটিয়া বসেন ও রক্ত চুষিয়া লন। যাহার কিছু করিবার নাই এমনি লোকই উকিল হইয়া থাকে। অলস লোক বিলাস আরাম ভোগ করিবার ইচ্ছায় উকিল হয়। ইহাই আসল অবস্থা। অন্য যে সকল যুক্তি দেওয়া হয়, তাহা ভান মাত্র। ওকালতি খুব সম্মানজনক ব্যবসা—এ যুক্তি উকিলরাই বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা যেমন নিজেদের প্রশংসা নিজেরাই করেন, তেমনি নিয়ম-কানুনও নিজেরা তৈয়ারী করিয়া লন। লোকের নিকট হইতে কত ফী লইতে হইবে তাহাও তাঁহারাই স্থির করেন; তাঁহারা এমন আড়ম্বর ও ঠাট সৃষ্টি করিয়াছেন যে, দেখিয়া মনে হয় যেন দেবলোক হইতে দেবতা নামিয়া আসিয়াছেন।

মজুর যত পয়সা চায়, তার চাইতে বেশী পয়সা উকিল কেন চাহিবে? মজুর অপেক্ষা কি উকিলের আবশ্যকতা বেশী? যদি মজুর অপেক্ষা আবশ্যকতা অধিকও হয় তাহা হইলে তাঁহারা কি বেশী উপকার করিয়াছেন? তাহা ছাড়া যে উপকার বেশী করে তাহারই কি বেশী পয়সা লওয়ার অধিকার আছে? পয়সার জন্য যে কাজ তাহা ভাল কেমন করিয়া বলা যায়? ওকালতি ব্যবসা সম্বন্ধে এই কয়টা কথাই আপনাকে বলিলাম, অন্য কথা ছাড়িয়া দিতেছি।

হিন্দু-মুসলমানদের ঝগড়া সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু জানেন, তাঁহাদেরই জানা আছে যে আইন ব্যবসায়ীদেরই হস্তক্ষেপে প্রায়ই তাহা ঘটিয়া থাকে। তাঁহাদের জন্য কত পরিবার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা কত ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর চিরজন্মের শত্রুতা গড়িয়া তুলিয়াছেন। কত রাজ-রাজড়া উকিলের জালে পড়িয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। অনেকে সর্বস্ব হারাইয়াছে। এরকম অনেক উদাহরণ আছে।

কিন্তু ইঁহারা দেশের সব চেয়ে বেশী যে ক্ষতি করিয়াছেন তাহা হইল, ইঁহাদের জন্যই ইংরেজের মুষ্টি দৃঢ় হইয়াছে। আপনি কি মনে করেন, আইন আদালত ছাড়া ইংরেজরা শাসন চালাইতে পারিত? এ দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য আদালত প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, এ ধারণা ভুল। যাহারা নিজেদের ক্ষমতা পাকা করিতে চায়, তাহারা আদালতের সাহায্যেই তাহা করে। লোকে যদি আপসে বিবাদ মিটাইয়া লয় তবে তৃতীয় ব্যক্তির মাঝখানে পড়িবার আবশ্যকতা কোথায়? আসলে, লোকে যখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া আত্মীয়-স্বজনকে দিয়া বিরোধ মিটাইত, তখন তাঁহারা অনেক বেশী পৌরুষ দেখাইত। আইন আদালতের আশ্রয় লইয়া তাহারা কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে। মানুষ যখন নিজেদের মধ্যে লড়াই

করিয়া বিরোধের ফয়সালা করিত, নিশ্চয়ই তাহা বর্বরতার লক্ষণ। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া আমাদের ঝগড়া মিটাইবে ইহাই কি কম অসভ্যতা? নিশ্চয়ই, তৃতীয় পক্ষের সিদ্ধান্ত সব সময় ঠিক হয় না। তাহা ছাড়া বিবদমান পক্ষরাই জানেন কে ঠিক। আমরা আমাদের সরলতা ও অজ্ঞানতার জন্যই কল্পনা করিয়া লই যে অপরিচিত একজন আমাদের টাকা লইয়া আমাদের সুবিচার করিয়া দিতেছে।

যাহা হউক, সবচেয়ে বড় কথা যাহা স্মরণ রাখিতে হইবে তাহা হইল উকিল না থাকিলে আদালতই হইত না, আদালত চালানো যাইত না এবং বিনা আদালতে ইংরেজ শাসন করিতে পারিত না। ধরুন, কেবল ইংরেজ জজ, ইংরেজ উকিল, ইংরেজ সিপাহী হইলেন, তাঁহারা কেবল ইংরেজের উপরই শাসন করিতে পারিতেন। ভারতীয় জজ ও ভারতীয় উকিল ছাড়া ইংরেজের চলে না। উকিলের ব্যবসা কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিল এবং কেন যে তাঁহাদের পেয়ার করা হয়, তাহা যদি সব বুঝিতেন, তবে ওকালতি বৃত্তির উপর আমার যেমন ঘৃণা আপনারও তেমনি হইত। যদি উকিলরা ওকালতি ছাড়েন এবং ঐ ব্যবসা বেশ্যাবৃত্তির ন্যায় নীচ মনে করেন, তবে ইংরেজের রাজত্ব এক দিনেই ভাঙিয়া পড়িবে। মাছ যেমন জল ভালবাসে আমরা তেমনি ঝগড়া ও আইন আদালত ভালবাসি, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়েরের নিমিত্তই হইয়াছেন তাঁহারা। উকিল সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, জজদের সম্বন্ধেও একই কথা। উভয়ে পরস্পরের মাসতুতো ভাই এবং একে অপরকে মদত জোগায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

ডাক্তার

পাঠক—উকিলদের কথা বুঝিলাম। তাঁহারা যেটুকু যাহা ভাল করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা দৈবযোগাযোগ মাত্র। এই বৃত্তি নিশ্চয়ই ঘৃণার্হ বলিয়া আমি মনে করি। কিন্তু আপনি যে ডাক্তারকেও একই সঙ্গে জড়াইতেছেন তাহা কী করিয়া হয়?

সম্পাদক—আমি যে মতামত আপনার নিকট উপস্থিত করিতেছি উহা এখন আমার কথা হইলেও আমি ভাবিয়া এসব কথা বাহির করি নাই। ঐগুলি মৌলিক নয়। পাশ্চমী লেখকরা আইনজীবী ও ডাক্তার, উভয় সম্বন্ধেই আমার চেয়ে কড়া শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। একজন লেখক সমগ্র আধুনিক পদ্ধতিকেই বিষবৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঐ বৃক্ষের ডাল হইল আইন ও চিকিৎসা সহ পরোপজীবী সব বৃত্তি এবং কান্ডের উপর সত্যকার ধর্মের কুঠারের ঘা পড়িয়াছে। সেই বৃক্ষের মূলে দুর্নীতি। কাজেই আপনি দেখিতেছেন, আমি পকেট হইতে নতুন নতুন মত উপস্থিত করিয়া আপনার সামনে রাখিতেছি না। পক্ষান্তরে ইহা অনেকের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা।

আজ ডাক্তার সম্বন্ধে আপনার যে মোহ, আমারও একদিন তাই ছিল। এমন এক সময় ছিল যখন ডাক্তার হওয়া আমার আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। ডাক্তার হইয়া সাধারণের সেবা করিব এই ইচ্ছা এক সময় সত্যই আমি পোষণ করিতাম। এখন সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে। পূর্বে আমাদের এ দেশে বৈদ্যের ব্যবসা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানা হইত না। কেন এমন হইয়াছিল? আজ আমি তাহার ঠিক মূল্য বুঝিতে পারিতেছি।

ইংরেজরা ডাক্তারী বিদ্যার জোরে আমাদের নিজের মুঠার ভিতর আনিয়া ফেলিয়াছে। ইংরেজ চিকিৎসকরা রাজনৈতিক মুনাফা উশুল করিবার জন্য কয়েকজন এশীয় রাজা মহারাজার কাছে নিজেদের বৃত্তিকে কাজে লাগাইয়াছিলেন বলিয়া জানা আছে।

ডাক্তাররা আমাদের প্রায় পুরোপুরি স্থানভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কখনো কখনো ডাক্তার অপেক্ষা ত আনাড়ী বৈদ্যকেও আমার ভাল বলিতে ইচ্ছা হয়। বিচার করিয়া দেখুন, ডাক্তারের কাজ শরীরের যত্ন নেওয়া অথবা ঠিক বলিতে গেলে, এমন কি তাহাও নয়। শরীরে রোগ হইলে ডাক্তারের কাজ রোগ দূর করা। রোগ হয় কেন? নিশ্চয়ই আমাদের অবহেলা ও প্রশ্রয়ের ফলে। যাহা পেটে ধরে তাহার অতিরিক্ত খাইয়া অজীর্ণ হইল, গেলাম ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বড়ি দিলেন, ভাল হইয়া গেল। ফের আবার খুব করিয়া খাইলাম, পুনরায় অজীর্ণ হইল। আবার বড়ি। এই রকম চলিতে থাকে। গোড়ায় যদি আমি বড়ি না খাইতাম, অজীর্ণতার দণ্ডভোগ করিতাম। তাহা হইলে কিন্তু আর বে-হিসাবে খাইতাম না। ডাক্তার মাঝখানে পড়িয়া আমার বে-হিসাবী খাওয়ায় সহায়তা করিলেন। আমার শরীর আরাম হইল বটে, কিন্তু আমার মন দুর্বল হইল। এমনি করিয়া চলিতে চলিতে এমন অবস্থা হয় যে, আমার মনের উপর আমার কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

আমি দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলাম। আমাকে ডাক্তার ঔষধ দেওয়ায় রোগ আরোগ্য হইয়া গেল। অদ্ভুত ব্যাপার, আমি আবার দোষ করিব। যদি ডাক্তার মাঝখানে না থাকিতেন প্রকৃতি নিজের কাজ করিত। আমার মন দৃঢ় হইত, আর পরিণামে পাপাচরণ থেকে বিরত হইয়া সুখী হইতাম।

হাসপাতাল পাপ ছড়াইবার প্রতিষ্ঠান। উহা আছে বলিয়াই লোকে শরীরের যত্ন কম করে, আর দুর্নীতিও বাড়ে। বিদেশী বিলাতী ডাক্তার ত সব চেয়ে অধম: মানুষের শরীরের যত্ন লইবার মিথ্যাচার করিয়া উহারা বছরে হাজার হাজার প্রাণী হত্যা করে। তাহারা শবব্যবচ্ছেদ অনুশীলন করে। এরকম ব্যবস্থা কোনও ধর্মই অনুমোদন করে না। সকলেই বলেন, মানুষের শরীরের জন্য এত জীবের প্রাণ লওয়ার আবশ্যক নাই।

ডাক্তাররা আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করে। উহাদের অনেক ঔষধে পশুর চর্বি ও মদ থাকে। এই দুটিই হিন্দু মুসলমানের পক্ষে নিষিদ্ধ। আমরা সভ্য বলিয়া ভান করিতে পারি, ধর্মীয় অনুশাসনকে কুসংস্কার বলিতে পারি, আমরা যাহা পছন্দ করি, তাহাতেই মজিয়া যাইতে পারি। ব্যাপার হইল, ডাক্তাররাই আমাদের অসংযত হইতে প্রলুব্ধ করে। ফল হইয়াছে যে, আমরা দুর্বল হইয়া

পড়িয়াছি, আমাদের আত্মসংযম হারাইয়াছি। এ অবস্থায় আমরা দেশ সেবার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছি। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন গোলামির বাঁধন দৃঢ় করার সহায়ক।

আমরা ডাক্তার হই কেন? ইহার হেতু সম্মানের লোভ এবং পয়সা রোজগারের লোভ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার মধ্যে পরোপকার করার উদ্দেশ্য নাই। মানব সমাজের সত্যকার সেবা করার প্রবণতা যে ইহার মধ্যে নাই, এবং ইহা মানব সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক, তাহা আমি দেখাইয়া দিয়াছি। ডাক্তাররা তাঁহাদের জ্ঞানের আড়ম্বর দেখান এবং খুব বেশী ফী চার্জ করেন। পয়সার মূল্যে ঔষধ দিয়া তাহারা টাকা আদায় করিয়া লন। লোকও আরাম হওয়ার ভরসায় ঠকে।

ডাক্তারের ব্যবসা যদি এইরূপ হয়, তবে যাহারা তাহাদের মত পরোপকার করার ভান করে না, সেই সব হাতুড়ে চিকিৎসকও যে তাহাদের অপেক্ষা ভাল তাহাতে কি কিছুমাত্র সন্দেহ আছে?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সত্যকার সভ্যতা কী?

পাঠক—আপনি রেলের নিন্দা করিয়াছেন, উকিল ডাক্তারকেও আমল দিতেছেন না। আমি দেখিতেছি, আপনি কল-কব্জা ও মেসিনের সমস্ত কাজই হানিকর বলিয়া বাদ দিতে চান। তাহা হইলে সভ্যতার আর কী রহিল?

সম্পাদক—এই প্রশ্নের জবাব কিছুমাত্র কঠিন নহে। আমার মত এই যে, আমাদের সভ্যতার কাছে পৃথিবীর আর কোনও সভ্যতাই দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, কিছুই তাহার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। রোম মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে, গ্রীস ধ্বংস হইয়াছে, ফারাওদের আধিপত্য আজ আর নাই। জাপান পাশ্চাত্ত্য ঘেঁসা হইয়া পড়িয়াছে। চীনের অবস্থা কিছু বলা যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ যেভাবেই হউক ভিত্তিতে আজও দৃঢ় রহিয়াছে। যে রোম ও গ্রীসের আগের গৌরব আর নাই, তাহাদের পুঁথির পাঠই ইউরোপীয়রা পড়িতেছে। তাহাদের কাছ হইতে শিখিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া ইউরোপীয়রা কল্পনা করিয়া লইতেছে, তাহারা গ্রীস ও রোমের ভুল এড়াইয়া যাইবে। এমনি দীন তাহাদের অবস্থা। কিন্তু হিন্দুস্থান অচল, অটল। ইহাই হিন্দুস্থানের গৌরব। ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগই হইল যে এই দেশের লোক এতই অসভ্য, এতই অজ্ঞান ও এতই নির্বোধ যে তাহাদের দিয়া কোন পরিবর্তন মানাইয়া লওয়া যায় না; প্রলুব্ধ করা যায় না। সত্য বলিতে কি, ইহা আমাদের গুণের প্রতি দোষারোপ! অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে আমরা তাহা বদলাইতে সাহস করি না। অনেক

পথ-প্রদর্শক আসিতেছে, যাইতেছে, কিন্তু হিন্দুস্থান অচল আছে। ইহাই তাহার সৌন্দর্য, ইহাই তাহার আশার আলোক।

সভ্যতা হইল আচরণধারা, যাহা মানুষকে কর্তব্য-পথ নির্দেশ করে। মন আর ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে রাখার নামই নৈতিক চরিত্র রক্ষা। আমরা এমনি করিয়া নিজে নিজেকে জানিতে পারি। সভ্যতার গুজরাটি প্রতিশব্দ হইল 'সৎ আচরণ'। এই সংজ্ঞা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের, অনেক লেখক যেমন লিখিয়া গিয়াছেন, কাহারো নিকট হইতে কিছু শিখিবার নাই; এবং এই রকমই হওয়া উচিত।

মানুষের মন চঞ্চল। যত পায়, ততই চায়। অনেক পাইয়াও সে সুখী হইতে পারে না। ভোগ করিতে পারিলে ভোগ করিবার ইচ্ছা বাড়িতেই থাকে। এই জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণ উহার একটা সীমা বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, সুখ বহুলাংশে মনের ব্যাপার। আমীরের আমিরী তাহাকে যেমন সুখ দেয় না, গরীবের গরিবীও তেমনি দুঃখের কারণ হয় না। আমীর দুঃখী ও গরীব সুখী ইহাও দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ সব সময়ই গরীব থাকিবে। এই সব দেখিয়াই আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের বিলাস ও আমোদ আহ্লাদ থেকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। হাজার হাজার বছর আগে যে ধরনের লাঙ্গল ছিল, আমরা তাহা লইয়াই কাজ চালাইতেছি। হাজার বৎসর পূর্বে যে কুটীর ছিল তাহাই এখনো রাখিয়াছি। হাজার বৎসর পূর্বে যে শিখিবার ও পড়িবার ধরন ছিল আমরা তাহাই বজায় রাখিয়াছি। হানিকর প্রতিযোগিতামূলক কোনো রীতিনীতিকেই আমরা আমাদের কাছে ভিড়িতে দিই নাই। সকলে নিজ নিজ ব্যবসা করিতেছিলাম। দস্তুর মত মজুরির ব্যবস্থা ছিল। একথা সত্য নয় যে, আমরা কলের খোঁজ ও কল উদ্ভাবনের বিদ্যা জানিতাম না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা দেখিয়াছিলেন যে. মানুষ যদি কলের বেড়াজালে পড়ে তবে সে গোলাম হইয়া যাইবে, নীতিধর্ম হারাইবে। তাঁহারা অনেক বুদ্ধি বিচার করিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, নিজেদের হাত পা কাজে লাগানোয়ই সত্যকার সুখ—উহাতেই স্বাস্থ্য। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, বড় বড় শহর বানানো মিথ্যা ফাঁদ পাতারই সামিল। তাহাতে অনেক ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হয়, লোকে সুখী হইতে পারে না। চমৎকার বাজার আর জমকালো অট্টালিকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা আমীরেরাই গরীবকে লুটিবার সুবিধা পায়। এই জন্য তাঁহারা গ্রামেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, রাজা ও তলোয়ারের বল অপেক্ষা নীতির বল অধিক। সেইজন্যই তাঁহারা রাজাকে ঋষি ও ফকিরের নীচে স্থান দিয়াছিলেন। যে জাতির এই প্রকার রীতিনীতি, তাহারা অপরকে শিক্ষা দিতে পারে, অপরের নিকট হইতে তাহাদের শিক্ষা লওয়ার কিছু নাই।

আমাদের দেশেও আদালত ছিল, উকিল ডাক্তার ছিল—কিন্তু সমস্তই সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতরে। সকলেই জানিতেন যে, ঐ সকল কাজ বিশেষ করিয়া উন্নততর নয়। তা'ছাড়া উকিল বৈদ্য ইত্যাদি লোকের টাকাও লুটিয়া লইতেন না। তাঁহারা মানুষকে সাহায্য করিতেন, মাথার উপর বসিয়া থাকিতেন না। মোটামুটি ন্যায়বিচার হইত। লোকের আদালতে না যাওয়াই ছিল নিয়ম। লোককে ফুসলাইবার জন্য দালালের দল

ছিল না। তা ছাড়া, এই সব মন্দ ব্যাপার কেবল রাজধানীতে ও তাহার আশেপাশেই দেখা যাইত। বাকী লোকেরা রাজ-রাজড়ার ভিড় হইতে দূরে নিরিবিলিতে গ্রামের ভিতর আনন্দে ক্ষেতের কাজ করিত। তাহাদের খাঁটী স্বরাজ ছিল।

আর আজও যেখানে এই অভিশপ্ত সভ্যতা পেঁছায় নাই সেখানে হিন্দুস্থান এখনো আগের মতই আছে। সেখানে যদি এই সব নতুন ধরনের ধারণা চালানো হয়, তবে লোক উপহাস করিবে। তাহাদের উপর ইংরেজ শাসন করে না, আপনিও কখনো তাহা করিবেন না। আজ যাহাদের নামে আমরা কথা বলি, তাঁহাদের আমরা জানি না, তাহারাও আমাদের জানে না। আপনার আর আপনার মত যাঁহাদের দেশের প্রতি ভালবাসা আছে তাঁহাদের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, আপনারা আগে দেশের যেখানে রেল নাই, সেই সব স্থানে ছয় মাস বাস করিয়া আসুন; তাহার পরই আপনারা সত্যকার দেশপ্রেমিক হইবেন এবং তখন স্বরাজ সম্বন্ধে কথা বলিবেন।

আপনি হয়ত বুঝিয়াছেন, সত্যকার সভ্যতা বলিতে আমি কী বুঝাইতেছি। যাহারা ঐ অবস্থা বদল করিতে চায়—আমি যেমন বর্ণনা দিয়াছি—তাহারা দেশের শত্রু, পাপী।

পাঠক—আপনি যেরূপ বলিলেন হিন্দুস্থান যদি সেইরূপ হয় ত ভাল কথা। কিন্তু যে দেশে শত শত বাল-বিধবা রহিয়াছে, যেখানে দুই বৎসর বয়সের বালিকার বিবাহ হয়, যেখানে বার বৎসরের মেয়েরা মা হয়, ঘর সংসার করে, যে দেশে মেয়েরা বহু পতি গ্রহণ করে, যে দেশে ধর্মের নামে কুমারী কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করে, যে দেশে ধর্মের নামে ছাগবলি দেওয়া হয়, সে দেশেও ত হিন্দুস্থানই বটে। ইহাও কি আপনার মতে সভ্যতার লক্ষণ?

সম্পাদক—আপনি ভুল করিতেছেন। আপনি যে সব কথা বলিলেন সেগুলি ত ত্রুটি, সেগুলিকে সভ্যতা কেহ বলে না। সভ্যতা সত্ত্বেও ঐগুলি রহিয়া গিয়াছে। ঐ সকল দূর করার জন্য সর্বদা চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেও থাকিবে। আমাদের মধ্যে যে জাগরণ আসিয়াছে উহাকে আমরা ত্রুটি সংশোধনের কাজেই লাগাইতে পারি। আমি আপনার কাছে বর্তমান সভ্যতার লক্ষণ সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছি, উহার অনুরক্ত ব্যক্তিরাও তাহা মানিয়া লন এবং হিন্দুস্থানের সভ্যতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার উপাসকরাও তাহা স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন না। কোনও দেশেই কোনও সভ্যতাতেই সকল মানুষের সম্পূর্ণতা আসে নাই। ভারতীয় সভ্যতার প্রবণতা মানুষের নৈতিক মান উন্নীত করার দিকে; আর পশ্চিমী সভ্যতা কু-নীতি প্রচার করিতেছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা নাস্তিকভাবাপন্ন। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপর।

এই সব কথা জানার পর, সন্তান যেমন মাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে, আমাদেরও ভারতীয় সভ্যতাকে তেমনি করিয়া আঁকড়াইয়া থাকা উচিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

ভারতবর্ষ কীভাবে স্বাধীন হইতে পারে

পাঠক—সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার মত জানিলাম। আপনার কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব কথা মানিয়া লইতে পারি না। তাহা হইলে, আপনি যে মতামত পোষণ করেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুস্থানের মুক্তির উপায় কী বলিয়া আপনি মনে করেন?

সম্পাদক—এমন আশা আমি করি না যে, সকলে আমার কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই মানিয়া লইবেন। আপনার ন্যায় যিনি আমার বিচার জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকট আমার মত ব্যক্ত করা কর্তব্য মনে করি। আমার বিচার তাঁহাদের পছন্দ হয় কিনা তাহা সময়মত বোঝা যাইবে। হিন্দুস্থানের মুক্তির উপায় ত পরোক্ষভাবে বিচার করাই হইয়াছে; এইবারে না হয় আসুন, স্পষ্ট ভাবেই বিচার করা যাক।

এ কথা ত সকলেই মানে, যে কারণে মানুষের রোগ হয় সেই কারণ দূর করিতে পারিলেই রোগও চলিয়া যায়। তেমনি যে কারণে হিন্দুস্থান দাস হইয়াছে, সেই সকল কারণ দূর করিলে দাসত্বও দূর হইবে।

পাঠক—যদি হিন্দুস্থানের সভ্যতাকে সব চাইতে ভাল মনে করেন তবে হিন্দুস্থানের দাসত্ব কী করিয়া হইল?

সম্পাদক—এই সভ্যতা প্রশ্নাতীতভাবে সর্বোত্তম; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে সকল সভ্যতাই পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতেছে। যে সভ্যতা অটল, পরিণামে সে সব আপদ দূর করিতে পারে। হিন্দুস্থানের সন্তানদের ভিতর দুর্বলতা ছিল। তাই তাহাদের সভ্যতা বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই আঘাত হইতে মুক্তি পাওয়ার শক্তিও উহার আছে। ইহাই উহার বৈশিষ্ট্য। তা'ছাড়া সারা হিন্দুস্থানকে নতুন সভ্যতা স্বারা স্পর্শ করা যায় নাই। যাহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়াছে ও তাহার পাকে জড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারাই দাসত্বে ডুবিয়াছে।

আমরা আমাদের নিজেদের ছোট মাপে সারা সংসারকে মাপিয়া থাকি। নিজে যখন গোলাম হইয়াছি তখন সারা সংসারকেই গোলাম মনে করি। বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু এ রকম হয় না। আবার অন্য দৃষ্টিতে দেখিলে নিজেদের গোলামি দেশেরই গোলামি। নিজেদের দাসত্ব দূর হইলে দেশেরও দাসত্ব দূর হইবে। ইহাই স্বরাজের সংজ্ঞা। নিজের উপর নিজের আধিপত্যই স্বরাজ, আর তাহা ত নিজের হাতেই আছে। এই স্বরাজ স্বপ্ন মনে করিবেন না। স্বরাজ লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার ব্যাপার নয়। স্বরাজ এমন জিনিস যে, উহার স্বাদ নিজে একবার পাইলে অপরকে সে স্বাদ পাওয়াইবার জন্য জন্ম-ভর যত্ন করিয়া যাইতে হয়। আসল কথা ত এই, প্রত্যেকেই যেন স্বরাজ ভোগ করে। যে নিজে ডুবিতেছে সে অপরকে পার করিতে পারে না, যে সাঁতরাইতে জানে সেই পারে। নিজে দাস থাকিয়া অপরকে মুক্ত করার চেষ্টা নিষ্ফল। আপনি এখন সম্ভবতঃ বুঝিয়াছেন যে, ইংরেজকে বহিষ্কার করাই আমাদের চরম কাম্য নহে। ইংরেজরা যদি ভারতীয় হইয়া থাকিতে পারে তাহা হইলে আমরা

উহাদের স্থান দিতে পারি। তবে ইংরেজ যদি নিজের সভ্যতা আঁকড়াইয়া ধরিয়া এখানে থাকিতে চায়, এখানে তাহাদের স্থান নাই। এই রকম অবস্থা সৃষ্টি করা ত আমাদের নিজের হাতের ভিতরেই আছে।

পাঠক—আপনি ইংরেজকে হিন্দুস্থানী করিবার যে কথা বলিলেন, উহা অসম্ভব কথা।

সম্পাদক—উহা অসম্ভব বলিবার অর্থ ইংরেজদের মধ্যে কোন মনুষ্যত্ব নাই বলারই সামিল। তবে ইংরেজরা এ পথ গ্রহণ করিবে কিনা তাহাও আমাদের ভাবিবার দরকার নাই। আমাদের নিজেদের ঘর সাফ করাই আগে দরকার। সাফ করা হইলে উহাতে যে সব লোক থাকার যোগ্য তাহারাই থাকিবে, অপরে নিজের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিয়া লইবে। এই রকমের অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু আছে।

পাঠক—কিন্তু ইতিহাসে ত ঐরূপ ঘটে নাই।

সম্পাদক—যাহা ইতিহাসে নাই, তাহা কখনো হয় নাই এবং হইতেও পারে না—এ রকম বিশ্বাস করা মানুষের মর্যাদায় অবিশ্বাস করার পক্ষে যুক্তি দেওয়ারই সমান। অন্ততঃ যে সকল কথা যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া মনে হয় তাহা যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক। সকল দেশের এক রকম অবস্থা হয় না। কিন্তু হিন্দুস্থানের অবস্থা অভিনব। তাহার অপরিমেয় শক্তি। তাই অন্য দেশের ইতিহাসের সহিত আমাদের তুলনাও চলে না। আমি আপনাকে দেখাইয়াছি যে, অন্য সভ্যতা যখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ভারতীয় সভ্যতা বহু ঘাত প্রতিঘাত কাটাইয়া উঠিয়াছে।

পাঠক—আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। অস্ত্রশস্ত্রের জোরে ইংরেজদের এ দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে যে হইবে, সে বিষয়ে অল্পই সন্দেহ রহিয়াছে। তাহারা যতদিন এদেশে থাকিবে, আমরা শান্ত হইতে পারি না। আমাদের এক কবি বলিয়াছেন, পরাধীন ব্যক্তির স্বপনেও সুখ নাই। তাহারা থাকাতেই আমরা শক্তিহীন হইয়া আছি, আমাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং আমাদের দেশের লোকদের ভীত সন্ত্রস্ত দেখায়। ইংরেজরা আমাদের দেশে যমের মূর্তিতে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং সর্বপ্রযত্নে তাহাদের বিদায় করাতেই আমাদের কল্যাণ।

সম্পাদক—আপনি আপনার উত্তেজনায় আমার সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। আমরাই ইংরেজকে আনিয়াছি, আর আমরাই থাকিতে দিতেছি। তাহাদের সভ্যতা আমাদের নিজের করিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই যে তাহারা টিঁকিয়া থাকিতে পারিতেছে, একথা আজ আপনি কেমন করিয়া ভুলিয়া গেলেন? তাহাদের উপর আপনার যে ঘৃণা, তাহা হওয়া উচিত তাহাদের সভ্যতার উপর। কিন্তু যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে, লড়াই করিয়াই তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব তাহারই বা উপায় কী?

পাঠক—যেমন ইটালী করিয়াছিল। ম্যাজিনী আর গ্যারীবল্ডী যাহা করিয়াছেন আমরাও তাহা করিতে পারি। তাঁহারা যে মহাপুরুষ ছিলেন তাহা ত আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইটালী ও ভারতবর্ষ

সম্পাদক—ইটালীর উদাহরণ দিয়া আপনি ভালই করিয়াছেন। ম্যাজিনী মহান ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। গ্যারীবল্ডীও বড় যোদ্ধা ছিলেন। উভয়েই পূজ্য ব্যক্তি। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিতে পারি। তবুও ভারতবর্ষের ও ইটালীর অবস্থায় পার্থক্য আছে। প্রথমে ত গ্যারীবল্ডী ও ম্যাজিনীতে কী প্রভেদ তাহা জানা দরকার। ম্যাজিনী যাহা চাহিয়াছিলেন ইটালীতে তাহা এখনো রূপায়িত হয় নাই। ম্যাজিনী মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষেরই আত্মশাসন শেখা উচিত। ইটালীতে ইহা সাধিত হয় নাই। গ্যারীবল্ডী ম্যাজিনীর এই অভিমত পোষণ করিতেন না। গ্যারীবল্ডী সমস্ত ইটালীয়ানকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়াছেন, প্রত্যেক ইটালীয়ানও অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। ইটালী ও অষ্ট্রিয়া এই উভয়ের সভ্যতার মধ্যে প্রভেদ নাই। এ বিষয়ে উভয়ের সম্বন্ধ ছিল পরস্পর খুড়তুতো ভাইয়ের মত। ব্যাপারটি ছিল কিলের বদলে কিল। গ্যারীবল্ডী শুধু চাহিতেন অষ্ট্রিয়ার বাঁধন হইতে ইটালীকে মুক্ত করিতে। মন্ত্রী কাভুরের বুদ্ধিতে ইটালী যে পথ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাতে ইটালীর গৌরব খর্বই হইয়াছে—বাড়ে নাই। আর ইহার শেষ ফলই বা কী? আপনি যদি এ কথা বলেন যে, ইটালীতে ইটালীয়ানরা রাজত্ব করিতেছে এবং তাহাতেই ইটালীর প্রজা সুখী হইয়াছে তাহা হইলে আমি বলিব আপনি অন্ধকারে হাতড়াইতেছেন। ম্যাজিনী নিঃসংশয়ে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইটালী মুক্ত হয় নাই। ভিক্টর ইমান্যুয়ালের নিকট স্বাধীনতার অর্থ এক, আর ম্যাজিনীর নিকট ছিল অন্য রকম। ইম্যানুয়াল, কাভুর, এমন কী গ্যারীবল্ডীর কাছেও ইটালী বলিতে বুঝাইত ইটালীর রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গ। ম্যাজিনীর কাছে সারা ইটালীর মানুষ অর্থাৎ তাহার কৃষকবর্গই ছিল ইটালী; আর ইমান্যুয়াল মাত্র ইটালীর ভৃত্য। ম্যাজিনীর ইটালী আজও দাস হইয়া রহিয়াছে। তথাকথিত জাতীয় সমরের সময় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার মধ্যে যেন শতরঞ্জ খেলা চলে, আর ইটালীর প্রজারা যেন ঘুঁটি। ইটালীর মজুরেরা আজও দুঃখী। এই জন্য তাহারা খুন করে, বিদ্রোহ করে; তাহাদের দিক হইতে বিদ্রোহ সর্বদাই প্রত্যাশিত। অষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর প্রস্থানের পর ইটালীর কী উল্লেখজনক লাভ হইয়াছে? লাভ ত নামে মাত্র। যে সংস্কার সাধন, যে পরিবর্তন আনার জন্য যুদ্ধের আশ্রয় নেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়, তাহা এখনো অপূর্ণ রহিয়াছে। প্রজার দশা বদলায় নাই। হিন্দুস্থানেরও এই দশা হয়, আপনি নিশ্চয়ই তাহা চাহিবেন না। আমি জানি যে, আপনার ইচ্ছা হিন্দুস্থানের কোটি কোটি গরীব লোকের সুখ হোক। আপনি আমি রাজ্য-পাট লই, এমন ইচ্ছা আপনার নাই। যদি তাই হয় তাহা হইলে আমাদের একটা কথাই বিচার করিতে হইবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ কীভাবে স্বরাজ পাইতে পারে?

আপনি স্বীকার করিবেন যে, কত দেশীয় রাজ্যে প্রজাকে পীড়ন করা হয়।

দেশীয় রাজারা নির্মমভাবে প্রজাদের পদদলিত করিয়া থাকেন। ইংরেজের চাইতে তাঁহাদের জুলুম বেশী। আপনি যদি ভারতবর্ষে ঐ ধরনের প্রজাপীড়ন, অত্যাচার চান তবে আমাদের দুইজনের মতের অমিল ঘুচিবে না।

আমার স্বদেশ-প্রেম একথা আমাকে শিখায় না যে, প্রজার উপর দেশীয় রাজ্যে যে অত্যাচার হইতেছে তাহা চলিতে থাকুক, কেবল ইংরেজরা চলিয়া যাক। আমার ক্ষমতা থাকিলে ইংরেজদের অত্যাচার উৎপীড়ন যেমন, তেমনি দেশীয় রাজাদের অত্যাচারও প্রতিহত করিতাম। স্বদেশ-প্রেম মানে আমি দেশের হিত বুঝি। যদি দেশের হিত ইংরেজের হাত দিয়া হইত তবে আমি ইংরেজের নিকট নতশির হইতাম। যদি কোনও ইংরেজ হিন্দুস্থানের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, এদেশে অত্যাচার দূর করিবার জন্য, এ দেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়, তবে সে ইংরেজকে আমি ভারতীয় হিসেবেই অভিনন্দিত করিব।

আবার, হিন্দুস্থান যদি ইটালীর মত অস্ত্র-শস্ত্র পায়, তবে সে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করিতে পারে। মনে হয় এই সমস্যার কথা আপনি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। ইংরেজরা ভালভাবে সশস্ত্র রহিয়াছে; তাহাতে অবশ্য আমি ভীত নই, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট যে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র লইয়া দাঁড়াইতে হইলে হাজার হাজার ভারতীয়কে অস্ত্রসজ্জিত করিতে হইবে। যদি তাহা সম্ভবও হয়, তাহার জন্য কত বৎসর লাগিবে? তাহা ছাড়া হিন্দুস্থানকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করার মানে ত হিন্দুস্থানকে ইউরোপ বানাইয়া ফেলা। সে ক্ষেত্রে এ দেশের অবস্থাও ইউরোপের মতই দুর্দশাগ্রস্ত হইবে। সংক্ষেপতঃ ইহার মানে, হিন্দুস্থানকে ইউরোপের সভ্যতাই মানিয়া লইতে হইবে। তাহাই যদি আমরা চাই, তবে ইউরোপীয় সভ্যতায় যাঁহারা অভিজ্ঞ আমাদের ভিতর তাঁহাদেরই আমদানি করিতে হয়। তাহার পর কতকগুলি অধিকারের জন্য লড়াই আরম্ভ হইবে, যাহা পাওয়া যায় তাহাই আদায় করিয়া লইব এবং এমনি করিয়া আমাদের দিন কাটিবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল, হিন্দুস্থানের জনসাধারণ কখনও সকলে অস্ত্র ধারণ করিতে সম্মত হইবে না। এবং হওয়াও সঙ্গত নয়।

পাঠক—আপনি অনেকটা বাড়াবাড়ি করিতেছেন। সকলের অস্ত্র-শস্ত্র লওয়ার দরকার নাই। প্রথম প্রথম আমরা স্বল্প কয়েকজন ইংরেজকে খুন করিয়া সন্ত্রাস সৃষ্টি করিব। তারপর কিছু লোক প্রস্তুত হইলে সামনাসামনি যুদ্ধ করিব। ইহাতে সম্ভবতঃ আড়াই লাখ ভারতীয়ের জীবন যাইতে পারে। কিন্তু তাহার ফলে আমরা আমাদের দেশকে উদ্ধার করিতে পারিব। আমরা গরিলা যুদ্ধ চালাইয়া ইংরেজকে হারাইয়া দিব।

সম্পাদক—অর্থাৎ আপনি ভারতবর্ষের পবিত্র ভূমিকে দানবপুরীতে পরিণত করিতে চান। খুন জখম করিয়া হিন্দুস্থানকে স্বাধীন করিবার কল্পনায় আপনার হৃৎকম্প উপস্থিত হয় না? খুন যদি হইতে হয়, আমাদের নিজেদেরই হইতে হইবে। অপরকে খুন করিবার কল্পনা ত কাপুরুষতা। হত্যার দ্বারা আপনি কাহাকে মুক্ত করিবেন? হিন্দুস্থানের জনসাধারণ এখনো ইহা চায় না। আপনার ন্যায় যাঁহারা মিথ্যা সভ্যতার নেশায় মশগুল হইয়া আছেন তাঁহারাই এই রকম মতের ফেরে

পড়িয়া থাকেন। হত্যার মধ্য দিয়া যাঁহারা ক্ষমতায় আসিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জাতিকে সুখী করিতে পারিবেন না। ধীংরা যে খুন করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানে অন্য যে সকল খুন হইয়াছে তাহাতে ভারতের লাভ হইয়াছে বলিয়া যদি মনে করেন, তবে আপনি ভুল করিতেছেন। ধীংরাকে দেশ-প্রেমিক বলা যায়, কিন্তু তাঁহার প্রীতি ছিল অন্ধ। তিনি নিজের শক্তিকে ভুল পথে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহার পরিণাম কখনো ভাল হইতে পারে না।

পাঠক—কিন্তু আপনাকে ইহা ত মানিতেই হইবে যে, ইংরেজ এই সব খুনের জন্যই ভয় পাইয়াছিল এবং লর্ড মর্লের সংস্কার ঐ ভয়ের জন্যই।

সম্পাদক—ইংরেজ যেমন ভীরু তেমনি বীরও বটে। আমি মানি যে, গোলা বারুদের দ্বারা ইংরেজকে সহজে প্রভাবিত করা যায়। হইতে পারে লর্ড মর্লে যাহা কিছু দিয়াছেন ভয়েই দিয়াছেন। কিন্তু ভয় দেখাইয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা ততদিনই থাকিবে যতদিন ভয় থাকিবে।

ষোড়শ অধ্যায়

পাশব শক্তি

পাঠক—ভয় দেখাইয়া পাওয়া জিনিস ততদিন টিঁকিয়া থাকিতে পারে যতদিন ভয় দেখানো যায়, ইহা আপনার নতুন সিদ্ধান্ত। যাহা পাওয়া গেল তাহা ত পাইলামই। তাহার আবার এদিক ওদিক কী করিয়া হইবে?

সম্পাদক—তাহা নয়। ১৮৫৭ সালের ঘোষণা বিদ্রোহের পর এবং শান্তি স্থাপনের জন্যই প্রচারিত হইয়াছিল। যখন শান্তি স্থাপিত হইল, লোক সরল মন হইয়া পড়িল, এই ঘোষণা রূপায়ণও মন্থর হইয়া গেল। যদি আমি সাজার ভয়েই চুরি না করি, তবে যখন সাজার ভয় চলিয়া যাইবে, তখন পুনরায় চুরি করিবার ইচ্ছা হইবে, আর চুরি করিবও বটে। ইহা ত অত্যন্ত সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়। আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে, জবরদস্তি করিয়া লোকের নিকট হইতে কাজ আদায় করা যায়, তাই আমরা জোরও প্রয়োগ করিয়া আসিতেছি।

পাঠক—আপনি যে যুক্তি দিতেছেন, তাহা ত আপনারই বিরুদ্ধে যায়। আপনি জানেন যে, ইংরেজরা যাহা কিছু নিজেদের দেশে পাইয়াছে পাশব শক্তি প্রয়োগ করিয়াই পাইয়াছে। আপনি অবশ্য একথাও বলিয়াছেন যে, ইংরেজরা যাহা কিছু পাইয়াছে তাহা কোনও কাজের জিনিস নয়। সে কথা আমার স্মরণ আছে। কিন্তু তাহাতেও আমার যুক্তি উল্টাইয়া যায় না। তাহারা নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিসই চাহিয়াছিল আর পাইয়াছেও তাহাই। কিন্তু কথা ত তাহা নহে। কথা হইতেছে এই যে, তাহারা নিজের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ করিতে পারিয়াছে। নিজের উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয়, তবে তাহা যে প্রকারেই সিদ্ধ হোক না কেন, তাহাতে ক্ষতি কী?

আমাদের লক্ষ্য, যাহা ভালো, তাহা যে কোন উপায়ে, এমন কী বল প্রয়োগ করিয়াও কেন পূরণ করিব না? ঘরে যখন চোর ঢোকে তখন কী আমরা ভাল-মন্দ উপায়ের বিচার করি? আমার ধর্ম তখন উহাকে তাড়াইয়া দেওয়া—তাহা যেমন করিয়াই হোক না কেন। এ কথা বোধ হয় আপনি মানেন যে, আবেদন নিবেদন করিয়া কিছু পাওয়া যায় নাই, এবং পাইবও না। তাহা হইলে আমরা বল প্রয়োগ করিয়া কেন তাহা লইব না? এবং আমরা যাহা পাইব, তাহা রক্ষা করিতে যতটা প্রয়োজন হইবে ততটাই সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া ভীতি জাগাইয়া রাখিব। ছোট ছেলে যদি আগুনে পা দিতে যায়, তবে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহার উপর বল প্রয়োগ করা নিশ্চয়ই আপনি খারাপ বলিয়া মনে করেন না। যেমন করিয়াই হোক আমাদের কাজ হাঁসিল করিয়া লওয়া চাই।

সম্পাদক—আপনি এরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন যাহা আপাত দৃষ্টিতে ঠিক বলিয়া মনে হয়। অনেকেই এই যুক্তির মোহে ভুলিয়াছে। আমিও পূর্বে এই রকম ভাবেই বিচার করিতাম। কিন্তু এখন আমার চোখ খুলিয়া গিয়াছে এবং ভুল দেখিতে পাইতেছি। আপনাকেও আমি সাবধান করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমে এই যুক্তিই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক যে, উহারা যেমন পশুবল প্রয়োগ দ্বারা কার্যসিদ্ধি করিয়া লইয়াছে, আমাদেরও তেমনি পশুবল প্রয়োগ করিয়াই কার্যসিদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজরা মারামারি করিয়াছে, আমরাও উহা করিতে পারি—একথা ঠিক। কিন্তু তাহারা মারামারি করিয়া যে দ্রব্য পাইয়াছে, মারামারি করিয়া আমরাও সেই ধরনের জিনিসই পাইব। আপনি ত এ কথা মানিবেন যে, সে ধরনের জিনিসের আমাদের প্রয়োজন নাই। আপনি লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহা স্বীকার করেন না। ইহা অত্যন্ত ভুল। এই ভুলবশতঃ যাঁহাদের ধর্মাত্মা বলিয়া মানা যায় তাঁহারাও দুস্কর্ম করিয়াছেন। বিষাক্ত আগাছা পুঁতিয়া গোলাপফুল পাওয়া যায় বলা যেমন, আপনার যুক্তিও তেমনি। নদী পার করার উপায় হইতেছে নৌকা। গরুর গাড়িতে বসিয়া যদি নদী পার হইতে চাই, তাহা হইলে গাড়িও ডুবিবে, আমিও ডুবিব।

'যেমন দেবতা তেমনি তাহার পূজা,' একথা খুবই ঠিক। ইহার ভুল অর্থ করিয়াই লোকে ভুল পথে চলে। সাধন হইতেছে বীজ আর সাধ্য হইতেছে বৃক্ষ। অতএব যে সম্বন্ধ বীজ ও বৃক্ষে সেই সম্বন্ধ সাধ্য ও সাধনে। শয়তানকে ভজনা করিয়া যদি ঈশ্বর ভজনার ফল চাই, তাহা কি কখনও পাওয়া যাইতে পারে? কাজেই একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কেবল ঘোর অজ্ঞতাবশতঃই একথা বলা হয়—আমার ঈশ্বর ভজন করা দরকার, তাহার উপায় যদি শয়তানী হয়, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু যেমন কর্ম তেমনি ফল ফলে। ইংরেজরা হিংসার পথে ১৮৩৩ সালে বেশী ভোটাধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু পাশবিক বল প্রয়োগ করিয়া কি তাহারা নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে অধিক অবহিত হইতে পারিয়াছে? মতলব ছিল ভোট দিবার অধিকার পাওয়া। তাহা তাহারা বল প্রয়োগ করিয়াই পাইয়াছিল। সত্যিকার অধিকার ত কর্তব্য পালনের ফল; তাহা তাহারা পায় নাই। কাজেই আমরা এখন দেখিতেছি যে ইংলণ্ডে প্রত্যেকেই দাবি করিতেছে,

তাহারা অধিকারের জন্য জেদ করিতেছে, কেহই নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবিতেছেনা। যেখানে সকলেই দাবির কথা বলে সেখানে কে কাহাকে কী দিবে? আমি এ কথা বলিতে চাই না যে, তাহারা কোন কর্তব্যই পালন করে না। কিন্তু এই বলি যে, তাহাদের যাহা আবশ্যক তাহা চাহিয়াছিল এবং পাইয়াছিল এবং পাইয়া যে কর্তব্য পালন করা দরকার তাহা করে নাই; তাহারা যাহা চাহিয়াছিল তদনুযায়ী নিজেদের সাধনের যোগ্যতা অর্জন করে নাই। সুতরাং অধিকার তাহাদের গলায় ফাঁসি হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। অন্যভাবে বলা যায়, তাহারা যাহা পাইয়াছে, তাহা তাহাদের অনুসৃত পথ বা উপায়েরই যথার্থ পরিণতি। আমার যদি আপনার ঘড়ি জোর করিয়া লওয়াই মতলব হয়, তাহা হইলে আপনার সঙ্গে অকারণ মারামারি বাধাইতে হইবে। কিন্তু যদি আপনার ঘড়িটাকে কিনিতে চাই, তাহা হইলে আমাকে তাহার মূল্যই দিতে হইবে। যে বস্তু ভিক্ষা দ্বারা লইতে হইবে তাহার জন্য খোশামোদ করা দরকার। পাওয়ার জন্য আমি যে সাধন প্রয়োগ করিব সেই অনুসারে উহা চোরাই মাল, কেনা মাল বা দানের দ্রব্য হইবে। তিন প্রকার বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা তিন রকমের ফল পাওয়া যায়। এখনও আপনি কি বলিবেন যে, উপায় বা সাধন সম্বন্ধে চিন্তা করার দরকার নাই?

আপনার চোরকে তাড়াইয়া দেওয়ার উদাহরণ লওয়া যাক। আপনার একথা আমি মানি না যে, চোরকে তাড়াইয়া দিবার জন্য যে কোনও উপায় লওয়া যায়। যদি আমার পিতা চুরি করিতে আসেন, সে ক্ষেত্রে আমি এক ধরণের পথ লইব। কোনও পরিচিত ব্যক্তি যদি আসে আমি অন্য কোন পথ লইব। কোনও অপরিচিত লোক যদি চুরি করিতে আসে তবে তৃতীয় কোনও উপায় অবলম্বন করিব। আপনি হয়ত ঐ অপরিচিত চোর যদি শ্বেতাঙ্গ হয়, তবে এক উপায়, আর ভারতীয় হইলে অন্য উপায় গ্রহণ করিতে বলিবেন। যদি কোনও দুর্বল লোক চুরি করিতে আসে তবে আমি সম্পূর্ণ অন্য পথ লইব। যদি ঐ ব্যক্তি আমার সহিত জোরে সমান হয় তবে এক রকম পথ লইব, আর যদি সে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত থাকে, তাহার গায়ে জোর বেশী থাকে তবে চুপচাপ শুইয়া থকিব। এইভাবে পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া বলবান চোরের জন্য বিভিন্ন পন্থায় চলিতে হইবে। বাপ যদি চোর হন তবে সম্ভবতঃ শুইয়াই থাকিব। বলবান অস্ত্রধারী চোর হইলেও আমাকে ঐ পথই অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ হইল, আমার পিতাও 'সশস্ত্র' হইতে পারেন এবং উভয়েরই বলের কাছে বশীভূত হইয়া আমি আমার মাল চুরি হইতে দিব। পিতার বল আমার মনে করুণার উদ্রেক করিয়া কাঁদাইবে। সশস্ত্র ব্যক্তির বল আমার মধ্যে ক্রোধের ভাব উপস্থিত করিবে এবং আমি ঐ ব্যক্তির বিষম শত্রু হইয়া যাইব। এমনি বিচিত্র অবস্থা। এই উদাহরণে উপায় অবলম্বন সম্বন্ধে আমরা দুইজনে একমত না হইতে পারি। আমার ত সকল চোর সম্বন্ধে কী করিতে হইবে তাহা জানা। তবে সেকথা শুনিলে আপনি ভয় পাইবেন, সেইজন্য সে বিচার এখানে তুলি নাই। যদি পারেন বুঝিয়া লইবেন, আর যদি নাও বুঝেন ক্ষতি নাই। কিন্তু একথা ঠিক যে, সব সময়েই বিভিন্ন পথ লইয়া আপনাকে আপনার কাজ নিষ্পন্ন করিতে হইবে। চোরকে তাড়াইয়া দেওয়ার জন্য ইচ্ছানুরূপ উপায়ই সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়

না। আর সাধন যেমন হইবে ফলও তেমনি হইবে। আপনার ধর্ম ইহা নয় যে, যেমন করিয়া পারি চোরকে তাড়াইয়া দিব।

এখন আর একটু আলোচনা করা যাক। এই অস্ত্রধারী চোর, ধরুন, আপনার দ্রব্য চুরি করিয়াছে। কিন্তু আপনি ত ইহা বুঝিয়া লইয়াছেন যে, চোর তাড়াইবার জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করা যায় না এবং উপায়ও যেমন বাছিয়া লওয়া হইবে ফলও তেমনি হইবে। সুতরাং যেমন করিয়াই হোক চোর তাড়াইতে হইবে, ইহাই আপনার ধর্ম নহে।

এইবার যে অস্ত্রধারী চোর আপনার জিনিস চুরি করিয়া লইয়াছে তাহার কথা ধরুন। আপনি তাহাকে চিনিয়া রাখিয়াছেন, আপনার ক্রোধ হইয়াছে। ঐ বদমাইসকে দণ্ড দেওয়া দরকার, নিজের জন্য না হোক, সংসারের ভালর জন্যই দণ্ড দেওয়া দরকার। আপনি কতকগুলি লোক জমা করিলেন এবং উহার বাড়িতে গিয়া চড়াও হইলেন। চোর আপনার আগমনের কথা জানিতে পারিয়া বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। তারপর সেও চটিয়া গিয়া কতকগুলি লাঠিয়াল একত্র করিয়া শোধ লইবার জন্য দিন-দুপুরে আপনার বাড়ি লুটিবার আয়োজন করিতে লাগিল। আপনার বল আছে, আপনি উহাতে ভয় পাইলেন না। আপনি নিজে তৈয়ারি হইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে তাহারা আপনার প্রতিবেশীদের বাড়ি লুটিতে আরম্ভ করিল। প্রতিবেশীরা আসিয়া আপনার নিকট নালিশ করিতে লাগিল। আপনি বলিলেন— আমি ত আপনাদের জন্যই এ সব করিতেছি, নতুবা আমার নিজের জন্য ত কোনও চিন্তাই ছিল না। প্রতিবেশীরা উত্তর দিল—আগে ত উহারা আমাদের উপর অত্যাচার করিত না; আপনি যখন হইতে লড়াই আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই ত এই সব আরম্ভ হইয়াছে। তখন আপনার সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা হইল। গরীবের দুঃখে দয়া হয়, তা'ছাড়া তাহাদের কথাও সত্য। এখন করা যায় কী? দস্যুদের নিকট হার মানিলে নাক কাটা যায়। কিন্তু কেহ কি নিজের নাক কাটিতে দিতে চায়? ও জিনিসটা সকলেরই প্রিয়। তাই আপনি গরীব প্রতিবেশীদের বলিবেন—ভাই, আমার টাকা-পয়সা তোমরা লও, আমি তোমাদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র দিই, অস্ত্র চালানো শিখাইয়া দিই, দুষ্টদের মারো, ছাড়াছাড়ি নাই। এমনি করিয়া লড়াই বাড়িয়া গেল। দস্যুদের দলও বাড়িতে লাগিল। লোকের মাথার উপর এক মহাবিপদ ঘনাইয়া আসিল। চোরকে সাজা দেওয়ার চেষ্টা করিতে গিয়া লাভ হইল এই যে, যেখানে শান্তি ছিল সেখানে অশান্তি উপস্থিত হইল। আগে মৃত্যু আসিলে তবে লোকে মরিত; এখন মৃত্যু দিন-রাত মাথার উপর নাচিয়া ফিরিতে লাগিল—এই আসে ত এই আসে। যাহারা সাহসী ছিল তাহাদের সাহস ফুরাইতে লাগিল। এই উদাহরণ আমি যে বাড়াইয়া বলি নাই, আপনি ধীরভাবে বিচার করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই গেল চোর তাড়াইবার এক উপায়।

এখন অন্য আর একটি উপায় পরখ করিয়া দেখা যাক। আপনি মনে করিলেন যে, চোর অবুঝ। অবসর পাইয়া উহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আপনি ভাবিলেন, চোরটা ত মানুষ বটে। জানি না কেন চুরি করিতেছে। কিন্তু আমার কাজ হইবে, সময় উপস্থিত হইলে তাহার মন হইতে চুরি করিবার প্রবৃত্তি বিতাড়ন

করা। আপনার যখন মনের অবস্থা এই রকম, তখন মনে করুন, সেই ভাইসাহেব চুরি করিতে আসিয়াছেন। আপনার রাগ হইল না। উহার প্রতি আপনার দয়া হইল। আপনার মনে হইল যে, লোকটি দুঃখী জীব। আপনি খিড়কির দরজা খুলিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। আপনি শয়নের জায়গা বদলাইয়া লইলেন। জিনিস-পত্র এমন করিয়া সামনে রাখিয়া দিলেন যে, চোরের আর খোঁজাখুঁজি না করিতে হয়। চোর মহাশয় আসিয়া ভয় পাইয়া গেল। সে ভাবে এ আবার কী নতুন ঢং? মাল ত সে তখন লইয়া গেল, কিন্তু তাহার মনে এ বিষয় লইয়া একটা নাড়াচাড়া চলিতে লাগিল। সে ক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিল ও আপনার দয়ার কথা জানিতে পারিল। তখন তাহার কষ্ট হইল ও আপনার নিকট মাফ চাহিল। আপনার জিনিস-গুলিও ফিরাইয়া দিল। এবং চোরের ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া আপনার একেবারে চাকর হইয়া গেল। আপনি তাহাকে রোজগারের কোনও ভাল পথ দেখাইয়া দিলেন। ইহা অন্য রকমের উপায়। আপনি দেখিতে পাইতেছেন, ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন ফল হয়। আমি এই উদাহরণ দিয়া একথা বলিতে চাই না যে, সকল চোর এমনি ব্যবহার করিবে বা সকলের মনে আপনার ন্যায় দয়াভাব আছে। কেবল এইটুকুই বুঝাইতে চাই যে, ভাল ফল পাইতে হইলে পথটাও ভাল হওয়া চাই এবং যদি সব সময়ও না হয়, তবু কোনও কোনও সময় অস্ত্রের বল অপেক্ষা দয়ার বল যে অধিক শক্তিশালী তাহাতে এতটুকুও সন্দেহ নাই। পাশব শক্তি প্রয়োগে হানি ঘটে, দয়ায় কখনো ক্ষতি হয় না।

তারপর প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করার কথা ধরা যাক। যে আবেদনের পিছনে বল নাই সে আবেদনের কোন দামও নাই। একথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। সে যাহাই হোক, স্বর্গীয় বিচারপতি রানাডে বলিতেন, আবেদন নিবেদন করাও লোক শিক্ষা দেওয়ার অন্যতম উপায়। ইহা লোককে নিজের অবস্থা সম্বন্ধেও সচেতন করিয়া তোলে এবং শাসকদিগকেও সতর্ক করিয়া দেয়। এই দৃষ্টিতে দেখিলে আবেদন করা একেবারে নিষ্ফল নহে। বরাবর কোন লোক যদি প্রার্থনা করিয়া যায় তবে তাহা দাস-মনোভাবের পরিচয় দেয়। যে প্রার্থনার পিছনে শক্তি আছে সেই প্রার্থনাই সর্বদা প্রয়োগের যোগ্য। এই প্রকার শক্তির অধিকারী প্রার্থনার গরজ দেখাইলে উহাতে তাহার মহত্ত্বই প্রমাণিত হয়।

প্রার্থনার পিছনে দুই রকমের শক্তি থাকিতে পারে। এক রকমের জোর এই যে, "যদি না দাও তবে তোমাকে আঘাত করিব।" ইহাই অস্ত্রশস্ত্রের শক্তি। উহার ফল যে খারাপ হয় সে বিচার পূর্বে করিয়াছি। আর এক রকমের শক্তি আছে যাহা বলে—'যদি তোমরা আমাদের দাবী স্বীকার না কর, আমরা আর আবেদন জানাইয়া দরখাস্ত করিব না। যতদিন আমরা শাসিত থাকিব, ততদিনই কেবল তোমরা আমাদের শাসন করিতে পারিবে; আমরা আর তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিব না।' ইহার মধ্যে যে বল অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে প্রেম-বল, আত্মার বল বা অত্যন্ত জনপ্রিয় সংজ্ঞায়—যদিও তত সঠিকভাবে নয়—অসহযোগ বলা যায়। এই শক্তির কখনও নাশ হইতে পারে না। এই শক্তি যাঁহারা প্রয়োগ করিতে পারেন, তাঁহারা নিজেদের অবস্থাও ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন। যাঁহার এই শক্তি আছে

তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-শস্ত্রের বল কিছুই করিতে পারে না।

তারপর, ছেলে যদি আগুনে পা দেয় তবে তাহাকে আটকাইতে হইবে, এই বলিয়া জবরদস্তি করার যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাক। পরীক্ষা করিলে, কষ্টিপাথরে উহাকে ঘষিলে, আপনিই হারিয়া যাইবেন। আপনি ছেলেদের বেলায় কী করিয়া থাকেন? ছেলে যদি এমন হয় যে, শারীরিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা আপনার বাধাকে ব্যর্থ করিয়া সে আগুনের ভিতর পা বাড়ায়, তবে ত আপনি আর তাহাকে রুখিয়া রাখিতে পারেন না। আপনার কাছে তখন দুইটি মাত্র উপায় থাকে। একটি—আগুনে যাহাতে না পড়িতে পারে সেজন্য উহারই প্রাণ লওয়া; দ্বিতীয়টি—আগুনে পুড়িয়া তাহার অপমৃত্যু দেখিতে না হয়, এই জন্য আপনার নিজেরই প্রাণ বিসর্জন দেওয়া। আপনি নিশ্চয়ই ছেলের প্রাণ লইবেন না; আর, আপনার হৃদয় যদি করুণায় পরিপূর্ণ না হয় তবে আপনি নিজের প্রাণ বিসর্জনও দেবেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে, আপনি অসহায়ভাবে আপনার ছেলেকে আগুনে পুড়িয়া মরিতে দেখিবেন। এইভাবেই স্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে যে যাহাই হউক, আপনি বল প্রয়োগ করিতেছেন না। আপনি পারিলে জোর করিয়া, শিশুকে আগুনের দিকে ছুটিয়া যাইতে বাধা দেবেন; আমি আশা করি, আপনি এখনো ইহাকে দৈহিক বল বলিবেন না। ঐ বল অন্য রকমের। সে বল যে কিসের বল তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আবার দেখুন, ছেলেকে যখন আটকাইতে চান, তখন সেই ছেলের হিত করাই ঐ শিশুর স্থলাভিষিক্ত। এবং যেহেতু আপনি এরকম শিশুকে রক্ষা করিতে চান, তাহাও উহারই ভালর জন্য। কিন্তু এ রকম উদাহরণ ত ইংরেজের সম্বন্ধে খাটে না। আপনি যখন ইংরেজের উপর অস্ত্রের বল প্রয়োগ করিতে চান, তখন আপনার দৃষ্টি থাকে নিজের অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থের দিকে। ইহার মধ্যে করুণা বা প্রীতি বলিয়া কিছুই নাই। যদি একথা বলেন যে, ইংরেজ অধর্মাচরণ করিতেছে; অধর্ম আগুন; এবং অজ্ঞানতাবশতঃ ইংরেজরা সেই আগুনের দিকে ছুটিয়া যাইতেছে; তখন তাহারা ঐ শিশুর স্থলাভিষিক্ত। এবং যেহেতু আপনি এরকম শিশুকে রক্ষা করিতে চান, আপনাকে ঐ ধরনের মন্দ কাজ যিনিই করিয়া থাকুন না কেন, তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং দুষ্ট শিশুর ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আপনাকে আত্মবিসর্জন দিতে হইবে। আপনার ভিতর যদি এত অপরিসীম দয়া থাকে—আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি আপনি যেন তাহা ব্যবহার করিতে পারেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

*সত্যাগ্রহ—আত্মিকবল

পাঠক—আপনি যে সত্য-বল বা আত্মিকবলের কথা বলিতেছেন উহার কি কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে? আজ পর্যন্ত কোন জাতি এই আত্মিকবলের মধ্য দিয়া উন্নীত হইয়াছে, এমন ত দেখা যায় না। মার-কাট না করিলে দুষ্ট লোককে সিধা করা যায় না, ইহাই ত আজ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা।

সম্পাদক—তুলসীদাসজী বলিয়াছেন যে—

ধর্মমূল দয়া, পাপমূল অভিমান।
তুলসী দয়া না ছাড়িও, যব তক ঘটমে প্রাণ॥

আমার কাছে ত এই কথা বেদমন্ত্রের সমান। যেমন দুই আর দুই নিশ্চয়ই চার হয়, তেমনি এ কথাটাও নিশ্চিত সত্য বলিয়া আমি জানি। দয়াবলই হইতেছে আত্ম-বল। আর এই বলের প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়। উহা যদি বল না হইত তবে পৃথিবী রসাতলে যাইত। কিন্তু আপনি যখন ইতিহাসের প্রমাণ চাহিতেছেন তখন আমাকে বিচার করিতে হইবে, ইতিহাস কাহাকে বলে?

ইতিহাস-এর গুজরাটি প্রতিশব্দের অর্থ—'এই রকম ঘটিয়াছিল।' ইতিহাস শব্দের অর্থ যদি এই হয়, আপনাকে অনেক প্রমাণ দিতে পারিব। কিন্তু ইতিহাসের অর্থ যদি রাজা মহারাজাদের কীর্তিকলাপ হয়, তাহা হইলে সেই ইতিহাসে আত্মিক বল বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কোন সাক্ষ্য প্রমাণ মিলিবে না। টিনের খনিতে যদি আপনি রূপা খোঁজেন তবে কী করিয়া তাহা পাইবেন? এইজন্য ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, যে দেশের হিস্টিরী বা ইতিহাস নাই, অর্থাৎ যুদ্ধ লড়াই নাই, সে দেশের লোক সুখী। হিস্টিরীতে পাওয়া যায় কী? রাজা কেমন করিয়া খেলা করিতেন, কেমন করিয়া খুন করিতেন, কেমন করিয়া শত্রুতা সৃষ্টি করিতেন—এই সবই ত হিস্টিরী বা ইতিহাসের বিষয়। যদি ইহাই সত্যকার ইতিহাস হয়, পৃথিবীতে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই যদি এই হয়, তবে সংসার করে ডুবিয়া যাইত। যদি পৃথিবীর গল্প যুদ্ধ দিয়াই আরম্ভ হইত, তবে আজ একজন লোকও বাঁচিয়া থাকিত না। যে সকল জাতির মধ্যে যুদ্ধ করাই অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল তাহারা সকলেই প্রায় লোপ পাইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার হাবসীগণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যাহারা অস্ট্রেলিয়া দখল করিয়াছে তাহারা হাবসীদের কাহাকেও বাঁচিয়া থাকিতে দেয় নাই।

* গান্ধীজী ১৯০৮ সালে যখন 'হিন্দ স্বরাজ' লেখেন, 'সত্যাগ্রহ' শব্দটি ব্যবহার করেননি। মূল গুজরাটির ইংরাজি অনুবাদে 'প্যাসিভ রেজিসটান্স' লেখেন। বাংলায় তা 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' বললে সব অর্থটুকু প্রকাশ পায় না, তা ছাড়া নেতিবাচকও হয়ে পড়ে। সেজন্যই 'সত্যাগ্রহ'-ই সঠিক সংজ্ঞা। গান্ধীজী নিজেও পরে লিখেছেন, ইংরাজি প্রতিশব্দ 'প্যাসিভ রেজিসটান্স', আমি যে শক্তির কথা লিখতে চাই, তা প্রকাশ করে না। 'সত্যাগ্রহ'-ই ঠিক শব্দ। সত্যাগ্রহ সশস্ত্র শক্তির বিপরীত—আত্মিক বল। (১৯১৭র ২রা সেপ্টেম্বর শঙ্করলালকে লেখা চিঠি)—সম্পাদক

অনুগ্রহ করিয়া লক্ষ্য করুন, এই আদিবাসীরা আত্মরক্ষায় আত্মিক বল প্রয়োগ করে নাই। এবং একথা বুঝিবার জন্য খুব বেশী দূরদৃষ্টির দরকার হয় না যে, অস্ট্রেলীয়রাও একদিন ঐ পরাজিত, নিহতদের ভাগ্যই পাইবে। 'যাহারা তলোয়ার চালায় তাহাদের মৃত্যু তলোয়ারের দ্বারাই হয়।' প্রবাদ আছে, 'ভাল সাঁতারু জলে ডুবিয়াই মরে।'

পৃথিবীতে যে আজও এত লোক বাঁচিয়া আছে, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, পৃথিবী অস্ত্রের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পরন্তু দয়া, সত্য ও আত্মবলের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ইতিহাসের প্রধান প্রমাণ ত ইহাই যে, পৃথিবীতে যুদ্ধের ধুম চলিতে থাকিলেও, লোক বাঁচিয়া থাকিয়া সংসার-ধর্ম করিতেছে, যুদ্ধের উপরেই উহারা বাঁচিয়া নাই। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, যুদ্ধের শক্তি ছাড়াও অন্য কোন শক্তি এই সংসারকে পরিচালনা করিতেছে।

হাজার হাজার কেন লাখ লাখ লোক তাহাদের অস্তিত্বের জন্য এই শক্তিরই অত্যন্ত সক্রিয় প্রকাশের উপর নির্ভর করে। লক্ষ লক্ষ পরিবারের তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাট বিবাদ বিসম্বাদ এই শক্তি প্রয়োগেই মিটিয়া যায়। শত শত জাতি শান্তিতে আছে। কিন্তু (হিস্টিরী) ইতিহাসে সে কথার উল্লেখ দেখা যায় না হিস্টিরী তাহা উল্লেখ করিতেও পারে না। কারণ যেখানে দয়া, প্রেম বা সত্যের প্রবাহ বন্ধ হয় সেখানকার কথাই হিস্টিরীতে লেখা হয়। এক পরিবারে দুই ভাই ঝগড়া করিল। একজনের অনুতাপ হইল এবং সে নিজের মনের সুপ্ত প্রীতি পুনরায় জাগাইল। তারপর আবার তাহারা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে লাগিল। ইহা কে খেয়াল করিয়া থাকে? যদি তাহাদের মনে উকিলের সাহায্যে বা অন্য কারণে বৈরীভাব বাড়িত, যদি অস্ত্রের জোরে বা আদালত নামক অন্য প্রকার অস্ত্রের সাহায্যে তাহারা লড়িত, তাহা হইলেও তাহাদের কথা ছাপার হরপে লিখিত হইত, পাড়া-পড়শী জানিতে পারিত এবং সময়ে এই ঘটনা হয়ত ইতিহাসেও স্থান পাইত। একটা পরিবারের সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, সমস্ত কাল, সমস্ত স্থান, আর সমস্ত জাতির সম্বন্ধেও উহাই সত্য বলিয়া জানিবেন। পরিবারের সম্বন্ধে এক রকম, আর জাতির সম্বন্ধে অন্য রকম হয় এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। যাহা অস্বাভাবিক, ইতিহাসের পাতায় তাহারই স্থান আছে। আত্মিক-বল স্বাভাবিক, সেইজন্য ইতিহাসের পাতায় উহার কথা ত উঠিবে না।

পাঠক—আপনার কথায় ত মনে হয়, সত্যাগ্রহের উদাহরণ ইতিহাসে থাকিবার কথাই নয়। সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সবিস্তারে জানা দরকার। আপনি যাহা বলিতে চাহেন তাহা যদি খুলিয়া বলেন তবে ভাল হয়।

সম্পাদক—প্যাসিভ রেজিস্টান্স বা সত্যাগ্রহ হইল ব্যক্তিগতভাবে ক্লেশ সহিয়া অধিকার অর্জন; ইহা সশস্ত্র প্রতিরোধের বিপরীত। যে কাজে আমার বিবেকের সায় নাই, আমি যখন তাহা করিতে অস্বীকার করি, আমি আত্মিক-বল প্রয়োগ করি।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, সরকার এমন এক নিয়ম করিলেন যাহা আমার বিবেক অনুমোদন করে না। এই অবস্থায় যদি সরকারের বিরুদ্ধে জোর প্রয়োগ করিয়া ঐ আইন আমি রদ করাই, তাহা হইলে উহাতে আমার দৈহিক বল

প্রয়োগ করা হইল। কিন্তু যদি আমি ঐ আইন স্বীকার না করি, আর সেজন্য নির্দিষ্ট সাজা স্বেচ্ছায় বরণ করি, তবে আমি প্রয়োগ করিলাম আত্মিক বল। ইহার মধ্যে পড়ে আত্মবিসর্জন।

প্রত্যেকেই স্বীকার করেন যে আত্মবিসর্জন অন্যদের বলি দেওয়ার চেয়ে অসীম শ্রেয়ঃ। তা'ছাড়া সত্যাগ্রহ যদি অসংগত কারণে করা হয়, তাহা হইলে কেবল সত্যাগ্রহীই দুঃখ ভোগ করে। তাহার নিজের ভুলের জন্য সে অপরকে ক্লেশ দেয় না। মানুষ এমন অনেক কিছু করিয়াছে, করে, যাহা পরে ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কোন মানুষই এমন দাবী করিতে পারে না যে সে সম্পূর্ণ নির্ভুল বা কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় ভুল বা মন্দ, কারণ সে সেইরূপ মনে করে। কিন্তু যতক্ষণ কোন কিছু তাহার সুচিন্তিত বিচারে ভুল বলিয়া মনে হইবে, তাহা তাহার পক্ষে ভুলই। কাজেই সে যাহা ভুল বা অন্যায় বলিয়া জানে, তাহার তাহা করা উচিত নয় এবং পরিণাম যাহাই হউক সেই দুর্ভোগ ভোগ করা উচিত।

পাঠক—তাহা হইলে আপনি ত আইন অমন্য করিতেছেন, ইহা ত বিশ্বাস-ঘাতকতা। আমাদের সর্বদা আইন মান্যকারী জাতি বলিয়াই গণ্য করা হইয়া থাকে। আমি এখন দেখিতেছি, আপনি গরম দল হইতেও এক পা আগাইয়া গিয়াছেন। একস্ট্রিমিস্টরাও বলিয়া থাকেন, যে আইন হইয়াছে তাহা মানিতে হইবে। কিন্তু আইন যদি খারাপ হয় তাহা হইলে যাহারা আইন করিয়াছে, আমরা এমন কি বলপ্রয়োগ করিয়াও তাহাদের তাড়াইয়া দিব।

সম্পাদক—আমি তাহাদের আগাইয়া যাইতেছি কি যাইতেছি না, তাহাতে আমাদের উভয়েরই কাহারো কিছু আসে যায় না। যাহা ন্যায় আমি তাহারই অনুসন্ধান করিতেছি, আর সেই অনুসারেই চলিতে চাহিতেছি। আমরা আইন মান্যকারী জাতি, এই মন্তব্যের প্রকৃত অর্থ আমরা সত্যাগ্রহী। যদি কোনও আইন পছন্দ না হয়, তাহা হইলে আমরা আইনকারকদিগের মাথা ফাটাই না, পরন্তু অপছন্দ আইন রদ করার জন্য নিজেরা কষ্ট সহ্য করি। আজকাল সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ভালই হোক আর মন্দই হোক, আইন হইলেই আমরা তাহা মানিয়া লইতেছি; পূর্বে এরকম ছিল না। যে আইন অন্যায় মনে হইত পূর্বে লোক তাহা ভঙ্গ করিত ও তজ্জন্য সাজা ভোগ করিত। যে আইন আমাদের বিবেকের বিরোধী তাহা মান্য করা মনুষ্যত্বের পক্ষে অবমাননাকর; ধর্ম-বিরুদ্ধ এবং তাহা দাসত্বের অনুরূপ। সরকার যদি বলে—তোমরা নেংটা হইয়া নাচ, তাহা হইলে কি আমরা নাচিব? যদি সত্যাগ্রহী হই, তবে গভর্নমেণ্টকে বলিব যে, এই নিয়ম আপনি আপনার ঘরে বসিয়া পালন করুন, আমি নেংটাও হইব না, নাচিবও না। কিন্তু আজ আমরা এমন আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছি, এত বশ্য হইয়াছি যে আমরা কোন অবমাননাকর আইনেও কিছু মনে করি না।

যে মানুষের মনুষ্যত্ব আছে, যিনি কেবল ঈশ্বরকে ভয় করেন তিনি কখনও আর কাহাকেও ভয় করেন না। তাঁহাকে মানুষের তৈরি কোনও নিয়মই বাঁধিতে পারে না। গভর্নমেণ্টও একথা বলে না যে, তোমাকে এই কাজ করিতেই হইবে; সে বলে, যদি তুমি ইহা না কর, তবে তোমার সাজা হইবে। আমরা অধঃপতিত

হইয়াছি বলিয়াই আইন হইলেই আমরা মনে করি—আমাদের এ আইন অনুসারে চলিতেই হইবে, উহাই আমাদের কর্তব্য ও ধর্ম। যাহারা কেবল ইহা বুঝিয়াছে যে, যাহা অন্যায় বলিয়া মনে হয়, সে আইন মানা কাপুরুষতা, কেহই কি জুলুম করিয়া তাহাদের দিয়া অন্যায় কাজ করাইয়া লইতে পারে? কোন মানুষের অত্যাচার উৎপীড়নই তাহাদের দাসত্ব শৃঙখলে আবদ্ধ করিতে পারে না। আত্ম-শাসন বা স্বরাজের ইহাই চাবিকাঠি।

সংখ্যাগরিষ্ঠের আইন সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষে বাধ্যতামূলক, এইরূপ বিশ্বাস করা কুসংস্কার, ভগবৎবিরোধী। এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যাইবে, যেখানে অনেক লোক যাহা বলিয়াছে তাহা অসভ্য প্রমাণিত হইয়াছে, আর অল্প লোক যাহা বলিয়াছে তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানেই কোনো সংস্কার কার্যকর হইয়াছে, সেখানেই অল্প সংখ্যক লোক অধিক লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহা করিয়াছে। ঠগের গ্রামে অধিক লোকই বলিবে—ঠগী-বিদ্যা শিক্ষা করা চাই; তাই বলিয়া যদি কেহ সাধু থাকেন, তাঁহাকেও কি ঠগ হইয়া যাইতে হইবে? না, তাহা কখনও নয়। অন্যায় আইন মানিতেই হইবে এই রকম ভুল যে পর্যন্ত দূর না হইবে, সে পর্যন্ত নিজেদের দাসত্ব কখনও যাইবে না। এই জাতীয় ভ্রম কেবল সত্যাগ্রহীই দূর করিতে পারেন। শরীরের বল বা গোলা বারুদ দ্বারা কাজ উদ্ধার করা সত্যাগ্রহের বিপরীত ব্যবস্থা। বল প্রয়োগের মানে এই দাঁড়ায় যে, আমার যাহা পছন্দ, আমার আশপাশে যাহারা আছে তাহাদের দিয়াও তাহাই করাইয়া লইতে চাই। যদি ইহাই ঠিক হয় তাহা হইলে, আশপাশের লোকও আমাকে দিয়া তাহারা যাহা চায় গোলা বারুদের সাহায্যে তাহাই করাইয়া লওয়ার অধিকারী। এ রকম করিয়া কখনো ত আমাদের অসুবিধা দূর হইতে পারে না। এ রকম করার মানে কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি বাঁধিয়া চলিতে থাকা, আর মনে করা যে, খুব আগাইয়া চলিতেছি। যদি ভাবিয়া দেখেন তবে বুঝিতে পারিবেন যে, সত্যই আমরা ঐ কলুর বলদের মত ঘানি-গাছ পরিক্রমণ করিতেছি। যিনি এ কথা মানেন যে, নিজের বিবেকের বিরোধী আইন মানিতে লোক বাধ্য নয়, তাঁহার পক্ষে সত্যাগ্রহই কাজ করার সর্বোৎকৃষ্ট পথ বলিয়া জানিবেন। অন্য উপায় গ্রহণ করার ফল অত্যন্ত মন্দ হয়।

পাঠক—আপনার কথায় বুঝিলাম যে, সত্যাগ্রহ দুর্বলের জন্য চমৎকার অস্ত্র। কিন্তু দুর্বল যদি সবল হইয়া উঠে তখন ত তাহারা অস্ত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

সম্পাদক—এখানে আপনি খুব ভুল করিলেন। সত্যাগ্রহই সব চেয়ে বড় অস্ত্র। এই আত্মিক বলের তুলনা হয় না। ইহা অস্ত্রবলের চেয়ে বড়। তাহা হইলে ইহা দুর্বলের অস্ত্র হইল কী করিয়া? সত্যাগ্রহের জন্য যে সাহস ও পৌরুষের দরকার দৈহিক বলপ্রয়োগকারীরা সেই সাহসের মুখ দেখেই নাই। অথচ সাহস সত্যাগ্রহীর পক্ষে অত্যাবশ্যক। আপনি কি মনে করেন যে, দুর্বল ব্যক্তি নিজের অপছন্দের আইন ভঙ্গ করিতে পারে? পাশব শক্তি প্রয়োগের ওকালতি করেন চরমপন্থীরা, তবে তাঁহারা আইন মানার কথা কেন বলেন? আমি তাঁহাদের দোষ ধরিতেছি না। তাঁহারা অস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু বোঝেনই না। তাঁহারাও যদি ইংরেজকে তাড়াইয়া শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁহারা চাইবেন আপনি আমি তাঁদের আইন

মান্য করি। এবং তাঁহাদের দিক হইতে উহাই ঠিক হইবে। কিন্তু সত্যাগ্রহী বলিবেন, যে নিয়ম তাঁহাদের বিবেক-বিরুদ্ধ তাহা তাঁহারা স্বীকার করিবেন না, এমনকি যদি সেজন্য তাঁহাদের তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়, তবুও নয়।

আপনি কী মনে করেন? তোপের মুখে শত শত লোককে উড়াইয়া দিতে বেশী সাহস দরকার, না তোপের মুখে হাসিতে হাসিতে মরিতে বেশী সাহস দরকার? যে মরণকে নিজের মাথাব উপর লইয়া বেড়ায় সেই বীর, না যে অপরের মৃত্যু নিজের হাতে রাখে সেই বীর? যে কাপুরুষ, যাহার মনুষ্যত্ব নাই সে একঘণ্টাও সত্যাগ্রহী থাকিতে পারে না, একথা নিশ্চয় জানিবেন। হাঁ, একথাও ঠিক যে, দুর্বল রোগাটে লোকও সত্যাগ্রহী হইতে পারে। একজন লোকও সত্যাগ্রহী হইতে পারে, লক্ষ লোকও হইতে পারে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকরাও সত্যাগ্রহী হইতে পারে। ইহার জন্য সৈন্যদলের ট্রেনিং-এর দরকার নাই। ইহার জন্য যুযুৎসু জানার দরকার নাই। দরকার কেবল নিজের মনকে বশে আনা। নিজের মনকে যে বশে আনিতে পারিয়াছে, সে বনের রাজা সিংহের মত নির্ভয়ে চলাফেরা করিতে পারে এবং তাহার তাকানোতেই শত্রুর বুক শুকাইয়া উঠে।

সত্যাগ্রহ এমন তলোয়ার যাহার সব দিকেই ধার। উহাকে যে ভাবে খুশি কাজে লাগানো যায়। সত্যাগ্রহ অস্ত্র যে ব্যবহার করে, আর যাহার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, সত্যাগ্রহ উভয়কেই আশীর্বাদ করে। একবিন্দু রক্তপাত না করিয়াও সুদূরপ্রসারী ফল পাওয়া যায়। সত্যাগ্রহ অস্ত্রে মরিচা ধরিতে পারে না। উহাকে কেহই হরণ করিতে পারে না। সত্যাগ্রহীদের নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কখনও তাহাদের ক্লান্ত করে না, ক্ষয় করে না। সত্যাগ্রহীর তলোয়ারের খাপের আবশ্যক নাই। ইহার পরও সত্যাগ্রহকে যদি দুর্বলের অস্ত্র বলা হয়, তাহা অদ্ভুত হয় না কি?

পাঠক—আপনি বলিয়াছেন যে, সত্যাগ্রহ হিন্দুস্থানের বিশেষ অস্ত্র। কেন? কোনও দিন কি হিন্দুস্থানে তোপের বল ব্যবহার করা হয় নাই?

সম্পাদক—আপনি জনকতক রাজাকেই হিন্দুস্থান মনে করিতেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় হিন্দুস্থানের প্রাণ হইতেছে কোটি কোটি কৃষক, যাহাদের বলে আমরা আর রাজ-রাজড়ারা বাঁচিয়া আছি।

রাজ-রাজড়ারা ত অবশ্যই সর্বদা রাজকীয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিবেন। বল প্রয়োগ তাঁহাদের কাছে ডাল ভাতের মত। তাঁহাদের কাজই ত হুকুম চালানো; কিন্তু যাহাদের উপর হুকুম চলে তাহাদের বন্দুকের দরকার নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই হুকুম মানিয়া চলে। তাঁহাদের হয় দৈহিক বল, না হয় আত্মিক-বল প্রয়োগ করিতে শিখিতে হইবে। যেখানে জনসাধারণ দৈহিক শক্তির চর্চা করে, সেখানে রাজা সমেত সমস্ত জাতিটা পাগলের মত হইয়া যায়। যেখানে হুকুম মানিয়া চলার লোক আত্মিক বল প্রয়োগ শিক্ষা করে, সেখানে রাজার হুকুম তাঁহার তরবারির অগ্রভাগ ছাড়াইয়া উঠে না, কারণ খাঁটি মানুষরা অন্যায় হুকুম অগ্রাহ্য করে। চাষী কখনো কাহারও তলোয়ারের বশীভূত হয় নাই, হইবেও না। তাহারা তলোয়ারের ব্যবহার জানে না, অপরের তলোয়ারের ভয়ও তাহাদের নাই। সেই জাতিই বড় এবং শক্তিমান যে মৃত্যু মাথায় করিয়াই বাঁচিয়া থাকে; মৃত্যুকে যাহারা ভয় পায়

না, তাহারা সকল ভয় হইতেই মুক্ত। যে জাতি অস্ত্রবলে উন্মত্ত তাহাদের জন্য এই চিত্র অনুমাত্রও বাড়াইয়া আঁকা হয় নাই। প্রকৃত ব্যাপার হইল, ভারতবর্ষের লোকরা নিজেদের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে এবং শাসনকার্যে সকল সময়েই সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করিত। রাজা যখন জুলুম করেন, প্রজা তখন তাঁহার সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়িয়া দেয়—আর ইহাই সত্যাগ্রহ।

আমার একটা ঘটনা স্মরণ হইতেছে। একবার রাজস্থানের এক জায়গায় রায়তেরা রাজআজ্ঞাপালনে অপারগ হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করে, ফলে ভীত হইয়া রাজাকে প্রজার নিকট মাফ চাহিতে হইয়াছিল। তিনি নিজের হুকুম ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। যেখানে সত্যাগ্রহ জনগণের পরিচালন-শক্তি, সেখানেই কেবল সত্যকার স্বরাজ সম্ভব। অন্য যে কোন শাসন বিদেশী শাসন।

পাঠক—তাহা হইলে আপনি বলিবেন যে শরীরকে মজবুত করিবার দরকার নাই।

সম্পাদক—এ রকম কথা আমি নিশ্চয়ই বলিব না। শরীর শক্ত না হইলে সত্যাগ্রহী হওয়া কঠিন। বিশেষতঃ যিনি ভোগ-বিলাসে শরীর ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহার শরীরে যে মন বাস করে সেও দুর্বল হইয়া যায়। আর যেখানে মনোবল নাই, সেখানে আত্মিক বল কী করিয়া আসিবে? আমাদের বাল্যবিবাহ, বিলাসজীবন প্রভৃতি মন্দ রীতি ত্যাগ করিয়া শরীর শক্ত করিতে হইবে। জরাজীর্ণ শরীর কোন মানুষকে যদি একাকী তোপের মুখে যাইতে বলি, তাহাতে আমি নিজেই নিজের হাসির খোরাক হইব।

পাঠক—আপনার কথায় মনে হইতেছে যে, সত্যাগ্রহী হওয়া যেমন তেমন কথা নহে। আর যদি তাহাই হয়, তবে এটাও আপনার বোঝা উচিত যে, আমরা সকলেই বা কী করিয়া সত্যাগ্রহী হইব?

সম্পাদক—সত্যাগ্রহী হওয়া সহজ। কিন্তু যেমন সহজ, তেমনি কঠিনও বটে। আমি চৌদ্দ বৎসরের বালককে সত্যাগ্রহী হইতে দেখিয়াছি। রোগীকেও দেখিয়াছি সত্যাগ্রহী হইতে। আর ইহাও দেখিয়াছি যে, শরীরে যাহার বেশ বল, সাধারণের হিসাবে যে সুখী, সে ব্যক্তিও সত্যাগ্রহী হইতে পারে নাই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি জানি যে, যিনি দেশের ভালর জন্য সত্যাগ্রহী হইতে চান, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে, দারিদ্র্য গ্রহণ করিতে হইবে, সত্যের সেবা করিতে হইবে ও তাঁহাকে সকল রকমেই নির্ভীক হইতে হইবে।

ব্রহ্মচর্য এক মহাব্রত, উহা ছাড়া মন দৃঢ় হইতে পারে না। ব্রহ্মচর্য পালন না করিলে মানুষ নির্বীর্য, কাপুরুষ ও দুর্বল হইয়া পড়ে। যাহার মন জৈব কামাদি রিপুর বশীভূত তাহার দ্বারা কোনও প্রকার বড় কাজ হইতে পারে না। এই বাক্যের সত্যতা অনেক উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যায়। এই অবস্থায় গৃহস্থ লোকের কী করা কর্তব্য এ প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। যখন স্বামী এবং স্ত্রী রিপু-পরবশ হন তখন তাঁহারা পশু-প্রবৃত্তিই চরিতার্থ করেন। কেবল বংশ রক্ষা ছাড়া এ ধরনের অমিতাচার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু

সত্যাগ্রহীকে এমন কি এই অতি সীমিত প্রবৃত্তিও দমন করিতে হয়, কারণ তাহার বংশ রক্ষার কোন ইচ্ছা জাগিতে পারে না। কাজেই, বিবাহিত লোকও সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করিতে পারে। এই সকল কথা খোলাখুলি লেখা যায় না। স্ত্রী সম্বন্ধে কী করা যায়, এ সকল কী করিয়া সম্ভব, স্ত্রীর অধিকার কী ইত্যাদি নানা বিচার উপস্থিত হয়। যিনি বড় কোনও কাজ করিবেন তাঁহাকে এ বিষয়ে সমস্ত সমস্যা নিজেকেই সমাধান করিয়া লইতে হইবে।

যেমন ব্রহ্মচর্য আবশ্যক, দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করাও তেমনি আবশ্যক। পয়সার লোভ রাখা আর সত্যাগ্রহী হওয়া, এই দুই কাজ একসঙ্গে চলিতেই পারে না। একথা দ্বারা ইহা বলিতেছি না যে, যাঁহার পয়সা আছে তাঁহাকে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইতে হইবে। সত্যাগ্রহ ছাড়িয়া দেওয়ার চেয়ে তাঁহাদের বরং প্রতি পাই পয়সা হারাইবার জন্যও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বিচারকালে আমি সত্যাগ্রহকে সত্যের বল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। কাজেই, এমন কি যে কোন মূল্য দিয়াও সত্যানুসরণ প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে একটি জীবন রক্ষা করার জন্যও কি মানুষ মিথ্যা বলিবে না, ইত্যাদি প্রশ্ন উঠিতে পারে; কিন্তু যাঁহারা মিথ্যার পক্ষে যুক্তি দিতে চান, কেবল তাঁহাদের মনেই এ সব প্রশ্ন জাগে। যাঁহারা সর্বদা সত্য পথ লইতে চাহেন তাঁহাদের নিকট ঐ প্রকার সংকট উপস্থিত হয় না। আর উপস্থিত হইলেও সত্যাগ্রহী মিথ্যাচার করার বিপদ হইতে রক্ষা পায়।

নির্ভীকতা ব্যতীত সত্যাগ্রহী এক পাও চলিতে পারে না। তাহার সব রকমে অবস্থাতেই নির্ভয় হওয়া চাই। কঠিন বলিয়া সত্য পালনের ব্রত লঙ্ঘন করা চলে না। মাথায় যখন বিপদ আসিয়া পড়ে তাহা সহিবার ক্ষমতা মানুষকে ঈশ্বরই দান করিয়াছেন। যাঁহাদের দেশের সেবা করিতে হইবে না, তাঁহাদেরও সত্যের সেবা করা দরকার। ভুল করিলে, চলিবে না যে, যাহারা অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার শিখিতে চান, তাঁহাদেরও কম বেশী এই গুণ থাকা দরকার। ইচ্ছা করিলেই বীর হওয়া যায় না। যোদ্ধার ব্রহ্মচর্য পালন করা চাই, এবং দারিদ্র্যের ভাগ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকা দরকার। আর নির্ভীক না হইলে ত সিপাহীই হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যোদ্ধার সত্য পালন করার তত আবশ্যকতা নাই। কিন্তু যেখানে লোক সত্যসত্যই নির্ভয়, সেখানে মিথ্যার আবশ্যকতা কোথায়? সেখানে সত্য ত সহজেই আসিয়া দেখা দেয়। যখন কেহ সত্য ত্যাগ করে তখন কোনও ভয়বশতঃই তাহা করিয়া থাকে। সেইজন্য ব্রহ্মচর্য, দারিদ্র্য, নির্ভীকতা ও সত্য পালন এই চারি গুণ সম্বন্ধে কাহারও ভয় পাইবার হেতু নাই। অস্ত্রবলের উপর যাহাদের নির্ভর তাহাদের আরও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গুণ থাকা দরকার; কিন্তু একজন সত্যাগ্রহীর কখনো সেইগুলির প্রয়োজন করে না। আপনি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, একজন অস্ত্রধারীকে যেটুকু যাহা অতিরিক্ত আয়াস করিতে হয়, তাহার কারণ হইল নির্ভীকতার অভাব। সম্পূর্ণ নির্ভীক হইতে পারিলে তখন তাহার হাত হইতে তলোয়ার খসিয়া পড়ে। অস্ত্রের সাহায্যের তখন তাহার দরকার হয় না। অন্যের প্রতি ঘৃণামুক্ত মানুষের তরবারি অপ্রয়োজন। একজনের হাতে এক লাঠি ছিল,

সে বাঘের সামনে পড়িয়া গেল। অমনি সে স্বাভাবিকভাবে আত্মরক্ষায় লাঠি তুলিল। ইহার পরেই বুঝিতে আর তাহার দেরি হইল না যে, সে অনর্থকই নির্ভীকতার বড়াই করিয়া আসিয়াছে; আদৌ সে তাহা নয়। সেই মুহূর্তে সে লাঠি ছাড়িল, আর সর্বপ্রকার ভয় হইতেও মুক্ত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিক্ষা

পাঠক—আপনি এত কথা বলিলেন, কিন্তু শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ত কিছুই বলিলেন না। আমরা সর্বদাই আমাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব লইয়া অভিযোগ করি। আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারের একটি আন্দোলন চলিতেছে দেখিতেছি। মহারাজ গায়কোয়াড় তাঁহার রাজ্যে সকলের পক্ষে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়া দিয়াছেন। এই দিকে সকলের লক্ষ্য গিয়াছে। এজন্য আমি মহারাজ গায়কোয়াড়কে ধন্যবাদ দিতেছি। এই সমস্ত পরিশ্রম কি ব্যর্থ মনে করিতে হইবে?

সম্পাদক—যদি আমরা নিজেদের সভ্যতাকে সব চাইতে ভাল বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইবে যে, এই পরিশ্রম সমস্তই ব্যর্থ হইতেছে। রাজা সাহেব এবং আমাদের অন্যান্য মাননীয় নেতারা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য নির্মল বলিয়া আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়াসের যে ফল হওয়া সম্ভব তাহা লুকাইয়া রাখিয়া ত লাভ নাই।

শিক্ষা কাহাকে বলে? শিক্ষার অর্থ যদি অক্ষর পরিচয় মাত্র হয় তবে তাহা একটা যন্ত্র বিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। যন্ত্রের দ্বারা ভাল ও মন্দ দুই-ই হইতে পারে। একই অস্ত্রদ্বারা রোগীকে আরাম করাও যায়, উহার প্রাণও লওয়া যায়। এই রকম অক্ষর জ্ঞান শিক্ষা করিয়া অনেক লোক উহার অপব্যবহার করে। খুব অল্প লোকই তাহার সদ্ব্যবহার করে। আমরা প্রত্যহই তাহা দেখিতেছি। যদি এ কথা ঠিক হয় তবে ইহাও ঠিক যে, অক্ষর জ্ঞান দ্বারা পৃথিবীর লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হইয়াছে।

অক্ষর জ্ঞান অর্থেই সাধারণতঃ শিক্ষা শব্দটির ব্যবহার হয়। লিখিতে পড়িতে ও হিসাব করিতে পারাকে প্রাথমিক শিক্ষা বলে। কোনও কৃষক সততার সহিত চাষের কাজ করিয়া উপার্জন করে। পৃথিবী সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান সাধারণ। তবে আপন মা বাপ স্ত্রী পুত্র, প্রতিবেশীর প্রতি আপনার রীতি অনুযায়ী কর্তব্য জ্ঞান তাহার মোটামুটি ভালোই। কর্তব্যনীতি যে বোঝে ও ঠিক ঠিক পালন করে। কিন্তু সে ব্যক্তি দস্তখত করিতে পারে না। এখন এমন লোককে অক্ষর জ্ঞান দিয়া আপনি কী করিতে চান? পড়াইয়া উহার কোন্ সুখ বাড়াইবেন? আপনি কি উহার হৃদয়ে উহার কুড়ে ঘর ও উহার অবস্থার প্রতি অসন্তোষ বাড়াইতে চান? তাও

যদি করিতে হয় তবুও উহার অক্ষর জ্ঞান আবশ্যক নাই। পাশ্চাত্ত্যের চিন্তাধারার স্রোতে ভাসিয়া গিয়া আমরা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছি, সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

এখন উচ্চ শিক্ষার কথা হোক। আমি ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা পড়িয়াছি। বীজগণিত শিখিয়াছি। জ্যামিতির জ্ঞান পাইয়াছি। এ সকলের ফল কী হইয়াছে? ইহাতে আমার বা আমার পাড়াপড়শীর কী লাভ হইয়াছে? আমি ঐ জ্ঞান কেন পাইয়াছি? অধ্যাপক হাক্‌স্‌লি বলিয়াছেন, "সেই লোক সত্য শিক্ষিত যাঁহার শরীর এমনভাবে তৈরি যে, উহা তাঁহার ইচ্ছার বশে আছে ও আনন্দের সহিত নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যাইতে পারে। সেই ব্যক্তিই সত্যকার শিক্ষা পাইয়াছেন, যাঁহার বুদ্ধি স্বচ্ছ, শান্ত ও ন্যায়ানুগামী,—ইঞ্জিনের সব অংশ সমান জোরালো এবং সমান ভাবে ক্রিয়াশীল। তিনিই সত্যকার শিক্ষায় শিক্ষিত যাঁহার হৃদয় প্রকৃতির মুখ্য সত্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন,......যাঁহার ইন্দ্রিয় তাঁহার মনের বশ ও বিবেকের অনুগত। যে ব্যক্তি নীচ কাজ করিতে ঘৃণা করেন, পরকে আপনার ন্যায় দেখেন, তাঁহাকেই সত্যকার শিক্ষিত বলা যায়। কেন না তিনি প্রকৃতির নিয়মে চলিতেছেন। প্রকৃতি তাঁহার নিকট হইতে খুব কাজ আদায় করিবে আর তিনিও প্রকৃতির নিকট হইতে খুব কাজ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।" যদি ইহাই সত্যকার শিক্ষা হয়, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারিব যে, উপরে যে বিজ্ঞানাদির কথা বলিলাম উহা দ্বারা শরীর বা ইন্দ্রিয় বশে আনিবার কাজে কিছুমাত্র সাহায্য হয় না। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষার কথাই বলুন, আর উচ্চ শিক্ষার কথাই বলুন, তাহাতে আমাদের আসল উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, উহাতে মানুষ গড়িয়া উঠে না।

পাঠক—তাহাই যদি হয়, তবে আপনার কথার মাঝখানে আমি আর একটা কথা বলিতে চাই। আপনি যে এই সকল কথা আমাকে বলিতেছিলেন ইহা কিসের প্রভাবে? আপনার যদি অক্ষর জ্ঞান না থাকিত, আপনি যদি শিক্ষা না পাইতেন, তবে এই সকল কথা কেমন করিয়া বুঝাইতেন?

সম্পাদক—আপনি ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু আমারও সোজা জবাব আছে। যদি আমি উচ্চ অথবা নিম্ন শিক্ষা না পাইতাম, তাহা হইলেও যে নিষ্কর্মা হইয়া যাইতাম তাহা আমি মানি না। যেহেতু আমি বক্তৃতা করিতে পারি, কথা বলি, কাজেই আমি দেশের সেবা করিতেছি, ইহা আমি মনে করি না। আমি সেবা করিতে চাই এবং এই অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাই বলিয়াই আমি যাহা পড়িয়াছি তাহা কাজে লাগাইতে চাই। কিন্তু এই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার কোটি কোটি ভাইয়ের নিকট আমার কথা পৌঁছাইয়া দিতে পারি না। আপনার মত যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন কেবলমাত্র সেই ধরনের লোকের নিকটেই আমার শিক্ষা যাহা কিছু কাজে লাগিতেছে। ইহাতেই আমার কথা যে সত্য তাহা প্রমাণিত হয়। আমরা উভয়েই মিথ্যা শিক্ষার ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি নিজেকে উহা হইতে মুক্ত মনে করিতেছি। তাই আমার অভিজ্ঞতার শিক্ষা আপনাকে দিতে চাই এবং সেইজন্য আমাদের শিক্ষার মন্দ দিকটা আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।

তা'ছাড়া অক্ষর জ্ঞান পাওয়ার সব ব্যাপারটা আমি মন্দ বলি নাই। আমি কেবল

এইটুকুই বলিতেছি যে, ঐ জ্ঞান আমাদের পূজা করিবার বিষয় নয়; ঐ প্রকার জ্ঞান আমাদের কামধেনু নয়। কেবলমাত্র উপযুক্ত স্থানেই ঐ প্রকার অক্ষর জ্ঞানের সার্থকতা আছে। সে উপযুক্ত ক্ষেত্র কী তাহা বলিতেছি। যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়কে বশে আনিতে পারিব, যখন আমাদের নীতিজ্ঞান দৃঢ় হইবে, তখনই এই অক্ষর জ্ঞানের দাম। এবং তখন যদি আমাদের এই শিক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা হয়, আমরা তাহার সদ্ব্যবহারও করিতে পারিব। তখন ঐ শিক্ষা আমাদের অলঙ্কারের ন্যায় শোভা পাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আবশ্যক নাই, আমাদের পুরাতন বিদ্যালয় ব্যবস্থাই যথেষ্ট। ইহাতে চরিত্র গঠনেরই স্থান সর্বাগ্রে এবং ইহাই প্রাথমিক শিক্ষা। এই ভিত্তির উপর যদি ঘর তৈরি হয় তবেই তাহা টিঁকিবে।

পাঠক—তাহা হইলে কি বুঝিব যে, আপনি স্বরাজ পাওয়ার জন্য ইংরেজি শিক্ষায় কোনও লাভ আছে বলিয়া মনে করেন না।

সম্পাদক—'হাঁ'ও বটে 'না'ও বটে। লক্ষ লক্ষ লোককে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া ত উহাদের দাসত্বে বাঁধিয়া ফেলার সামিল। মেকলে যে শিক্ষার ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন উহা আসলে দাসত্বের ভিত্তি। একথা আমি বলিতে চাই না যে, তিনি জানিয়া শুনিয়া ঐ প্রকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কাজের ঐ রকম ফল হইয়াছে। স্বরাজের কথা আমাদের বিদেশী ভাষায় বলিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা হীনতা আর কী হইতে পারে? যে শিক্ষা পদ্ধতি ইংরেজরা নিজেরা পরিত্যাগ করিয়াছে উহাই আমরা অন্ধের ন্যায় অনুকরণ করিতেছি, উহাতেই খুশি হইতেছি—ইহাও ভাবিবার বিষয়। ইউরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান তাঁহারা প্রতিনিয়ত পদ্ধতির পরিবর্তন করিতেছেন। যে পদ্ধতি অকাজের জানিয়া তাঁহারা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছেন, আমরা অজ্ঞতাবশতঃ তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। সে দেশে ত সকলেই নিজ নিজ ভাষাকে শ্রেষ্ঠতর করিবার চেষ্টা করিতেছে। ওয়েল্‌স ইংলণ্ডের এক ছোট অংশ। যাহাতে ওয়েল্‌সের ছেলেরা ওয়েল্‌সের ভাষাই ব্যবহার করে তাহার চেষ্টা চলিতেছে। এজন্য ইংলণ্ডের চ্যান্সেলার মিঃ লয়েড জর্জ যথাসাধ্য করিতেছেন। এই অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার তুলনা করুন। আমরা যদি একে অন্যকে পত্র লিখি তাহাও ভুল ভ্রান্তিযুক্ত ইংরেজিতে লিখি। যাঁহারা ইংরেজিতে এম-এ উপাধি পান তাঁহাদেরও ইংরেজিতে ভুল থাকে। আমাদের ভাল চিন্তা আমরা ইংরেজির সাহায্যেই প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদের কংগ্রেস অধিবেশনের কার্যবিবরণী ইংরেজিতে পরিচালিত হয়; আমাদের সবচেয়ে ভালো সংবাদপত্রগুলি ছাপা হয় ইংরেজিতে। আমার মনে হয়, যদি এই রকম ভাবে ইংরেজি ভাষা ব্যবহারের ব্যবস্থা অধিক দিন চলিতে থাকে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ আমাদের নিন্দা করিবে, অভিশাপ দিবে।

একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা ইংরেজি শিক্ষা পাইয়া জাতিকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করিয়াছি। ইংরেজি শিক্ষার ফলেই ভণ্ডামি, যথেচ্ছাচার বাড়িয়াছে। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষিত তাঁহারা সাধারণ লোককে প্রতারিত করিতে ও ভয় দেখাইতে ত্রুটি করিতেছেন না। এখন, আমরা যদি জনসাধারণের জন্য আদৌ

কিছু করি, তাহা হইল—তাঁহাদের কাছে আমাদের ঋণের আংশিক পরিশোধ দেওয়া মাত্র। ইহা কি কম অত্যাচার যে, নিজের দেশে যদি বিচার কাজ চালাইতে হয়, তবে আমাকে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করিতেই হইবে। ব্যারিস্টার হইয়া আমি নিজের ভাষায় আমার বক্তব্য বলিতে পারিব না, আমার জন্য অনুবাদক আবশ্যক হইবে। ইহা কি পুরাপুরি এক অদ্ভুত ব্যাপার নয়? ইহা কি দাসত্বের লক্ষণ নয়? ইহার জন্য কি ইংরেজদের উপর দোষারোপ করিব, না, নিজেদের উপর? হিন্দুস্থানকে ত আমরা যাহারা ইংরেজি জানি তাহারাই দাসত্বের শৃংখলে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। জাতির ধিক্কার ইংরেজের উপর পড়িবে না, পড়িবে আমাদের উপরেই।

কিন্তু আমি বলিয়াছি যে, আমার জবাব 'হাঁ' ও 'না' উভয়ই বটে। 'হাঁ' কেন বলিয়াছি তাহা ব্যাখ্যা করিলাম। এখন 'না' কেন তাহা বুঝাইতেছি।

আমাদের সভ্যতা রোগে এমন ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে, ইংরেজি শিক্ষাকে আমরা একেবারে বাতিল করিয়া দিতে পারি না। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষা পাইয়াছেন, প্রয়োজন মত তাঁহারা ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। ভাষার জ্ঞান আমরা কতকগুলি কাজে লাগাইতে পারি, যথা :—ইংরেজের সহিত কাজ-কর্মে, যে সকল হিন্দুস্থানীর ভাষা আমরা বুঝি না অথচ যাঁহারা ইংরেজি লেখাপড়া জানেন তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তায়, আর ইংরেজ নিজেরাই তাঁহাদের সভ্যতার প্রতি কী প্রকার বিরূপ হইয়া পড়িয়াছেন তাহাও জানিবার জন্য। যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্তব্য নিজের সন্তানদের প্রথমে মাতৃভাষার সাহায্যে নীতি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া; দ্বিতীয় আর একটি দেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া। সন্তানরা যখন বড় হইয়া যাইবে, তাহারা ইংরেজি শিখিতে পারে—কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য হইল, ইংরেজি জ্ঞান আমাদের প্রয়োজন নেই। কাজেই ইংরেজি শিখিয়া টাকা করার উদ্দেশ্য পরিহার করিতে হইবে। এমন কি এই রকম সীমিতভাবে ইংরেজি শিখিবার সময় আমাদের বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে যে, ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়া আমরা কোন্ জ্ঞান অর্জন করিব ও কোন্ জ্ঞান অর্জন করিব না। ইহাও আলোচনা করিয়া স্থির করা দরকার যে, কোন্ কোন্ বিজ্ঞানশাস্ত্রই বা আমরা পড়িব। একথা বোঝা কঠিন নয় যে, যখনই আমরা ইংরেজি ডিগ্রীর জন্য আর লালায়িত হইব না, শাসকেরা সচকিত হইয়া উঠিবেন।

পাঠক—তাহা হইলে আমরা কী শিক্ষা দিব?

সম্পাদক—এ বিষয় ত উপরে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আরো কিছু বেশী আলোচনা করা আবশ্যক। আমার মতে আমাদের সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাই উন্নত করা চাই। নিজেদের ভাষায় আমাদের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা উচিত, সে কথা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। ইংরেজি ভাষার মূল্যবান পুস্তকগুলি দেশীয় নানা ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে। আমাদের অনেক বিজ্ঞান শিক্ষা করার ভাণ ছাড়িতে হইবে। ধর্মীয়, অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা প্রথম স্থান লইবে। প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবাসীকেই নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষা ছাড়া, যদি হিন্দু হন তবে সংস্কৃত, যদি মুসলমান হন তবে আরবী, যদি পারসী হন তবে পারসী শিখিতে হইবে। সকলেরই হিন্দী ভাষায় জ্ঞান থাকা চাই। কয়েকজন হিন্দু আরবী ও পারসী

শিখিবেন, আবার কয়েকজন মুসলমান পারসী ও সংস্কৃত শিখিবেন। ভারতের উত্তর ও পশ্চিম ভাগের লোকের অধিক পরিমাণে তামিল ভাষা জানা দরকার। সারা ভারতবর্ষের জন্য একটি সর্বজনীন ভাষা হইবে হিন্দী। তবে লেখার সময় পারসী বা নাগরী যাঁহার যে অক্ষরে ইচ্ছা লিখিতে পারেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উভয়েরই দুই রকমের অর্থাৎ পারসী ও নাগরী অক্ষরের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। যদি এইরূপ অবস্থার প্রবর্তন করিতে পারি তবেই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ইংরেজি ভাষা তাড়াইবার আশা করিতে পারি। এ সকল কাহার জন্য চাই? যে দাস হইয়া গিয়াছে তাহারই জন্য। আমাদের দাসত্বের মাধ্যমে জাতিই দাসত্ব শৃংখলাবন্ধ হইয়াছে। আমরা মুক্ত হইলে জাতিরও মুক্তি হইবে।

পাঠক—আপনার ধর্ম শিক্ষার কথা বড় গোলমেলে।

সম্পাদক—ঠিক বটে, কিন্তু ইহা ছাড়া চলিবে না। হিন্দুস্থান কদাচ নাস্তিক হইতে পারে না। উৎকট নাস্তিকতা এই ভূমিতে পুষ্ট হইতে পারে না। করণীয় অবশ্য কঠিন।ধর্মশিক্ষার বিষয় ভাবিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া উঠে। আমাদের ধর্মাচার্যগণ দাম্ভিক ও স্বার্থান্বেষী। তবু তাঁহাদেরই দ্বারস্থ হইতে হইবে। মোল্লা, দস্তুর ও ব্রাহ্মণদের হাতেই চাবি রহিয়াছে। কিন্তু উহাদের যদি সুবুদ্ধি না হয় তাহা হইলে ইংরেজি শিক্ষার দরুণ যে উৎসাহ আমাদের ভিতর জাগিয়াছে, তাহার সাহায্যেই লোকের ভিতর ধর্ম শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে হইবে। এ কাজ খুব কঠিন নহে। সমুদ্রের উপকূলেই কেবল জল দূষিত হইয়াছে। এই কিনারায় যাহারা রহিয়াছে, কেবল তাহাদেরই সাফ হওয়া দরকার। আমার সমালোচনা হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর প্রতি নহে। ভারতবর্ষকে তাহার মূল স্থিতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আমাদেরও ফিরিতে হইবে। আমাদের সভ্যতায় স্বভাবতঃই উন্নতি ও অবনতি, সংস্কার ও প্রতিক্রিয়া থাকিবে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়াই একমাত্র প্রযত্ন হওয়া চাই। আর যাহা কিছু তাহা উহার সঙ্গে সঙ্গেই আসিবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

যন্ত্রপাতি

পাঠক—আপনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বহিষ্কার করিবার কথা বলিতেছেন। তাহা হইলে ত আপনি ইহাও বলিবেন যে, আমাদের কল-কারখানা যন্ত্রপাতির আবশ্যক নাই।

সম্পাদক—আপনি এই প্রশ্ন তুলিয়া আমার ক্ষত স্থানেই আঘাত করিয়াছেন। যখন আমি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের হিন্দুস্থানের আর্থিক ইতিহাস নামক পুস্তকখানা পড়িতেছিলাম, তখন আমি চোখের জল রাখিতে পারি নাই। আবার যখনই

সে সম্বন্ধে চিন্তা করি, আমার বুক ব্যথায় ভরিয়া উঠে। এই যন্ত্রপাতিই ভারতবর্ষকে দরিদ্র করিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার আমাদের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা পরিমাপ করা কঠিন। ম্যাঞ্চেষ্টারের জন্যই ভারতীয় হস্তশিল্প যত, সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু আমার ভুল হইতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের দোষই বা কেমন করিয়া দেওয়া যায়? আমরা যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছি তখনই না সে কাপড় তৈয়ারি আরম্ভ করিয়াছে। যখন আমি বাঙ্গলা দেশের বীরত্বের কাহিনী পড়িলাম আমার আনন্দ হইল। প্রেসিডেন্সীতে কাপড়ের কল ছিল না। কাজেই তাহারা আমাদের মূল হস্ত-বয়ন শিল্পকে বাঁচাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। আবার ইহাও সত্য, বাঙ্গলাই বোম্বাইয়ের মিলগুলিকে উৎসাহিত করিয়াছে। বাঙ্গলা যদি সব রকম যন্ত্রে তৈয়ারি দ্রব্যসম্ভার বয়কট ঘোষণা করিতে পারিত তাহা হইলে আরো ভাল হইত।

কলের জন্য ইউরোপ ধ্বংস হইতেছে; সর্বনাশী হাওয়া ইংরেজের দ্বারে ধাক্কা দিতেছে। কলই আজকালকার সভ্যতার প্রধান চিহ্ন। ইহা মহা পাপের প্রতিভূ।

বোম্বাইয়ের কলে যে সব মজুর কাজ করে তাহারা একেবারে দাস বনিয়া গিয়াছে। এই সকল কলে যে সব স্ত্রীলোক কাজ করে তাহাদের অবস্থা দেখিয়া বুক কাঁপিয়া উঠে। যদি মিল না থাকিত তাহা হইলে ঐ সকল স্ত্রীলোক যে না খাইতে পাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিত এমন নয়। যন্ত্রের জন্য উন্মত্ত অনুরাগ যদি আমাদের দেশে বাড়ে, এ দেশ অসুখী হইবে। আমার কথা অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার নিকট হিন্দুস্থানে আর মিল বাড়ানো অপেক্ষা ম্যাঞ্চেষ্টারের পাতলা কাপড় ব্যবহার করাও ভাল বলিয়া মনে হয়। উহাদের কাপড় ব্যবহার করিলে কেবল দেশের পয়সাই দেশের বাহিরে যাইবে, কিন্তু যদি হিন্দুস্থানকে ম্যাঞ্চেষ্টার বানানো হয়, তাহা হইলে দেশের পয়সা দেশেই থাকিবে বটে, কিন্তু উহা আমাদের রক্ত জল করিয়া দিবে এবং আমাদের নৈতিক চরিত্রই নষ্ট হইবে। মিলে যাহারা কাজ করে তাহাদেরই সাক্ষী মানিতেছি আমার এ কথায়। যাঁহারা মিল বসাইয়া পয়সা রোজগার করিতেছেন, কল-কারখানার দ্বারা যাঁহারা টাকা জমাইয়াছেন অন্যান্য বড়লোক অপেক্ষা তাঁহাদের ভাল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আমেরিকার রক্‌ফেলারের তুলনায় ভারতীয় রক্‌ফেলার ভাল হইবে এই রকম বিবেচনা করা ভুল। গরীব ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে; কিন্তু চরিত্র নষ্ট করিয়া ধনী হইলে সে হিন্দুস্থানের পক্ষে স্বাধীন হওয়া কঠিন।

আমার ত মনে হয় যে, ইংরেজের রাজত্ব এ দেশে এই ধনীরাই টিঁকাইয়া রাখিয়াছেন। ইংরেজরা এখানে থাকিলেই ধনীদের স্বার্থ পূর্ণ হয়। টাকাই মানুষকে অসহায় করিয়া তোলে। আর একটি বিষয়, যাহা সমান ক্ষতিকর, তাহা হইল যৌন পাপ। উভয়ই বিষ। সাপের বিষ ইহাদের চেয়ে কম ক্ষতিকর। সাপে যদি কাটে তাহা হইলে এই শরীরটাই ধ্বংস হয়; কিন্তু এই দুই বিষ ধ্বংস করে দেহ, আত্মা, মন—এ সমস্তকেই। কাজেই দেশে কল শিল্প বাড়ার সম্ভাবনায় খুশি হওয়ার কোন কারণ নাই।

পাঠক—তাহা হইলে কি মিল বন্ধ করিয়া দিতে হইবে?

সম্পাদক—তাহা করা কঠিন, শিকড় একবার গাড়িয়া বসিলে তুলিয়া ফেলা সহজ নয়। গড়িয়া ভাঙ্গার চাইতে প্রথম হইতে এ কাজ আরম্ভ না করাই বিজ্ঞের কাজ। আমরা মিল মালিকদের নিন্দা করিতে পারি না; তাঁহাদের প্রতি কৃপা করাই উচিত। তাঁহারা তাঁহাদের মিল ছাড়িয়া দিবেন, ইহা আশা খুব বেশী প্রত্যাশা। কিন্তু আমরা অনুরোধ জানাইতে পারি—তাঁহারা যেন আর তা না বাড়ান। তাঁহারা যদি যদি সৎ হন ধীরে ধীরে কাজ কমাইতেই থাকিবেন। তাঁহারা ঘরে ঘরে হাজার হাজার প্রাচীন ও পবিত্র হস্তচালিত তাঁত বসাইতে পারেন; সেই কাপড় কিনিয়া লইতে পারেন। আর কলওয়ালারা এ কাজ করুন বা না করুন, জনসাধারণ নিজেরাই কলের কাপড় ব্যবহার করা বন্ধ করিতে পারেন।

পাঠক—কিন্তু ইহা ত কেবল কলে তৈরী কাপড়ের বিষয়ে বলিলেন। কল হইতে কত অগণিত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। সে সকল হয় বিদেশ হইতে আনিতে হয়, নয় ত তাহাদের জন্য এই দেশেই কল বসাইতে হয়।

সম্পাদক—ঠিক কথা। আমাদের দেবতা পর্যন্ত জার্মানীর কল হইতে গড়িয়া আসে। পিন, দেশলাই আর কাঁচের জিনিসের কথা ত বলাই বাহুল্য। আমার ত একই জবাব, যখন এ সব জিনিসের প্রচলন হয় নাই, তখন ভারতবর্ষ কী করিত? সে সময় যাহা করিত আজও তাহাই করিবে। যতদিন যন্ত্রে ছাড়া আলপিন না গড়িতে পারিতেছি, ততদিন আলপিন ছাড়াই কাজ চালাইব। কাঁচের জ্বলজ্বলে চমৎকারিত্বের আমাদের কোন দরকার নাই; আগেকার কালের মত আপন ক্ষেতে উৎপন্ন তুলায় পলিতা পাকাইব ও বাতি হিসাবে মাটির তৈয়ারী প্রদীপ ব্যবহার করিব। উহাতে চোখ ভাল থাকিবে, পয়সা বাঁচিবে, স্বদেশী সমর্থন করা হইবে এবং এইরূপে আমরা স্বরাজ লাভ করিব।

এই সব দেশের সকলে একযোগে করিয়া ফেলিবে, অথবা একই সময় অনেক লোক কলের দ্রব্য ত্যাগ করিবে, এরূপ অবশ্য আশা করা যায় না। কিন্তু এই চিন্তাধারা যদি নির্ভুল হয়, আমরা সর্বদাই স্থির করিয়া লইতে পারিব, কী কী আমরা ছাড়িতে পারি এবং ক্রমশঃ ব্যবহার বন্ধ করিতে পারি। স্বল্প কয়েকজন যাহা করিতে পারে, অন্যরা তাহা অনুকরণ করিবে; এবং আন্দোলন গণিতের অঙ্কের নারিকেলের মত বাড়িয়াই যাইবে। নেতারা যাহা করেন, জনসাধারণের পালা আসিলে সানন্দে তাঁহারাও তাহা করিবেন। ব্যাপারটি জটিলও নয়, কঠিনও নয়। অন্যদের সঙ্গে লইতে না পারা পর্যন্ত আপনার আমার অপেক্ষা করার দরকার নাই। যিনি করিবেন না, তাঁহারই ক্ষতি; আর যাঁহারা সত্য জানিয়াও ইহা করিবেন না, তাঁহাদের কাপুরুষ বলাই উচিত।

পাঠক—ট্রামগাড়ি ও বৈদ্যুতিকশক্তি সম্বন্ধে আপনি কী বলেন?

সম্পাদক—এ প্রশ্নে নতুন কিছু বলিবার নাই। যখন আমি রেলকেই বাতিল করিয়া দিয়াছি, তখন ট্রামের কথা আর কোথায় থাকে? কল ত সাপের বাসার মত, একটা নহে, শত সাপ থাকিতে পারে। যেখানে কল সেখানেই বড় শহর; সেখানেই ট্রাম, রেলগাড়ি; বৈদ্যুতিক আলোও সেখানে। আপনি হয়ত জানেন যে, ইংলণ্ডেও গ্রামের ভিতর বৈদ্যুতিক আলো ও ট্রাম নাই। সৎ চিকিৎসকরা বলিবেন, যেখানে

কৃত্রিম গতিশীল যন্ত্রসরঞ্জাম বাড়িয়াছে, সেখানে লোকের স্বাস্থ্যও নষ্ট হইতেছে। আমার মনে আছে, কোনও এক ইউরোপীয় শহরে যখন অর্থের অভাব ঘটিয়াছিল, তখন ট্রাম, উকিল ও ডাক্তারের আমদানি কমিয়াছিল, আর লোকের স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছিল। কলের গুণের কথা একটাও আমার মনে আসে না। কিন্তু দোষের কথা লিখিতে গেলে বইয়ের পর বই তৈয়ারি হইয়া যাইবে।

পাঠক—এ সব যাহা বলিতেছেন তাহা ত কলের সাহায্যেই ছাপাইবেন। ইহা ভাল না মন্দ?

সম্পাদক—ইহা বিষে বিষক্ষয়ের একটি উদাহরণ। ইহা যন্ত্র সম্বন্ধে কোন ভাল দিক নয়। ইহা—এ ক্ষেত্রে যন্ত্র—মরিতে মরিতেও বলিয়া যাইতেছে যে, সাবধান হও; আমার নিকট হইতে তুমি কোন লাভই আদায় করিতে পারিবে না। ছাপা বা মুদ্রণে যে সুবিধা, যাঁহারা যন্ত্র-পাগল, তাঁহারাই ভোগ করিবেন।।

কাজেই মূল কথাটা ভুলিবেন না। কল যে একটা খারাপ জিনিস এ কথা মনে গভীরভাবে আঁকিয়া রাখিবেন। তারপর ধীরে ধীরে কলের মোহ আমরা কাটাইয়া উঠিব। প্রকৃতি এমন পথ দেখায় নাই, যে পথে আমরা হঠাৎ লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া যাইতে পারি। তবে যন্ত্রকে আশীর্বাদ বলিয়া স্বাগত না জানাইয়া আমরা যদি তাহাকে মন্দ বলিয়া দেখিতে থাকি, শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌঁছাইব।

বিংশ অধ্যায়

উপসংহার

পাঠক—আপনার কথায় বুঝিতেছি যে, আপনি তৃতীয় এক দল খাড়া করিতে চাহেন। আপনি দেখিতেছি গরম দলেরও নহেন, নরম দলেরও নহেন।

সম্পাদক—আপনি ভুল করিতেছেন। আমি তৃতীয় একটি দলের কথা ভাবিতেছি না। আমরা সবাই একই রকম ভাবি না। এমন কি নরম দলের সকলের বিচারও এক রকম হয় না। যাহার কাজ কেবল সেবা করা তাহার আবার পক্ষ কোথায়? আমি যেমন নরম দলের সেবক, তেমনি গরম দলেরও সেবক। যেখানে যাঁহাদের সহিত আমার মত ভিন্ন হয়, সেখানে সবিনয়ে তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন করি এবং আমার কাজ চালাইয়া যাই।

পাঠক—আর যদি আপনাকে দুই দলকেই বলিতে হয় তখন?

সম্পাদক—গরম দলওয়ালাকে বলিব: আপনি ত ভারতবর্ষের স্বরাজ চাহেন। কিন্তু স্বরাজ চাহিলেই পাওয়া যাইতে পারে না। স্বরাজ সকলকে নিজেদের শক্তিতে অর্জন করিয়া লইতে হয়। আমার কাছে অপরের দেওয়া স্বরাজ স্বরাজ নহে—উহা বিদেশী-রাজ এই জন্য আপনি যদি ইংরেজদের তাড়াইয়া দিয়া মনে করেন, যে আপনি স্বরাজ পাইয়াছেন, তাহা ঠিক হইবে না। স্বরাজ সত্যকার কী তাহা আমি এতক্ষণ বলিয়াছি। ঐ প্রকার স্বরাজ, আপনি অস্ত্র-শস্ত্র বলে পাইতে পারেন না। পাশবিক

শক্তি ভারতীয় মাটির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এই জন্য সত্যাগ্রহের উপরই ভরসা রাখিবেন। মনের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও একথা আনিবেন না যে, আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য কোন পর্যায়ে হিংসাত্মক পথ দরকার।

নরম দলওয়ালাকে বলিব : নিছক আবেদন, আকুতি আমাদের হীনতারই পরিচয়। উহার দ্বারা আমরা কেবল নিজেদের দৈন্যকেই স্বীকার করি। বৃটিশ শাসন অপরিহার্য বলা প্রায় ঈশ্বরকেই অস্বীকার করা। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের আর কাহাকেও অপরিহার্য একথা ত বলা চলে না। তা ছাড়াও, সাধারণ জ্ঞানই আমাদের বলিয়া দেয়, আপাততঃও ইংরেজদের উপস্থিতি আমাদের প্রয়োজন, এ কথা বলার অর্থ তাহাদের অহমিকা বাড়াইয়া তোলা।

ইংরেজ যদি আপনার তল্পিতল্পা লইয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলেও হিন্দুস্থান অনাথ হইবে না। হয়ত উহারা চলিয়া গেলে আজ যাহারা তাহাদের চাপে চুপ করিয়া আছে তাহারা লড়াই করিতে আরম্ভ করিবে। বিস্ফোরণ দাবাইয়া রাখিয়া কোন লাভ নাই; তাহাকে প্রকাশ পাইতে দেওয়াই উচিত। কাজেই যদি শান্তিতে থাকিবার আগে আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই-ই করি, আমাদের তাহা করিতে দেওয়াই ভালো। দুর্বলদের রক্ষা করার জন্য কোন তৃতীয় পক্ষের দরকার নাই। তথাকথিত এই রক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের কাপুরুষ করিয়াছে। দুর্বলকে এই প্রকারে রক্ষা করা উহাকে অধিক দুর্বল করিবারই কারণ। এই কথা উপলব্ধি করা ছাড়া স্বরাজ লাভ করা যাইতে পারে না। আমি আপনাকে এক ইংরেজ ধর্মযাজকের কথা স্মরণ করাইয়া দিব। তিনি বলেন, স্বরাজ বা স্ব-শাসনে অরাজকতাও সু-শৃংখল বিদেশী শাসনের চেয়ে ভালো। কেবল, আমার ধারণায় ভারতীয় হোম রুলের যে অর্থ তার সংগে ঐ ধর্মযাজকের স্বরাজের অর্থের পার্থক্য রয়েছে। আমাদের ইহা শিখিতে হইবে এবং অন্যকেও শিখাইতে হইবে যে, সে ইংরেজ শাসনই হউক বা ভারতীয় শাসনই হউক, কাহারও অত্যাচার সহ্য করিতে চাই না। এই ধারণা যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে গরম দল ও নরম দল একসংগে হাত মিলাইতে পারে। একের অন্যকে অবিশ্বাস করার অথবা ভয় করার দরকার নাই।

পাঠক—তাহা হইলে ইংরেজকে কী বলিবেন?

সম্পাদক—তাহাদের সবিনয়ে বলিব : আপনারা আমাদের শাসনকর্তা—স্বীকার করিতেছি। আপনারা তলোয়ারের জোরে আছেন, না আমাদের সম্মতিতে আছেন ইহা লইয়া তর্ক করার আবশ্যক নাই। আপনারা যদি আমাদের দেশে থাকেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু শাসক হইলেও জনগণের সেবক হইয়াই আপনাদের থাকিতে হইবে। আপনার কথা আমরা শুনিব না, আমাদের কথাই আপনাকে শুনিতে হইবে। আজ পর্যন্ত আমাদের দেশ হইতে যত ধন বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন আপনি তাহা রাখিতে পারেন, কিন্তু ভবিষ্যতে আর এ রকম চলিবে না। আপনি হিন্দুস্থানের সিপাহীর কাজ করিতে যদি ইচ্ছা করেন তবে তাহা করিতে পারেন। কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ হইতে কোন বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা আদায়ের মনোভাব অবশ্যই পরিহার করিবেন।

আপনারা যে সভ্যতা সমর্থন করেন, আমরা তাহাকে সভ্যতার বিপরীত বলিয়া

গণ্য করি। আমাদের সভ্যতাকে আমরা আপনাদের সভ্যতা অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া জ্ঞান করি। আপনারা যদি এই সত্য বুঝেন, তাহাতে আপনাদেরই সুবিধা। আর আপনারা যদি না বুঝেন, তাহা হইলে আপনাদের নিজেদের প্রবাদ বাক্য অনুযায়ীই—আমরা যেমন রহিয়াছি, আপনাদেরও সেই একই ভাবে আমাদের দেশে বাস করা উচিত। আপনার দ্বারা আমাদের ধর্মে যেন কোনও বাধা উপস্থিত না হয়। আপনি শাসক বলিয়া আপনারও ধর্ম হইবে যে, আপনি হিন্দুর মনের দিকে চাহিয়া গরু এবং মুসলমানের মনের দিকে চাহিয়া শূকর মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিবেন। আমরা দলিত হইয়া আছি বলিয়াই আমরা এবাবৎ কিছু বলি নাই। কিন্তু এ কথা জানিবেন যে, আপনাদের আচরণে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়া আছে। এই কথা প্রকাশ করিয়া বলা আমরা অবশ্য কর্তব্য জ্ঞান করিতেছি। স্বার্থের জন্য বা কোনও ভয়ে আপনাকে একথা বলিতেছি না। আমাদের বিবেচনায় আপনাদের পরিচালিত আদালত ও শিক্ষাশালা সকল কোনও কাজের হয় নাই। আমরা চাই, আমাদের আগেকার দিনে যে বিদ্যালয় ও আদালত ছিল, তাহাই ফিরিয়া আসুক।

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা ইংরেজি নহে, হিন্দী। উহা আপনাদের শিখিতে হইবে। আমাদের জাতীয় ভাষাতেই কেবল আমরা আপনাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিব।

রেলপথ ও সামরিক বাহিনীর জন্য অর্থ ব্যয়ের পিছনে আপনাদের যে ধারণা রহিয়াছে, আমরা তাহা বরদাস্ত করিতে পারি না। ঐ ব্যয়ের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করি না।

আপনার রাশিয়ার ভয় থাকিতে পারে, আমাদের নাই। যদি উহারা আসে তখন আমরা দেখিয়া লইব। আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন, আমরা যুক্ত-ভাবে তাহার মোকাবিলা করিতে পারি। আমাদের বিলাতী কাপড় আবশ্যক নাই। আমাদের এই দেশে উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারাই আমরা কাজ চালাইয়া লইব। আপনি এক চক্ষু ম্যাঞ্চেস্টারের দিকে, আর অপর চক্ষু ভারতবর্ষের দিকে রাখিবেন, ইহা চলিতে পারে না। কেবল যদি আমাদের উভয়েরই স্বার্থ এক হয়, তাহা হইলেই একসঙ্গে কাজ করিতে পারি।

আপনাকে এই সকল কথা দম্ভ লইয়া বলিতেছি না। আপনার সামরিক শক্তি বিপুল। বৃহৎ নৌ-বাহিনী আছে। আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রবল দ্বারা আমরা যুঝিতে পারিব না। কিন্তু উপরে যাহা নিবেদন করিয়াছি, তাহা যদি আপনাদের গ্রহণযোগ্য না হয়, আমরা আর শাসিতের ভূমিকা পালন করিব না। আপনার ইচ্ছা হয় ত যদি পারেন, তবে আমাদিগকে কাটিয়া ফেলুন, আমাদিগকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিন। কিন্তু আপনি যদি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করেন, তবে আমরা আপনার সহিত সহযোগিতা করিতে পারিব না। আর আমাদের সাহায্য ছাড়া আপনি এক পাও চলিতে পারেন না।

সম্ভব যে আপনি এই সকল কথা অহংকারবশতঃ হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ভুল হয় ত দেখাইয়া দিতে পারিব না। কিন্তু যদি আমাদের

মধ্যে কিছু পুরুষত্ব থাকে, অনতিবিলম্বে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আপনাদের এই মদমত্ততা আত্মঘাতী এবং আমাদের প্রতি আপনাদের উপহাস বুদ্ধিভ্রংশতা।

আমরা এ কথা মানি, আপনারা অন্তরে ধার্মিক জাতিরই মানুষ। আমরাও ধর্মস্থানেই বাস করিতেছি। আপনারা ও আমরা কেমন করিয়া একসাথে বাঁধা পড়িলাম, এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। কিন্তু আমাদের এই সম্বন্ধ আমরা ভাল কাজে লাগাইতে পারি।

যে সকল ইংরেজ হিন্দুস্থানে আসেন, তাঁহারা ইংরেজ জাতির ভাল নমুনা নন। তেমনি আমরা—যাহারা অর্থেক ইংরেজ হইয়া গিয়াছি, আমরাও সত্যকার ভারতীয় জাতির ভালো প্রতিভূ নহি। আপনারা যাহা সব করিয়াছেন, ইংরেজ জাতির যদি তাহা জানা থাকিত, আপনাদের বহু কাজেরই তাহারা বিরোধিতা করিত। আপনাদের সহিত ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের সম্পর্ক, আদান-প্রদান স্বল্পই।

আপনারা যদি আপনাদের তথাকথিত সভ্যতা পরিহার করিয়া নিজেদের ধর্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করেন, দেখিবেন আমাদের দাবি ন্যায্য। আমাদের দাবি পুরা-পুরি মানিয়া লওয়ার সর্তেই আপনারা ভারতবর্ষে থাকিতে পারেন। আর এমনি করিয়া যদি থাকেন, তবে আপনাদের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে, আমরা সে সকল শিখিয়াও লইব। আমাদের নিকট হইতেও আপনাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে, তাহাও আপনারা শিখিবেন। এই ভাবে চলিলে আমরা পরস্পর লাভবান হইব, আর পৃথিবীরও লাভ হইবে। কিন্তু এই প্রকার ব্যবস্থা কেবল তখনই হইতে পারিবে, যখন আমাদের উভয়ের সম্বন্ধ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পাঠক—জাতিকে আপনি কী বলিবেন?

সম্পাদক—জাতি কে?

পাঠক—আমাদের এ ক্ষেত্রে জাতি হইল, যাঁহাদের কথা লইয়া আমি এবং আপনি আলোচনা করিতেছিলাম, অর্থাৎ যাঁহারা ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন এবং যাঁহারা এ দেশের স্বরাজের জন্য ব্যগ্র।

সম্পাদক—এ ক্ষেত্রে আমি বলিব যে, কেবল সেই ভারতীয়রাই, যাঁহারা সত্যকার স্বরাজ প্রেমে উদ্বুদ্ধ, তাঁহারাই ভীত না হইয়া ইংরেজদের ঐ ভাবে বলিতে পারিবে; যাঁহারা বিবেকের সঙ্গে বিশ্বাস করেন, ভারতীয় সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ ও ইউরোপীয় সভ্যতা নয় দিনের তামাশা, তাঁহারাই এইরূপ উদ্বুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবেন। এমনি কতই স্বল্পজীবী সভ্যতা সৃষ্ট হইয়াছে ও নষ্ট হইয়াছে; আরও কত হইবে ও যাইবে।

সত্যকার স্বরাজ প্রেমে তিনিই উদ্বুদ্ধ যে ব্যক্তি আত্মিক বলের দ্বারা পরিচালিত হইয়া শরীরের বলের কাছে পরাভব মানিবেন না, নির্ভয়ে থাকিবেন ও স্বপ্নেও অস্ত্রবল ব্যবহার করার কল্পনা করিবেন না।

স্বরাজের সত্যকার নেশা তাঁহারই জাগিয়াছে, যিনি ভারতবর্ষের আধুনিক

দীন অবস্থায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন ও বিষের পাত্র থেকে আগেই পান করিয়া লইয়াছেন।

একজন ভারতীয়ও যদি এ রকমের হয়, তবে সে ইংরেজদের ওই কথাগুলিই শুনাইয়া দিবে এবং সে কথা ইংরেজদের শুনিতেও হইবে।

এগুলি ত দাবি নহে ইহা হিন্দুস্থানের মনের অবস্থা বোঝানো মাত্র। চাহিয়া আমরা কিছু পাইব না; আমরা যাহা চাহি, আমাদের তাহা লইতে হইবে এবং এইজন্য আবশ্যকীয় শক্তি চাই। এই শক্তি তখনই আমাদের ভিতরে জাগ্রত হইযা উঠিবে যখন—

(১) ইংরেজি ভাষা আমরা বিরল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করিব, যেখানে উহা ব্যতীত কাজ চলিতে পারে না।

(২) যখন উকিল ওকালতি ছাড়িয়া দিয়া নিজ ঘরে চরকা চালাইয়া কাপড় বুনিবেন।

(৩) যখন উকিল নিজের জ্ঞান কেবল লোককে ও ইংরেজদের বুঝাইবার জন্য প্রয়োগ করিবেন।

(৪) যখন উকিল বাদী-প্রতিবাদীর ঝগড়ায় জড়াইয়া পড়িবেন না, আদালত ছাড়িয়া দিবেন, নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া অপরকে ঐ ব্যবসা ছাড়িবার কথা বলিবেন।

(৫) যখন উকিল যেমন ওকালতি ত্যাগ করিবেন, তেমনি জজিয়াতিও গ্রহণ করিবেন না।

(৬) যখন ডাক্তার নিজের ব্যবসা ছাড়িয়া দিবেন এবং তিনি লোকের শরীর ভাল করা অপেক্ষা আত্মাকে শুদ্ধ করিয়া উহাকে নীরোগ করাই নিজের কর্তব্য বুঝিবেন।

(৭) যখন ডাক্তার, তাঁহার ধর্ম যাহাই হোক, একথা বুঝিবেন যে, ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে পৈশাচিক ভাবে যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর দেহ কাটা ছেঁড়া করিয়া তাহাকে যে নিরাময় করা হয়, তাহার চেয়ে বরং যদি রোগ থাকে তাহাও ভাল।

(৮) যখন ডাক্তার চরকা চালাইবেন আর ব্যাধির আসল কারণ বাহির করিয়া উহা দূর করিবার উপদেশ দিবেন ও নিরর্থক ঔষধ দিয়া রোগীকে অতি প্রশ্রয় দিবেন না। যখন বুঝিবেন যে, অকেজো ঔষধ ব্যবহার করার পরিবর্তে যদি রোগীর মৃত্যু হয় তাহাতে পৃথিবীর ক্ষতি হইবে না এবং তিনি কার্যতঃ রোগীর প্রতি করুণাই দেখাইয়াছেন।

(৯) যখন ধনবান অর্থনাশ হওয়ার ভয় না করিয়া মনের কথা নির্ভয়ে অপরকে বলিবেন।

(১০) যখন ধনী নিজের ধন চরকার কাজে লাগাইবেন, আর নিজে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া অপরকে উৎসাহিত করিবেন।

(১১) অন্য যে কোন ভারতীয়ের ন্যায়ই তিনিও বুঝিবেন যে, এখন শোক, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রার্থনা করার সময়।

(১২) যখন প্রত্যেক ভারতীয়ের মতই তিনি বুঝিবেন যে, ইংরেজকে দোষ

দেওয়া নিরর্থক। তাহারা আমাদের দোষেই আসিয়াছে, আমাদের দোষেই টিকিয়া আছে; আর আমরা যখনই আমাদের নিজেদের সংস্কার করিব, হয় তাহারা চলিয়া যাইবে, না হয় তাহারাও নিজেদের প্রকৃতি বদল করিবে।

(১৩) যখন সকলে বুঝিবেন যে, শোকের অবস্থায় আমোদ প্রমোদ চলে না। যতদিন আমাদের এই অধঃপতিত অবস্থা থাকিবে, ততদিন হয় জেলে, না হয় নির্বাসনে থাকাই শ্রেয়ঃ।

(১৪) যখন আমরা বুঝিব যে, জেলের বাহিরে থাকিয়া লোককে বুঝাইবার যে কাজ করিতেছি, আমি জেলে গেলে সে কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে এরূপ ভাবা সম্পূর্ণ ভ্রম।

(১৫) যখন সকলে জানিবেন যে, বক্তৃতা করা অপেক্ষা কাজ করা অনেক ভাল; যখন নির্ভীক ভাবে মনের কথা বলিয়া সকলে তাহার পরিণাম ভোগ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন এবং এইরূপ ভাবে কথা বলার দ্বারাই অপরের মনে দাগ কাটা যায়, এ কথা বুঝিতে পারিবেন।

(১৬) যখন সকল হিন্দুস্থানীই বুঝিবেন যে, আমরা কষ্ট সহ্য করিয়াই মুক্ত হইতে পারি।

(১৭) যখন সকলে ইহা বুঝিবেন যে, ইংরেজের সভ্যতাকে উৎসাহ দিয়া আমরা যে পাপ করিয়াছি, যদি জীবনান্ত পর্যন্ত দ্বীপান্তরে আন্দামানে থাকিতে হয় তাহা হইলেও তাহা যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

(১৮) যখন সকলে একথা বুঝিবেন যে, কোন জাতিই কষ্ট না করিয়া বড় হয় নাই। এমন কি যুদ্ধাদির ব্যাপারেও অন্যকে হত্যা করা নয়, কষ্ট সহ্য করাই সত্যকার পরীক্ষা এবং সত্যাগ্রহের লড়াইয়ে ইহা আরও সত্য।

(১৯) যখন সকলে বুঝিবেন যে, "সকলে করিলেই করিব" এ প্রকার বলা না-করার ভান করার সমান। আমার যাহা ঠিক মনে হয় আমি তাহা করিব, অন্যরা যখন পথ দেখিবে, তাহারাও করিবে। যখন মুখের সামনে সুস্বাদু খাদ্য আসে তখন তাহা গ্রহণ করিবার পূর্বে কাহারও জন্য বসিয়া থাকি না। জাতীয় উদ্যোগ প্রয়াস এবং দুঃখ ভোগ সুস্বাদু খাদ্য ভোজনের সমান। চাপে পড়িয়া কষ্ট ভোগ আদৌ কষ্ট স্বীকারই নয়।

পাঠক—এ ত বিরাট হুকুম। সকলে কখন এই সব করিবে?

সম্পাদক—আপনি আবার ভুল করিতেছেন। সকলে কী করিবে ইহা লইয়া আপনার ও আমার কী দরকার? প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্তব্য পালন করুন। আমি যদি আমার কর্তব্য করি অর্থাৎ নিজের সেবা করি, আমি অন্যেরও সেবা করিতে পারিব।

আপনার নিকট বিদায় লইবার পূর্বে আর একবার আপনাকে জানাইতে চাই যে :—

(১) সত্যকার হোম-রুল বা স্বরাজ হইল স্ব-শাসন বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ।

(২) উহার চাবি সত্যাগ্রহ, আত্ম-বল বা প্রেম-বল।

(৩) ঐ বল সংগ্রহ করার জন্য সর্বপ্রকার স্বদেশী গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৪) আমরা যাহা করিতে চাই, তাহা আমাদের কর্তব্য বোধেই করিতে চাহিতেছি; যেহেতু আমরা ইংরেজদের বিরোধী বা যেহেতু আমরা প্রতিশোষ লইতে চাই, সেজন্য নয়। এইজন্যই ইংরেজ যদি নুনের ট্যাক্স উঠাইয়া লয়, যে ধন এ দেশ হইতে লইয়াছে তাহা যদি ফিরাইয়া দেয় এবং সকল হিন্দুস্থানীকে বড় বড় চাকরি দেয়, সৈন্য সামন্ত সরাইয়া লয়, তাহা হইলেই কি আমরা উহাদের মিলের কাপড় পরিব বা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করিব, অথবা উহাদের শিল্প আমরা ব্যবহার করিতে থাকিব? তাহা নয়। লক্ষণীয় যে, তাহাদের প্রকৃতিতে এইগুলি ক্ষতিজনক এবং সেইজন্য আমরা তাহা চাহি না।

ইংরেজদের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নাই, কিন্তু তাহাদের সভ্যতার আমি বিরুদ্ধে।

আমার মত হইল যে আমরা ইহার সত্যকার তাৎপর্য না বুঝিয়াই 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। আমি নিজে যেমন বুঝিয়াছি তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার ধর্ম জানে যে, এই স্বরাজ লাভের জন্যই আমার সমস্ত জীবন আজ উৎসর্গীকৃত।

স্বাস্থ্য নির্দেশিকা

(কী টু হেলথ)

প্রথম ভাগ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদিকা

বাসন্তী দেবী

১

মনুষ্য দেহ

মানুষের শরীরের বর্ণনা দেওয়ার আগে 'স্বাস্থ্য' শব্দটির অর্থ বোঝা দরকার। স্বাস্থ্য বলতে বোঝায় দেহের স্বাভাবিক, সহজ অবস্থা। যার দেহে কোন রোগ নেই, সে-ই স্বাস্থ্যবান। ক্লান্ত না হয়ে সে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যায়। এ ধরনের মানুষ সহজেই দিনে দশ থেকে বার মাইল হাঁটতে পারে, শ্রান্ত না হয়ে সাধারণ কায়িক শ্রম করার ক্ষমতা রাখে। সে সাধারণ সাধাসিধে খাদ্য হজম করতে পারে।

যারা পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য লড়ে বা ঐ ধরনের শক্তিমান, এই সংজ্ঞার মধ্যে তারা পড়ছে না। অপূর্ব দৈহিক শক্তিসম্পন্ন মানুষ মাত্রেই যে স্বাস্থ্যবান হবে. এমন কোন মানে নেই। হয়তো সে কেবল তার মাংসপেশীকেই পুষ্ট করেছে এবং সম্ভবতঃ অন্য কিছুর বিনিময়েই।

উপরে স্বাস্থ্যের যে মানের কথা বলা হলো, মানুষের দেহ সেই লক্ষ্যে পৌছোবে, এটাই প্রত্যাশিত। আর এজন্য মানুষের দেহ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

প্রাচীনকালে কী ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তা ভগবানই জানেন। গবেষকরা এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলতে পারেন, কিন্তু ঐ কিছুই। কিন্তু আমাদের সকলেরই এ দেশের আধুনিক শিক্ষাধারা সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। এই শিক্ষাপদ্ধতির সংগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে আমরা আমাদের নিজের নিজের শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকি। আমাদের নিজেদের গ্রাম এবং আমাদের নিজেদের ক্ষেত-খামার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানেরও ঐ একই হাল। অপর দিকে, যে সব জিনিসের সংগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সম্পর্ক নেই, তা নিয়ে আমাদের যথেষ্ট শেখানো হয়। আমি এ কথা বলছি না যে, এ জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রত্যেক কিছুরই একটা নিজস্ব স্থান আছে। সব প্রথম আমাদের নিজের নিজের শরীর, নিজের ঘরবাড়ী, আপন গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, সেখানে যে সব শস্য জন্মায় সে সব ফসল সম্বন্ধে যথেষ্ট জানতে হবে—তারপর অন্য কিছু জানার চেষ্টার কথা উঠবে। এই প্রাথমিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে অর্জিত ব্যাপক সাধারণ জ্ঞানই কেবল মানুষের জীবন সহজ করতে পারে।

প্রাচীন দার্শনিকরা বলেছেন, মানুষের দেহ পঞ্চ ভূতে তৈরী। এগুলি হলো ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

মানুষের সব কাজই মনের দ্বারা চালিত। সহায়ক রূপে রয়েছে দশটি ইন্দ্রিয়। তার মধ্যে পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, যথা, হাত, পা, মুখ, গুহ্যদেশ, জননেন্দ্রিয়; আর পাঁচটি স্পর্শেন্দ্রিয়, যথা, চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক। মনের কাজ মনন চিন্তন।

কেউ কেউ একে একাদশ ইন্দ্রিয় বলেন। যাঁর এই সব কটি ইন্দ্রিয় ও মন সম্পূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করে, তিনিই সুস্থ।

মানুষের দেহ-যন্ত্রের আভ্যন্তরীণ কার্যপরিচালন ব্যবস্থা চমৎকার। মানুষের দেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতিরূপ। যা নেই ভাণ্ডে তা নেই ব্রহ্মাণ্ডে। এ জন্যই দার্শনিকের সূত্র হল, মানুষের দেহভাণ্ডে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিফলন।

এ থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের নিজেদের দেহ সম্বন্ধে জ্ঞান যদি নির্ভুল হয়, আমরা বিশ্বকেও জানতে পারব। কিন্তু এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার, হাকিম ও বৈদ্যরাও এই সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন না। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে তা আকাঙ্খা করা তো দম্ভ করার সামিল। এখনো কেখ এমন যন্ত্র উদ্ভাবন করতে পারেন নি, যা মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে কোন তথ্য সংবাদ দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেহের ভিতরে ও বাইরে যে সব কার্যকলাপ চলছে, তার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু কিসে যে চাকা ঘুরছে, তা কেউ বলতে পারেন না। কেন মৃত্যু হয় বা কোথা থেকে তা আসে কে ব্যাখ্যা করবেন? কেই বা মৃত্যুর দিনক্ষণ নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন? সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে—মানুষ অসংখ্য পড়াশোনা করে ও লিখে এ কথাটাই বুঝতে পেরেছেন যে কত কম তাঁর জ্ঞান!

মনুষ্য-যন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনা নির্ভর করছে বিভিন্ন আনুসঙ্গিক উপাদান ও অঙ্গের সুসমঞ্জস কার্যকলাপের উপর। এই সব কিছু যদি নিয়ম শৃঙ্খলায় চলে যন্ত্রের গতিও স্বচ্ছন্দ হয়। অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গগুলির একটিও বিকল হয়ে পড়লে এ থেমে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, হজম শক্তি নষ্ট হয়ে গেলে গোটা দেহই কেমন শিথিল হয়ে পড়ে। কাজেই, যিনি গরহজম ও কোষ্ঠকাঠিন্যকে খুব হালকা-ভাবে নেন, তিনি স্বাস্থ্যবিধির ক-খ-গ জানেন না। এই দুইটিই হলো অসংখ্য রোগ ব্যাধির মূল কারণ।

এর পরেই যে প্রশ্নটি আমাদের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দাবী করে, তা হচ্ছে : মানুষের দেহের উপযোগিতা কী। পৃথিবীতে যে কোন জিনিসেরই ব্যবহার ও অপব্যয় করা যায়। দেহ সমন্ধেও ঐ একই কথা। আমরা যখন স্বার্থপর উদ্দেশ্যে, বা আত্মচরিতার্থ করতে কিংবা অপরের ক্ষতি করার জন্য এই দেহকে কাজে লাগাই, আমরা এর অসদ্ব্যবহারই করি। কিন্তু আমরা যদি আত্মসংযম করি এবং সারা বিশ্বের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করি, এই দেহের সুপ্রয়োগ ঘটে। মানুষের আত্মা হলো বিশ্বজনীন প্রকৃতি বা ঈশ্বরের অঙ্গ বিশেষ। এই যোগসূত্র, এই সম্বন্ধ উপলব্ধি করার জন্য যখন আমাদের সকল প্রচেষ্টা ধাবিত হয়, দেহ আত্মার বাসোপযোগী মন্দির হয়ে ওঠে।

দেহকে ময়লার খনি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে এটি আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। তবে দেহ যদি কেবল তা-ই হতো, তা হলে আর দেহের যত্ন করার জন্য এত কষ্ট করার কোন যুক্তিই থাকতো না। কিন্তু এই তথাকথিত ময়লার খনির যদি সদ্ব্যবহার করতে হয়, আমাদের প্রথম কর্তব্যই হলো, দেহ পরিচ্ছন্ন করা ও একে সুস্থ মজবুত রাখা। দামী প্রস্তর ও সোনার খনিরও উপরটা দেখতে সাধারণ মাটির মত। তলায় সোনা ও দামী প্রস্তর রয়েছে,

এই খবরটুকুই খনির ভিতরের সম্পদ আহরণে মানুষকে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করে। ঠিক তেমনিই, আত্মার মন্দির অর্থাৎ মানুষের দেহকে মজবুত রাখতে আমরা যত ক্লেশই নিই না কেন, তা যথেষ্ট হতে পারে না।

মানুষ পৃথিবীতে আসে পৃথিবীর ঋণ পরিশোধ করতে; অর্থাৎ ঈশ্বরের ও (বা তাঁর মধ্য দিয়ে) তাঁর সৃষ্টির সেবা করতে। সামনে এই দৃষ্টিভঙ্গী রেখে মানুষ তার দেহের অভিভাবক হিসাবে আচরণ করে। দেহ যাতে তার সাধ্যমত সেবাদর্শ পালনে সমর্থ হয়, সেজন্য তার উপযুক্ত যত্ন নেওয়া মানুষের কর্তব্য।

২

বায়ু

জল ছাড়াও মানুষ অল্প ক'দিন বাঁচতে পারে, কিংবা বিনা খাদ্যে আরো বেশী দিন; কিন্তু বায়ু ব্যতিরেকে এক মুহূর্তও নয়। সেজন্যই প্রকৃতি আমাদের চারদিকে বায়ু দিয়ে ঘিরে রেখেছেন, যাতে বিনা আয়াসেই আমরা তা পেতে পারি।

আমরা নাক দিয়ে ফুসফুসে বাতাস টেনে নিই। ফুসফুস এক ধরনের হাপরের মত কাজ করে। আমরা প্রকৃতির যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিই, তার মধ্যে একটি জীবন-প্রদ উপাদান রয়েছে—সে গ্যাস হলো অক্সিজেন। আর নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে যে বাতাস ছেড়ে দিই, তার মধ্যে রয়েছে বিষাক্ত গ্যাস। আমরা যদি ঐ বিষাক্ত গ্যাস-গুলিকে সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে প্রাকৃতিক বায়ুমণ্ডলে মিশে যেতে না দিই, এগুলি আমাদের মৃত্যু ঘটাতে পারে। এজন্যই দরকার উপযুক্ত হাওয়া খেলার ব্যবস্থা।

বায়ু ফুসফুসের ভিতরে রক্তের ঘনিষ্ঠ সংযোগে আসে এবং রক্তকে পরিশুদ্ধ করে। অনেক লোকই শবাস-প্রশ্বাস নেওয়ার কৌশলটি জানে না। এই ত্রুটি তাঁদের রক্তের উপযুক্ত পরিশোধনে বাধা ঘটায়। কিছু লোক আছে, যারা নাক দিয়ে না নিয়ে মুখ দিয়ে বাতাস টানে। এটা একটা বদ অভ্যাস। প্রকৃতি মানুষের নাক এমন-ভাবে সৃষ্টি করেছেন যে বায়ু যখন ভিতরে ঢোকে, নাক একটা ফিল্টারের মত কাজ করে এবং বায়ুকে উষ্ণ করে। আর যারা মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়, তাদের ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের বাতাস প্রাথমিক শোধন ব্যতিরেকে ও তাপিত না হয়েই ফুসফুসে গিয়ে পেঁাছোয়। কাজেই যারা কীভাবে শ্বাস নিতে হয় জানে না, তাদের উচিত শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা। ঐ ব্যায়াম শেখা যেমন সহজ, তেমনি দরকারীও। আমি বিভিন্ন আসন বা ভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। তা বলে আমি একথা বলছি না যে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় নয়। তবে আমি এ ব্যাপারেই জোর দিতে চাই যে সুনিয়ন্ত্রিত বাঁধাধরা জীবন যাপন করতে পারলে বহু ভঙ্গীর আসন বা ব্যায়াম অনুধ্যান ও অনুশীলনের প্রয়োজন হ্রাস পায়। যে কোন স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী, যা নাক দিয়ে আমাদের শ্বাস টানা সুনিশ্চিত করে ও অবাধে বক্ষোদেশের

সম্প্রসারণ ঘটায়, আমাদের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।

আমরা যদি শক্ত করে মুখ বন্ধ রাখি, সে ক্ষেত্রে নাক দিয়েই শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হয়। আমরা যেমন প্রত্যহ সকালে মুখ ধুই, তেমনি নাকও পরিষ্কার করা উচিত। পরিষ্কার জল, ঠাণ্ডা বা ঈষদুষ্ণ—এজন্য সবচেয়ে উপকারী। এই জল কাপে বা হাতের তালুতে নিয়ে এক নাক দিয়ে টানতে হবে, অন্য নাক তখন বন্ধ থাকবে; তারপর বন্ধ নাক খুলে সেখান দিয়ে জল বার করে দিতে হবে, সে সময় আবার প্রথম নাকটি বন্ধ রাখতে হবে। যাতে না কোনরকম অস্বস্তি ঘটে, সেভাবে ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়া চালাতে হবে। নাকের পিছন দিকটা, ন্যাশোফেরিনক্স নামে যা পরিচিত, সেখানটা সাফ করার জন্য মুখ দিয়ে জল বার করে দিতে হবে বা এমন কি গিলে ফেলতে হবে।

আমরা যে বায়ু শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিই, তা যাতে বিশুদ্ধ, মুক্ত বায়ু হয়, তা নিশ্চয়ই আমাদের দেখতে হবে। এজন্য তারকাখচিত মুক্ত আকাশ তলে ঘুমোনোর অভ্যাস করা ভালো। ঠাণ্ডা লেগে যাবার ভয় মন থেকে দূর করে দিতে হবে। গায়ে বেশ ভালো ভাবে ঢাকা দিয়ে রাখলে ঠাণ্ডা লাগবে না। তবে কখনো ঢাকা গলার ওপরে ওঠানো ঠিক নয়। মাথায় ঠাণ্ডা লাগছে বলে যদি মনে হয়, আলাদা কাপড়ের টুকরো দিয়ে মাথা ঢাকা দেওয়া যেতে পারে। তবে শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ অর্থাৎ নাক ঢাকা দিতে নেই।

শুতে যাওয়ার আগে দিনের পোষাক বদলে ঢিলে নৈশ পোষাক পরে নিতে হয়। বলতে কি, যে চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমোয় রাত্রে তার কোন পোষাকেরই দরকার করে না। অবশ্য দিনের বেলায়ও খুব আঁটসাট পোষাক পরা এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

আমাদের চারদিকে বায়ুমণ্ডল, সেখানে বাতাস সব সময় বিশুদ্ধ হয় না—বা সব দেশে সমানও নয়। দেশ বাছাই করা সব সময় আমাদের হাতে থাকে না; কিন্তু উপযুক্ত এলাকায় উপযুক্ত ঘর বাছা কিছুটা আমাদেরই উপর নির্ভর করে। সাধারণ নিয়ম হলো, যে অঞ্চল খুব জনাকীর্ণ নয়, সেখানে বাস করা এবং ঘরে যাতে ভালো আলো বাতাস খেলে, তার ওপর জোর দেওয়াই কাম্য।

৩

জল

বায়ুর পরেই জলের প্রয়োজন মানুষের জীবনে। বায়ু ছাড়া আমরা অল্প ক' মিনিটের বেশী যেমন বাঁচতে পারি না, ঠিক তেমনি বিনা জলে স্বল্প ক' দিনের বেশী বাঁচা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যই, প্রকৃতি বায়ুর মতই জলও আমাদের প্রচুর দিয়েছে। যেখানে জল নেই, সেরকম অনুর্বর মাটিতে মানুষ বাস করতে পারে না। মরুভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্পূর্ণ জনবসতিহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সুস্থ থাকার জন্য প্রত্যেকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫ পাউণ্ড করে জল বা অন্য জলীয় খাদ্য পান করা উচিত। পানীয় জল অবশ্যই বিশুদ্ধ হওয়া চাই। অনেক

জায়গায় বিশুদ্ধ জল পাওয়া কঠিন। কূপের জল পান করার মধ্যে সর্বদাই ঝুঁকি থাকে। অগভীর কূপ এবং এমন কি গভীর কূপ, যেখানে তলায় জলের স্তর পর্যন্ত সিঁড়ি রয়েছে,—এদের জল পানীয় হিসাবে ব্যবহারের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। মুশকিল হলো কি, জলের চেহারা, এমন কি তার স্বাদ থেকেও জলের বিশুদ্ধতা বোঝা যায় না। যে জল দেখতে ও স্বাদে সম্পূর্ণ অ-ক্ষতিকর, তাও বিষের কাজ করতে পারে। অজানা কূপ থেকে বা অপরিচিতের গৃহে জল পান না করার যে প্রাচীন প্রথা ছিল, তা অনুসরণযোগ্য।

বাংলা দেশে প্রায় সব বাড়ির সঙ্গেই সংলগ্ন একটা করে কাঁচা পুকুর রয়েছে। নিয়ম হিসাবেই এ সব পুকুরের জল পানের অনুপযোগী। নদীর জলও প্রায় ক্ষেত্রেই পানের যোগ্য নয়—বিশেষ করে যেখানে নৌ পরিবহণ চলাচল করে বা যেখানে নদী কোন বড় সহরের পাশ দিয়ে বয়ে যায় ও সে সহরের ড্রেন ও পয়ঃপ্রণালীর জল এসে নদীতে পড়ে।

আমি জানি, যা বললাম, তা সত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবিশুদ্ধ জল বলে আমি যা বোঝাতে চেয়েছি, সেই জলই পান করতে হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণযোগ্য। প্রকৃতি আমাদের জীবনীশক্তির পর্যাপ্ত ভাণ্ডারের জোগান দিয়েছে। এ না হলে, মানুষ নিজের ভুলে ও স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের ফলে বহু দিন আগেই পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

এ ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য কেবল স্বাস্থ্য রক্ষায় জলের ভূমিকা নিয়ে। যেখানেই জলের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ থাকবে, পানের আগে সে জল ফুটিয়ে নেওয়া উচিত। কার্যতঃ তা হলে দাঁড়াচ্ছে যে প্রত্যেকেরই সঙ্গে পানীয় জল নিয়ে চলাফেরা করা উচিত। এ দেশে বহু নিষ্ঠাবান হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার বশতঃ ভ্রমণ-কালে জলই পান করেন না। নিশ্চয়ই, ধর্মের নামে সংস্কারবদ্ধ মানুষ যা করে থাকেন, সংস্কারমুক্ত মানুষ স্বাস্থ্যের জন্যই তা করতে পারেন।

৪

খাদ্য

এটা সত্য যে মানুষ বায়ু ও জল ছাড়া বাঁচতে পারে না। তেমনি যা দেহকে পুষ্ট করে, তা হলো খাদ্য। এজন্য চলিত কথায় বলে, খাদ্যই জীবন।

খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; নিরামিষ, আমিষ ও মিশ্র। আমিষ খাদ্যের মধ্যে পড়ে হাঁস-মুরগী-পাখী ও মাছ। দুধও পশুজাত, কাজেই তা কোন মতেই পুরোপুরি নিরামিষ খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। দুধ, মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যই বহুলাংশে পূরণ করে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় দুধকে পশুজ খাদ্যের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। তবে সাধারণ অনভিজ্ঞ মানুষ তা মনে করে না। অপর পক্ষে, তাদের ধারনায় ডিম হচ্ছে মাংসজাত খাদ্য। প্রকৃত বাস্তবে কিন্তু তা ঠিক নয়। আজকাল ফলহীন ডিমও উৎপন্ন হয়। মোরগের কাছে মুরগীকে যেতে

দেওয়া হয় না, তবু সে মুরগী ডিম দেয়। এই ফলহীন ডিম ফুটে কখনো বাচ্চা বেরোয় না। কাজেই যিনি দুধ খেতে পারেন, তাঁর এই ফলহীন ডিম খাওয়ায় আপত্তি থাকা উচিত নয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিমত প্রায় সর্বাংশে মিশ্র খাদ্য তালিকার অনুকূলে। অবশ্য এক শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে, যাঁদের দৃঢ় অভিমত হলো যে শারীর বিদ্যার যুক্তি মানুষের নিরামিষাশী হওয়ার পক্ষে। তার দাঁত, তার পাকস্থলী, তার অন্ত্র প্রভৃতি সাক্ষ্য দিচ্ছে, প্রকৃতি মানুষকে নিরামিষাশী করেই সৃষ্টি করেছে।

শস্যদানা, ডাল, ভোজ্য মূল, আলু, কন্দ, পাতা ছাড়াও নিরামিষ খাদ্য তালিকার মধ্যে রয়েছে টাটকা ও শুকনো ফল। শুকনো ফল বলতে বোঝায় বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি।

আমি সব সময়ই পুরো নিরামিষ খাওয়ার পক্ষে। তবে অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিখেছি যে সম্পূর্ণ সুস্থ সবল থাকতে হলে নিরামিষ খাদ্য তালিকায় দুধ ও দুধ থেকে তৈরী দৈ, মাখম, ঘী প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। গোড়ায় আমার যে ধারণা ছিল, এটা তা থেকে যথেষ্ট সরে আসা বৈকি। আমি ছ' বছর আমার খাদ্য তালিকা থেকে দুধ বাদ দিয়ে রেখেছিলাম। ঐ সময় সেজন্য আমার কিছু খারাপ লাগত না। কিন্তু ১৯১৭ সালে, আমার অজ্ঞতার জন্যই প্রচণ্ড আমাশা রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। দেহ আমার অস্থি-চর্মসার হয়ে পড়ে। তবুও আমি প্রবলভাবে কোন ওষুধ খেতে অস্বীকৃতি জানাই; সমান জেদের সংগে দুধ বা মাখন দুধ খেতে আপত্তি করি। কিন্তু কিছুতেই আর আমার শরীর সারছিল না, বিছানা ছাড়ার মত শক্তি পাচ্ছিলাম না। দুধ খাবো না বলে আমার প্রতিজ্ঞা ছিল। একজন চিকিৎসক বন্ধু আমাকে বোঝালেন যে আমি যখন প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম,, আমার মনে গরু ও মোষের দুধের বিষয়ই ছিল এবং তা-ই সম্ভব। তা হলে ঐ শপথের জন্য ছাগলের দুধ খেতে বাধা কোথায়? আমার স্ত্রীও তাঁকে সমর্থন করলেন। আমি নতি স্বীকার করলাম। সত্য কথা বলতে কি, যে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, শপথ নেওয়ার সময় তার মনে কেবল গরু ও মোষের দুধ থাকলেও, তার ক্ষেত্রে দুধ পান নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। সব পশুর দুধই কার্যতঃ এক, যদিও ক্ষেত্র বিশেষে দুধের উপাদানের অনুপাতের মধ্যে তারতম্য থাকতে পারে। কাজেই বলা যায়, আমি মাত্র আক্ষরিক অর্থে শপথ রেখেছি, নীতিগতভাবে নয়। সে যাই হোক, সংগে সংগে ছাগলের দুধ দোওয়া হলো এবং আমি তা পান করলাম। আমি যেন নতুন জীবন ফিরে পেলাম। আমি দ্রুত সেরে উঠতে লাগলাম এবং শীঘ্রই বিছানা ছাড়তে পারলাম। এজন্য এবং আরো কয়েকবার অনুরূপ অভিজ্ঞতা থেকে, আমি সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য তালিকায় দুধ যোগ করার আবশ্যকতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছি। তবে আমার এ বিশ্বাসও আছে যে, বিশাল সব্জী রাজ্যে নিশ্চয়ই এমন উপকরণও রয়েছে, যা, দুধ ও মাংস থেকে আমরা যে উপাদান পাই, সেই প্রয়োজনীয় উপাদানই যোগান দিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুধ ও মাংসের নৈতিক ও অন্য যে ত্রুটি, তা থেকে মুক্ত।

আমার মতে, দুধ ও মাংস খাওয়ায় নিশ্চয়ই দোষ হয়। মাংস পেতে হলে জীব হত্যা করতে হয়। আর, আমাদের শৈশবে মায়ের দুধ ছাড়া আমরা নিশ্চয়ই আর কোন দুধ পাবার অধিকারী নই। তা ছাড়াও অর্থাৎ নৈতিক বাধা ব্যতীতও নিছক স্বাস্থ্যবিধির দিক থেকেও কিছু অসুবিধা রয়েছে। দুধ ও মাংস, দু-ই যে জীব থেকে পাই, সঙ্গে সঙ্গে তার যা খুঁত বা গলদ, তাও দুধ ও মাংসে বর্তায়। গৃহপালিত গবাদি পশু কদাচিৎ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যবান হয়। মানুষের মতই তারাও অসংখ্য রোগে ভোগে। যেখানে গবাদির মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে, সেখানেও এই সব রোগের অনেকগুলিই তাচ্ছিল্য করা হয়। তা ছাড়া, ভারতের সব গবাদি পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা একটা অসম্ভব ব্যাপার—অন্ততঃ এখানকার মত তো বটেই। আমি সেবাগ্রামে একটা ডেয়ারী চালাচ্ছি। আমি সহজেই চিকিৎসক বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারি। তবু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারে না, সেবাগ্রামে ডেয়ারীর সব গবাদিরই স্বাস্থ্য ভালো। আবার অন্যদিকে এমনও হয়েছে যে প্রত্যেকেই যে গরুটিকে স্বাস্থ্যবতী বিবেচনা করলো, আসলে তার যক্ষ্মা রয়েছে বলে দেখা গেল। এই রোগ নির্ণয় হওয়ার আগে পর্যন্ত ঐ গরুর দুধ নিয়মিতভাবে আশ্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। আশ্রমে প্রতিবেশী অঞ্চলের চাষীদের কাছ থেকেও দুধ নেওয়া হয়। তাদের গরুগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় নি। দুধের কোনও নির্দিষ্ট নমুনা—খাওয়ার পক্ষে নিরাপদ কি নিরাপদ নয়, তা স্থির করা কঠিন। দুধ ফোটালে যেটুকু যা নিরাপত্তার আশ্বাস মেলে তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আশ্রমই যদি নিজেদের সব গরুর পুরো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার গ্যারান্টি দিতে ও ডেয়ারিজাত খাদ্য দ্রব্যের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হতে না পারে, তা হলে অন্যত্র যে পরিস্থিতি আরও ভালো হবে, সে সম্ভাবনা কমই। দুগ্ধবতী গবাদি সম্বন্ধে যা কথা, মাংসের জন্য যে সব প্রাণী হত্যা করা হয়, তাদের ক্ষেত্রে তো তা আরও অনেক বেশী প্রযোজ্য। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, মানুষ এসব বিপদ, ঝুঁকি এড়াতে নিছক ভাগ্যের উপর নির্ভর করে চলছে। সে যে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খুব চিন্তিত তা তাকে দেখে মনে হয় না। সে নিজেকে ডাক্তার, বৈদ্য, হাকিমে ঘেরা চিকিৎসারূপ দুর্গে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে জ্ঞান করে। তার প্রধান উদ্বেগ উৎকণ্ঠা হলো, কী করে সম্পদ লাভ করতে ও সমাজে মর্যাদা পেতে হয়। এই চিন্তাই বাকী সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে রাখে। কাজেই, যতদিন না কোন নিঃস্বার্থ বিজ্ঞানী ধৈর্য সহকারে গবেষণা করে দুধ ও মাংসের কোন সব্জী-বিকল্প আবিষ্কার করছেন, ততদিন মানুষ মাংস ও দুধ খেয়ে যাবে।

এখন মিশ্র খাদ্য তালিকাটা বিচার করে দেখা যাক। মানুষের খাদ্য দরকার, কারণ খাদ্যই দেহের পুষ্টি সাধনে এবং নিত্য যে ক্ষয় হচ্ছে, তা পূরণের জন্য পেশী গঠনের উপাদান জোগাতে পারে। খাদ্যের মধ্যে আরো কিছু থাকা দরকার, যা শক্তি জোগাবে,—যা চর্বি, কয়েক ধরনের লবণ—এবং মল হিসাবে অসার পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ায় সহায়তা করে, এরকম অপাচ্য উপাদান জোগাবে। প্রোটিন মেলে দুধ, মাংস, ডিম, ডাল ও বাদাম থেকে। দুধ ও মাংসে যে প্রোটিন

থাকে, যাকে বলা হয় জৈব প্রোটিন, তা সহজে পরিপাক করা যায়, শোণিতে পরিণত হয়। সব্জি প্রোটিনের চেয়ে তা বেশী মূল্যবান। দুধ—মাংসের চেয়েও ভালো। চিকিৎসকগণ বলেন, যে ক্ষেত্রে মাংস পরিপাক হচ্ছে না, দুধ খুব সহজেই হজম হয়। নিরামিষাশীদের পক্ষে দুধই একমাত্র উপকরণ, যার মধ্যে জৈব প্রোটিন রয়েছে; এজন্য তাঁর খাদ্য তালিকায় দুধ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কাঁচা ডিমে প্রোটিন অন্য সব প্রোটিনের চেয়ে সবচেয়ে সহজে হজম করা যায়।

কিন্তু প্রত্যেকেরই দুধ খাওয়ার সংগতি থাকে না। এবং দুধ সব জায়গায় পাওয়াও যায় না। দুধ সম্বন্ধে আমি এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে চাই। সাধারণ বিশ্বাসের বিপরীতটাই সত্য—মাঠা তোলা দুধ অত্যন্ত দামী খাদ্য উপাদান। কখনো কখনো এ এমনি দুধের চেয়েও বেশী উপকারী বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে। দুধের প্রধান কাজ হলো পেশী গঠন ও দেহে ক্ষয় পূরণের জন্য জৈব প্রোটিন সরবরাহ। মাঠা বা সর তুলে নিলে আংশিকভাবে চর্বি চলে গেলেও প্রোটিন উপাদানের আদৌ কোন হেরফের হয় না। তাছাড়া, মাঠা তোলার যে সব যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়, তা দিয়ে দুধ থেকে চর্বির সবটা সরিয়ে নেওয়া যায় না। যাতে তা সম্ভব হয়, সে ধরনের কোন যন্ত্র উদ্ভাবিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই।

দেহের পক্ষে মাঠা তোলা বা এমনি দুধ ছাড়াও আরো কিছু দরকার। আমি তণ্ডুল-জাতীয় খাদ্যশস্য—গম, চাল, জোয়ার, বজরা প্রভৃতিকে দ্বিতীয় স্থান দিই। এগুলি প্রধান খাদ্য। অবশ্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রধান উপাদান হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন তণ্ডুল-জাতীয় খাদ্যশস্য ব্যবহৃত হয়। অনেক জায়গায়ই আবার একসঙ্গে একাধিক খাদ্য শস্য লোকে খেয়ে থাকে; যেমন, সামান্য পরিমাণ গম, বজরা ও চাল প্রায়ই একসঙ্গে পরিবেশন করা হয়। তবে দেহের পুষ্টির জন্য এই মিশ্র খাদ্য দরকার করে না। বরং এই মিশালী খাদ্য খাওয়ার জন্য পরিমাণ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। পরিণামে হজম শক্তির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এইসব নানান ধরনের খাবার প্রধানতঃ শ্বেতসার জোগায়—কাজেই একসঙ্গে একটি খাওয়াই ভালো। গমকে খাদ্যশস্যের রাজা বলা যেতে পারে। আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখবো গমই প্রথম স্থানাধিকারী। স্বাস্থ্য রক্ষার দিক থেকেও, আমরা যদি গম খাই, চাল ও অন্য সব খাদ্যশস্যের আর দরকার হয় না। অবশ্য যদি গম না পাওয়া যায় এবং জোয়ার ইত্যাদি অপছন্দের দরুণই হোক বা হজম করায় অসুবিধার কারণে খাওয়া সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে চাল খেতে হয়।

এই খাদ্যশস্য দানা ভালোভাবে পরিষ্কার করে জাঁতাকলে গুঁড়িয়ে নিতে হবে; এবং তাতে যে আটা হবে, তা তেমনিই ব্যবহার করা উচিত। চালনি দিয়ে তা ছাঁকার দরকার নেই। কারণ তা করতে গেলে ভূষি বা খোসা—যা নানা লবণ ও ভিটামিনে বেশ পরিপূর্ণ এবং পুষ্টির দিক থেকে যে দুটি উপাদানই সবচেয়ে দরকারী, তা দূর হওয়ারই সম্ভাবনা। খোসা মোটা উপাদানও জোগায়, যার সাহায্যে পেট খোলসা হয়। চালের দানা খুব ভঙ্গুর, সেজন্যই প্রকৃতি তাকে একটি বহিরাবরণ বা ঢাকা দিয়েছে। এটা ভক্ষ্য নয়। এই অভক্ষ্য অংশ থেকে চালকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই ভানা প্রয়োজন। ভানাই এমন হওয়া উচিত, যা কেবল চালের দানার বাইরের

ঢাকাটাই অপসারণ করার পক্ষে যথেষ্ট হয়, তার বেশী নয়। কিন্তু কলে ভানাই কেবল ঢাকাটাই বিচ্ছিন্ন করে না, চালের খোসাও ছাড়িয়ে নিয়ে চাল মসৃণ করে। মসৃণ চালের জনপ্রিয়তার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তার কারণ হলো, এই মসৃণতা চাল মজুত রাখার সহায়ক। খোসা খুব মিষ্টি এবং অপসারণ করা না হলে কতকগুলি পোকামাকড় সহজেই আকৃষ্ট হয়ে ক্ষতি করে। খোসা বাদ মসৃণ চাল ও গম আমাদের প্রায় বিশুদ্ধ শ্বেতসার জোগান দেয়। খোসা ছাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য শস্যের দরকারী কতকগুলি উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। চালের এই খোসা ভূষি হিসাবে বিক্রি হয়। চাল ও গমের ভূষি রাঁধা যায় ও তা খাওয়া চলে। তা দিয়ে চাপাটি বা পিঠাও হয়। সম্ভবতঃ চালের চাপাটি এমনি ভাতের চেয়ে আরো সহজে পরিপাক হয় ও তা অপেক্ষাকৃত কম খেলেই পরিতৃপ্তি ঘটে।

আমাদের অভ্যাস হচ্ছে, খাওয়ার আগে প্রতিটি চাপাটি সবজি বা ডালের ঝোলে ডুবিয়ে নিই। এর ফল হলো কি, অধিকাংশ লোকই ভালো ভাবে না চিবিয়েই খাবার খেয়ে থাকে। পরিপাক প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের ক্ষেত্রে চর্বন হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। মুখের লালার সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিপাক সুরু হয়। চর্বন লালার সঙ্গে খাদ্যের সম্পূর্ণ মিশ্রণ সুনিশ্চিত করে। কাজেই, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অপেক্ষাকৃত শুকনো খাওয়াই উচিত, কারণ তার ফলে বেশি করে লালা বেরোয় এবং শক্ত খাবার খেতে বেশ ভালো করে চিবোনোরও দরকার হয়।

শ্বেতসার জাতীয় উপাদান সরবরাহকারী খাদ্যশস্যের পরেই প্রোটিন সরবরাহকারী ডাল—মটর কলাই, মসুর প্রভৃতির প্রসঙ্গ উঠে। মনে হয়, প্রায় সবাইয়ের এই এক ধারণা যে ডাল হলো খাদ্য তালিকায় একটা অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। এমন কি মাংসাশীদেরও ডাল অবশ্য খাওয়া উচিত। এটা সহজেই বোঝা যায় যে যাদের কঠোর কায়িক শ্রম করতে হয় এবং যারা দুধ খাওয়া সংগতিতে কুলিয়ে উঠতে পারে না, তারা ডাল ছাড়া চলতে পারে না। কিন্তু কোনওরকম দ্বিধা না করেই আমি বলতে চাই যে যাদের বসে চাকরি, যেমন কেরাণী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, ডাক্তার, শিক্ষক এবং যারা দুধ কিনতে না পারার মত গরীব নয়, তাদের ডাল খাওয়া দরকার হয় না। সাধারণতঃ ডাল হজম করা কঠিন বলেই ধরা হয় এবং আটা, ভাতের মত খাদ্যশস্যের চেয়ে পরিমাণেও কম খাওয়া হয়। নানা জাতের যে সব ডাল পাওয়া যায়, তার মধ্যে মটর, ছোলা ও কলাই হজম করা সবচেয়ে বেশী এবং মুগ ও মুসুর সবচেয়ে কম কঠিন।

আমাদের খাদ্য তালিকায় সব্জী ও ফলের স্থান তৃতীয়। আমাদের দেশে তা সস্তা ও সুলভ হবে বলেই আশা করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ তা নয়।

গ্রামে টাটকা সব্জী বিরল বললেই হয়। অধিকাংশ জায়গায়ই ফল পাওয়া যায় না। সব্জী ও ফলের এই অভাব দেশের শাসনকর্তাদের কলঙ্ক। অবশ্য গ্রামবাসিগণ ইচ্ছা করলে প্রচুর কাঁচা সব্জী ফলাতে পারে। কিন্তু ফলের সমস্যা এত সহজে মেটানো যায় না। গ্রামবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে ভূমি আইন মন্দ। কিন্তু এ ভিন্ন প্রসঙ্গ।

টাটকা সব্জীর মধ্যে বেশ কিছু শাকপাতা প্রত্যেকদিনই খাওয়া আবশ্যিক। সব্জীর মধ্যে আমি আলু, মিষ্টি আলু, 'সুরন' প্রভৃতি ধরি না। ঐগুলি প্রধানতঃ শ্বেতসার জোগান দেয়। শ্বেতসার সরবরাহকারী খাদ্যশস্যের শ্রেণীর মধ্যেই ঐগুলিকে ধরা উচিত। সাধারণ টাটকা সব্জী বেশ কিছুটা খাওয়া ভালো। কতকগুলি, যেমন শসা, টমাটো, রাই, শুশুনি শাক ও অন্যান্য নরম পাতা রাঁধবার দরকার নেই। ভালো করে ধুয়ে অল্প পরিমাণে কাঁচা খাওয়াই উচিত।

ফলের ব্যাপারে, যে ফল যে ঋতুতে পাওয়া যায়, তাই আমাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত—যেমন আম, জাম, পেয়ারা, আঙ্গুর, পেঁপে, লেবু—মিষ্টি বা টক, কমলা লেবু, মৌসম্বী প্রভৃতি। ফল খাওয়ার সবচেয়ে ভালো সময় হলো খুব সকাল বেলা। ফল ও দুধ দিয়ে প্রাতঃরাশ পুরো তৃপ্তি দেবে। যারা তাড়াতাড়ি মধ্যাহ্ন ভোজ সারে, তারা কেবল ফল দিয়েই প্রাতঃরাশ করতে পারে।

কলা ভালো ফল। কিন্তু এতে খুব বেশী শ্বেতসার রয়েছে, কাজেই কলা রুটির বদলে চলে। দুধ ও কলায় বেশ আহার হয়।

কিছুটা চর্বিও দরকার। ঘী বা তেলে তা মেলে। আর ঘী পাওয়া গেলে তেলের দরকার করেনা। তেল হজম করা শক্ত, আর তা ছাড়া বিশুদ্ধ ঘী-এর মত তত পুষ্টিকর নয়। দৈনিক মাথা পিছু দেড় আউন্স ঘী শরীরের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট। মাঠা না-তোলা দুধ থেকে ঘী করা যায়। যাঁদের সে সঙ্গতি নেই, চর্বির চাহিদা মেটাবার জন্য তাঁদের যথেষ্ট তেল খাওয়া উচিত। তেলের মধ্যে আবার জলপাইয়ের তেল, বাদাম তেল, নারকেল তেলই ভালো। তবে অবশ্যই টাটকা তেল চাই। পাওয়া গেলে ঘানির তেল বেশী ভালো। বাজারে যে তেল, ঘী বিক্রি হয়, তা সাধারণতঃ খুব বাজে। এটা খুবই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। সে আইন করেই হোক বা শিক্ষা প্রচারের মধ্য দিয়েই হোক,—যতদিন না সততা ব্যবসায় নীতির অবিচ্ছেদ্য অংগ হচ্ছে, ততদিন ব্যক্তিগতভাবে আমাদের নিজেদেরই ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সংগে খাঁটি জিনিসটি খুঁজে জোগাড় করে নিতে হবে। ধরন বা গুণ না দেখে যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়।

বাজে তেল ও ভেজাল ঘী খাওয়ার চেয়ে বরং একেবারে ঘী ও তেল বাদ দিয়ে চালানোও অনেক ভালো। যেমন চর্বির ক্ষেত্রে, তেমনি কিছু পরিমাণ চিনি খাওয়াও দরকার। যদিও মিষ্টি ফল যথেষ্ট চিনির জোগান দিয়ে থাকে, তাহলেও দিনে এক থেকে দেড় আউন্স চিনি খাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। যিনি মিষ্টি ফল পান না, তাঁর পক্ষে চিনি খাওয়া দরকারই। তবে আজকাল মিষ্টি জিনিসের উপর অহেতুক যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তা ভুল। শহরের লোকরা খুব বেশী মিষ্টি জিনিস খেয়ে থাকে। দুধ থেকে তৈরি পুডিং, দুধের মিষ্টি এবং অন্যান্য ধরনের মিষ্টি জিনিস প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয়। সবই অকারণ এবং খুব সামান্য পরিমাণে না খেলে তা ক্ষতিরই হেতু হয়। কোন-রকম অতিশয়োক্তি করার অপবাদ হবার আশংকা না করেই বলা যায়, যে দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ সাধারণ খাওয়াও পেটভরে খেতে পায় না, সেখানে মিষ্টি ও অন্য উপাদেয় খাবার খাওয়া ডাকাতি করার সমান।

মিষ্টি সম্বন্ধে যে কথা, ঘী ও তেল সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ঘী বা তেলে

ভাজা খাবার খাওয়ার কোন দরকার নেই। পুরী ও লাড্ডু তৈরী করতে ঘী ব্যবহার বিনা চিন্তায় অপচয়। এরকম খাবার খেতে যাঁরা অভ্যস্ত নন, তাঁরা আদৌ এসব খেতে পারেন না। যেমন ধরুন, ইংরেজরা প্রথম এ দেশে এসে আমাদের মিষ্টি ও ভাজা খাবার খেতে পারেন না। আমি প্রায়ই দেখি, যাঁরা এসব খান, অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা। আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে স্বাদবোধ জন্মায় না, তা অর্জন করা হয়। ক্ষুধা পেলে খাদ্যে যে তৃপ্তি, বিশ্বের সব উপাদেয় জিনিসও সেই সমান পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। ক্ষুধার্ত মানুষ এক টুকরো শুকনো রুটিও গভীরতম তৃপ্তির সঙ্গে খাবে—আর, যে ক্ষুধার্ত নয় সে সর্বোৎকৃষ্ট মিষ্টান্নও দূরে ঠেলে দেবে।

এবার বিবেচনা করে দেখা যাক, কতবার ও কতটা একজনের খাওয় উচিত। শরীর রক্ষার জন্য কর্তব্য হিসাবে—এমন কি ওষুধের মতই—খাদ্য গ্রহণ, কখনোই রুচি তৃপ্তির জন্য নয়। কাজেই, সত্যকার ক্ষুধা পরিতৃপ্তিতেই আনন্দদায়ক অনুভূতি জাগে। কাজেই, আমরা একথা বলতে পারি যে ক্ষুধার ওপরই পরিতৃপ্তি নির্ভর করে, বাইরের কোন কিছু ওপর নয়। আমাদের ভুল অভ্যাস ও জীবনযাত্রার কৃত্রিম পদ্ধতির জন্যই খুব অল্প লোকই আমরা জানি আমাদের দেহের কী দরকার। আমাদের মাতাপিতা, যাঁরা আমাদের এ পৃথিবীতে এনেছেন,—নিয়ম হিসাবে আত্মসংযম পালন করেন না। তাঁদের অভ্যাস ও জীবন নির্বাহের পদ্ধতি, ধারা কিছুটা ছেলেমেয়েদেরও প্রভাবিত করে। গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্য শিশুকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। তাছাড়া ছেলেমেয়ের শৈশবে মা যত রকম সুস্বাদু খাবার খাইয়ে তাদের প্রশ্রয় দেয়। মা নিজে যা-ই খায় তারই একটা টুকরো শিশুকে দেয় এবং এইভাবেই শৈশব থেকে শিশুর পরিপাকযন্ত্র ভুল শিক্ষা পায়। একবার অভ্যাস গড়ে উঠলে তা ছাড়া কঠিন। খুব অল্প লোকই তা থেকে মুক্তি লাভে সফল হয়। কিন্তু মানুষ যদি বোঝে সে নিজেই নিজের দেহরক্ষী এবং তার দেহ সেবায় উৎসর্গীকৃত, সে ক্ষেত্রে সে নিজেই দেহ মজবুত রাখার বিধি নিয়ম শিখতে চাইবে ও সেগুলি অনুসরণ করার কঠোর আয়াস করবে।

আমার এখন আলোচনার এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছি যে এবার, এসব যাঁরা পড়বেন সেই সব নরনারী অধিকাংশের যা অভ্যাস অর্থাৎ বসে থাকা, তাঁদের এক একজনের কতটা কী খাওয়া দরকার, তার একটা তালিকা করে দিতে পারি:

গরুর দুধ	...	...	২ পাউণ্ড
তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য (গম, চাল, বজরা—সর্বসমেত)			৬ আউন্স
শাকসব্জী পাতা	...		৩ আউন্স
অন্য সব্জী	...	...	৫ আউন্স
কাঁচা সব্জী	...	...	১ আউন্স
ঘী	...	...	১½ আউন্স
বা মাখন	...	...	২ আউন্স
গুড় বা সাদা চিনি	...	...	১½ আউন্স

টাটকা ফল যে যাঁর রুচি ও সংগতি অনুযায়ী খাবেন। যাই হোক, দিনে দুটো করে টক পাতি লেবু খাওয়া ভালো। লেবুর রস নিংড়ে নিয়ে সব্জীর সঙ্গে বা ঠান্ডা কিংবা গরম জলে মিশিয়ে খেতে হবে। উপরে যে ওজন দেওয়া হয়েছে, সবই কাঁচা জিনিসের। লবণ কতটা খেতে হবে তা আমি ঠিক করে দিচ্ছি না। রুচি অনুযায়ী তা পরে যোগ করতে হবে।

এখন কথা হলো, দিনে ক'বার খেতে হবে। অনেক লোক দুবার খায়। সাধারণ নিয়ম হলো দিনে তিনবার খাওয়া: প্রত্যূষে কাজে বেরোবার আগে প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্ন-ভোজন এবং সন্ধ্যায় বা পরে নৈশ ভোজন। তিনবারের বেশী খাওয়ার কোন দরকার নেই। শহরে কিছু লোক মাঝে মাঝেই কিছু না কিছু চিবিয়ে যাচ্ছে। এই অভ্যাস ক্ষতিকর। পরিপাক যন্ত্রের বিশ্রাম দরকার।

৫

মশলা

এর আগের অধ্যায়ে আমি মশলার কথা বলিনি। লবণকেই যথার্থ মশলার রাজা বলে ধরা যায়। অনেকে লবণ ছাড়া খেতেই পারেনা। শরীরেরও কিছু লবণজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন; আর এই জাতীয় পদার্থের অন্যতম হচ্ছে সাধারণ লবণ। বিবিধ খাদ্যদ্রব্যে স্বাভাবিকভাবেই এই লবণ থাকে কিন্তু স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তো রান্না করা হয় না। যেমন ধরা যাক, ভাত আলু বা অন্যান্য সব্জি সিদ্ধ করা জলটা যদি ফেলেই দেওয়া হয় তাহলে এই খাদ্যদ্রব্যে লবণের পরিমাণ কমে যায়। সে ক্ষেত্রে কাঁচা লবণ মিশিয়ে খেয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করতে হয়। মানবদেহের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি লবণের মধ্যে সাধারণ লবণ অন্যতম। সেজন্য আগের অধ্যায়েই আমি বলেছি, কিছু পরিমাণে এর ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে।

তবে সাধারণতঃ সব রকম মশলা, যেমন কাঁচা অথবা শুকনো লঙ্কা, গোলমরিচ, হলুদ, ধনে, জোয়ান, সর্ষে, মেথি, হিং ইত্যাদি আমাদের শরীরের পক্ষে অপরিহার্য নয়। স্বাদ-গন্ধের জন্য এগুলোর ব্যবহার। ব্যক্তিগতভাবে পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয়েছে আমাদের সুস্থ থাকার জন্য এগুলির একটিরও দরকার হয় না। যাঁদের হজমশক্তি কম, প্রয়োজন হলে তাঁরা কিছুদিন এসব মশলা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই খেয়াল রাখা উচিত কেবলমাত্র রসনার পরিতৃপ্তির জন্য মশলার ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জন করা ভাল। সমস্ত মশলা এমনকি নুনও শাকসব্জি ও তন্ডুলজাতীয় খাদ্যের স্বাভাবিক গন্ধ নষ্ট করে। যাদের স্বাদজ্ঞান বিকৃত হয়নি মশলা লবণ যোগ না করেই তারা খাদ্যদ্রব্যের স্বাভাবিক স্বাদ গন্ধ উপভোগ করতে পারে। সেজন্যই বলছিলাম নিতান্ত প্রয়োজন হলে খাবার সময় লবণ যোগ করা উচিত। লঙ্কা খেলে মুখ জ্বালা করে, পাকস্থলীতে উত্তেজনা জাগে। যারা ঝাল খায় না প্রথমে তারা সহ্যও করতে পারে না। আমি বেশ কয়েকজনকে দেখেছি



অনশন করার পূর্বে শেষখাদ্য গ্রহণ
রাজকোট মার্চ ১৯৩৯

লঙ্কা খেয়ে মুখে ঘা হয়েছে। আমি একজনকে জানি যে খুব ঝাল খেতে ভালবাসতো এবং প্রচুর ঝাল খেয়ে তার অকালমৃত্যু হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোরা মশলা স্পর্শ করে না। খাদ্যে হলুদের রংও তাদের ভালো লাগে না। তেমনি ইংরেজরাও আমাদের মশলা চট করে ব্যবহার করে না।

৬

চা, কফি ও কোকো

চা, কফি, কোকো—এগুলির কোনওটাই শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। শোনা যায় চা-পানের প্রথম সূচনা হয় চীনদেশে। ওদেশে এর একটা বিশেষ ব্যবহার ছিল। সাধারণতঃ চীনের পানীয় জলের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করা যায় না; তাই নিরাপত্তার জন্য ব্যবহারের আগে জল ফুটিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক সেখানে। কয়েকজন বুদ্ধিমান চৈনিক চা নামে একরকম ঘাসের খোঁজ পেল যা সামান্য পরিমাণে ফুটন্ত জলে ফেলে দিলেই জলের রং সোনালী হয়ে যায়। তবে জলটা ভালো করে না ফুটলে রং ধরবেনা; অতএব জলটা যে যথাযথ ফোটানো হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ চা-এর পাতা ফেলে পরীক্ষা করা। একটা ছাঁকনিতে চা-এর পাতা রেখে তাতে গরম জল ঢেলে দিয়ে এই পরীক্ষা করা হতো। যদি জল ঠিক ফোটানো হয়ে থাকে রং-টা সোনালী হয়ে যাবে। আর এক ধরনের চা-এর পাতায় নাকি জলে সুন্দর গন্ধ হতো।

এই প্রণালীতে তৈরী চা নির্দোষ। কিন্তু সাধারণতঃ চা যে উপায়ে তৈরী ও পান করা হয়ে থাকে তাতে উপকার তো কিছুই হয় না বরং ক্ষতিই হয়। এর পাতায় যে ট্যানিন থাকে তা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। চামড়ার কারখানায় চামড়াকে শক্ত করতে ট্যানিন ব্যবহৃত হয়। চা খেলে পরে পাকস্থলী ও অন্ত্রের আঠাল আস্তরণে অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এতে হজমের গোলমাল হয়, এবং পরিণামে দেখা দেয় ডিসপেপসিয়া (অজীর্ণতা)। ট্যানিনযুক্ত বলে চা খাওয়ার জন্য ইউরোপে অনেক মহিলা নানারকম রোগ ভোগ করেন বলে শোনা যায়। চা-খোররা ঠিক সময়ে চা-এর পেয়ালাটি না পেলে অস্থির হয়ে ওঠে। আমার তো মনে হয় চায়ের যদি কোনও উপযোগিতা থাকে তা হলো এটা একটা গরম সুমিষ্ট পানীয়, যাতে একটু দুধ আছে। গরম জলে সামান্য দুধ, চিনি মিশিয়ে খেলে একই ফল হয়।

চা-এর সম্পর্কে যা যা বললাম কফির ক্ষেত্রেও অল্পাবিস্তর তাই প্রযোজ্য। কফি সম্পর্কে একটা প্রচলিত হিন্দুস্থানী প্রবাদ আছে, "কফি কাশির উপশম করে, পেটফাঁপা কমায়, কিন্তু দৈহিক ও যৌনক্ষমতা বিনষ্ট করে এবং রক্তের জলীয় অংশ বাড়িয়ে দেয়, দুটো ভালোর জায়গায় তিনটে মন্দ হয়।" এ প্রবাদ কতদূর সঙ্গত আমি জানি না।

কোকো সম্পর্কেও আমার এই একই মত। যাদের পরিপাক ক্রিয়া স্বাভাবিক তাদের চা, কফি এবং কোকোর সাহায্য লাগেনা। স্বাস্থ্যবান মানুষ সাধারণ খাদ্যে সবরকম তৃপ্তি পেতে পারেন। তিনটি পানীয়ই আমি যথেষ্ট পান করেছি। যখন ব্যবহার করতাম একটা না একটা উপসর্গ লেগেই থাকত। ছেড়ে দেবার পর আমার কোনও লোকসান তো হয়ইনি, বরং লাভ হয়েছে। চা ইত্যাদি খেয়ে যে তৃপ্তি পেতাম তরিতরকারির ঝোল থেকে সে তৃপ্তি পাই। চা-কফির বদলে গরম জল মধু ও পাতিলেবু মিশ্রিত পানীয় স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর।

৭

মাদকদ্রব্য

ভারতবর্ষে ব্যবহৃত মাদকদ্রব্যগুলি হলো—মদ, ভাং, গাঁজা তামাক ও আফিং। মদ বলতে বোঝায় দেশী মদ এবং আরক, এ ছাড়া আছে বিদেশ থেকে আমদানি করা প্রচুর সুরা। এ সমস্তই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা উচিত। সুরা মানুষের আত্মবিস্মৃতি ঘটায় এবং যদি এর প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হয় তাহলে মানুষের যথার্থ কিছু কাজ করবার ক্ষমতা থাকেনা। যারা সুরাসক্ত তারা নিজেদের এবং আত্মজনদের সর্বনাশ করে। তারা সমস্ত শোভনতা এবং সমীচীনতা বোধ হারায়।

একদল বলেন নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় সুরাপান করা ভালো। আমি এদের যুক্তির কোনও মূল্য দেখিনা। ক্ষণিকের জন্যও আমরা এঁদের মত যদি মেনে নিই তাহলেও এ সত্যের সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে যে অসংখ্য মানুষকে নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে রাখা যায় না। অতএব এই অগণিত জনসাধারণের জন্যও অন্ততঃ মাদকবর্জন করা আমাদের কর্তব্য।

পার্সীরা তাড়ির ব্যবহার বিশেষভাবে অনুমোদন করেন। তাঁরা বলেন তাড়ি মাদকদ্রব্য হলেও একরকম খাদ্য এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হজমে সাহায্য করে। যুক্তিটি আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এবিষয়ে অনেক পড়াশোনাও করেছি। কিন্তু তাড়ি গরীবদের দুঃখকষ্টকে কত শোচনীয় করে তোলে তা আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে মানুষের খাদ্যতালিকায় এর স্থান থাকা উচিত নয়।

তাড়ির যে সব উপকারিতা আছে বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে অন্যান্য খাদ্যাদিতেও সেগুলি সব বর্তমান। খেজুরের রস থেকে তাড়ি হয়। টাটকা খেজুর রসে নেশা হয় না। হিন্দুস্থানীতে একে বলে নীরা—নীরা পান করে অনেকের কোষ্ঠবদ্ধতা সেরে গিয়েছে বলে শোনা যায়। আমি নিজে নীরা খেয়ে দেখেছি, যদিও আমার ক্ষেত্রে তা রেচকের কাজ করেনি। আমার মনে হয়েছে এর খাদ্যগুণ আখের রসের মতই। কেউ যদি সকালে চা ইত্যাদির বদলে এক গ্লাস নীরা খায় তবে তার অন্য কোনও প্রাতরাশের দরকার হয় না। যেমন আখের রস—তেমনি

তালের রস জ্বাল দিয়েও তালগুড় তৈরী হয়। খেজুর গাছ তাল গাছের স্বজাতি। আমাদের দেশে আপনা থেকেই নানা জাতের পাম গাছ হয়। সবগুলি থেকেই পানযোগ্য রস নির্গত হয়। নীরা তাড়াতাড়ি গেঁজিয়ে ওঠে বলে সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গায় বসেই এ ব্যবহার করতে হয়। বস্তুতঃ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া এভাবে ব্যবহার সম্ভব হয় না বলে নীরাকে গুড় করে ফেলাই ভাল। আখের গুড়ের বদলে তালগুড় স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যায়। অনেকে আবার খেজুরের চেয়ে তালগুড়টাই বেশি পছন্দ করেন। খেজুরগুড়ের চেয়ে তালগুড়ের একটা সুবিধা যে এটার মিষ্টত্ব কম, কাজেই বেশী খাওয়া যায়। অখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ তালগুড় জনপ্রিয় করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এখনো আরও কিছু করণীয় আছে। তাড়ি করতে যে তালের রস ব্যবহার করা হয় তা দিয়ে যদি গুড় করা হয় ভারতে কখনও চিনির অভাব হবে না এবং গরীবরা সুলভে ভালো গুড় পাবে। তালগুড় থেকে মাতগুড় ও চিনি হয়। গুড়ে যে লবণ থাকে রিফাইন করলে তা বিনষ্ট হয়। যেমন গমের ময়দা এবং কলে ছাঁটা চালের বীজকোষ নষ্ট হওয়ায় তাদের খাদ্যগুণ কমে যায় তেমন রিফাইন করা গুড়ের পুষ্টিকর গুণ কমে যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে কোনও খাদ্য যতটা সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করলে তার খাদ্যমূল্য তত বেশি থাকবে।

তাড়ির কথা বলতে গিয়ে স্বভাবতঃই আমি নীরার কথা বলতে সুরু করেছিলাম এবং তারপর গুড়ের প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। আপাততঃ আবার সুরার কথাতেই ফিরে আসি।

সুরা যে কত ক্ষতিকারক সে সম্পর্কে আমার মত তিক্ত অভিজ্ঞতা বোধ হয় আর কোনও সমাজসেবীর হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা, যাঁরা অধিকাংশ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক তাঁরা পানাসক্ত। তখনকার আইন অনুসারে চিকিৎসকের ব্যবস্থা-পত্র ছাড়া কোনও ভারতীয় বাড়ীতে মদ নিয়ে যেতে পারত না। তারা শুঁড়িখানায় গিয়ে যথেচ্ছ মদ খেতে পারত। এমনকি এই কুঅভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছিল তারা। আমি তাদের অতি শোচনীয় অবস্থায় দেখেছি। শুঁড়িখানার সামনে সেসব দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁরা কখনও মদ্যপানকে সমর্থন করবেন না।

আফ্রিকান নিগ্রোদের আগে মদ খেতে দেওয়া হতো না। মদ তাদের সর্বনাশ করেছে বলা যায়। বহু নিগ্রো শ্রমিক মদে তাদের সমস্ত উপার্জন খুইয়ে বসেছে—তাদের জীবনে কোনও মহিমা নেই।

ইংরেজরাই বা কী? বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও আমি মদ খেয়ে নর্দমায় পড়ে থাকতে দেখেছি। এ উক্তি অতিরঞ্জিত নয়। যুদ্ধের সময় অনেক ইংরেজকে ট্রান্সভাল ছেড়ে যেতে হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ আমার বাড়ীতে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, সবদিক দিয়েই ভালো লোক, অবশ্য যখন মদের ঝোঁকে থাকতেন না। তিনি একজন ধর্মতত্ত্ববিদ। দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি সুরাসক্ত ছিলেন এবং মদ খেলে তাঁর নিজেকে সংযত রাখার ক্ষমতা থাকতনা। অভ্যাসটা ছেড়ে দেবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি যতদূর জানি সফল হননি।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে আসবার পরও মদ্যপান সম্পর্কে আমার একই

রকম মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বহু রাজন্যবর্গের মদ খেয়ে সর্বনাশ হয়েছে এবং হচ্ছেও। ধনবান যুবকদের অল্পবিস্তর একই অবস্থা। মদ খাওয়ার ফলে শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়। এইরকম তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে আমি যে মদ্যপানের কঠোর বিরোধী হবো, এতে পাঠকরা বিস্মিত হবেন না।

এককথায় সুরা মানুষকে দৈহিক, নৈতিক, বুদ্ধিগতভাবে এবং আর্থিক দিক দিয়ে ধ্বংস করে।

৮

আফিং

মদ সম্পর্কে যেসব অভিযোগ আফিং সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য—যদিও দুটির প্রতিক্রিয়া ভিন্ন রকমের। মদ খেলে লোকে হৈ চৈ করে আর আফিংখোর নিস্তেজ আর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এমনকি সে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে কিছু কাজকর্ম করার ক্ষমতা থাকে না। মদের কুফল প্রতিদিন চোখে পড়ে, কিন্তু আফিং-এর প্রতিক্রিয়া ততটা দৃষ্টিগোচর হয় না। আফিং যে কত ক্ষতিকারক তা দেখতে হলে আসাম অথবা উড়িষ্যায় যেতে হয়। ঐসব প্রদেশে হাজার হাজার লোক আফিংখোর। জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা কী তাদের দেখলে বোঝা যায়।

আফিং-এর কুফল সবচেয়ে বেশি নাকি চীনে দেখা যায়। ভারতীয়দের চেয়ে তাদের স্বাস্থ্য ভাল। কিন্তু আফিংখোর চীনাকে অত্যন্ত দুঃস্থ দেখায় এবং জীবিতের বদলে মৃত মনে হয়। আফিংখোর একমাত্র আফিংএর জন্য যে কোনও রকম হীনতা স্বীকার করে।

বহুকাল আগে চীন ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে এক যুদ্ধ হয়, তাকে 'আফিং যুদ্ধ' বলে। চীন ভারত থেকে আফিং কিনতে চায়নি কিন্তু ইংরেজরা চীনদের কিনতে বাধ্য করতে চেয়েছিল। এব্যাপারে ভারতও অপারাধী কারণ বহু ভারতীয় আফিং সরবরাহের ঠিকাদারী নিয়েছিলেন। এই ব্যবসায় বেশ লাভজনক এবং আবগারি শুল্ক হিসাবে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। স্পষ্টতঃ এটা নীতিবিগর্হিত ব্যবসা তবু এর সমৃদ্ধি হতে থাকে। শেষপর্যন্ত ইংলণ্ডে প্রবল আলোড়নের ফলে তা বন্ধ করতে হয়। যা মানুষের সর্বনাশ করে এক মুহূর্তের জন্যেও তা সহ্য করা উচিত নয়।

মাদকদ্রব্য হিসাবে আফিং সম্পর্কে আমার বক্তব্য বলা সত্ত্বেও চিকিৎসাশাস্ত্রে আফিং-এর স্থান যে অদ্বিতীয় একথা আমাকে মানতেই হবে। আফিং ছাড়া ওষুধ তৈরী করা অসম্ভব। কিন্তু সে কারণে মাদকদ্রব্য হিসাবে এর ব্যবহার অযৌক্তিক। আফিং যে বিষ সকলেই জানে এবং মাদক হিসাবে এর ব্যবহার অবশ্যই নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

৯

তামাক

তামাক মানব সমাজে বিপর্যয় ঘটিয়েছে। একবার অভ্যাস করলে আর তা ছাড়া যায় না। কোনও না কোনও রূপে এর ব্যবহার সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত। টলষ্টয় মাদকদ্রব্যগুলির মধ্যে তামাককে সবচেয়ে খারাপ বলেছিলেন। ঐ মনীষীর এই অভিমতকে আমাদের মর্যাদা দেওয়া উচিত। প্রথম বয়সে তিনি তামাক ও সুরা যথেচ্ছ ব্যবহার করায় উভয়ই কত ক্ষতিকারক তাঁর জানা ছিল। তা সত্বেও আমি স্বীকার করি মদ এবং আফিং-এর কুফল সম্পর্কে আমার বলবার যে অধিকার এবং অভিজ্ঞতা আছে তামাক সম্পর্কে তা নেই। তবে একথা অবশ্যই বলব তামাক খেয়ে কোনও একটা উপকার হয়েছে এমন কখনও শুনিনি। তামাক ব্যয়বহুল নেশা। আমি একজন ইংরেজকে জানি যাঁর তামাকের জন্য মাসে পাঁচ পাউন্ড অর্থাৎ পঁচাত্তর টাকা খরচ হতো। তাঁর মাসিক আয় ছিল পঁচিশ পাউন্ড অর্থাৎ উপার্জনের এক পঞ্চমাংশ তিনি ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিতেন।

ধূমপানকারীরা অপরের মনোভাবকে উপেক্ষা অগ্রাহ্য করেন। যাঁরা ধূমপায়ী নন তাঁরা এর গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু ট্রেনে কিংবা ট্রামে পার্শ্ববর্তীদের কথা না ভেবে ধূমপায়ীরা ধূমপান করে যান। ধূমপান করলে মুখে থুতু আসে এবং অধিকাংশ ধূমপায়ী যেখানে সেখানে তা ফেলেন।

ধূমপায়ীদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। তামাক সূক্ষ্ম অনুভূতিকে বিনষ্ট করে, এই কারণেই বোধহয় মানুষ ধূমপান করে। তামাক যে মাদক এতে কোনও সন্দেহ নেই। এর নেশায় মানুষ তার দুঃখ দুর্ভাগ্য ভুলে থাকে। টলষ্টয়ের সৃষ্ট একটি চরিত্রকে এক ভয়ানক কাজ করতে হয়েছিল। টলষ্টয় তাকে প্রথমে মদ খাওয়াতে শুরু করেন, কারণ তাকে একজনকে খুন করতে হবে। মদের ঝোঁকে সে তা করতে ইতঃস্তত করছিল। কিছু ভাবতে না পেরে সে একটা চুরুট ধরাল এবং ধূমপান করতে লাগল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হলো 'আমি কি কাপুরুষ? হত্যা কাজটি করা যখন আমার কর্তব্য তখন আমি ইতঃস্তত করব কেন? ওঠ, এগিয়ে যাও এবং নিজের কাজ কর।' এইভাবে তার দ্বিধাগ্রস্ত মন শেষ পর্যন্ত হত্যা করবে ঠিক করলো। জানি এ যুক্তি খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। ধূমপায়ী হলেই লোক খারাপ হয় না। লক্ষ লক্ষ ধূমপায়ী সহজ সাধারণ জীবন যাপন করে থাকে। সে যাই হোক যাঁরা চিন্তাশীল তাঁরা পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি সম্পর্কে চিন্তা করবেন। সম্ভবতঃ টলষ্টয় বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ধূমপায়ীরা ছোটখাট অপরাধ করে থাকে, যা সাধারণতঃ আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

আমাদের দেশে নানাভাবে তামাকের ব্যবহার প্রচলিত। কেউ ধূমপান করে, কেউ নস্য নেয়, কেউ তামাক পাতা চিবিয়ে খায়। কারও বিশ্বাস নস্যর কিছু উপকারিতা আছে এবং বৈদ্য কি হাকিমের নির্দেশে তারা তা ব্যবহার করে। আমার

মনে হয় এর কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই। স্বাস্থ্যবান মানুষের এসব দরকার হয় না।

তামাকের তিন রকম ব্যবহারের মধ্যে চিবিয়ে খাওয়া (খৈনি 'খাওয়াও বলে) সবচেয়ে অপরিছন্ন। আমার বরাবরই ধারণা, এর উপযোগিতা আছে এমন ভাবা অলীক কল্পনা। আমার মত পরিবর্তনের কোনও কারণ দেখি না। গুজরাটিতে একটা প্রচলিত কথা আছে যে, তিনটেই সমান খারাপ—ধূমপায়ী ধোঁয়ায় ঘর ভরে, দোক্তা যে খায় সে ঘরের এখান ওখান ময়লা করে, আর যে নস্য নেয় সে জামাকাপড় ময়লা করে।

যারা খৈনি বা দোক্তা খায় তাদের যদি বোধ থাকে তাহলে হাতের কাছে পিকদানি রাখবে। কিন্তু অধিকাংশই নির্লজ্জের মত ঘরের কোণায়, মেঝেতে কিংবা দেওয়ালের গায়ে পিক ফেলে। ধূমপায়ী ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়ে ফেলে, ঘরে আগুন লাগবার ঝুঁকিও নেয়। আর যে নস্য নেয় সে জামাকাপড় নোংরা করে হয়ত কেউ কাপড় বাঁচাতে রুমাল ব্যবহার করে কিন্তু তারা ব্যতিক্রম মাত্র। যাঁরা স্বাস্থ্যপ্রেমী (অথবা স্বাস্থ্য সন্ধানীরা), তাঁদের যদি কারও এরকম বদাভ্যাস থাকে মনে জোর এনে তা ছেড়ে দেওয়া উচিত। অনেকেরই একটি, দুটি কিংবা তিনটি অভ্যাসই আছে। তাদের কাছে এগুলো ঘৃণ্য নয়। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে আমরা দেখব ধোঁয়া উড়িয়ে দিয়ে অথবা সারাদিন প্রায় মুখ পানজর্দায় ভর্তি করে রেখে কিংবা যখন তখন নস্য নিয়ে ভালো কিছু হয় না। তিনটেই নোংরা অভ্যাস।

১০

ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্যের আক্ষরিক অর্থ হলো ঈশ্বরোপলব্ধির উপায়। আত্মসংযম ছাড়া এ উপলব্ধি হয় না। আত্মসংযম বলতে বোঝায় সকল ইন্দ্রিয় সংযত রাখা। কিন্তু ব্রহ্মচর্য বলতে সাধারণতঃ বোঝায় যৌনঅঙ্গগুলির সংযম এবং যৌনকামনা ও যৌনাঙ্গা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বীর্যপাত প্রতিরোধ। যে সব দিক দিয়ে আত্মসংযম করে তার পক্ষেই এটা স্বাভাবিক। ব্রহ্মচর্য পালন স্বভাবগত হয়ে গেলে তা বেশি কল্যাণদায়ক হবে। এ'দের ক্রোধ এবং সমজাতীয় রিপু থেকে মুক্ত হতে হবে। তথাকথিত যে সব ব্রহ্মচারীর সংস্পর্শে সাধারণতঃ আমরা আসি তাদের ব্যবহার দেখে মনে হয় কোপ ফলনোই তাদের একমাত্র কাজ।

দেখা যায়, এ'রা ব্রহ্মচর্যের সাধারণ নিয়ম নীতি না মেনে কেবল বীর্যস্খলন প্রতিরোধের চেষ্টা এবং আশা করেন। তাঁরা উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হন। কেউ প্রায় উন্মাদ হয়ে যান; কাউকে রুগ্ন দেখায়। বীর্যপাত বন্ধ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু যদি কেবল যৌনসঙ্গম থেকে নিজেদের নিবৃত্ত রাখতে পারেন তাহলেই মনে করেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেবল যৌনসঙ্গ না করাকেই ব্রহ্মচর্য

আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যতদিন যৌনকামনা থাকবে ততদিন ব্রহ্মচর্য লাভ হয়েছে বলা যায় না। যে আসঙ্গলিপ্সার মূলোচ্ছেদ করতে পেরেছে সে-ই যথার্থ জিতেন্দ্রিয়।

ব্রহ্মচর্যের সরাসরি পরিণতি বীর্যস্খলন বন্ধ। কিন্তু এই-ই সব নয়। পুরোপুরি ব্রহ্মচারী যে তার মধ্যে বেশ কিছু লক্ষণীয়ও রয়েছে। তার কথাবার্তা, তার চিন্তা, তার কাজের ধারা, সব কিছুই, সে যে জীবন্ত শক্তির অধিকারী, তা প্রকাশ করছে।

এ রকম ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোকের কাছ থেকে পালায় না। স্ত্রীলোকের সঙ্গের জন্য সে লালায়িত না হতে পারে, কিন্তু যখন প্রয়োজনীয় সেবা করার ডাক আসে, সে তা এড়িয়েও যায় না। তার কাছে পুরুষ, স্ত্রীলোকের পার্থক্য প্রায় লোপ পায়। তা বলে কারো আমার কথাগুলি বিকৃত করে লাম্পট্যাচারের সমর্থনে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা হলো এই—যে মানুষের যৌনকামনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, সে আর পুরুষ স্ত্রীর মধ্যে ভেদ করে না। এ রকমই হওয়া উচিত। সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণাই বদলে যায়। তখন আর বাহ্যরূপের প্রতি তাঁর নজর থাকে না। পুরুষ বা স্ত্রী, যাঁর চরিত্র সুন্দর, তিনিই তাঁর (প্রকৃত ব্রহ্মচারীর) চোখে সুন্দর বলে প্রতিভাত হন। কাজেই সুন্দরী বলে খ্যাত নারীর দর্শনে তার মনে কোন উত্তেজনা জাগে না। এমন কি তাঁর যৌনাঙ্গেও সাড়া পড়ে না। অন্য ভাষায় বলা যায়, এ রকম লোক এমনভাবে তাঁর যৌন কামনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে তাঁর যৌনাঙ্গ ঋজু হয়ে ওঠে না। যৌন গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনীয় নিঃসরণের অভাবে তিনি পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েন না। তাঁর ক্ষেত্রে এই নিঃস্রবণ তাঁর সারা সত্তা ব্যেপে এক মৌলিক জীবন্ত শক্তিতে পূত হয়ে প্রকাশ পায়। বলা হয়ে থাকে, পুরুষত্বহীন মানুষও যৌন কামনা থেকে মুক্ত নয়। এই গোষ্ঠীতে পড়েন, আমার এমন কয়েকজন পত্রলেখক আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা চান যে তাঁদের যৌনাঙ্গ ঋজু হোক, কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন; অথচ তাঁদের বীর্যপাতও ঘটে। এসব লোক প্রয়োজনীয় নিঃস্রবণের অভাবে হয় পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছেন বা হতে চলেছেন। এ এক শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু যে মানুষ প্রয়াস করে পুরুষত্ব-হীনতা আয়ত্ত করছে, যাঁর যৌনবাসনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, যাঁর নিঃস্রবণ জীবন্ত শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তাঁর ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রত্যেকেরই তা আকাঙ্খিত হওয়া উচিত। অবশ্য এও সত্য যে এ রকমের ব্রহ্মচারী বিরল।

১৯০৬ সালে আমি ব্রহ্মচর্যের শপথ নিই। অন্যভাবে বলতে গেলে, পুরো ব্রহ্মচারী হওয়ার জন্য আমার প্রয়াস ৩৬ বছর আগে সুরু হয়েছে। ব্রহ্মচারী সমন্ধে আমার যে সংজ্ঞা, সেইমত পূর্ণ ব্রহ্মচর্য আমি অর্জন করেছি, তা বলতে পারি না; তবে আমার মতে সেদিকে উল্লেখযোগ্য ভাবে এগিযে গিয়েছি। ভগবান যদি ইচ্ছা করেন, এই জীবনেই, এমন কি পূর্ণতাও লাভ করতে পারি। সে যাই হোক, আমার চেষ্টার দিক থেকে কোন শিথিলতা নেই, এ প্রয়াসের মধ্যে কোন নৈরাশ্য জাগে নি। এ প্রয়াসের জন্য ছত্রিশটা বছরকে আমি খুব দীর্ঘ সময় বলে মনে করি না। পুরস্কার যত দামী হবে, পুরস্কার অর্জনের জন্য প্রয়াস, প্রযত্নও তত বেশী হবে।

ইতোমধ্যে, ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার ধারণা আরো দৃঢ় হয়েছে। আমার কতকগুলি পরীক্ষা এখনো এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় নি যে সুবিধাজনকভাবে জনসাধারণ্যে তা পেশ করা চলে। আমার মনোমত, যদি সেগুলি সফল হয় কোন একদিন তা প্রকাশ করতে পারব বলে আশা রাখি। সেই সাফল্য ব্রহ্মচর্য অর্জন অপেক্ষাকৃত সহজ করে তুলতে পারে।

কিন্তু এই অধ্যায়ে যে ব্রহ্মচর্যের উপর আমি জোর দিতে চাচ্ছি, তা যৌন নিঃস্রবণ রোধ করে সংরক্ষণের মধ্যেই সীমিত। সীমাবদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালন করে পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের গৌরবজনক সুফল পাওয়া যায় না। কিন্তু সীমিত ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ না করে কেউই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য আয়ত্ত করতে পারে না।

ব্রহ্মচর্য ছাড়া—যে ব্রহ্মচর্য বীর্য সংরক্ষণ করে—ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখা প্রায় সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই গণ্য করা উচিত। যে বীর্যের অন্য মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে, সেই বীর্যের অপচয় সমর্থন করা, উৎসাহ দেওয়া, খুব কম করে বললেও, পরিপূর্ণ অজ্ঞতারই পরিচায়ক। শুক্র কেবল প্রজননের জন্যই উদ্দিষ্ট, ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগের জন্য নয়, এই তথ্য দৃঢ়ভাবে অনুধাবন করলে জৈবিক কাম-বাসনার বশবর্তী হওয়ার কোন অবকাশ থাকে না। এই জৈবনিক তরল পদার্থ কখনোই অপচয়িত হবার জন্য নয়—এই জ্ঞান আহরণ, যৌন সঙ্গমের জন্য উন্মত্ত হওয়া থেকে নরনারীদের নিবৃত্ত করবে। বিবাহের তখন ভিন্ন তাৎপর্য উপলব্ধ হবে; এবং এখন যে দৃষ্টিতে বিবাহকে দেখা হয়, তা হতাশব্যঞ্জক বলে গণ্য হবে। দম্পতীর হৃদয়ের মিলনই বিবাহের দ্বারা সূচিত হওয়া উচিত। বিবাহিত দম্পতীও ব্রহ্মচারী রূপে গণ্য হবার যোগ্য হতে পারে, যদি তাঁরা সন্তানের জন্মদানের জন্য ছাড়া কখনো যৌন সঙ্গমের বিষয় চিন্তা না করেন। উভয় পক্ষের ইচ্ছা না থাকলে এরকম সঙ্গম সম্ভব হয় না। সন্তান কামনা ছাড়া কেবল যৌনলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য কখনোই সঙ্গমে প্রবৃত্ত হবেন না তাঁরা। কর্তব্য হিসাবে সঙ্গম করার পর তার পুনরাবৃত্তি করার ইচ্ছাও জাগবে না।

আমি যা বলছি, তা বই পড়া জ্ঞান হিসাবে যেন নেওয়া না হয়। পাঠক জেনে রাখুন, দীর্ঘ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পর আমি এসব লিখছি। তবে আমি জানি, সাধারণ প্রথা যা তার বিপরীত কথাই বলছি। কিন্তু এও তো সত্য যে, উন্নতি করতে হলে আমাদের প্রায়ই সাধারণ অভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে যেতে হয়। সাধারণ অভিজ্ঞতা বা সাধারণ্যে যে সব বিশ্বাস প্রচলিত, সে সব চ্যালেঞ্জ করার পরিণামেই না বড় বড় আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। নিছক দেশলাই কাঠি উদ্ভাবনও সাধারণ অভিজ্ঞতার প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল; বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কার তো আগের সব ধারণা পাল্টে দিয়েছিল।

পার্থিব ব্যাপারে যা সত্য, আত্মিক ক্ষেত্রেও তা সমান সত্য। আদিম যুগে বিবাহ বলে কিছু ছিল না। প্রাণীদের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মানুষের জগতেও পুরুষ স্ত্রীরা যে যার সঙ্গে মিলিত হতো। আত্মসংযম অবিদিত ছিল। কিছু উন্নত মনের মানুষ প্রচলিত প্রথার বেড়া ডিঙ্গিয়ে গিয়ে আত্মসংযমের নিয়মবিধি

উদ্ভাবন করলেন। আত্মসংযমের নিয়মবিধির মধ্যে যে লুক্কায়িত সম্ভাবনা রয়েছে, তা অনুসন্ধান করা আমাদের কর্তব্য। কাজেই, আমি যখন বলি যে, বিবাহ-সম্পর্ককে আমার প্রদর্শিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া স্ত্রী মাত্রেরই কর্তব্য, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক নয়। মানুষের জীবন, যেমন হওয়া উচিত তেমনি ভাবে যদি সুগঠিত হয়, তাহলে এই জীবনদায়ী তরল পদার্থ সংরক্ষণ প্রত্যেকের পক্ষেই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

যৌন গ্রন্থী থেকে সব সময়ই শুক্র নিঃসৃত হচ্ছে। প্রত্যেকের মানসিক, দৈহিক ও আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এই নিঃসরণের সদ্ব্যবহার করা উচিত। যিনি এই সদ্ব্যবহার করা শিখবেন, তিনিই দেখবেন যে তাঁর দেহকে মজবুত রাখার জন্য তাঁর খুব কম খাদ্যের দরকার হচ্ছে। অথচ যে কোন রকম কায়িক শ্রম করতেই সক্ষম তিনি। মানসিক উদ্যম তাঁকে সহজে ক্লান্ত করে তুলবে না; বা বার্ধক্যের সাধারণ লক্ষণগুলি তাঁর মধ্যে প্রকাশ পাবে না। যেমন পাকা ফল বা পুরোনো পাতা স্বাভাবিক ভাবে ঝরে পড়ে, তেমনি এই ব্রহ্মচারীও, যখন তাঁর সময় হয়, অটুট কর্মক্ষমতা নিয়েই প্রয়াণ করে। কালক্রমে যদিও তাঁর দেহে স্বাভাবিক-ভাবেই ঝড়্তি পড়্তির লক্ষণ জাগে, কিন্তু তাঁর বুদ্ধি, মেধার কোন ক্ষয়ের চিহ্ন তো থাকেই না, পরন্তু তা ক্রমশঃ আরো বেশী স্বচ্ছ হয়। এ সব যদি ঠিক হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্যরক্ষার আসল চাবি কাঠিটি রয়েছে জীবনদায়ী শক্তি সংরক্ষণেরই মধ্যে।

আমি যা জানি, ঐ জীবনদায়ী শক্তি সংরক্ষণের জন্য সেই কয়েকটি নিয়ম-বিধির এখানে তালিকা করে দিচ্ছি—

(১) প্রত্যেকেরই চিন্তায় যৌনকামনার মূল নিহিত। কাজেই, চিন্তা পুরো-পুরি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এই লক্ষ্য সাধনের পথ হলো—কখনো আপনার মনকে অলস রাখবেন না। ভালো ও দরকারী সব ধারণা-চিন্তায় মন ভরে রাখুন। অন্য ভাষায় বলা যায়, আপনার সামনে যা করণীয় আছে, সে সমন্ধে ভাবতে থাকুন। ঐ করণীয় সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা বোধের দরকার নেই; আপনি বরং ভেবে দেখুন কেমন ভাবে আপনার ক্ষেত্রে আপনি বিশেষজ্ঞ বা দক্ষ হতে পারেন, আর তারপর আপনার চিন্তাধারাকে কাজে রূপ দিন। চিন্তার অপচয় হতে দেওয়া উচিত নয়। অলস চিন্তা যখন আপনার মনকে আচ্ছন্ন করতে থাকবে, তপ (ভগবানের নাম করা) তখন আপনার বড় আশ্রয়। নিরাবয়ব ভগবানকে আপনি যদি না জানেন, আপনি তাঁকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, সেই রূপেই তাঁকে ধ্যান করুন। তপ চলার সময় অন্য কোন চিন্তা মনে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। এই হচ্ছে আদর্শ অবস্থা। কিন্তু এমন যদি হয়, কেউ ঐ অবস্থায় পৌঁছোতে পারছেন না এবং যত রকমের অ-প্রার্থিত চিন্তা মনে আলোড়ন তুলছে, তাহলেও কিন্তু কারো হতাশ হওয়া উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ হবেই, এই আস্থা নিয়ে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে নাম-জপ করে যেতে হবে।

(২) আমাদের চিন্তা সম্বন্ধে যে কথা, সেই একই কথা আমাদের পড়াশোনা ও কথাবার্তা সম্বন্ধেও। তা সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। উত্তেজক পুস্তক

পাঠ এড়িয়ে যেতে হবে। অলস, অশোভন কথাবার্তা অশালীন কাজের প্রশ্রয় দেয়। এ তো স্পষ্টই, যে তার জৈবিক কামনা, ক্ষুধাকে পুষ্ট করতে না চায়, স্বভাবতঃই সে তেমন আচরণ এড়িয়ে চলবে, যা তাদের প্রলোভিত করে।

(৩) মনকে যেমন, দেহকেও তেমনি ভালো, সুস্থ ও সৎকর্মে ব্যাপৃত রাখতে হবে। যাতে দিনের শ্রম-ক্লান্তি জীবনদায়ী নিঃস্বপ্ন নিদ্রায় নিঃশেষিত হয়। যতদূর সম্ভব খোলা জায়গায় কাজকর্ম করা উচিত। যারা কোন কার্যকারণে কায়িক শ্রম করতে পারে না, তাদের নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করা অবশ্য কর্ম হওয়া উচিত। আমার মত হলো, খোলা জায়গায় মনে স্ফূর্তি নিয়ে ভ্রমণ সবচেয়ে ভালো ব্যায়াম। হাঁটবার সময় মুখ বন্ধ রাখতে হবে এবং নাক দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে হবে। বসার সময়ই হোক বা হাঁটার সময়ও দেহ খাড়া রাখতে হবে। অন্য কোনভাবে বসা বা দাঁড়ানো আলস্যের চিহ্ন এবং আলস্য আত্ম-সংযমের শত্রু। যোগ ব্যায়াম বা আসন করাও ফলপ্রদ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ পর্যন্ত বলতে পারি, যে তার হাত-পা চোখ-কান কাজে ব্যাপৃত রাখে, তার জৈবিক ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

(৪) সংস্কৃতে একটা কথা আছে, মানুষ যেমন ও যা খায়, তা-ই হয়। পেটুক লোক খাওয়ায় কোন বাছবিচার রাখে না, সংযম মানে না, সে তার জৈবিক কামনা বাসনার দাস হয়ে পড়ে। যে তার খাদ্য রুচি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে কখনোই তার অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করতে পারবে না। এ যদি সত্য হয়, তা হলে এটাও স্পষ্ট হয়ে পড়ছে যে প্রত্যেকেরই দেহের জন্য যা প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, তার বেশী নয়। খাদ্যও স্বাস্থ্যপ্রদ ও সুসম হওয়া চাই। দেহের অর্থ কখনোই এমন নয় যে এটি একটা ডাস্টবিন ও মানুষ তার জিহ্বার স্বাদ মেটাতে যত রকম সম্ভব খাদ্য দিয়ে তা বোঝাই করবে। খাদ্যের প্রয়োজন দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ভগবান মানুষকে দেহ দিয়েছেন আত্মোপলব্ধির মাধ্যম হিসাবে। আত্মোপলব্ধির অর্থ ঈশ্বরোপলব্ধি। যে মানুষের এই উপলব্ধি ঘটেছে, সেই পুরুষ বা স্ত্রী কখোনই জৈবিক কামনার দাস হবে না।

(৫) পুরুষের প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মা, বোন বা কন্যা রূপে দেখা উচিত। কেউ কখনো নিজের মা, বোন বা কন্যা সম্বন্ধে কুচিন্তা করে না। তেমনি, প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরও উচিত পুরুষ মাত্রকেই বাবা, ভাই বা পুত্র বা সন্তান হিসাবে দেখা।

আমার অন্য সব লেখায় এর চেয়েও বেশী ইঙ্গিত দিয়েছি আমি, কিন্তু সেই সবই ওপরে ওই পাঁচটি সূত্রের মধ্যে বিধৃত রয়েছে। যে কেউই ঐগুলি পালন করলে দেখবে সব কামনা বাসনার যা সেরা, তা অতিক্রম করাও সহজ। ব্রহ্মচর্যের জন্য যার সত্যকার বাসনা জেগেছে, সে পুরুষ বা স্ত্রী যে-ই হোক,—এই সব নিয়ম-বিধি পালন তার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে বলে কিংবা দশ লক্ষে এক জনের মাত্র নাগালের মধ্যে তা, এই ধারণায় সে প্রয়াসে বিরত হবে না। প্রয়াস করাটাই আনন্দ! অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার যে আনন্দ, তার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না; ক্রীতদাসরা সু-স্বাস্থ্য অর্জন করতে পারে না। জৈবিক কামনার দাস হওয়া নিকৃষ্ট দাসত্ব।

জন্মনিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কৃত্রিম পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম প্রতিরোধ প্রথা নতুন বিষয় নয়। অতীতেও এ ধরনের পদ্ধতি গোপনে অনুসৃত হতো এবং সেগুলি ছিল স্থূল ধাঁচের। আধুনিক সমাজ সেই ব্যবস্থাগুলিকে সম্মানজনক স্থান দিয়েছে এবং সে সবের অনেক উন্নতিও ঘটিয়েছে। তাদের লোকহিতৈষণার মুখোশ পরানো হয়েছে। জন্মনিরোধক ব্যবস্থার সমর্থকরা বলে থাকেন, যৌন কামনা একটা স্বাভাবিক আবেগ; আবার কেউ কেউ একে আশীর্বাদ বলেন। কাজেই তাঁদের বক্তব্য হলো, এই কামনা দমন করা সম্ভব হলেও বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁদের মতে, আত্মসংযমের সাহায্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রশংসা করা কঠিন। আত্মসংযমের কোন বিকল্প পদ্ধতি যদি না নির্দেশ করা হয়, অসংখ্য নারীর স্বাস্থ্য উপর্যুপরি গর্ভধারণের জন্য ভেঙ্গে যেতে বাধ্য। তাঁরা আরো বলেন যে জন্ম যদি নিয়ন্ত্রিত না করা হয়, অতি জনস্ফীতি দেখা দেবে; পারিবারিক দৈন্য দারিদ্র্য বাড়বে, তাদের ছেলেমেয়েরা উপযুক্ত খাবার পাবে না, পোশাক পাবে না, শিক্ষা পাবে না। সেজন্য, তাঁরা যুক্তি দেন যে জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে কার্যকর, অথচ অনিষ্টকর নয়, এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা বৈজ্ঞানিকদের কর্তব্য। এই যুক্তি আমার মধ্যে প্রত্যয় জাগাতে পারে নি। গর্ভনিরোধক বস্তু ব্যবহারে হয় তো এমন সব অনিষ্টকর লক্ষণ দেখা দেবে, যে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারনাই নেই। কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিপদ হলো যে গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ায় আত্মসংযমের ইচ্ছাই তিরোহিত হচ্ছে। আমার মতে, কোন সম্ভাব্য আশু লাভের জন্য এ খুব বেশী মূল্য দেওয়ার সামিল। কিন্তু আমার বক্তব্য নিয়ে যুক্তি বিস্তারের জায়গা এটা নয়। যাঁরা এ বিষয়ে আরো কিছু জানতে চান, তাঁরা যেন 'আত্মসংযম বনাম আত্ম-চরিতার্থতা' (শেলফ রেসট্রেনট ভি শেলভ ইনডালজেন্স) পুস্তকটি সংগ্রহ করে পড়েন। তাতে আমি যা বলেছি, তা অনুধাবন করে যেন তাঁরা তাঁদের মস্তিষ্ক ও অন্তরের নির্দেশ অনুসারে চলেন। ঐ পুস্তিকাটি পাঠে যাঁদের ইচ্ছা নেই কিংবা সময়ের অভাব, তাঁরা যদি আমার উপদেশ অনুসরণ করতে চান, তাঁদের বলবো, বিষবৎ গর্ভনিরোধক দ্রব্য পরিহার করে চলুন। তাঁদের উচিত সাধ্যমত আত্মসংযম পালন করা। তাঁদের এমন সব কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করা উচিত, যাতে তাঁদের দেহ ও মন পূর্ণ ব্যাপৃত থাকতে পারে এবং তাদের উৎসাহ, শক্তি উপযুক্ত আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। মানুষ যখন কায়িক শ্রমের ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তার জন্য কিছু সুস্থ আমোদ আহ্লাদ দরকার হয়। মনে যাতে কু-চিন্তা ঢুকতে না পারে সেজন্য একটা মুহূর্তের আলস্যও বাঞ্ছনীয় নয়। এইভাবেই সত্যকারের দাম্পত্য প্রেম গড়ে ওঠে ও স্বাস্থ্যদায়ী পথে পরিচালিত হয়। দম্পতীর দু শরিকই এর ফলে ক্রমশঃ আত্মিক উন্নতি লাভ করে। তাঁরা সত্যকার ত্যাগের আনন্দ একবার বুঝলে আর জৈবিক উপভোগের দিকে ফিরে তাকাবেন না। আত্ম-প্রবঞ্চনা সবচেয়ে বড় বাধা। সররকম জৈবিক কামনা বাসনার মূলাধার যে মন, সেই মনকে নিয়ন্ত্রিত না করে পুরুষ ও স্ত্রীরা দৈহিক সংযোগ এড়াবার ব্যর্থ চেষ্টাই করে থাকে। চিন্তা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প জাগলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবীভাবেই আসবে। পুরুষকে অবশ্যই বুঝতে হবে স্ত্রী হচ্ছে জীবনে সঙ্গী, সহায়িকা, সাথী—কামেচ্ছা

পরিতৃপ্ত করার মাধ্যম নয়।

এ মর্মে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক যে জৈব কামনা চরিতার্থ করার চেয়ে সন্তানের জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্য একেবারে আলাদা।

স্বাস্থ্য নির্দেশিকা

দ্বিতীয় ভাগ

প্রাকৃতিক চিকিৎসা

১
মাটি

পাঠকবর্গকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পর্কে অবহিত করতে এবং আমি নিজে কীভাবে এই পদ্ধতির সদ্ব্যবহার করেছি তা বলবার জন্য আলোচ্য অধ্যায়ের অবতারণা। আগেকার অধ্যায়ে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

পাঠককে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই মানুষের দেহের পাঁচটি উপাদান হচ্ছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে এগুলিকে কেমনভাবে কাজে লাগানো যায় সেই আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য।

১৯০১ সাল পর্যন্ত, অসুস্থ হলেই চিকিৎসকের কাছে না গেলেও আমি কিছু কিছু ওষুধপত্র ব্যবহার করেছি। কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য ফ্রুট সল্ট খেয়েছি। স্বর্গত ডাঃ প্রাণজীবন মেহতা যখন নাটালে এসেছিলেন সাধারণ অবসন্নতা দূর করবার জন্য আমাকে কয়েকটি ওষুধের কথা বলেছিলেন। তারপর থেকেই আমি ওষুধপত্রের ব্যবহার সম্পর্কে পড়াশোনা সুরু করি। এ ছাড়া নাটালের একটি ছোট্ট হাসপাতালে সামান্য কাজকর্ম করতে গিয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ফলে আমি শরীরটাকে আরও কিছুদিন চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত ওষুধে কোনও সুফল হচ্ছিল না। মাথাধরা এবং অবসন্নতা লেগেই থাকত। এ অবস্থা আমার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হতো এবং ওষুধের উপর যেটুকু বিশ্বাস ছিল তাও যেতে বসল।

এই মধ্যবর্তী সময়ে পথ্যাদি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে থাকল। প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে আমার গভীর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে বাস্তবজ্ঞান দিয়ে সাহায্য করবার মত কাউকে পাইনি। প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিষয়ক যৎসামান্য পুস্তকাদি যা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তার সাহায্যে আমি খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করলাম। আমার অনেকখানি হাঁটার অভ্যাসও আমাকে শক্ত রেখেছিল এবং এই অভ্যাসের জন্যই আমাকে শয্যাশায়ী হতে হয়নি। এইভাবে আমি যা হয় করে চালাচ্ছিলাম, তখন মিঃ পোলক যাষ্ট-এর 'প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন' (রিটার্ন টু নেচার) বইটি দেন। যাষ্ট-এর খাদ্যাদি নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ ছাড়া মিঃ পোলক নিজে আর অন্য কোনও নির্দেশ অনুসরণ করেননি। আমিও তাই করি জেনে তিনি ভেবেছিলেন বইটি আমার ভালো লাগবে। রোগ নিরাময়ে মাটির প্রলেপের উপর যাষ্ট বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত বলে আমি ভাবলাম। কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য যাষ্ট তলপেটে মাটির প্রলেপ দিতে বলেছেন। পরিষ্কার শুকনো মাটি জলে ভিজিয়ে একটা পাতলা কাপড়ের উপর লাগিয়ে আমি সারারাত তলপেটের উপর রেখেছি। ফল খুব সন্তোষজনক হয়। পরদিন সকালে আমার স্বাভাবিক পায়খানার বেগ আসে এবং, তারপর থেকে বলতে

গেলে ফ্রুট সল্টের ব্যবহার আর করিনি। কচিৎ রেচকের প্রয়োজন হলে বড় চামচের প্রায় এক চামচ ক্যাস্টর অয়েল খুব ভোরে খেয়ে নিয়েছি। মাটির প্রলেপটা তিন ইঞ্চি চওড়া, ছয় ইঞ্চি লম্বা আর আধ ইঞ্চি মোটা হবে। যাষ্ট এও বলেছেন মাটি বিষাক্ত সাপের কামড় থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত শরীরে ভিজে মাটি মাখতে হবে।

আমি নিজে যেগুলি পরীক্ষা করে সফল হয়েছি সেগুলোর কথাই আমি এখানে বলছি। আমার অভিজ্ঞতা, মাথা ধরলে মাথায় মাটির প্রলেপ দিলে প্রায়শঃ তা উপশম হয়। শত শত ক্ষেত্রে আমি এ পরীক্ষা করেছি। মাথা নানা কারণেই ধরে, তবু কারণ যাই হোক মাটির প্রলেপ দিলে তখনকার মত কমে যায়।

সাধারণ ফোড়াও এই মাটির প্রলেপে সেরে যায়। পুঁজরক্ত পড়ছে এমন যে ঘা,তাতেও আমি মাটির প্রলেপ লাগিয়েছি। এক্ষেত্রে ঘা ভাল করে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট লোশনে ধুয়ে নিয়ে এক টুকরো কাপড়ও ঐ লোশনে ডুবিয়ে তার উপর মাটি মাখিয়ে ঘায়ে লাগিয়ে দিয়েছি। এই চিকিৎসায় অধিকাংশ ঘা শুকিয়ে গিয়েছে। সেরে যায়নি এমন একটা ঘটনাও আমার মনে পড়ে না। বোলতার কামড়ে মাটি লাগালে সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা কমে যায়। কাঁকড়া বিছের কামড়েও বহু ক্ষেত্রে মাটি লাগিয়েছি, কিন্তু ততটা সফল হইনি। সেবাগ্রামে কাঁকড়া বিছের উপদ্রব খুব। বিছের কামড়ে আমার জানা সব রকম প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে দেখেছি কিন্তু কোনওটাই অভ্রান্ত হয়নি। তবে এইটুকু বলতে পারি অন্যান্য চিকিৎসার চেয়ে মাটির প্রলেপ লাগানো খারাপ ফল দেয় নি।

বেশী জ্বরে মাথায় ও তলপেটে মাটির প্রলেপ খুব উপকারী। সবসময় তাতে দেহের তাপ না কমলেও রোগীর আরাম লাগে ও ভালো বোধ হয়, যেজন্য রোগী নিজেই প্রলেপ দিতে চায়। জ্বর অবশ্য যেমন তেমনই থাকে তবে মাটির প্রলেপে অস্থিরতা ও কষ্ট কমে। সেবাগ্রামে দশ জনের টাইফয়েডে আমরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। তারা সকলেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। এর পর থেকে আশ্রমবাসীরা কেউ আর রোগের ভয় করতো না। এসব অসুখে আমি অন্য কোনও ওষুধ ব্যবহার করিনি। মাটির প্রলেপ ছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক-চিকিৎসা পদ্ধতিরও প্রয়োগ করেছি। সে সব যথাস্থানে বলবো।

সেবাগ্রামে আমরা এ্যান্টিফ্লজেষ্টিনের বদলে যথেচ্ছ গরম মাটির প্রলেপ ব্যবহার করেছি। মাটিতে সামান্য তেল ও নুন মিশিয়ে নিতে হয় প্রথমে; তারপর তা বীজানুমুক্ত করবার জন্য যথেষ্ট গরম করার ব্যবস্থা।

মাটির প্রলেপের জন্য কী ধরনের মাটি ব্যবহার করতে হবে এখনো তা আমি বলিনি। গোড়ার দিকে আমি মিষ্টি গন্ধযুক্ত পরিষ্কার লাল মাটি সংগ্রহ করেছি। জল দিয়ে মাখলে এর থেকে হালকা একটা গন্ধ বেরোয়। কিন্তু এই ধরনের মাটি সহজ লভ্য নয়। বোম্বাই-এর মত শহরে কোনও রকম মাটিই দুর্লভ। নরম পলিমাটি যা আঠাল বা কাঁকরওলা নয়, তাই ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ। সার মেশানো জমি থেকে মাটি নেওয়া উচিত নয়। মাটিটা শুকিয়ে গুঁড়ো করে সরু চালুনিতে চেলে নিতে হবে। যদি তেমন পরিষ্কার নয় বলে মনে হয় তাহলে ভালো করে গরম

করে বীজানুমুক্ত করে নিতে হবে। পরিষ্কার দেহে প্রলেপ রূপে ব্যবহৃত মাটি ফেলে দেবার দরকার নেই। সেগুলি রোদে শুকিয়ে বা আগুনে গরম করে চেলে বারবার করে ব্যবহার করা যায়। এইভাবে একই মাটি প্রলেপের কাজে অনেকবার ব্যবহৃত হলে তা ফলপ্রদ থাকেনা একথা আমি শুনিনি। আমি নিজে এভাবে ব্যবহার করে দেখেছি বহুবার ব্যবহৃত হবার ফলে কম ফলপ্রদ বলে মনে হয়নি। নিয়মিত মাটির প্রলেপ ব্যবহার করেন আমার এমন কয়েকজন বন্ধু বলেছেন, একাজে যমুনা তীরের মাটি বিশেষ ফলপ্রদ।

মাটি খাওয়া

যাষ্ট লিখেছেন, কোষ্ঠবদ্ধতা সারাবার জন্য পরিষ্কার মাটি খাওয়া যায়। পাঁচ থেকে দশ গ্রাম সর্বোচ্চ ডোজ। এর স্বপক্ষে যুক্তি হলো মাটি হজম হয় না। এগুলো ছিবড়ের মত, কিছুতেই পেটে জমে থাকে না, বেরিয়ে যায়।

আমি নিজে এ পদ্ধতি পরীক্ষা করিনি। সুতরাং যাঁরা করতে চান তাঁরা যেন নিজেরা বুঝে করেন। আমার মনে হয়, একবার দুবার পরীক্ষা করে দেখলে কোনও ক্ষতি হবে না।

২

জল

জলচিকিৎসা সুবিদিত ও সুপ্রাচীন পদ্ধতি। এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। তবে আমার মতে কুহ্নের জলচিকিৎসা পদ্ধতি সরল এবং কার্যকর। ভারতে কুহ্নের লেখা বই খুব জনপ্রিয়। অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় এ বই অনুদিত হয়েছে। অন্ধ্রে কুহ্নের অনুগামী সর্বাধিক। তিনি পথ্য সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন। কিন্তু আমি এখানে কেবল জলচিকিৎসা সম্পর্কে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বলব।

জলচিকিৎসা পদ্ধতিতে কুহ্নের গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো, কটি স্নান বা নীবি স্নান এবং বসা-স্নান। এজন্য তিনি এক বিশেষ ধরনের টবের পরিকল্পনা করেছেন, যদিও সেই বিশেষ টব অপরিহার্য নয়। রোগীর উচ্চতা অনুসারে ত্রিশ থেকে ছত্রিশ ইঞ্চি লম্বা টব দিয়ে কাজ চলে। ব্যবহার করতে গিয়ে সেই টব বা পাত্রের যথোচিত সাইজ বোঝা যাবে। ঠাণ্ডা টাটকা তোলা জলে টবটা এমনভাবে ভর্তি করতে হবে যাতে রোগী বসলে জল ছাপিয়ে না পড়ে। রোগীকে মৃদু শক দেবার জন্য গরমকালে জল যদি তেমন ঠাণ্ডা না থাকে তা হলে বরফ মেশানো যায়। সাধারণতঃ সারারাত মাটির কলসীতে জল রাখা থাকলে তাই দিয়ে চলে। জলের উপরিভাগে এক টুকরো

কাপড় রেখে তারপর জোরে বাতাস করলে জল ঠান্ডা হয়। স্নানের ঘরে দেওয়ালের কাছে টবটা রেখে ঠেস দেবার জন্য পিঠের কাছে একখানি কাঠ রাখা যায়। রোগী পায়ের পাতা বাইরে রেখে জলের মধ্যে বসে থাকবে। জলের বাইরে দেহের যে অংশ থাকবে তা যেন ভালো করে ঢাকা দেওয়া থাকে, না হলে শীত বোধ হবে। রোগী আরাম করে জলের মধ্যে বসলে নরম তোয়ালে দিয়ে আস্তে আস্তে তলপেটটা ডলে দিতে হবে। পাঁচ থেকে ত্রিশ মিনিট এইভাবে স্নান করা যায়। তারপর শুকনো করে গা মুছে রোগীকে শোয়াতে হবে।

বেশি জ্বরে এইভাবে স্নান করলে দেহের তাপমাত্রা নেমে যায়। ঐ পদ্ধতিতে স্নান করলে কখনও ক্ষতি তো হয়ই না, বরং অনেক উপকার হয়। এতে কোষ্ঠবদ্ধতা কমে এবং হজমশক্তি বাড়ে। স্নানের পর রোগী সতেজ এবং কর্মঠ হয়। কোষ্ঠবদ্ধতার ক্ষেত্রে কুহ্‌ন স্নানের পর আধ ঘণ্টা দ্রুত পায়চারী করতে বলেছেন। কখনও ভরপেট খেয়ে স্নান করা উচিত নয়।

বহু ক্ষেত্রে আমি এই কটি স্নান প্রয়োগ করেছি। একশটি ক্ষেত্রের মধ্যে পঁচাত্তরটিতে সফলও হয়েছি। হাইপারপাইরেক্সিয়া রোগে আক্রান্ত রোগী যদি টবের মধ্যে বসতে পারে তাহলে অবশ্যই দেহের তাপ অন্ততঃ দু-তিন ডিগ্রী কমে যাবে এবং রোগীর ভুল বকাও কমবে।

কটি স্নানের স্বপক্ষে কুহ্‌নের যুক্তি হলো এইরকম: জ্বরের আপাতঃ কারণ যা-ই হোক মূল কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক, অন্ত্রে মল সঞ্চয়। এইভাবে সঞ্চিত পচনশীল পদার্থ থেকে উৎপন্ন তাপ জ্বর এবং অন্যান্য উপসর্গ রূপে দেখা দেয়। এইভাবে স্নানের ফলে ভিতরের তাপ নেমে যায়, স্বভাবতঃ যার ফলে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ ইত্যাদি বহির্লক্ষণগুলির উপশম হয়। এই যুক্তি কতটা সত্য আমি জানিনা। বিশেষজ্ঞরাই এটা বলতে পারেন। চিকিৎসকরা প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতির কিছু কিছু গ্রহণ করলেও মোটের উপর কিন্তু সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই থেকেছেন। আমার মতে এ ব্যাপারে উভয় পক্ষকেই দোষী করা যায়। চিকিৎসকদের একটা অভ্যাসই হলো তাঁদের নিজেদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের প্রতি কেবল মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা। তাঁদের প্রণালীর বাইরে যা কিছু তার প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা না থাকলেও নিস্পৃহতা থাকে। অন্যদিকে প্রাকৃতিক চিকিৎসকরা ডাক্তারদের সম্পর্কে নানারকম অভিযোগ পোষণ করেন এবং নিজেদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় দাবী করেন। তাঁদের মধ্যে গোষ্ঠীগত মনোভাব নেই। প্রত্যেকেই আত্মতুষ্ট এবং নিজেদের চিকিৎসা পদ্ধতির বিকাশের জন্য সকলের শক্তিকে সংহত না করে এককভাবে কাজ করেন। এই পদ্ধতির সমস্ত উপযোগিতা ও সম্ভাবনার জন্য কেউ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কাজ করবার চেষ্টা করেন না। কেউই বিনম্র হবার প্রয়াস করেন না। (অবশ্য চেষ্টা করে যদি বিনীত হওয়া সম্ভব হয়।)

প্রাকৃতিক চিকিৎসকদের কাজকে হেয় করবার জন্য আমি এসব বলছি না। সামান্য একজন সহযোগী হিসাবে আমি চাই তাঁরা সমস্ত বিষয়গুলিকে যথাযথ ভাবে বিচার করুন যাতে সম্ভবক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সেগুলিকে উন্নত করতে পারেন। আমার বিশ্বাস, যতদিন না এঁদের মধ্য থেকেই শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কয়েকজন

এটাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে এগিয়ে আসেন ততদিন যেমন অবস্থা আছে তেমনই থাকবে। প্রচলিত চিকিৎসার নিজস্ব বিজ্ঞান, চিকিৎসক সংস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এঁরা নানাক্ষেত্রে সফলও হয়েছেন। সুতরাং যেসব বিষয়ের এখনও পুরোপুরি পরীক্ষা হয়নি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে যেগুলি প্রমাণিত হয়নি সেগুলিকে তাঁরা বিশ্বাস করবেন এমন আশা করা যায় না।

ইতোমধ্যে জনসাধারণের জানা উচিত, প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতির বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে প্রাকৃতিক বলে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও নিরাপদে এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। যদি কারও মাথা ধরে সে যদি এক টুকরো কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে মাথায় জড়িয়ে রাখে তাতে তার কোনও ক্ষতি হয় না। এছাড়া ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে একটু মাটি গুলে দিলে ঠাণ্ডা পটি লাগাবার উপযোগিতা আরও বাড়ে।

এবার উপবেশন বা সম্মার্জন স্নানের কথা। জননেন্দ্রিয় মানুষের দেহের সবচেয়ে স্পর্শকাতর অঙ্গ। পুরুষাঙ্গ ও শিশ্নমুণ্ডাচ্ছাদন ত্বকের স্পর্শকাতরতা সম্বন্ধে কিছু একটা মায়াময় ধারণা রয়েছে। যাই হোক, সেটা কীভাবে বর্ণনা করতে হবে আমি জানি না। কুহন্ প্রাকৃতিক চিকিৎসায় তাঁর এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন। ঠাণ্ডা জল ঢালার সময় একখণ্ড নরম ভিজে কাপড় দিয়ে যৌনাঙ্গের বাইরের গায়ে ধীরে ধীরে ঘষার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। পুরুষাঙ্গের ক্ষেত্রে ঘষবার আগে মুণ্ডাচ্ছাদন ত্বক যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়। কুহনের পদ্ধতিটা হলো এইরকম : ঠাণ্ডা জলের টবে একটা টুল বা চৌকি বসাতে হবে, যাতে আসনটা জলের সীমার ঠিক লাগোয়া থাকে। রোগী টবের বাইরে পা রেখে সেই টুলে বসবে, তারপর ধীরে ধীরে যৌনাঙ্গ ঘষতে থাকবে; যৌনাঙ্গ টবের জলের উপর উপর স্পর্শ করছে তখন। ব্যথা লাগে এমন ভাবে যেন ঘষা না হয়। পক্ষান্তরে রোগীর পক্ষে এটা যেন আরামদায়ক হয়। উপবেশন স্নানে রোগী তখনকার মত ভালো বোধ করে। কুহন্ বসা-স্নানকে কটি স্নানের চেয়ে উৎকৃষ্ট বলেছেন। শেষোক্তের তুলনায় প্রথমোক্ত স্নান সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা অনেক কম। এজন্য দোষ সবটাই আমার। আমারই ত্রুটি। তাছাড়া যাঁদেরই আমি বসে স্নানের পরামর্শ দিয়েছিলাম, তাঁরাও এই পরীক্ষায় ধৈর্য ধরেন নি। কাজেই এই সব স্নানের উপোযোগিতা সমন্ধে আমি কোন অভিমত দিতে পারি না। প্রত্যেকেরেই এটা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। যদি সেরকম গামলা জোগাড় না হয় তাহলে একটা জগ কিংবা ঘটি করে জল ঢেলে ঢেলে ঘষে ঘষে স্নান করা যায়। এতে রোগী অবশ্যই আরাম ও শান্তি পাবে। সাধারণভাবে জননেন্দ্রিয়ের পরিচ্ছন্নতার প্রতি লোকে তেমন নজর দেয় না। ঘষে ঘষে স্নান করলে সহজেই সে উদ্দেশ্য মেটে। বিশেষভাবে যত্ন না নিলে পুরুষাঙ্গ ও আচ্ছাদন ত্বকের মধ্যে ময়লা জমে। তা অবশ্যই দূর করা দরকার। যৌনাঙ্গ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হলে ও উপরে যে চিকিৎসা প্রণালী বা পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে, তা ধৈর্যের সঙ্গে অনুসরণ করা হলে ব্রহ্মচর্য পালন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে পড়ে। এর ফলে অবাঞ্ছনীয় বীর্যস্খলন কমই ঘটে। বলা বাহুল্য, বীর্যস্খলন হতে দেওয়া খুব অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার। পরিচ্ছন্নতার প্রতি বেশী মনোযোগ দিলে এ সম্বন্ধে একটা বিরূপতা জাগবে এবং ফলে এটা এড়াবার জন্য মানুষ

সব রকম সর্তকতা নেওয়া সম্বন্ধে যত্নবান হবে।

কুহ্ন নির্দেশিত দুই রকম স্নান নিয়ে আলোচনা করবার পর চাদর ভিজিয়ে ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশেষ করে পাইরেক্সিয়ায় এবং অনিদ্রায় এটা অত্যন্ত ফলপ্রদ। পদ্ধতিটা হচ্ছে এইরকম। খাটের উপর তিনচারটে মোটা গরম কম্বল পেতে, তার উপর একটা চাদর ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে নিংড়ে নিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে। রোগীকে এর উপর শুতে হবে তবে তার মাথাটা ভিজে চাদরের বাইরে একটা বালিশের উপর থাকবে। এবার ঐ ভিজে চাদর আর কম্বল দিয়ে রোগীর সমস্ত দেহটা মুড়ে দিতে হবে, মাথাটা থাকবে কেবল বাইরে। মাথাও চাদরের মত তোয়ালে ভিজিয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে। রোগীকে এমন ভাবে চাদরে কম্বলে জড়িয়ে রাখতে হবে যাতে বাইরের হাওয়া গায়ে না লাগে। প্রথমে ভিজে চাদরে মুড়লে রোগীর হয়ত সামান্য কাঁপুনি হতে পারে। কিন্তু পরে আরামদায়ক মনে হবে। দু এক মিনিটের মধ্যেই তার গরম বোধ হবে। যদি পুরোনো জ্বর না হয় তাহলে প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘাম দিয়ে জ্বর কমে যাবে। রোগ প্রতিষেধক রূপে আমি রোগীকে আধঘন্টা ভিজে চাদরে মুড়ে রেখেছি। শেষ পর্যন্ত ঘাম দেখা দিয়েছে। কখনও হয়ত ঘাম হয়নি কিন্তু রোগী ঘুমিয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে তাকে জাগানো উচিত নয়। ঘুম এলে বোঝা যাবে ভিজে চাদর জড়িয়ে রেখে যন্ত্রণার প্রশমন হয়েছে এবং সম্পূর্ণ আরাম পাচ্ছে। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে জ্বর দু-তিন ডিগ্রী কমবেই।

ত্রিশ বছর আগে আমার মেজ ছেলের ডবল নিমোনিয়া হয়। জ্বর বেশী হওয়াতে ভুল বকতে আরম্ভ করে। আমার এক চিকিৎসক বন্ধু তার চিকিৎসা সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন। কিন্তু আমি তাঁর বিধানে চিকিৎসা করাইনি। বরং জলের সাহায্যে চিকিৎসার চেষ্টা করেছিলাম। জ্বর খুব বাড়লে ভিজে চাদরে মুড়ে রাখতাম। ৭।৮ দিন পরেই জ্বর নেমে গেল। যতদূর মনে পড়ে আমি তাকে জল ছাড়া আর কিছু খেতে দিই নি। হয়ত কমলা লেবুর রসও দিয়েছিলাম, কিন্তু আর কিছু না। এর উপর টাইফয়েড হলো এবং ৪২ দিন থাকল। সাধারণ শুশ্রূষা ছাড়া কোনও চিকিৎসাই ছিল না। পথ্য দিতাম দুধ আর জল। রোজ গা মুছে দেওয়া হতো। সে সম্পূর্ণ সেরে গেল এবং আমার চারটি ছেলের মধ্যে সেই এখন সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমান। এই চিকিৎসা সম্পর্কে এইটুকু অন্ততঃ বলা যায় যে তার অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায় নি।

ঘামাচি এবং 'আরটিকেরিয়া' হাম, বসন্ত প্রভৃতি রোগে এই চিকিৎসা ফলপ্রদ। এসব অসুখে আমি এ পদ্ধতি অনেকবার প্রয়োগ করে দেখেছি। বসন্ত ও হাম হলে জলে প্রচুর পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মিশিয়ে নিয়েছি। এতে জলের রং হালকা গোলাপী হয়েছে। এসব রোগীদের জন্য যে চাদর ব্যবহৃত হয়ে থাকে প্রায় সেগুলিকে ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে রেখে দিতে হবে। তারপর বেশ ঠাণ্ডা হলে সাবান জলে ধুয়ে জীবানুমুক্ত করে নিতে হবে।

রক্ত সঞ্চালন ভালো হয় না এমন ক্ষেত্রে পায়ের পেশীতে ব্যথা হয় এবং পায়ে অদ্ভুতরকম যন্ত্রণা ও অস্বস্তি ঘটে। তখন বরফ ঘষলে বেশ উপকার হয়। গরমের সময় এই চিকিৎসা বেশী ফলপ্রদ। দুর্বল রোগীর শরীরে শীতকালে বরফ ঘষা

বিপজ্জনক।

এবার গরম জলে প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্পর্কে দু-একটি কথা। বহু ক্ষেত্রে—বুদ্ধি করে গরম জল ব্যবহার করলে আরাম হয়। কোনও কেটে ছড়ে গেলে আমরা সাধারণতঃ সকলেই টিনচার আয়োডিন ব্যবহার করে থাকি। এই রকম অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরম জলের ব্যবহার একই কাজ দেবে। কোথাও ফুলে উঠলে কি কালসিটে পড়লে সে জায়গায় টিনচার আয়োডিন লাগাই। এক্ষেত্রে গরমজলের সেঁকে বেশি না হলেও একই রকম উপকার হবে। কানের ব্যথায়ও আয়োডিন ফোঁটা করে দেওয়া হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কানে গরম জল-সেচে ব্যথা কমে। আয়োডিন ব্যবহারে বিপদ আছে। রোগীর এ ওষুধে এলার্জি থাকতে পারে। আয়োডিনকে অন্য ওষুধ ভেবে খেয়ে ফেললে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয়। কিন্তু গরম জল ব্যবহারে এসব কোনও বিপদ নেই। ফুটন্ত জল টিনচার আয়োডিনের মতই বীজানু নিরোধক। আমি আয়োডিনের উপযোগিতা উপেক্ষা করছি না কিংবা এ কথাও বলছি না সব ক্ষেত্রেই আয়োডিনের পরিবর্তে গরম জল ব্যবহার করলে হয়। আমি যে কয়টা ওষুধকে প্রয়োজনীয় মনে করি তার মধ্যে আয়োডিন অন্যতম। তবে পয়সা খরচ হয়। গরীব লোকরা আয়োডিন কিনতে পারে না। তাছাড়া সকলে তা নিরাপদে ব্যবহার করতে জানে না। কিন্তু জল সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। তবে সহজে পাওয়া যায় বলে এর রোগনিরাময়ের ক্ষমতার দিকটাকে অবজ্ঞা করব না। সংকটকালে অনেক সময় সাধারণ গৃহ চিকিৎসা ভগবৎদত্ত বলে মনে হয়।

বিছের কামড়ে সব চিকিৎসা ব্যর্থ হলে যেখানটায় কামড়েছে শরীরের সেই জায়গাটা গরম জলে ডুবিয়ে রাখলে ব্যথা কমে।

রোগীকে ভালো করে ঢাকা দিয়ে তার চার দিকে ফুটন্ত গরম জলের বালতি রেখে কিংবা অন্য কোনও পন্থায় ঘরের আবহাওয়া বাষ্পাচ্ছন্ন করতে পারলে ফিট বা রাইগার কমে যায়। রবারের গরম জলের ব্যাগ অত্যন্ত দরকারী জিনিষ, কিন্তু সব বাড়িতে থাকে না। আঁট করে ছিপি বন্ধ করা কাঁচের বোতলে গরম জল ভরে কাপড়ে মুড়ে নিলে হটব্যাগের কাজ হয়। গরম জল ঢাললে বোতল যাতে ফেটে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

গরম ভাপের সাহায্যে চিকিৎসা আরও ফলদায়ক। এতে রোগীর ঘাম হয়। রিউম্যাটিজম এবং অন্যান্য গাঁটের ব্যথায় বাষ্পস্নান খুব উপকারী। বাষ্পস্নানের সবচেয়ে সহজ ও প্রাচীন পদ্ধতি হলো নিম্নরূপ: ফাঁক ফাঁক অথচ আঁট করে বোনা একটি খাটিয়ার উপর দু-একটা কম্বল বিছিয়ে তার নিচে একটা কি দুটো মুখ ঢাকা পাত্রে গরম জল ভর্তি করে রাখতে হবে। রোগীকে খাটিয়ার উপর চিৎ করে শুইয়ে এমন ভাবে কম্বল ঢাকা দিতে হবে যাতে খাটের দুপাশে কম্বল মেঝে পর্যন্ত ঝুলে থাকে। এতে ভিতরের গরম ভাপ বাইরে বেরিয়ে যাবে না এবং বাইরের হাওয়াও ভিতরে ঢুকবে না। এইভাবে সব ঠিকঠাক করে নিয়ে ফুটন্ত জলের পাত্রের ঢাকা খুলে দিলে ভাপটা কম্বলের ভিতরে শোয়া রোগীর দিকে উঠতে থাকবে। দু-একবার জলটা বদলানোর দরকার হতে পারে। ভারতে সাধারণতঃ লোকে জলের পাত্রের নিচে আগুনের আংটা রাখে জলটা ফোটাবার

জন্য। এতে একটানা ভাপ বেরোতে থাকে, তবে এতে বিপদের ঝুঁকিও থেকে যায়। একটা আগুনের ফুলকিতে কম্বলে কি খাটে আগুন ধরে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং আমি যে উপায়ের কথা বললাম সেটা অনুসরণ করাই ভালো, যদিও এটা মন্থর এবং বিরক্তিকর লাগবে।

অনেকে গরম জলে নিমপাতা বা অন্য কোনও ওষুধি দেন। এতে বাষ্পের গুণাগুণ কিছু বাড়ে কিনা আমি জানি না। রোগীর যাতে ঘাম হয় এমন কিছু করা যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে শুধু বাষ্প হলেই হয়।

পায়ে ঠাণ্ডা লাগলে অথবা ব্যথা হলে রোগীর সহ্য হয় এমন গরম জলে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবিয়ে রাখতে হবে। জলে একটু সরষের গুঁড়োও দেওয়া যায়। ১৫ মিনিটের বেশি ফুটবাথ নেবার দরকার নেই। এতে স্থানীয় রক্ত চলাচল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে উপকার হয়।

সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা বা গলা ব্যথায় লম্বা নলওয়ালা চা-দানীর মত কেটলীতে নাকে ও গলায় গরম ভাপ লাগানো যায়। সাধারণ কেটলীর মুখে প্রয়োজনমত লম্বা রবারের নল লাগিয়েও নেওয়া যেতে পারে।

৩

আকাশ (ইথার?)

অনুবাদ করার পক্ষে 'আকাশ' একটি কঠিন শব্দ, বস্তুতঃ যেহেতু অন্য চারটি উপাদানও ঐ নামে উল্লিখিত হয়। কারণ পানি মূলে কেবল জলই নয়, যেমন নয় বায়ু শুধু বাতাস, পৃথিবি শুধু মাটি; অথবা তেজ আলো মাত্র নয়। আকাশকে নিতান্ত সীমিত অর্থেই ইথার বলা যায়। সম্ভবতঃ, আক্ষরিক অর্থে শূন্যতা এর নিকটতম প্রতিশব্দ। বলতে কি মূল অর্থ যা, এতেও তা শোচনীয়ভাবে অপ্রকাশিত থেকে যায়। মূলে পাঁচটি উপাদানই জীবনের মত জীবন্ত। সে যাই হোক, আমরা যদি আকাশের নিকটতম প্রতিশব্দ বলে 'ইথার'-কে ধরি, নিশ্চয়ই আমরা এও স্বীকার করবো যে, ইথার সমন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প, আর আকাশ সম্বন্ধে আরো কম। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় এর ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও অনেক সীমাবদ্ধ। পৃথিবী ও তার চার পাশের বায়ুমণ্ডলকে ঘিরে যে শূন্য স্থান রয়েছে, 'আকাশ' সেই অর্থে নেওয়া যেতে পারে। স্বচ্ছ দিনে উপরের দিকে তাকালে সুন্দর বেগুনি রং নীল চাঁদোয়া চোখে পড়ে—এটাই আকাশ নামে পরিচিত। আমাদের সম্পর্ক যতটুকু, আকাশ বা ইথার নিঃসীম। আমাদের চারদিকে আকাশ ঘিরে রয়েছে এবং আকাশ নেই এমন কোন কোণ বা অন্ধিসন্ধি অবিদ্যমান। সাধারণভাবে আমরা কল্পনা করি, আকাশ এমন একটা কিছু যা উপরে রয়েছে—আমাদের মাথার উপরে যেন নীল চাঁদোয়া। কিন্তু আকাশ যেমন আমাদের উপরে রয়েছে, তেমনি নিচেও রয়েছে—আমাদের চারদিকেই রয়েছে। আমরা পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরে চলেছি।

কাজেই আকাশ গোল এবং এই গোলাকৃতির ভিতরেই প্রত্যেকে রয়েছি। এটা একটা আচ্ছাদন—এর সবচেয়ে বাইরের দিকটা সীমাহীন। আকাশের নিচের স্তরটি বহু মাইল পর্যন্ত বায়ুতে পূর্ণ। এই বায়ু না থাকলে শূন্যতা সত্বেও মানুষের দম বন্ধ হয়ে যেতো। সত্য যে, আমরা বায়ুকে দেখতে পাই না—কিন্তু বায়ুতে যখন গতি জাগে আমরা অনুভব করতে পারি। আকাশ বা ইথার হলো বায়ুমণ্ডলের আবাস। খালি বোতল থেকে পাম্প করে বাতাস বের করে নিয়ে শূন্যতা সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু যা শূন্য, তা কে পাম্প করে শূন্য করবে? এই হলো আকাশ।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা এই আকাশকে কাজে লাগাই। জীবনরক্ষার জন্য বাতাস অপরিহার্য; প্রকৃতিই তাকে সর্বব্যাপী করেছে। তবে বাতাসের সর্বব্যাপ্তি আপেক্ষিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তা অসীম নয়। বৈজ্ঞানিকরা বলেন পৃথিবীর কিছু মাইল উপরে বাতাস নেই। বায়ুমণ্ডলের বাইরে কোনও প্রাণী বাঁচতে পারে না। একথা সত্য হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। আমাদের এইটুকু জানলেই হবে যে বায়ুমণ্ডলের বাইরেও আকাশ বিরাজিত। বৈজ্ঞানিকরা কোনদিন হয়তো প্রমাণ করে দিতে পারেন যে যাকে আমরা ইথার বলি তা-ও একটা উপাদান, যা শূন্য স্থান—আকাশকেই পূর্ণ করছে। তখন আমাদের বাতাস এবং ইথার কোনওটাই নেই এমন শূন্য মহাকাশের নতুন নাম খুঁজতে হবে। সে যাই হোক আমাদের চারপাশের এই শূন্য মহাকাশের রহস্য সবচেয়ে বিস্ময়কর। যতদিন স্বয়ং ঈশ্বরের রহস্য ভেদ করতে না পারছি ততদিন এই রহস্যের মীমাংসা আমরা করতে পারব না। শুধু এইটুকু বলা যায় আকাশ এই উপাদানকে আমরা যত কাজে লাগাতে পারবো ততই স্বাস্থ্যবান হবো। প্রথম যে পাঠ আমাদের নিতে হবে তা হলো, আকাশ —নিঃসীম—আমাদের খুব নিকটে অথচ খুব দূরে, তার আর আমাদের মধ্যে কোনও বিভেদের প্রাচীর তোলা উচিত নয়। যদি আমরা ঘরের মধ্যে, ছাদের নিচে বাস না করে, এমন কি নিরাবরণ থেকে আকাশ ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিই, তাহলে সবচেয়ে ভাল স্বাস্থ্য উপভোগ করতে পারবো। সকলের পক্ষে তা তো সম্ভব নয়। কিন্তু সকলেই এই উক্তির সারবত্তা মেনে নিতে এবং জীবনকেও সেই ভাবে মানিয়ে নিতে পারেন। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা এটা যতটুকু অনুসরণ করতে পারবো ততটুকুই সন্তোষ ও মানসিক শান্তি উপভোগ করেত সমর্থ হবো। এই চিন্তাধারার চরম পর্যায়ে পৌছোলে এমন অবস্থা আসবে যখন আমাদের মনে হবে আমাদের এই দেহটাই অনন্তের সঙ্গে ব্যবধান রচনা করেছে। এ সত্য উপলব্ধি করতে পারলে দেহের বিনাশের প্রতিও আমরা নিঃস্পৃহ হয়ে যাব। অনন্তের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার অর্থই নিজেকে জানা। এইভাবে দেহ তখন আর আত্মরতির মাধ্যম থাকবে না। এই সাধনার পথে মানুষ একদিন জানবে, সে তার চারপাশের জীবনপ্রবাহেরই একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ। অবশ্যই এর অর্থ জীবসেবা এবং তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভ করা।

এই চিন্তাধারায় ভাবিত হলে মানুষ যতদূর সম্ভব তার চারপাশ খোলা রাখবে। সে অনাবশ্যক আসবাবপত্রে ঘর বোঝাই করবে না, নিতান্ত প্রয়োজনীয় এইরকম জামা কাপড় ব্যবহার করবে। কোনও কোনও বাড়ী এত রকমের সাজসজ্জা

ও আসবাবপত্রে ভর্তি থাকে যেগুলোর কোনও দরকারই হয় না এবং সাধাসিধে জীবন কাটায় এমন লোকের সে পরিবেশে দম আটকে আসবে। সেগুলো কেবল ধুলো, বীজানু আর পোকামাকড়ের আবাসস্থল। এখন যে ঘরে আমি অন্তরীণ হয়ে রয়েছি (গান্ধীজী ১৯৪২-৪৪ সালে পুণায় আগাখান প্রাসাদে অন্তরীণ থাকাকালে এই অধ্যায়গুলি লেখেন—সম্পাদক), এখানে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করছি। ভারী ভারী আসবাবপত্র, চেয়ার টেবিল, সোফা, বিছানাপত্তর, অসংখ্য আয়না সব আমার মনের উপর বোঝার মত চেপে বসছে। মেঝেয় যে দামী দামী কার্পেট বিছানো, তার মধ্যে যত পোকামাকড়ের আবাস। একদিন একটা ঘরের কার্পেট ধুলো ঝাড়ার জন্য তোলা হয়েছিল। একজন মানুষ তা তুলতে পারে নি। সারা বিকেল লেগেছিল ছজন লোকের সেই ধুলো ঝাড়তে। তারা অন্ততঃ দশ পাউন্ড ধুলো ঝেড়েছিল। কার্পেটটি আবার যখন জায়গায় রাখা হয়, তার চেহারা তখন নতুন। এ সব কার্পেট রোজ বার করে ঝাড়া সম্ভব নয়। তা করতে গেলে ছিঁড়ে যাবে, তা ছাড়া মজুর খরচও অনেক বাড়বে। তবে এটা কথা প্রসঙ্গেই বললাম। আমি যা বলতে চাই, তা হলো, অনন্তর সঙ্গে এক সুরে বাঁধা হয়ে জীবন যাপনের আকাঙ্খা আমাকে জীবনের অনেক জটিলতা থেকে মুক্ত রেখেছে। এর ফলে কেবল গৃহস্থালী ও পোষাক পরিচ্ছদ নয়, আমার জীবনযাত্রা সব দিকেই অনাড়ম্বর হয়েছে। এককথায় এবং যে বিষয়ের আলোচনা করছি তার ভাষায় বলতে গেলে আমি ক্রমশঃ আকাশের সঙ্গে আমার সংযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছি। এই সংযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। আমি আরও বেশি সন্তোষ ও মানসিক শান্তি পেয়েছি এবং উপকরণ লাভের আকাঙ্খা প্রায় চলে গিয়েছে। যে অনন্তের সঙ্গে নিজেকে সম্পর্কান্বিত করতে পারবে সে কিছুই লাভ করবে না, অথচ সবই পাবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায় মানুষ এমন কিছু পায়, যা সে ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবহার করতে এবং জীবনের সঙ্গে সমন্বিত করতে পারে। সকলেই যদি এই নীতি অনুসরণ করেন তাহলে সকলের জন্যই প্রচুর জায়গা থাকবে এবং অভাবও থাকবে না, ভিড়ও থাকবে না।

অতএব মনে রাখা উচিত খোলা আকাশের নিচে ঘুমোতে হবে। ঠান্ডা কিংবা শিশির, প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভালো করে গায়ে ঢাকা দিতে হবে। বর্ষাকালে যাতে ভিজে যেতে না হয় তার জন্য দেওয়ালবিহীন ছাতার মত ছাদের নিচে থাকতে হবে। বাকি সময় নক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশ চন্দ্রাতপের মত থাকবে যাতে চোখ খুললেই নিয়ত পরিবর্তমান সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। এ দৃশ্য মানুষকে কখনও ক্লান্ত করবে না এবং চোখে কোনওরকম লাগবে না বা চোখ ধাঁধাবে না। বরং এতে তার আরাম হবে। আকাশের গায়ে নিজস্ব গরিমায় অবস্থিত বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ চোখের পক্ষে আনন্দের ভোজ। সকল চিন্তার সাক্ষীরূপে যে তারকারাশির সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারে সে কখনও মনে অসৎ বা কুচিন্তা প্রবেশ করতে দেবে না এবং শান্তিপূর্ণ, শ্রমাপহারক নিদ্রা উপভোগ করতে পারবে।

উপরের আকাশ থেকে এবার আমরা আমাদের ভিতরের এবং চারপাশের

আকাশে নেমে আসি। গায়ের চামড়ায় লক্ষ লক্ষ লোমকূপ আছে। এই কূপগুলিতে যে ফাঁক আছে তা যদি আমরা ভরে দিই তাহলে আমরা মরেই যাব। কোনও রকমে লোমকূপ বন্ধ হয়ে গেলে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে। তেমনি পাকপ্রণালীকেও অনাবশ্যক খাদ্যে বোঝাই করা উচিত নয়। আমাদের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খাব, তার বেশি নয়। অনেক সময় লোকে না বুঝেই বেশি কিংবা হজম হয় না এমন জিনিস খেয়ে ফেলে। মাঝে মাঝে, ধরা যাক সপ্তাহে কিংবা পক্ষকালের মধ্যে একদিন উপবাস করলে সমতা থাকে। যদি সারাদিন উপবাস করতে কষ্ট হয় তবে সারাদিনে একবার কি দুবারের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত। প্রকৃতি শূন্যতা চায় না এটা আংশিক সত্য। প্রকৃতি নিয়ত শূন্যতা চাইছে। আমাদের চারপাশের নিঃসীম শূন্যতা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৪

তেজ (সূর্য)

অন্য যেকটি উপাদানের কথা আলোচনা করা হলো সেগুলিরই মত সূর্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সূর্য আলো ও তাপের উৎস। সূর্য না থাকলে আলোও থাকবে না। দুঃখের বিষয় আমরা সূর্যালোকের পুরো সদ্ব্যবহার করি না, ফলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ করতে পারি না। রৌদ্র স্নান জলে স্নান করার মতই উপকারী, যদিও একটার বদলে আর একটা দিয়ে চলে না। দুর্বলতায় এবং রক্ত চলাচলে মন্থরতায় খালি গায়ে সকালের রোদ লাগালে তা সর্বাঙ্গীন টনিকের কাজ করে এবং দেহে পুষ্টিকর উপাদানের রূপান্তর ত্বরান্বিত হয়। সূর্যরশ্মির অংশীভূত বিভিন্ন রশ্মির মধ্যে সবচেয়ে উপকারী আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি সকালের রোদে বেশি থাকে। রোগী যদি ঠাণ্ডা বোধ করে তা'হলে গা ঢাকা দিয়ে রোদে শুয়ে থাকবে এবং একটু একটু করে সহ্য হয়ে গেলে ক্রমশঃ গায়ের কাপড় ফেলে দিতে হবে। নিজস্ব কোনও জায়গায় অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে যে কোনও জায়গায় সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে রোদে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ালে রৌদ্রস্নান হয়। সেরকম কোনও জায়গা না পেলে শরীরের গোপন অংশগুলিতে একটুকরো কাপড় বা ল্যাঙট পরে দেহের বাকিটা খোলা রাখতে হবে।

সূর্যস্নানে উপকৃত হয়েছেন এমন অনেককেই আমি জানি। ক্ষয় রোগের এটা একটা সুবিদিত চিকিৎসা। সূর্যস্নান অথবা সূর্যচিকিৎসা আর কেবল প্রাকৃতিক চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত হয়ে নেই। প্রচলিত চিকিৎসাপদ্ধতি প্রাকৃতিক চিকিৎসা থেকে একে গ্রহণ করে একে আরও বিকশিত করেছেন। শীতের দেশে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বিশেষভাবে কাঁচের বাড়ী তৈরী হয়, যাতে কাঁচের মধ্য দিয়ে রোদ আসে আবার রোগীর ঠাণ্ডা না লাগে।

বড় ঘা অনেক সময় সূর্যচিকিৎসায় সেরে যায়। ঘাম হবার জন্য আমি দুপুরের

ঠিক আগে রোগীকে রোদে শুইয়ে দিয়েছি। পরীক্ষা সফল হয়েছে এবং শীঘ্র রোগী ঘামে স্নান করে গিয়েছে। মাটির প্রলেপ দিয়ে মাথাটাকে রোদ থেকে বাঁচাতে হবে। মাথা আরও ঠাণ্ডা ও সুরক্ষিত রাখতে হলে কলা বা অন্য কোন গাছের পাতা দিয়ে মুখ আর মাথা ঢেকে রাখতে হবে। কড়া রোদ কখনও মাথায় লাগ্যাতে নেই।

৫

মরুৎ (বায়ু)

পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে আলোচিত অন্য উপাদানগুলির মত পঞ্চম উপাদান বায়ুও গুরুত্বপূর্ণ। পাঁচটি উপাদানের সমবায়ে গঠিত মানবদেহ এগুলি ছাড়া বাঁচে না। সুতরাং বাতাসকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। সাধারণতঃ লোকে যেখানেই যায় রোদ আর বাতাসকে সরিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করে এবং এইভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। যদি শৈশব থেকে প্রচুর নির্মল বাতাসের মধ্যে থাকতে মানুষ অভ্যাস করে তাহলে শরীর শক্ত হয় এবং তার কখনও মাথায় কিংবা অন্যত্র ঠাণ্ডা লাগে না। আগের অধ্যায়গুলিতে নির্মল বাতাস সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি। এখন আর তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

আমার অহিংসা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

ইংরাজিতে সঙ্কলন ও সম্পাদনা
শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[নির্বাচিত নিবন্ধাদির অনুবাদ : প্রণবেশ সেন]

অসি তত্ত্ব

আমি বিশ্বাস করি, যেখানে কাপুরুষতা ও হিংসার একটিকে বেছে নেবার প্রশ্ন উঠবে, আমি সেখানে হিংসাকেই বেছে নেবার পরামর্শ দেব। আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র জানতে চেয়েছিল ১৯০৮ সালে যখন আমাকে মারাত্মক ভাবে প্রহার করা হয়েছিল—সে সময় সে উপস্থিত থাকলে তার কী করা উচিত হ'ত? পালিয়ে যাওয়া? আমাকে মারতে দেখা, না তার দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে আমাকে রক্ষা করা? আমি তাকে বলেছিলাম—তার কর্তব্য হ'ত আমাকে রক্ষা করা—দরকার হ'লে হিংসার আশ্রয় নিয়েও।

তবুও আমি বিশ্বাস করি, হিংসার চেয়ে অহিংসা অসংখ্য গুণে শ্রেয়। শাস্তিদানের চেয়ে ক্ষমাপরায়ণতা অনেক বেশী পুরুষোচিত। ক্ষমাপরায়ণতা সৈনিকের ভূষণ। আর শাস্তি দেবার শক্তির সংযমই ক্ষমাপরায়ণতা। একটা অসহায় প্রাণীর দিক থেকে ক্ষমাপরায়ণতা অর্থহীন। বিড়াল যখন ইঁদুরকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে থাকে তখন ইঁদুরের দিক থেকে ক্ষমাপরায়ণতার কথাই ওঠে না। যারা জেনারেল ডায়ার বা তার মতো ব্যক্তিদের সমুচিত শাস্তি দেবার দাবী তোলে আমি তাদের আবেগ বুঝতে পারি। পারলে হয়তো তারা তাঁকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু আমি ভারতকে অসহায় বলে মনে করি না। আমি নিজেকেও অসহায় প্রাণী বলে জ্ঞান করি না। আমি শুধু চাই, ভারতের ও আমার শক্তি মহত্তর লক্ষ্য সাধনে ব্যবহার করতে।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। দৈহিক ক্ষমতা থেকে শক্তি আসে না। শক্তির উৎস হ'ল অদম্য ইচ্ছা শক্তি। গড়পড়তা একজন জুলু গড়পড়তা একজন ইংরেজের চেয়ে অনেক বেশী শারীরিক শক্তি ধরে। কিন্তু সে একটি ইংরেজ বালককে দেখলে পালিয়ে যায়। কারণ, সে ঐ বালকটির রিভালবারে বা যারা ঐ বালকটির হয়ে ওটা ব্যবহার করতে পারে তাদের ভয়ে ভীত। ঐ জুলু মৃত্যুভয়ে ভীত—তাই সে তার বিরাটাকৃতি সত্ত্বেও দুর্বল হয়ে পড়ে। আমরা ভারতীয়রা হয়ত একটা সময়ে বুঝতে পারবো, ৩০ কোটি মানুষের ১০ কোটি ইংরেজকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। কাজেই নিশ্চিত ক্ষমাপরায়ণতার অর্থই হল আমাদের শক্তির নিশ্চিত স্বীকৃতি। প্রদীপ্ত ক্ষমাপরায়ণতা আমাদের মধ্যে এমন এক শক্তির জোয়ার এনে দেবে যেখানে কোনো ডায়ার বা কোনো ফ্রাংক জনসনের পক্ষে ভারতের পূত মস্তকের উপর অপমানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এই মুহূর্তে আমি যদি আমার বক্তব্য বোঝাতে না পেরে থাকি—তাতে খুব একটা যাবে আসবে না। আমরা নিজেদের এত বেশী অধঃপতিত মনে করি যে আমরা ক্রুদ্ধ বা প্রতিহিংসাপরায়ণও হয়ে উঠতে পারি না। কিন্তু আমি একথা না বলে পারি না যে, শাস্তি দেবার অধিকার ত্যাগ করে ভারত অনেক বেশী লাভবান হ'তে পারে। আমাদের উন্নততর কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে।

আমি কল্পনাবিলাসী নই। আমি নিজেকে বাস্তববাদী আদর্শবাদী বলে মনে করে থাকি। অহিংসা ধর্ম শুধু মাত্র মুণি-ঋষিদের ধর্ম নয়। এটা সাধারণ মানুষেরও ধর্ম। অহিংসা আমাদের প্রজাতির বিধি; কিন্তু হিংসা পশুদের। পশুদেরও আত্মা রয়েছে, সে আত্মা সুপ্ত। দৈহিক শক্তির নিয়ম ছাড়া আর কোনো নিয়ম তারা জানে না। কিন্তু মানব মর্য্যাদার কাঙ্খিত বস্তু মহত্তর বিধি—সে চায় আত্মার শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে।

সেজন্য আমি ভারতের সামনে আত্মত্যাগের সুপ্রাচীন আদর্শ তুলে ধরতে চাই। সত্যাগ্রহ এবং তার সঙ্গী অসহযোগিতা ও অ-সামরিক প্রতিরোধ ঐ ত্যাগ স্বীকারের আদর্শেরই নূতন নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। যে সমস্ত ঋষি, হিংসার মধ্যেও এই অহিংসাধর্মকে আবিষ্কার করেছেন, আমি তাঁদের নিউটনের চেয়েও মহত্তর প্রতিভার অধিকারী বলে মনে করি। তাঁরা ওয়েলিংটনের চেয়েও বড় যোদ্ধা। তাঁরা নিজেরা অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা এ বিদ্যার ব্যর্থতাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তারা এই ক্লান্ত বিশ্বকে শিখিয়ে গিয়েছেন—হিংসার মধ্যে নয়—অহিংসার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুক্তি।

কর্মময় পরিবেশে অহিংসার অর্থ সচেতন ভাবে ত্যাগ স্বীকার করা। পাপীর ইচ্ছার কাছে বিনম্র নতিস্বীকার এর অর্থ নয়। এর অর্থ হ'ল অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিজের সত্তার সর্বতোমুখী প্রতিরোধ খাড়া করা। এই মানবিক বিধি অনুযায়ী কাজ করে একক মানুষও তাঁর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, ধর্ম ও আত্মাকে বাঁচাবার জন্য এক মহাপরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াতে পারে; রুখে দাঁড়াতে পারে ঐ সাম্রাজ্যের পতন বা পুনরুজ্জীবনের পথ তৈরী করতে।

সুতরাং, ভারতকে দুর্বল বলে আমি অহিংসার আদর্শ অনুসরণ করতে বলছি না। আমি চাই, সে তার শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়েই অহিংসা অনুশীলন করুক। শক্তি উপলব্ধি করতে ভারতের অস্ত্র শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। নিজেকে একটা মাংসপিণ্ড বলে ভাবলেই—এধরনের প্রয়োজনীয়তার কথা মনে পড়ে। আমি চাই ভারত-আত্মার বিনাশ নেই—সর্বপ্রকার দৈহিক দুর্বলতা ও সমগ্র বিশ্বের শরীরিক শক্তির বিরুদ্ধে সে জয়ী হতে পারে—এই বোধে ভারত জেগে উঠুক। রাম একজন মানুষ। সে তার বানর সঙ্গীদের নিয়ে উত্তাল সমুদ্র বেষ্টিত লংকার আপাতঃ নিরাপত্তায় সুনিশ্চিত দশ মস্তকধারী রাবণের স্পর্দ্ধিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ঐ ঘটনার অর্থ কী? এ কি আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে শারীরিক শক্তিকে জয় করবার সত্যই ঘোষণা করছে? সে যাই হোক, বাস্তববাদী হিসাবে কবে ভারত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক-জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করবে আমি তার অপেক্ষায় থাকবো না। যদি ভারত নিজেকে শক্তিহীন বলে মনে করে, ইংরেজের মেশিনগান ট্যাংক ও এরোপ্লেনের সামনে সে যদি চলৎ শক্তিহীন হয়ে পড়ে এবং এই দুর্বলতার দরুনই যদি সে অসহযোগের আশ্রয় নেয়, ব্যাপকভাবে এর চর্চা করে তবে সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অর্থাৎ ব্রিটিশদের অন্যায়ের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি আসবে।

ভারত যদি অসিতত্ত্বকে আশ্রয় করে, তবে সাময়িক জয় তার করায়ত্ত হতে পারে। কিন্তু তখন, ভারত আর আমার গর্ব থাকবে না। ভারতের সঙ্গে আমার অস্তিত্ব

জড়িয়ে রয়েছে—কেননা, আমার যা কিছু সবই ভারতেরই। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, বিশ্বকে দেবার মতো ভারতের বিশেষ বাণী রয়েছে। ভারতের অন্ধ ভাবে ইউরোপকে অনুকরণ করলে চলবে না। ভারত যদি অসিতত্ত্বকে গ্রহণ করে, সেটা হবে আমার পরীক্ষার মুহূর্ত। এবং আশাকরি সেদিন আমি পিছিয়ে থাকবো না। আমার ধর্মের কোনো ভৌগলিক সীমা নেই, এধর্মে আমার বিশ্বাস যদি প্রাণবন্ত হয়, তবে তা আমার ভারত-প্রেমকে অতিক্রম করে যাবে। অহিংসা ধর্মের মাধ্যমেই ভারত সেবায় আমি আমার জীবনকে উৎসর্গ করেছি এবং আমি বিশ্বাস করি এই অহিংসাই হ'ল হিন্দু ধর্মের মূল কথা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১১.৮.১৯২০

যুদ্ধ সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভংগী

রেভারেণ্ড. বি. লিগ্‌ট ফরাসী পত্রিকা "এভল্যুশনে" অমার ন্যামে একটি খোলা চিঠি লিখেছেন। তিনি অনুগ্রহ করে এই চিঠির একটি অনুবাদও আমাকে পাঠিয়েছেন। ঐ খোলা চিঠিতে, বুয়র যুদ্ধে এবং তারপরে ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধে আমার অংশ গ্রহণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং অহিংসার আলোকে আমাকে ঐ আচরণের ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। অন্যান্য বন্ধুরাও এধরনের প্রশ্ন তুলেছেন। আমিও একাধিকবার এর উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি।

শুধুমাত্র অহিংসার মাপকাঠিতে বিচার করলে আমার ঐ আচরণের সমর্থনে কিছু বলবার নেই। যাঁরা ধ্বংসাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করেন এবং যাঁরা রেড ক্রশের কাজ করেন তাঁদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমি দেখতে পাই না। উভয়েই যুদ্ধে অংশ নেন এবং যুদ্ধের উদ্দেশ্যকেই সাহায্য করেন। উভয়েই যুদ্ধাপরাধে অপরাধী। বিগত বছরগুলির আত্মসমীক্ষার পরেও, আমি মনে করি, বুয়র যুদ্ধ, ইউরোপীয় মহাসমর এবং ১৯০৬ সালের নাতালের জুলু বিদ্রোহের সময় আমি যে পরিস্থিতির মধ্যে ছিলাম—সে অবস্থায় যে পথ আমি গ্রহণ করেছিলাম তা করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

বহুবিধ শক্তি জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যদি কেউ একটা বিশেষ মুহূর্তেও কোন কিছু ভেবে দেখবার প্রয়োজন নেই, এমন একটা সাধারণ নীতির ভিত্তিতে তার কর্মপন্থা স্থির করে নিতে পারেন তবে বলবো জীবনের গতি খুব সহজ ও সরল। আমি কিন্তু এমন একটি ক্ষেত্রও স্মরণ করতে পারছি না, যেখানে এত সহজে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

মনে প্রাণে যুদ্ধ বিরোধী হওয়ায় আমি কখনই নিজেকে ধ্বংসাত্মক শস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত করিনি, যদিও এ ধরনের শিক্ষার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। এই-জন্যই সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষভাবে মানবজীবন ধ্বংস করার কাজ আমি এড়িয়ে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আমি ক্ষমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা সরকারী কাঠামোর অধীনে রয়েছি এবং যতদিন ঐ সরকারের সৃষ্ট সুযোগ সুবিধা

আমি গ্রহণ করছি, ততদিন পর্যন্ত আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ সরকারকে সাহায্য করতে বাধ্য—এমন কি তা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও। যদি আমি ঐ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করি এবং ঐ সরকারের দেওয়া সুযোগ সুবিধা প্রত্যাখ্যান করি তা হলে অবশ্য আলাদা কথা।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। আমি এমন একটা সংস্থার সদস্য যার অধীনে কয়েক একর জমি রয়েছে। ঐ জমিতে ফসলও হয়েছে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বানরের উপদ্রব দেখা দিয়েছে। আমি প্রাণের পবিত্রতায় বিশ্বাসী। সুতরাং আমি মনে করি বানরকে আঘাত করলে অহিংসাধর্ম লংঘিত হবে। কিন্তু শস্য রক্ষার জন্য ঐ বানরগুলিকে আক্রমণ করতে উৎসাহিত বা পরিচালিত করায় আমি দ্বিধা করবো না। আমি পাপ এড়াতে চাই। ঐ সংস্থাটি ভেঙ্গে দিলে বা ত্যাগ করলে হয়তো তা এড়াতেও পারি। কিন্তু আমি তা করবো না। কারণ, আমি এমন একটা সমাজ খুঁজে পাবার আশা রাখি না—যেখানে কৃষি নেই এবং সেজন্য কোনরূপ জীবন-নাশও নেই। ভয়ে এবং কম্পিত বক্ষে, বিনম্র চিত্ত ও পাপ বোধ নিয়েই ঐ বানর নিধনে অংশ নেব—শুধুমাত্র এই আশায় যে একদিন হয়তো পথ খুঁজে পাবো।

এটা ঠিক যে, আমি তিনটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমি যে সমাজের সেই সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা পাগলামি হ'ত। আমি তা পারতাম না। আর ঐ তিনটি ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অ-সহযোগিতা করবার কোন চিন্তাও আমার মনে ছিল না। কিন্তু আজকে ঐ সরকার সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভংগী সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং ঐ সরকারের কোনো যুদ্ধে স্বেচ্ছায় আমি অংশ নেবো না। আমাকে যদি আজ অস্ত্র ধরতে বা অন্যভাবে সামরিক অভিযানে অংশ নিতে বাধ্য করবার চেষ্টা করা হয় তবে আমি কারাবাসের, এমন কি ফাঁসী যাওয়ার ঝুঁকিও গ্রহণ করবো।

কিন্তু এতেও প্রশ্নের মীমাংসা হচ্ছে না। জাতীয় সরকার হলে আমি সক্রিয়-ভাবে যুদ্ধে অংশ নেব না ঠিকই, কিন্তু, এমন একটা সময় আসতে পারে যখন যাঁরা সামরিক শিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক, তাঁদের ঐ সামরিক শিক্ষা দেওয়ার বিষয়টি সমর্থন করা আমার কর্তব্য হবে। কারণ আমি জানি ঐ সরকারের সমস্ত সদস্য, অহিংসায় আমি যতটা বিশ্বাসী ততটা বিশ্বাসী নাও হতে পারেন। কোনো ব্যক্তিকে বা সমাজকে জোর করে অহিংস করে তোলা যায় না।

অহিংসার কাজ অত্যন্ত রহস্যজনক। অহিংসা বলতে যা বুঝি, অনেক সময় দেখা যায়, কোনো মানুষের কাজ তা অস্বীকার করছে। আবার এমনও দেখা যায়, আপাতঃ দৃষ্টিতে যে কাজকে সহিংস বলে মনে হয়—তা হ'ল অহিংসারই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ—হয়তো পরবর্তীকালে এর প্রমাণও মেলে। সুতরাং, আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, আলোচ্য ক্ষেত্রগুলিতে আমার আচরণ অহিংসার স্বার্থেই নিয়মিত ছিল। এর পিছনে কোনো নোংরা কিছু বা অন্য কোনো স্বার্থের চিন্তা ছিল না। কোনো স্বার্থকে বলি দিয়ে জাতীয় বা অপর কোনো স্বার্থ রক্ষার প্রয়াসে আমি বিশ্বাসী নই।

আমি আমার যুক্তিকে প্রসারিত করতে পারছি না। ভাষাও মানুষের

চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। আমার কাছে অহিংসা, শুধুমাত্র একটা দার্শনিক নীতি নয়। এটা আমার জীবন ধারা—আমার শ্বাস-প্রশ্বাস। আমি জানি, আমি প্রায়ই ভুল করে থাকি—কখনও কখনও সচেতনভাবে, তবে অধিকাংশ সময়ই অজ্ঞানে। এটা যুক্তিতর্কের বিষয় নয়, অনুভূতির ব্যাপার। আত্মোৎসর্গের জন্য সদা প্রস্তুত থেকে এবং বিনম্র চিত্তে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরের অপেক্ষায় থাকলে প্রকৃত নির্দেশ পাওয়া যায়। এর জন্য দরকার অপরিসীম নির্ভীকতা ও সাহসিকতা। বেদনাদায়ক হলেও আমি আমার ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

কিন্তু আমার অন্তরে যে আলো রয়েছে—তা অকম্পিত ও উজ্জ্বল। অহিংসা ও সত্য ছাড়া আমাদের কারোরই বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। আমি জানি যুদ্ধ অন্যায় এবং পাপ। আমি এও জানি যে যুদ্ধকে বিদায় দিতেই হবে। আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসও পোষণ করি যে, রক্তপাত ও প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা—স্বাধীনতাই নয়। আমার বিরুদ্ধে যেসব কাজের অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলি প্রমাণিত হয় হোক, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে আমি আমার অহিংসার আদর্শের সঙ্গে আপোষ করেছি, অথবা হিংসা ও অসত্যের প্রশ্রয় দিয়েছি, এটা যেন আমার কোনো কাজের দ্বারা কখনও প্রমাণিত না হয়। হিংসা নয়, অসত্য নয়; অহিংসা ও সত্যই আমাদের সত্তার নিয়ম।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৩.৯.১৯২৮

অহিংসার কি কোনো সীমা আছে?

মাদ্রাজে জাস্টিস পার্টির কর্মীরা, নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস কর্মীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিলেন। কোনো কোনো কংগ্রেস কর্মীকে তাঁরা প্রহার করেছিলেন, মুখে থুথু ছিটিয়েছিলেন, দেহে মলমূত্র ফেলেছিলেন। জাস্টিস পার্টির এই কর্মীরা ছিলেন সংখ্যায় কম, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন কংগ্রেস কর্মীরা। কংগ্রেস কর্মীরা ইচ্ছা করলে বলপ্রয়োগ করে তাদের দমন করতে পারতেন। একজন পত্র-লেখক গান্ধীজীকে অনুরোধ করেছিলেন ঐ অবস্থায় কংগ্রেস কর্মীদের করণীয় কী তা জানাতে এবং অহিংসার আদর্শে কীভাবে তার ব্যাখ্যা করা যাবে তা-ও লিখতে।

গান্ধীজী লিখেছিলেন: অহিংসাকে সুবিধামত ব্যবহার করবার দিন বহু আগেই গত হয়েছে। যাঁরা অন্তর থেকে অহিংস হতে পারছেন না, তাঁদের পত্রলেখক বর্ণিত অবস্থাতেও অহিংস হবার কোনো দায়িত্ব নেই। যদিও অহিংসা কংগ্রেসের আদর্শ, তবুও কেউ আর অহিংস হওয়ার বা অহিংস হয়ে থাকার কথাও বলেন না। কংগ্রেস কর্মী যারা অহিংস, তাঁরা অহিংস হয়েছেন অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয় বলেই। সুতরাং আমি বেশ জোরের সঙ্গেই এই উপদেশ দিতে চাই যে, অহিংসার ব্যাপারে আমাকে বা আর কোনো কংগ্রেস কর্মীকে কিছু জানাবার দরকার নেই। প্রত্যেককেই তাঁর নিজের দায়িত্বে কাজ করতে হবে এবং নিজের ক্ষমতা ও

বিশ্বাসের ভিত্তিতে কংগ্রেসের নীতিকে বুঝে নিতে হবে। আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি যে, ভীরুতার দরুণ অনেকেই নিজেদের বা তাঁদের উপর যারা নির্ভরশীল তাঁদের সম্মান রক্ষা করতে না পেরে কংগ্রেসের আদর্শ বা আমার উপদেশের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছেন। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। অসহযোগ আন্দোলন তখন চরমে। বেতিয়ার কাছে একটি গ্রামে কয়েকটি বাড়ীতে সে সময় লুটপাট হয়। গ্রামবাসীরা তাঁদের স্ত্রী-পুত্র, সম্পত্তি সব কিছু লুটেরাদের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসেন। কর্ত্তব্যে অবহেলা করে কাপুরুষের মত এভাবে পালিয়ে আসার অভিযোগে আমি তাঁদের বকেছিলাম। তাঁরা নির্লজ্জের মতো অহিংসার দোহাই পেড়েছিলেন। আমি প্রকাশ্যে তাঁদের আচরণের নিন্দা করি এবং বলি যে, যাঁরা অহিংসা বোধ করেন না বা যাঁরা নারী ও শিশুদের সম্মান রক্ষার জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁদের আচরণ আমার অহিংসা আদর্শের চোখে অপরাধ নয়। অহিংসা কাপুরুষদের মুখোশ নয়, অহিংসা সাহসীদের সবচেয়ে বড় গুণ। যাঁরা অহিংসার চর্চা করবেন তাঁদের অসিযুদ্ধে নিপুণ ব্যক্তির চেয়েও অনেক বেশী সাহসী হতে হবে। ভীরুতার সঙ্গে অহিংসার কোনো সম্পর্কই নেই। অসিযুদ্ধে নিপুণ ব্যক্তি, সহজেই নিজেকে অহিংস করতে পারেন। সুতরাং অহিংসার মধ্যে আঘাত হানার ক্ষমতাও রয়েছে। অহিংসা হ'ল, প্রতিশোধ স্পৃহার উপর আরোপিত সচেতন ও ইচ্ছাকৃত সংযম। তবে, নিষ্ক্রিয়, নিবীর্য এবং অসহায় নতি স্বীকারের চেয়ে প্রতিশোধ স্পৃহা বরং শ্রেয়। অবশ্য কাল্পনিক বা বাস্তব অনিষ্টের আশংকা থেকেই প্রতিশোধ স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটা কুকুর যখন ভয় পায় তখনই সে চীৎকার ক'রে, কামড়ায়। যে মানুষ কাউকে এ দুনিয়ায় ভয় পায় না তার পক্ষে, কেউ তাকে আঘাত করবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেও, তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠা মুশকিল। কোনো শিশু সূর্য্যের দিকে ধুলো ছুঁড়লে, সূর্য্য তার প্রতিশোধ নেয় না। কিন্তু ক্ষতি হয় ঐ শিশুরই।

জাস্টিস পার্টির কর্মীদের কুকার্য্য সম্পর্কে পত্রলেখক যে বিবরণ দিয়েছেন, তা সত্যি কিনা আমি জানি না। হয়তো এ ছবির অন্য দিকও রয়েছে। কিন্তু ঐ বিবরণকে সত্য বলে ধরে নিয়ে—যাঁদের মুখে থুতু ফেলা হয়েছে, যাঁদের প্রহার করা হয়েছে বা যাঁদের গায়ে মলমূত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাতে পারি। প্রতিশোধ স্পৃহা দমন করে সাহসিকতার সঙ্গে তাঁরা যদি ঐ কষ্ট স্বীকার করে থাকেন, তবে তাঁদের কোনো অনিষ্ট হবে না। কিন্তু যদি তাঁরা বিক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েও নেহাৎ সুবিধাবাদের তাড়নায় প্রতিশোধ না নিয়ে ঐ কষ্ট ভোগ করে থাকেন তবে তাঁরা অন্যায় করেছেন। আত্মসম্মান বোধ সমস্ত রকমের সুবিধাবাদকেই ঘৃণা করে থাকে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না জাস্টিস পার্টির মুষ্টিমেয় কয়েকজন গুণ্ডাকে বহুগুণে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীরা কী শাস্তি দেবেন? তাঁরা কি মলমূত্রের বদলে মলমূত্র, থুথুর বদলে থুথু, গালা-গালির বদলে গালাগালি দেবেন? নাকি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন গুণ্ডাকে উপেক্ষা করলে, বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের দলটির আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে। অসহযোগ যখন ফ্যাসন ছিল, তখন যে সব গুণ্ডা সভায় উপদ্রব সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে

তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আমি তা জানি। স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের ঘিরে রাখতেন কিন্তু কোন আঘাত করতেন না; তারা চীৎকার করতে থাকলে তা উপেক্ষা করা হত। আমি এও জানি যে, সেদিন অনেক সময় অহিংসার নিয়ম মেনে চলা হ'ত না। যদি সভায় কেউ গোলযোগ সৃষ্টি করবার দুঃসাহস দেখাতো বা বিরুদ্ধে বলতো, তবে ক্রুদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠেরা চীৎকার করে তার বক্তব্য শুনতে দিতেন না। এমন কি সময় সময় তাঁদের পক্ষে সম্মানজনক নয় বা তাদের আন্দোলনের আদর্শ বিরুদ্ধ, এমন রূঢ়ভাবেও গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো। আমি এই কংগ্রেস কর্মীদের কাছে এবং ঐ পত্রলেখক যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের কাছে এই প্রস্তাব রাখতে চাই যে জাস্টিস পার্টির বা অন্য কোনো পার্টির কর্মীদের নিজেদের পথে আনাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে ঐ সব পার্টির সদস্যদের রূঢ় আচরণের জবাবে তাদের প্রতি সহৃদয় আচরণ করাই বাঞ্ছনীয় হবে। যদি সমস্ত বিরোধই দমন করতে হয় তবে দ্বিগুণ প্রতিশোধ গ্রহণ বা বলপ্রয়োগই বাঞ্ছিত উপায়। তবে, তাতে আমরা স্বরাজের নিকটবর্তী হ'ব কিনা—সেটা আলাদা প্রশ্ন।

কিন্তু যেখানে বিশ্বাসের দৃঢ়তা নেই—সেখানে আমার পরামর্শেরও কোনো দাম নেই। সুতরাং প্রতিটি কংগ্রেস কর্মীর উচিত সমস্ত দিক থেকে ভেবে নিয়ে নিজের পথ ঠিক করা এবং ফলাফল যাই হোক না কেন সেই পথে এগিয়ে যাওয়া। তা যদি করতে পারেন, তারা ভুল করলেও যথার্থ কাজ করবেন। বিনা বিশ্বাসে সযত্ন ও সঠিক আচরণের চেয়েও না-জেনে-করা হাজার হাজার ভুল অনেক শ্রেয়। দেশের প্রতি যদি আমরা খাঁটি হই দেশকে যদি আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পরিচালিত করতে চাই তবে সর্বাগ্রে আমাদের নিজেদের কাছে নিজেদের খাঁটি করে তুলতে হবে। অহিংসার সঙ্গে কোন ক্রমেই কপটতা চলবে না। এটা একটা পোশাক নয় যে ইচ্ছে মত পরবো, ইচ্ছা মতো খুলবো। হৃদয়ের গভীরে অহিংসার আসন পাততে হবে—এটা হবে অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংগ। **ইয়ং ইণ্ডিয়া ১২.৮.১৯২৬**

পথ : সহিংস ও অহিংস

ভারতে আমরা যে পথ গ্রহণ করেছি, তাতে জালিয়াতি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এবং হিংসার কুশ্রী প্রকাশের কোনো স্থান নেই। এখানে যা করা হচ্ছে—সবই প্রকাশ্যে করা হচ্ছে, কারণ সত্য গোপনীয়তাকে ঘৃণা করে। নিজেকে যতই প্রকাশ করা যাবে, তত বেশী আমরা সত্যপ্রিয় হয়ে উঠবো। যে মানুষ সত্য ও অহিংসাকে তাঁর জীবনের ভিত্তি করছেন, তাঁর অভিধানে পরাজয় বা নৈরাশ্যের মতো কোনো শব্দ নেই। কিন্তু তবুও অহিংস পথ কোনো ভাবেই নিষ্ক্রিয় পন্থা নয়। এটা মূলতঃ একটা সক্রিয় আন্দোলন—যে সব ঘটনার সঙ্গে রক্তপিপাসু অস্ত্রের ব্যবহার যুক্ত, তারচেয়েও অনেক বেশী সক্রিয়। পৃথিবীতে যত শক্তি আছে, তার মধ্যে বোধ করি সত্য ও অহিংসাই সবচেয়ে বেশী সক্রিয়। যে লোক অস্ত্রশস্ত্র নাড়াচাড়া করে, সে বাক্যে

তার শত্রু বলে মনে করে, তাকে ধ্বংস করতেই ঐ সব অস্ত্র প্রয়োগ করে। কিন্তু তারও কিছু বিশ্রামের দরকার হয়, অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পর পর কিছুক্ষণ তার অস্ত্রকেও বিশ্রাম দিতে হয়। সুতরাং দিনে কিছুক্ষণ সে মূলতঃ নিষ্ক্রিয় থাকে। কিন্তু সত্য ও অহিংস সাধকের ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। কারণ এগুলো বাইরের অস্ত্র নয়। কি জাগ্রত, কি নিদ্রিত অবস্থায় সত্য ও অহিংসা মানুষের অন্তরেই থাকে এবং নিরলস ভাবে কাজ করে চলে। অহিংসা ও সত্যের বর্মধারীযোদ্ধা সদা সক্রিয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৩১.১২.১৯৩১

সামরিক কৃত্যক ও অহিংসা

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন ইউরোপীয় মহাসমরের সময় জনগণকে যুদ্ধে অংশ না নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রশ্ন উঠেছিল—অস্ত্র না নিলেই কি অহিংস হওয়া যায়?

গান্ধীজী এর উত্তরে বলেছিলেন—আমার শুধু একটিই উত্তর, তা হ'ল ইউরোপ যদি আন্তরিক ভাবে ঐ পথ অনুসরণ করতে পারে, তার চেয়ে ভাল আর কিছুই হবে না। একজন মহাপুরুষ সম্পর্কে যদি এভাবে বলা যায় তবে আমি বলবো, আইনষ্টাইন ঐ পথটা আমার কাছ থেকে চুরি করেছেন। বিষয়টাকে যদি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, সেক্ষেত্রে আমি বলবো, সামরিক চাকুরী প্রত্যাখ্যান করাটাই সব নয়। একটা বিশেষ মুহূর্তে এসে পৌঁছানোর পর সামরিক কাজে অস্বীকৃতির অর্থই হ'ল—অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই করবার উপযুক্ত মুহূর্ত চলে যাওয়ার পর সেই কাজ করা। মূলে রোগটা রয়েছে গভীরে, সামরিক চাকুরী তার উপসর্গ মাত্র। আমি বলতে চাই, আপনারা যারা এখনও সামরিক কাজের তালিকায় নিজেদের নাম লেখান নি অথচ অন্য কোন ভাবে রাষ্ট্রকে সমর্থন করে চলেছেন সেই আপনারাও সমানভাবে যুদ্ধপরাধে অংশ নিচ্ছেন। প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক যিনি সামরিক দিক থেকে সুসংগঠিত একটি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন, তিনিও ঐ পাপের অংশভাগী। কর মিটিয়ে রাষ্ট্রের খরচ খরচায় জোগান দিয়ে প্রতিটি মানুষ—কি বৃদ্ধ কি তরুণ, সকলেই ঐ পাপের ভাগীদার হয়ে পড়ছেন। সেই জন্যই যুদ্ধের সময় আমি নিজেকে বুঝিয়েছি যে যেহেতু আমি সৈন্য না হয়েও সবকিছু করছি, সৈন্যবাহিনীর দেওয়া গম খাচ্ছি, কাজেই আমার সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এবং গুলি খাওয়া উচিত। অন্যথায় পাহাড় পর্বতে গিয়ে প্রকৃতিতে আপনি ফলা আহার্য্য গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং যারা সামরিক চাকরির ব্যাপারটাই বন্ধ করতে চান তারা তা করতে পারেন সমস্ত সহযোগিতা প্রত্যাহার করে। রাষ্ট্রকে সমর্থন করার জন্য, মদত জোগাবার জন্য সামগ্রিকভাবে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে অসহযোগিতা করার চেয়ে সামরিক কৃত্যক অস্বীকার করা অনেক বেশী লঘু ব্যাপার।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৩১·১২·১৯৩১

নিরস্ত্র নিরপেক্ষ দেশ ও অহিংসা

প্রশ্ন উঠেছিল—একটা নিরস্ত্র নিরপেক্ষ দেশ অপর দেশকে কী ভাবে ধ্বংস হতে দিতে পারে? গত যুদ্ধের সময় আমাদের সীমান্তে যদি সৈন্যবাহনী প্রস্তুত না থাকতো, তবে আমরা কি ধ্বংস হয়ে যেতাম না?

গান্ধীজীর উত্তর—আমাকে স্বপ্নালু বা নির্বোধ ভাববার ঝুঁকি থাকবে বটে, তবুও আমার পক্ষে একমাত্র যেভাবে চলা সম্ভব সেইভাবেই চলার চেষ্টা করছি। একটা নিরপেক্ষ দেশ একটা সৈন্যবাহিনীকে যদি তার প্রতিবেশী-দেশকে ধ্বংস করতে দেয় তবে তা কাপুরুষের মতো কাজ হবে। তবে যুদ্ধের সৈনিক এবং অহিংস সৈনিকের মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। আমি যদি সুইজারল্যান্ডের নাগরিক ও ফেডারেল স্টেটের প্রেসিডেন্ট হতাম তা হলে আমি যা করতাম তা হ'ল— আক্রমণকারীর সৈন্যবাহিনীর রসদ পৌঁছে দেবার পথ বন্ধ করে দিতাম। দ্বিতীয়তঃ সুইজারল্যান্ডে থার্মোপালির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিতার জীবন্ত প্রাচীর তৈরী করে সৈন্যবাহিনীকে আমাদের দেহের উপর দিয়ে যেতে বলতে পারতাম। হয়তো বলতে পারেন এটা সামরিক অভিজ্ঞতা ও সহ্য ক্ষমতার বাইরে, কিন্তু আমি বলছি তা নয়। এটা খুবই সম্ভব। গত বছর গুজরাটে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করে মেয়েরা অকম্পিত বক্ষে লাঠি চালনার মুখে রুখে দাঁড়িয়েছে, পেশোয়ারে হাজার হাজার লোক ঝাঁক ঝাঁক গুলিকে স্বাগত জানিয়েছে। এবার কল্পনা করুন, এইসব নরনারী একটা সৈন্যবাহিনী যে পথ দিয়ে অপর একটি দেশে প্রবেশ করবে সেই পথে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়েছে। হয়তো বলবেন সৈন্য-বাহিনী নিষ্ঠুর ভাবে এদের মাড়িয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আমি বলবো আপনারা নিজেদের ধ্বংস হতে দিয়ে আপনাদের কর্তব্য করেছেন। যে সৈন্যবাহিনী একবার সরল নরনারীর দেহ মাড়িয়ে যাবার দুঃসাহস করবে সে আর ঐ পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সাহস পাবে না। আপনারা হয়তো জনতার এতবড় সাহসের বিষয় বিশ্বাস করতে চাইবেন না। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে অহিংসা অনেক বেশী কঠিন ব্যাপার। অহিংসা দুর্বলের নয়, সবল হৃদয়ের অস্ত্র।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৩১.১২.১৯৩১

সমালোচনার জবাবে—

যুদ্ধরত দেশগুলি কেন যুদ্ধ করছে তা জানে না, একথা কেন আমি মনে করি তা বলছি। আমি "ইউরোপীয় জনগণ" কথাটা ব্যবহার করিনি, ব্যবহার করেছি "যুদ্ধরত দেশগুলি" সংজ্ঞা। এটা আমি করেছি কারণ আমি একটা জাতিকে এবং তার নেতাদের আলাদা করে দেখাতে চাই। এই নেতারা অবশ্যই জানে তারা কেন যুদ্ধ করছেন। তারা যে ঠিক করছেন একথা আমি বলছি না। তবে ইংরেজ, জার্মান বা ইটালিয়ানরা কেউই জানেন না কেন তারা যুদ্ধ করছেন। তাঁরা তাদের নেতাদের

বিশ্বাস করেন, সুতরাং তাঁদের অনুসরণ করে চলেছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই যে বর্তমানে যুদ্ধের মত নৃশংস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রশ্নে এইটাই যথেষ্ট নয়। জার্মান ও ইটালিয়ানরা এটা জানেন না যে কেন তারা ঠাণ্ডা রক্তে ইংরেজ শিশুদের হত্যা করবেন বা ইংরেজদের সুন্দর ঘরবাড়ীগুলি ধ্বংস করবেন। বুয়োর যুদ্ধের সময় আমি যখন বৃটিশ সৈন্যদের জিজ্ঞেস করেছিলাম তখন তারাও বলতে পারেননি কেন তারা যুদ্ধ করছেন। অবশ্যই কেনর উত্তর খোঁজা তাদের কাজ নয়। কোথায় তাদের অভিযানে পাঠানো হচ্ছে তাঁরা তাও জানেন না। আমি যদি লণ্ডনে থাকতাম এবং যদি বৃটিশ জনগণের কাছে জানতে চাইতাম কেন তাদের সৈন্যরা বার্লিনে আঘাত হানছে, সেক্ষেত্রে তারাও আমাকে বেশি কোন সদুত্তর দিতে পারতেন না। সংবাদপত্রের বিবরণ যদি বিশ্বাস করতে হয় তবে বুঝতে হবে বৃটিশদের নৈপুণ্যে ও বীরত্ব,—জার্মানরা লণ্ডনে যে ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষয়-ক্ষতি ঘটিয়েছে বার্লিনে। কিন্তু বৃটিশ জনগণের কাছে জার্মান জনগণ কী অপরাধ করেছে? তাদের নেতারা অপরাধ করেছেন, যেভাবে হোক তাদের ধ্বংস করুক। কিন্তু সাধারণ জার্মান জনগণের ক্ষতি করছেন কেন? উন্মাদ ধ্বংসের তাণ্ডবে যারা গৃহহীন হয়ে পড়েছেন, পিতৃমাতৃহীন হয়েছেন, যারা নিহত হয়েছেন তাদের কাছে একনায়কতন্ত্র বা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মতো পবিত্র নামগুলির আদৌ কোন তাৎপর্য আছে কি? আমি সবিনয়ে এবং সবরকম জোর দিয়েই বলতে চাই যে সরল মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়লে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র অপবিত্র হয়ে পড়ে। আমার কানের কাছে সব সময় খৃীষ্টের এই কথাটি অনুরণিত হয়, "আমার এই তথাকথিত শিশুরা জানে না তারা কী করছে। তারা মিথ্যেই আমার পিতার নাম নিচ্ছে কেননা তারাই আমার পিতার মূল আদেশকে লঙ্ঘন করছে।" আমার শ্রবণেন্দ্রিয় যদি আমাকে ঠকিয়ে না থাকে, বলবো আমি আদৌ কোন ভুল করে থাকলে সৎসঙ্গেই তা করেছি।

কিন্তু কেন এই সত্যকথন? কারণ আমি নিশ্চিত ঈশ্বর আমাকে উন্নততর পথ প্রদর্শনের মাধ্যম করেছেন। বৃটেন যদি ন্যায় বিচার চায় তবে তাকে পরিচ্ছন্ন চিত্তে ঈশ্বরের রাজকীয় আদালতে হাজির হতে হবে। যুদ্ধ সম্পর্কে বলা যায় যে একনায়কতন্ত্রী-ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে পারবে না। যুদ্ধে হিটলারকে হিটলারোচিত কাজের দ্বারা পরাজিত করে সে পিছিয়ে আসতে পারবে না। গত যুদ্ধের এইটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। যদি সে জয়ী হয়ই তবে তা হবে একটা মায়া। আমি জানি আমার একথাগুলি অরণ্যে রোদনের সামিল। কিন্তু একদিন না একদিন এগুলি সত্যি হয়ে দেখা দেবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে যদি প্রকৃতই রক্ষা করতে হয় তবে তা করবার একমাত্র উপায় হল অহিংস-প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এবং এই প্রতিরোধ হিংসাত্মক প্রতিরোধের চেয়ে কম বীরত্বপূর্ণ বা কম গৌরবোজ্জ্বল নয়, বরং অনেক বেশী সাহসিকতাপূর্ণ এবং গৌরবোজ্জ্বল কেননা এর দ্বারা জীবন না নিয়ে জীবন দেওয়া যায়।

হরিজন ২৯.৯.১৯৪০

ভারত ছাড় প্রস্তাব—১

প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার আগে আমি আপনাদের কাছে দু একটি বিষয়ের অবতারণা করছি। দুটি বিষয় আপনাদের খুব ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে এবং যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এই বক্তব্য রাখছি—সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তা বিচার করে দেখতে হবে। আমি বিষয়টিকে আমার দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে অনুরোধ করছি কারণ যদি আপনারা তা অনুমোদন করেন, তবে আমি যা বলবো আপনাদের তাই করতে হবে। এটা একটা গুরুদায়িত্ব। এমন কেউ কেউ আছেন যারা জানতে চান ১৯২০ সালে আমি যা ছিলাম আজও তাই আছি কিনা বা আমার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা। আপনারা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই এ প্রশ্ন তুলে থাকেন।

সবচেয়ে আগে আমি আপনাদের জানাতে চাই, ১৯২০ সালে আমি যে গান্ধী ছিলাম আজও তাই রয়েছি। মৌলিক কোনো বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আমার হয়নি। সে সময় অহিংসার উপর আমি যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছি, আজও তাই করি। বরং বলবো অহিংসার প্রতি আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। বর্তমান প্রস্তাব এবং আমার আগেকার কথা বা লেখার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।

বর্তমান ঘটনার মতো ঘটনা, প্রত্যেকের জীবনে সব সময়ে ঘটেনা, বরং কদাচ কারো জীবনে ঘটে থাকে। আজ আমি যা বলছি এবং করছি, আমি চাই, আপনারা জানুন এবং বুঝুন যে তাতে বিশুদ্ধ অহিংসা ছাড়া আর কিছু নেই। ওয়ার্কিং কমিটির খসড়া প্রস্তাবের ভিত্তি হ'ল অহিংসা এবং আমরা যে সংগ্রামের কথা ভাবছি তারও মূলে রয়েছে ঐ অহিংসা। সুতরাং আপনাদের মধ্যে যদি কেউ অহিংসায় বিশ্বাস হারিয়ে থাকেন বা এতে ক্লান্তি বোধ করেন, তবে তিনি যেন এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট না দেন।

আমি আমার বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছি। ঈশ্বর আমাকে একটি অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়েছেন—এটা হলো অহিংসার অস্ত্র। আমি এবং আমার অহিংসা আজ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। বর্ত্তমানের এই সংকট মুহূর্তে, সারা পৃথিবী যখন হিংসার অনলে দগ্ধ হচ্ছে, মুক্তির জন্য ক্রন্দন করছে সেই সময় আমি যদি আমার ঈশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধিকে কাজে লাগাতে না পারি তবে ঈশ্বর আমায় ক্ষমা করবেন না এবং আমি ঐ পরম সম্পদের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হবো। আমাকে এখন কাজ করতেই হবে। রাশিয়া ও চীন যখন বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে তখন আমি দ্বিধা করতে পারি না। শুধু মাত্র দর্শক হয়ে থাকতে পারি না।

* * * * *

আমাদের সংগ্রাম ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম নয়। এটা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সম্পূর্ণ অহিংস সংগ্রাম। হিংসাশ্রয়ী সংগ্রামে দেখা যায় অনেক সময় বিজয়ী সেনাপতি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কংগ্রেসের

বর্তমান পরিকল্পনায়, বিশেষ করে এর ভিত্তি যখন মূলতঃ অহিংস আদর্শ—একনায়কতন্ত্রের কোনো স্থান বা অবকাশ নেই। স্বাধীনতার একজন অহিংস সৈনিক নিজের জন্য কোনো কিছু লোভ করবেন না। তিনি সংগ্রাম করবেন শুধুমাত্র তার দেশের স্বাধীনতার জন্য। স্বাধীনতা অর্জনের পর, কে শাসন করবেন না-করবেন সে প্রশ্নের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো যোগ নেই। ক্ষমতা এলে, সে ক্ষমতার অধিকারী হবেন ভারতীয় জনগণ, তাঁরাই স্থির করবেন ঐ ক্ষমতার গুরুভার তাঁরা কার উপর ন্যস্ত করবেন। হয়তো শাসনভার অর্পিত হবে পার্শীদের হাতে (আমি অবশ্য এটাই দেখতে চাই) কিংবা আর কারো উপর যাদের নাম আজকের কংগ্রেসে শোনা যায় না। তখন কিন্তু আপনারা আপত্তি তুলতে পারবেন না যে এই গোষ্ঠী নিতান্তই সংখ্যালঘিষ্ঠ বা ঐ দল স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো যোগ্য ভূমিকা নেয় নি, সুতরাং তারা ক্ষমতা পাবে কেন? সূচনা-লগ্ন থেকেই কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কংগ্রেসের চিন্তাধারার লক্ষ্য ছিল সমগ্র জাতি এবং সেইভাবেই তার কর্মপ্রয়াস নিয়োজিত হয়েছে।

* * * * *

আমাদের অহিংসা চর্চার ত্রুটি বিচ্যুতি, ঐ আদর্শ থেকে আমরা কতদূরে রয়েছি, তা আমার জানা আছে। কিন্তু অহিংসার ক্ষেত্রে কোনো চূড়ান্ত ব্যর্থতা বা পরাজয় নেই। আমার বিশ্বাস আছে, সেই হেতু আমি মনে করি আমাদের দোষ ত্রুটি সত্বেও যদি বড় কিছু ঘটে যায় তবে তা হবে শুধু এই কারণেই যে, গত ২২ বছর ধরে আমরা যে নিঃশব্দ ও নিরলস সাধনা চালিয়ে যাচ্ছি তা সফল করে তুলতে ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করতে চান।

আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য আমাদের এই প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মতো আর কোনো সংগ্রামের নজীর নেই। আমি যখন জেলে ছিলাম, তখন আমি কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লব পড়েছি। পণ্ডিত জওহরলাল আমাকে রুশ বিপ্লবের কথাও কিছু কিছু বলেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যেহেতু এই সংগ্রামগুলি পরিচালিত হয়েছে হিংসাত্মক অস্ত্র দ্বারা সেই হেতু এর দ্বারা গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যর্থ হয়েছে। আমি যে গণতন্ত্রের কথা ভেবেছি তা প্রতিষ্ঠিত হবে অহিংস উপায়ে। সেই গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের সমান স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেকেই হবে তার নিজের প্রভু। এই ধরনের গণতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামেই আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি। এই গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা যদি আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন তবে দেখবেন আপনারা আর নিজেদের হিন্দু বা মুসলমান বলে ভাবতে পারছেন না, দেখবেন আপনারা নিজেদের সর্বজনীন স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যাপৃত ভারতীয় বলে ভাবছেন।

* * * * *

এইবারে আসছে ব্রিটিশদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন। আমি লক্ষ্য করেছি জনগণের মধ্যে ব্রিটিশদের সম্পর্কে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলে থাকেন—ব্রিটিশদের আচরণে তারা বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। জনগণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ জনগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করছেন না। তাদের কাছে দুই-ই এক। এই ঘৃণার দরুণ তারা এমন কি জাপানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। এটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। এর অর্থ হ'ল এক ক্রীতদাসত্বের বদলে আর এক ক্রীতদাসত্ব গ্রহণ করা। এই মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। আমাদের এই বিবাদ ব্রিটিশ জনগণের সঙ্গে নয়—আমাদের সংগ্রাম তাদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ শক্তি অপসারণের প্রস্তাব ক্রোধ থেকে আসেনি। বর্তমান সংকট মুহূর্তে ভারত যাতে যথাযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে তার জন্যই এই প্রস্তাব। সম্মিলিত শক্তি যখন যুদ্ধ পরিচালনা করছে তখন শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে সংগৃহীত অর্থ বা উপকরণ দিয়ে সাহায্য করাটা ভারতের মতো একটা বিরাট দেশের পক্ষে সুখের অবস্থা নয়। যতদিন আমরা স্বাধীন না হচ্ছি ততদিন এই যুদ্ধকে আমরা আমাদের যুদ্ধ বলে ভাবতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমাদের ত্যাগ ও বীরত্বের আদর্শও উজ্জীবিত হবে না। আমি জানি, আমরা যদি যথেষ্ট পরিমাণ আত্মত্যাগ করতে পারি তবে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে স্বাধীনতা থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখা ক্ষমতায় কুলোবে না। সুতরাং আমাদের নিজেদের ঘৃণা থেকে মুক্ত হ'তে হবে। নিজের কথা বলতে পারি আমি কখনও ঘৃণা বোধ করি না। প্রকৃতপক্ষে আমি নিজেকে আগের চেয়ে এখন অনেক বেশী—ব্রিটিশদের বন্ধু বলে মনে করি। এর একটা বড় কারণ হ'ল এই যে আজ তারা দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। সুতরাং আমার বন্ধুত্ব বোধ থেকেই আমি চেষ্টা করবো যাতে তারা ভুল করা থেকে বিরত হ'তে পারে। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, আমি মনে করি তারা আজ বিপর্যয়ের কিনারায় এসে উপস্থিত। সুতরাং আমার কর্তব্য এই বিপদ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে দেওয়া। এতে তারা ক্রুদ্ধ হতে পারে। এমন কি আমি যে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছি তাও তারা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। জনগণ পরিহাস করতে পারেন। আমি কিন্তু বন্ধুত্বের দাবীই রাখছি। এমন একটা সময় আসতে পারে যখন আমি আমাদের জীবনের বৃহত্তম সংগ্রাম শুরু করবো, কিন্তু তখনও আমি কারো বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব পোষণ করবো না।

[৮.৮.৪২ তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।]

ভারত ছাড় প্রস্তাব—২

এইমাত্র আপনারা যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। প্রস্তাবের স্বপক্ষে বিপুল সমর্থন আছে জেনেও যে তিনজন সাথী সাহসের সঙ্গে তাদের সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট দাবী করেছেন তাঁদের অভিনন্দন জানাই। যে ১৩ জন বন্ধু প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরও আমি অভিনন্দন

জানাচ্ছি। এসবের জন্য এদের লজ্জা পাবারও কিছু নেই। গত ২০ বছর ধরে আমরা এইটেই শেখবার চেষ্টা করে এসেছি যে আমাদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা যত নৈরাশ্য-ব্যঞ্জকই হোক না কেন, আমাদের যত উপহাসই করা হোক না কেন, আমরা তবুও সাহস হারাবো না। আমরা ঠিক পথেই চলেছি—এই আস্থার ভিত্তিতেই আমরা আমাদের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখতে শিখেছি। প্রত্যয়ের দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে, কারণ এর দ্বারাই মানুষ মহৎ হয়, তার নৈতিক মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। গত ৫০ বছর বা তার বেশী সময় ধরে আমি যে নীতি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছি, এই সব বন্ধুরা তাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন দেখে আমি আনন্দিত বোধ করছি।

সাহসিকতার জন্য এদের অভিনন্দন জানিয়ে আমি বলতে চাই যে সংশোধনী প্রস্তাব দ্বারা তাঁরা কমিটিকে যা বলবার চেষ্টা করেছেন, তা কিন্তু পরিস্থিতির সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে না। মৌলানা সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বলে যে আবেদন জানিয়েছিলেন এদের সে সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত ছিল। জওহরলাল যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাও এদের সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল। তাঁরা তা করলে বুঝতে পারতেন, কংগ্রেসের কাছে যে অধিকার তারা এখন চাইছেন, কংগ্রেস সে অধিকার তাঁদের আগেই দিয়েছেন।

একটা সময় ছিল যখন প্রতিটি মুসলমান সমগ্র ভারতবর্ষকেই তার মাতৃভূমি বলে মনে করতেন। আলী ভ্রাতারা যে সময় আমার সঙ্গী ছিলেন তখন তাঁদের কথাবার্তা ও আলোচনার মধ্যে ভারতবর্ষ যতটা মুসলমানের ঠিক ততটাই হিন্দুর, এই বোধ ফুটে উঠতো। আমি বহু বছর তাদের সঙ্গে ছিলাম। আমি সাক্ষী দিতে পারি মুখোশ নয়, তাদের আন্তরিক বিশ্বাসই ছিল ওই রকম। আমি বহুদিন বহুরাত্রি তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছি। এবং আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই যে তাঁদের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে তাঁদের বিশ্বাসেরই সততাপূর্ণ প্রকাশ ঘটতো। আমি জানি যে কেউ কেউ বলে থাকেন আমি বড় বেশী সহজে বিশ্বাস করি এবং আমাকে প্রতারিত করাও খুব সোজা। আমার এই সব বন্ধুরা আমাকে যতটা মনে করেন আমি কিন্তু নিজেকে ততটা সরল মনে করি না। অবশ্য এদের সমালোচনায় যে আমি আঘাত পাই তাও নয়। নিজে প্রবঞ্চক হওয়ার চেয়ে বরং সহজে প্রতারিত হওয়া আমি বেশী পছন্দ করি।

এই সব কম্যুনিষ্ট বন্ধুরা তাঁদের সংশোধনীর মাধ্যমে যা বলতে চেয়েছেন তা নূতন কিছু নয়। বহু মঞ্চ থেকে এসব কথা বারবার বলা হয়েছে। হাজার হাজার মুসলিম আমাকে বলেছেন যে সন্তোষজনক ভাবে যদি হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান করতেই হয় তবে তা করতে হবে আমার জীবদ্দশাতেই। এই তোষামদে আমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যে প্রস্তাব আমার যুক্তিকে নাড়া দেয় না তা আমি মেনে নিই কী করে? হিন্দু মুসলিম ঐক্য নূতন কোনো বিষয় নয়। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান এর জন্য চেষ্টা করছেন। আমিও আমার ছোটবেলা থেকেই সচেতনভাবে এই ঐক্যের জন্য চেষ্টা করে আসছি। যখন স্কুলে পড়তুম আমার লক্ষ্য ছিল সহপাঠী মুসলিম ও পার্শী ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা।

সেই অল্প বয়সেই আমি বিশ্বাস করতাম ভারতের হিন্দুরা যদি অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তি ও মৈত্রী নিয়ে বসবাস করতে ইচ্ছুক হয় তবে তাদের সযত্নে প্রতিবেশী-সুলভ গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে। আমি যদি হিন্দুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টা না করি তাতে কিছু যাবে আসবে না। কিন্তু অন্ততঃ কিছু সংখ্যক মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে। একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর পক্ষ সমর্থন করতেই ব্যবহারজীবী হিসেবে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমি অনেক মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। এমন কি আমার মক্কেলের বিরোধীপক্ষের সঙ্গেও। সকলেই আমার সততা ও বিশ্বাসপরায়ণতার প্রশংসা করেছিলেন। আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে মুসলিমদের মতো পার্শীরাও ছিলেন। আমি তাঁদের হৃদয় জয় করেছিলাম। যখন আমি শেষবারের মতো ভারতে চলে আসি তারা দুঃখিত হয়েছিলেন, বিচ্ছেদ বেদনায় চোখের জল ফেলেছিলেন।

ভারতে আমি এই হিন্দু মুসলিম ঐক্য অর্জনের জন্য কোনো প্রচেষ্টাই বাকি রাখিনি। আমার এই আকাংখার জন্যই আমি খিলাফত আন্দোলনের সময় মুসলমানদের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করেছিলাম। দেশের মুসলিম জনগণও আমাকে তাদের প্রকৃত বন্ধু বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু এটা কী করে হল যে, এখন আমি তাঁদের কাছে এত মন্দ বলে বিবেচিত হচ্ছি? খিলাফত আন্দোলন সমর্থনের পিছনে আমার কি অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল? সত্যি আমি আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই আশাই পোষণ করেছিলাম যে এর ফলে হয়তো আমি গো-রক্ষা করতে পারবো। আমি গো-উপাসক। আমি এবং গাভী একই ঈশ্বরের সৃষ্টি। গো-রক্ষার জন্য আমি আমার জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার জীবনদর্শন বা চুড়ান্ত আশা যাই হোক না কেন, দরকষাকষির কোনো মনোভাব নিয়ে আমি ঐ আন্দোলনে যোগ দিই নি। আমার প্রতিবেশী যারা দুর্দশাগ্রস্ত তাঁদের প্রতি আমার দায়িত্ব পালন করবার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই আমি খিলাফতের সংগ্রামে সহযোগিতা করেছিলাম। আলীভ্রাতারা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তবে তাঁরা আমার বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য দিতেন। শুধু তারাই বা কেন আরও অনেকেই হয়তো বলবেন গো রক্ষার জন্য দরকষাকষি করবার উদ্দেশ্যে আমি খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিই নি। গাভীর মত খিলাফতেরও নিজস্ব মূল্য রয়েছে। একজন সৎলোক, প্রকৃত প্রতিবেশী এবং বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে, সংকট মুহূর্তে মুসলিম জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য ছিল।

সেই দিনগুলিতে আমি মুসলমানদের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করে হিন্দুদের মনেও আঘাত দিয়েছিলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজ তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মওলানা বারী আমায় বলেছিলেন যে তিনি আমাকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন, কিন্তু পাছে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কোনোদিন দুরভিসন্ধিমূলক চক্রান্তের অভিযোগ আনেন তাই তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে আহার করতে দেবেন না। সুতরাং আমি যখনই তাঁর সঙ্গে থাকতাম তিনি একজন ব্রাহ্মণ পাচক নিয়োগ করে আমার রান্নার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতেন। তার বাড়ী 'ফিরিঙ্গি

মহল' একটা পুরোনো বাড়ী। জায়গাও ছিল অল্প। তবুও প্রফুল্ল মনে কষ্ট স্বীকার করে তার সংকল্প পালন করতেন—আমি তাকে বিরত করতে পারিনি। সেই সব দিনে সৌজন্য মর্য্যাদা ও মহত্বের একটা আদর্শে আমরা উদ্বুদ্ধ ছিলাম। এক সম্প্রদায়ের লোক আর এক সম্প্রদায়ের মানুষকে ঠাঁই দেবার জন্য একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়ে দিতেন। তাঁরা একে অপরের ধর্মীয় অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করতেন এবং এই শ্রদ্ধাবোধকে ভাগ্য বলে মানতেন। কারও মনে সন্দেহের লেশমাত্র চিহ্নও ছিল না। কিন্তু মনের সেই মর্য্যাদা ও মহত্ত্ববোধ আজ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল? কায়েদে আজম জিন্না সহ সকল মুসলমানকেই আমি অনুরোধ করবো সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা স্মরণ করতে এবং কেন এই অচল অবস্থার সৃষ্টি হল, তা খুঁজে দেখতে। কায়েদে আজম জিন্না নিজেই একদিন কংগ্রেস কর্মী ছিলেন। আজ যদি কংগ্রেস তার ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে তার মনে সন্দেহের বিষ ঢুকেছে। ঈশ্বর তাঁকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, কিন্তু আমি যখন থাকবো না, তখন তিনি উপলব্ধি করবেন যে মুসলমানদের সম্পর্কে আমার কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না; আমি কখনো তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিনি। তাঁদের আদর্শে আঘাত করে বা স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে আমি কোথায় পালাবো? আমার জীবন তো তাদের হাতে; যখনই তারা ইচ্ছে করবেন তখনি বিনা বাধায় এই জীবনকে স্তব্ধ করে দিতে পারবেন। অতীতেও আমার প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ঈশ্বর আমায় এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং আক্রমণকারীরাই তাঁদের কাজের জন্য অনুশোচনা করেছেন। একজন দুর্বৃত্তের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছি মনে করে কেউ যদি আমায় গুলি করেন তবে যাঁকে তিনি দুর্বৃত্ত বলে ভাবছেন তাঁকেই হত্যা করবেন—প্রকৃত গান্ধীকে নয়।

যারা কাদাছোঁড়া ও অপবাদ প্রচারের অভিযানে নেমেছেন তাদের উদ্দেশে আমি বলবো এমন কি শত্রুর নামেও নিন্দা না করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছেন। যারা শত্রু, পয়গম্বর সহৃদয়তা দিয়ে তাদেরও হৃদয় জয় করবার চেষ্টা করেছেন—তাঁদের সঙ্গে উদার আচরণ করেছেন। আপনারা কি সেই ইসলামকেই অনুসরণ করে চলেন? যদি আপনারা সত্যিকারের ইসলাম অনুরাগী হন, তাহলে যে প্রকাশ্যে তার বিশ্বাস ঘোষণা করেছে তার কথায় অবিশবাস করা কি আপনাদের সাজে! আপনারা শুনে রাখুন, যিনি আপনাদের নিষ্ঠাবান বন্ধু ছিলেন তাকে হত্যা বা অবিশ্বাস করেছিলেন ভেবে একদিন আপনাদের অনুশোচনা করতে হবে। আমি ও মওলানা যতই আপনাদের আবেদন জানাই, দেখতে পাই, ততই নিন্দা প্রচার বেড়ে চলেছে। এতে আমি ব্যথিত হই। আমার কাছে এইসব গালাগালি বুলেটের মত। একটি বুলেট যেমন আমাকে হত্যা করতে পারে তেমনি এই গালাগালিও। আপনারা আমাকে হত্যা করুন তাতে আমি আঘাত পাবো না। এভাবে গালাগালি করে কি কোনো লাভ হয়? এর দ্বারা ইসলামেরই অসম্মান করা হয়। পবিত্র ইসলামের নামে আমি আবেদন জানাচ্ছি এই সব গালাগালি, অপবাদ প্রচার থেকে বিরত হোন।

মওলানা সাহেবকেই কদর্যতম গালাগালির লক্ষ্য করা হয়েছে। কেন? কারণ, তিনি আমার উপর তাঁর বন্ধুত্বের চাপ সৃষ্টি করতে অস্বীকার করেছেন। একজন

বন্ধু যাকে অসত্য বলে জানে, তাকে তা সত্য বলে মেনে নিতে বাধ্য করার চেষ্টা করলে বন্ধুত্বেরই অবমাননা করা হয় মওলানা একথা জানেন।

কায়েদে আজমের প্রতি আমি বলবো : পাকিস্তান দাবীর পিছনে যতটুকু সত্য ও যুক্তিসংগত বস্তু রয়েছে তা আপনারা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন। যা অন্যায় এবং গ্রহণযোগ্য নয় তাকে উপহার সামগ্রীতে পরিণত করে আপনাকে দেওয়া যায় না। যদি কেউ অন্যের উপর অসত্যের বোঝা চাপিয়ে দেয়ও, তবুও সে দীর্ঘদিন তার সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। ঈশ্বর আত্মম্ভরিতা অপছন্দ করেন; তা থেকে দূরে থাকেন। জোর করে অসত্যের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া ঈশ্বর বরদাস্ত করবেন না।

কায়েদে আজম বলেছেন যে তিনি তার চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ না করে পারেন না বলেই কটু কথা বলতে বাধ্য হন। অনুরূপ ভাবে আমিও বলবো, আমি নিজেকে মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করি। সুতরাং তাঁদের অসন্তুষ্টির ঝুঁকি নিয়েও আমি আমার মনের কথা প্রকাশ করবো না কেন? আমার মনের গভীরে যা রয়েছে তা আমি তাদের কাছে লুকিয়ে রাখবো কী করে? শ্রোতার কানে তিক্ত শোনালেও, অকপট ভাবে মনোভাব ও অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য আমার উচিত হবে কায়েদে আজমকে অভিনন্দন জানানো। তবুও সঙ্গে সঙ্গে বলবো, যে সব মুসলমান তার সঙ্গে একমত নন, যারা এখানে বসে রয়েছেন কেনই বা তাদের নিন্দা করা হবে। যদি লক্ষ লক্ষ মুসলমান আপনার অনুগামী হয়, তবে মুষ্টিমেয় যে কজন মুসলিম আপনার মতে বিপথগামী, তাদের উপেক্ষা করতে পারছেন না কেন? যার পিছনে কয়েক লক্ষ মানুষের সমর্থন রয়েছে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের বা সংখ্যালঘিষ্ঠকে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রাস করে ফেলবে—এ সব ভয়ে ভীত হবেন কেন? আরব বা মুসলমানদের মধ্যে কীভাবে পয়গম্বর কাজ করেছেন? কীভাবে তিনি ইসলাম প্রচার করেছেন? তিনি কি বলেছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তবে তিনি ইসলাম প্রচার করবেন? ইসলামের নামে আমি আপনাকে অনুরোধ করি—আমি যা বলছি তা ভেবে দেখুন। কংগ্রেস যা বিশ্বাস করে না, যা তার নীতি বিরোধী—কংগ্রেসকে তাই গ্রহণ করতে বলার পিছনে কোন যুক্তি বা ন্যায় থাকতে পারে না।

রাজাজী বলেন : "আমি পাকিস্তান বিশ্বাস করি না। কিন্তু মসুলমানরা এটা চান, মিঃ জিন্নাও চান এবং এই দাবী তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে। তাহ'লে আপনি এখনই তাঁদের হ'্যা বলছেন না কেন? পরে এই মিঃ জিন্না পাকিস্তানের অসুবিধা উপলব্ধি করবেন এবং ঐ দাবী ত্যাগ করবেন।' কিন্তু আমি বলি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার সময় এলে ঐ দাবী মেনে নেওয়া সম্পর্কে পীড়াপীড়ি করা হবে না, এ বিশ্বাসে যা আমি অসত্য বলে মনে করি তাকে সত্য বলে গ্রহণ করা, বা, অপরকে তা গ্রহণ করতে বলাটা আমি ন্যায়সঙ্গত হবে বলে মনে করি না। আমি যদি ঐ দাবী ন্যায্য বলে মনে করতাম, তাহলে এই মুহূর্তেই আমি তা মেনে নিতাম। শুধু জিন্না সাহেবকে তোষামোদ করবার জন্যই আমি এটা মেনে নিতে পারি না। মিঃ জিন্নাকে তোয়াজ করতে, তাঁর মন থেকে সন্দেহ দূর করতে এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হয় তা যাচাই করে দেখবার জন্য অনেক বন্ধুই আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে

সাময়িক ভাবে পাকিস্তান দাবী গ্রহণ করতে বলেছেন। কিন্তু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত একটা ব্যাপারে আমি নিজেকে শরিক করতে পারি না। আর যাই হোক না কেন, অন্ততঃ এটা আমার পথ নয়।

সিদ্ধান্ত রূপায়ণে নৈতিক শক্তি ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনো শক্তি নেই। কংগ্রেস বিশ্বাস করে একমাত্র অহিংসার ভিত্তিতেই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে হিংসাকে সম্পূর্ণ পরিহার করে, একমাত্র অহিংসার ভিত্তির উপরেই বিশ্বসংঘের বা বিশ্বরাষ্ট্রের কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব। এ যদি সত্য হয়, তাহলে হিংসার আশ্রয় নিয়েও হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান করা যাবে না। হিন্দুরা যদি মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে তবে কোন্ মুখে তাঁরা বিশ্ব রাষ্ট্রের কথা বলবেন? ঠিক এই একই কারণে হিংসার দ্বারা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনায় ইংরেজ ও আমেরিকান রাজনীতিকরা চললেও আমি তাতে বিশ্বাস করি না। কংগ্রেস বিরোধীয় বিষয়গুলি একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে পেশ করতে এবং এই ট্রাইব্যুনালের রায় মেনে নিতে রাজী আছে। যদি এই অত্যন্ত ন্যায্য প্রস্তাবটিও গ্রহণযোগ্য না হয় তবে একটি পথই খোলা থাকে সে পথ তরবারির—সে পথ হিংসার। এমন একটি অসম্ভব ব্যাপারে আমি কী করে নিজেকে রাজী করাই? একটা জীবন্ত সত্তাকে কেটে ফেলার অর্থই হ'ল তার প্রাণ নাশ করা। এটা একরকম যুদ্ধ আহ্বান। কিন্তু কংগ্রেস ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে পক্ষ হ'তে পারে না। ডঃ মুঞ্জে, শ্রীসাভারকারের মতো যে সব হিন্দু অসি-তত্ত্বে বিশ্বাসী তারা মুসলমানকে হিন্দু-দের কর্তৃত্বে রাখার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু আমি এই দলের নই। আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করি। যে হংস স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব করে সেই হংসটির মতো এই কংগ্রেসকেই আপনারা হত্যা করতে চাইছেন। যদি আপনারা কংগ্রেসকে অবিশ্বাস করেন তাহলে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে হিন্দু মুসলিম লড়াই চিরস্থায়ী হবে এবং গোটা দেশ এক নিরবিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয়ের মধ্যে গিয়ে পড়বে। আমাদের ভাগ্যে যদি এই ধরনের সংঘর্ষের কাল ঘনিয়ে আসে, তা দেখবার জন্য আমি বেঁচে থাকবো না।

এইজন্যই আমি জিন্না সাহেবকে বলেছিলাম: আপনি জেনে রাখতে পারেন আপনার পাকিস্তান দাবীর যেটুকু ন্যায় ও সুবিচারসম্মত সেটুকু আপনি পেয়েই গেছেন, কিন্তু ঐ দাবীর যেটুকু ন্যায় ও সুবিচার বিরুদ্ধ সেটুকু পেতে হলে তরবারি দিয়ে তা সংগ্রহ করতে হবে, অন্যভাবে নয়।

আমার মনে অনেক কথা জমে রয়েছে—আমি এই সমাবেশে সে সব বলতে চাই। যেটা সবচেয়ে বড় কথা সেটা আমি আগেই বলেছি। আপনারা জেনে রাখতে পারেন এটা আমার কাছে জীবন মরণের প্রশ্ন। যদি আমরা হিন্দু মুসলিম সবাই হৃদয়ের ঐক্য অর্জন করতে চাই তবে কোনো পক্ষেরই মনে কোনো দ্বিধা রাখলে চলবে না. এই সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ভারতের কিছু অংশ নিয়েই যদি পাকিস্তান গড়তে হয় তবে ভারতের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের যোগ দিতে বাধা কোথায়? তাই সর্বপ্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হতে

হবে। জিন্না সাহেব মনে করেন যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলবে। আমি তাঁর সঙ্গে এক মত নই। যুদ্ধ যদি ছয় মাসেরও বেশী স্থায়ী হয় তবে, চীনকে আমরা রক্ষা করবো কী করে?

সুতরাং আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই—সম্ভব হলে এই রাত্রেই, ভোর হবার আগে। স্বাধীনতা এখন আর সাম্প্রদায়িক মৈত্রী অর্জনের অপেক্ষায় থাকতে পারে না। ঐ ঐক্য যদি অর্জিত না হয়, তাহলে অন্য সময় যা লাগতো তার চেয়ে অনেক বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস হয় স্বাধীনতা অর্জন করবে, না হয়তো এ সংগ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ভুলে যাবেন না, কংগ্রেস যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে, সেই স্বাধীনতা অর্জিত হ'লে শুধু কংগ্রেস কর্মীরাই তো ভোগ করবেন না, ৪০ কোটি ভারতীয় জনগণও সেই স্বাধীনতা ভোগ করবেন। কংগ্রেস কর্মীরা চিরদিন জনগণের সেবক হয়েই থাকবেন।

কায়েদে আজম বলেছেন—ব্রিটিশরা মুসলমানদের হাত থেকেই সাম্রাজ্য নিয়েছিল। আজ যদি তারা মুসলিম লীগকে তা ফিরিয়ে দিতে রাজী থাকে, তাহলে মুসলিম লীগও ব্রিটিশদের কাছ থেকে শাসনভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। সেক্ষেত্রে এটা হবে মুসলিম-রাজ। মওলানা সাহেব এবং আমি যে প্রস্তাব দিয়েছি তাতে মুসলিম-রাজ বা মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কথা নেই। কংগ্রেস কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আধিপত্যে বিশ্বাসী নয়। কংগ্রেস গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আর এই গণতন্ত্রে এই বিরাট দেশে বসবাসকারী মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদি—সকলেরই স্থান রয়েছে। যদি মুসলিম রাজ অনিবার্য্য হয় তাহলে তাই হোক, কিন্তু আমরা কী করে তাতে সম্মতির সীল দেব? আমরা কী করে এক সম্প্রদায়ের উপর আর এক সম্প্রদায়ের আধিপত্য করায় রাজী হবো?

এদেশের লক্ষ লক্ষ মুসলমান হিন্দু বংশোদ্ভূত। ভারত ছাড়া আর কোন্ দেশ তাঁদের বাসভূমি হতে পারে? আমার জ্যেষ্ঠপুত্র কয়েক বছর আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কোনটা তার বাসভূমি—পোরবন্দর না পাঞ্জাব? আমি মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতে চাই—ভারত যদি আপনাদের দেশ না হয় তবে আপনারা কোন্ দেশের মানুষ? আমার যে পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন তার জন্য আপনারা কোন্ পৃথক বাসভূমির ব্যবস্থা করবেন? তার মা তাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন ধর্মান্তরিত হওয়ার পর সে মদ্যপান ত্যাগ করেছে কিনা, কারণ ইসলাম মদ্যপান বর্জন করবার নির্দেশ দিয়েছে। যাঁরা তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণে খুশী হয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি ঐ চিঠিতে বলেছিলেন—তার মুসলমান হওয়াতে আমার এতটা আপত্তি নেই, যতটা আপত্তি রয়েছে তার মদ্যপানে। মদ্যপান বরদাস্ত করবেন না। পানাসক্ত হয়ে সে নিজেকে দুশ্চরিত্রে পরিণত করেছে। যদি আপনারা তাকে আবার মানুষ করে তুলতে চান, তবে তাকে ভালোর দিকে নিয়ে চলুন। সুতরাং আপনারা অনুগ্রহ করে দেখবেন, মুসলমান হওয়ার পর যেন পান ও নারী আসক্তি থেকে মুক্তি পায়। যদি এই পরিবর্তন না আসে, তবে বলতে হবে, তার ধর্মান্তরিত হওয়া ব্যর্থ হয়েছে। এবং তার সঙ্গে আমাদের অসহযোগিতা চলতেই থাকবে।

ভারত সন্দেহাতীত ভাবেই এদেশে বসবাসকারী সমস্ত মুসলমানদের বাসভূমি। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানেরই কর্তব্য ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগিতা করা। কংগ্রেস কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের নয়, কংগ্রেস সমগ্র জাতির। মুসলমানরাও কংগ্রেসের দখল নিতে পারেন। ইচ্ছা করলে বিপুল সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে, তাঁরা তাঁদের পছন্দসই পথে কংগ্রেসকে পরিচালিত করতে পারেন।কংগ্রেস শুধু হিন্দুদের তরফ থেকেই সংগ্রাম করছে না, সংখ্যালঘু সহ সমগ্র জাতির পক্ষ থেকেই সে সংগ্রামে অবতীর্ণ। একজন কংগ্রেস কর্মীর হাতে একজন মুসলমান নিহত হওয়ার একটি ঘটনাও শুনতে পেলে আমি ব্যথিত বোধ করবো। আগামী বিপ্লবে কংগ্রেস কর্মীরা হিন্দুর আক্রমণ থেকে মুসলমানকে এবং মুসলমানের আক্রমণ থেকে হিন্দুকে রক্ষা করবেন। এটা তাঁদের আদর্শেরই অংগ এবং অহিংসার অন্যতম সর্ত। আশা করবো এ ধরনের ঘটনা ঘটলে, আপনারা বিচার বুদ্ধি হারিয়ে বসবেন না। হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন, প্রতিটি কংগ্রেস কর্মীর তাঁদের সংগঠনের প্রতি এইটেই কর্তব্য। যে মুসলমান এইভাবে কাজ করবেন, তিনি ইসলামেরই সেবা করবেন। দেশব্যাপী আসন্ন চূড়ান্ত সংগ্রামে সাফল্যের প্রধানতম সর্ত হ'ল পারস্পরিক বিশ্বাস।

আমি আগেই বলেছি, মুসলিম লীগ ও ইংরেজদের দিক থেকে বিরোধিতা আসায় এবারের এই সংগ্রামে আমাদের অনেক বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। স্যার ফ্রেডারিক পাক্‌ল যে গোপন সার্কুলার প্রচার করেছেন—আপনারা তা দেখেছেন। তিনি আত্মঘাতী পথ গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে লড়বার জন্য ব্যাঙের ছাতার মতো যে সব সংগঠন গজিয়ে উঠেছে ঐ সার্কুলারে তাদের খোলাখুলিভাবে উস্কানি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের এমন এক রাজশক্তির মোকাবিলা করতে হবে যা বাঁকা পথে চলে। কিন্তু আমাদের পথ সোজা—চোখ বাঁধা অবস্থাতেই সে পথে চলতে পারি। এইটেই সত্যাগ্রহের সৌন্দর্য্য।

সত্যাগ্রহে প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবাদিতা বা কোনো ধরনেরই অসত্যের স্থান নেই। প্রবঞ্চনা ও অসত্য পৃথিবী ছেয়ে ফেলেছে। এ অবস্থায় আমি নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। আমি সারা ভারত যেভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি—তেমন করে বোধ করি বর্তমান যুগে আর কেউ তা করেন নি। এদেশের কোটি কোটি মূক মানুষ আমাকে তাঁদের বন্ধু হিসেবে—প্রতিনিধি হিসেবে দেখেছেন। আমিও একজন মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব তাঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছি। আমি তাঁদের চোখে বিশ্বাস দেখেছি। আর এই বিশ্বাসকেই আমি অসত্য ও হিংসার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সৎকর্মে নিয়োগ করতে চাই। রাজশক্তির প্রস্তুতি যত বিরাটই হোক না কেন, আমাদের তার কবল থেকে মুক্তি পেতেই হবে। এই চরম মুহূর্তে কী করে আমি চুপ করে থাকি? দাহ্য পদার্থের আড়ালে কী করে তাদের লুকিয়ে রাখবো? আমি কি জাপানীদের কিছু অপেক্ষা করতে বলবো। সমগ্র বিশ্বকে যখন মহাসমর ঘিরে ফেলেছে সেই সময় আমি যদি ঈশ্বরের প্রদত্ত সম্পদ ব্যবহার না করে শান্ত ও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকি তাহলে ঈশ্বরই আমাকে ভৎর্সনা করবেন। পরিস্থিতি যদি অন্যরকম হ'তো—আমি আপনাদের আরও অপেক্ষা করতে বলতাম। কিন্তু অবস্থা আজ অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কংগ্রেসের সামনেও

আর কোনো বিকল্প পথ খোলা নেই।

সে যাই হোক। প্রকৃত সংগ্রাম এই মুহূর্তে শুরু হচ্ছে না। আপনারা আমাকে আপনাদের সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছেন। আমি এখন বড়লাটের জন্য অপেক্ষা করবো। তাঁকে কংগ্রেসের দাবী মেনে নিতে অনুরোধ জানাবো। এতে দু-তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। এই সময়টুকু আপনারা কী করবেন? এই বিরতির সময়টুকুতে আমরা এমন কী কার্য্যসূচী নিতে পারি যাতে আমরা সবাই অংশ নিতে পারবো? আপনারা জানেন, চরখার কথাই আমার সর্বাগ্রে মনে পড়ে। আমি মওলানাকেও এই কথাই বলেছি। তাঁর হয়তো একটি চরখাও নেই তবু তিনি পরে এর তাৎপর্য্য বুঝতে পেরেছেন। ১৪ দফা গঠনমূলক কার্য্যক্রম তো আপনাদের সামনেই রয়েছে। এ ছাড়া আর কী করবেন? আমি সেই কথাই বলছি। আপনারা প্রত্যেকে এই মুহূর্ত থেকে নিজেকে এই সাম্রাজ্যবাদের পদানত নয় বলে মনে করবেন—মনে করবেন আপনারা স্বাধীন নর বা নারী এবং একথা মনে রেখেই কাজ করবেন।

আমি আপনাদের আজগুবি কোনো কথা বলছি না। স্বাধীনতার এইটেই মূল কথা। একজন ক্রীতদাস যে মুহূর্তে নিজেকে স্বাধীন মানুষ বলে মনে করে, সেই মুহূর্তেই তার দাসত্ব শৃঙ্খল ছিঁড়ে পড়ে। সে শুধু সরলভাবে তার প্রভুকে জানিয়ে দেয়, "এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আপনার দাস ছিলাম, কিন্তু আর নই। ইচ্ছে করলে আপনি আমাকে মেরেও ফেলতে পারেন আবার বাঁচিয়েও রাখতে পারেন। আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই আপনি যদি নিজে থেকে আমাকে আপনার বন্ধন থেকে মুক্তি দেন—তবে আমি অতিরিক্ত কিছুই চাইব না। আপনি আমাকে খাইয়েছেন—পরিয়েছেন। অবশ্য আমি আমার শ্রমের দ্বারা এই আহার্য্য ও পরিধানের ব্যবস্থা করতে পারতাম। এতদিন আমি আহার্য্য ও পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করে আপনার উপর নির্ভর করেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরই এখন আমাকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং আমি আজ থেকে স্বাধীন মানুষ, আপনার উপর নির্ভরশীল নই।"

আপনারা একথা জেনে রাখুন, মন্ত্রিত্ব বা অন্য কিছুর জন্য আমি বড়লাটের সঙ্গে দরকষাকষি করবো না। পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হবো না। হয়তো তিনি লবণ কর রদ বা মাদকতা বর্জন প্রভৃতির প্রস্তাব করবেন। কিন্তু আমি শুধু বলবো—'স্বাধীনতার কমে কিছুতেই হবে না।'

আমি আপনাদের একটা মন্ত্র দিচ্ছি—একটা সংক্ষিপ্ত মন্ত্র। এই মন্ত্র আপনাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হোক, প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রকাশিত হোক। মন্ত্রটি হ'ল—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। হয় আমরা ভারতকে স্বাধীন করবো, না হয়তো এই চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করবো। দাসত্ব স্থায়ী হবে এ দেখবার জন্য আমরা বেঁচে থাকবো না। দেশকে দাসত্ব ও পরাধীনতার শৃঙ্খলে জর্জরিত দেখবার জন্য আমরা বেঁচে থাকবো না—এই অনমনীয় সংকল্প নিয়ে প্রতিটি প্রকৃত কংগ্রেস কর্মী ও মহিলা এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এই হোক আপনাদের শপথ। জেলের কথা আপনারা ভাববেন না। সরকার আমাকে যদি মুক্ত রাখেন, জেল পূর্ণ করবার কষ্ট থেকে আমি আপনাদের রেহাই দেব। যে সময় সরকার বিপদে পড়েছেন সে সময় জেলে বহুসংখ্যক বন্দী রাখার

দায় আমি সরকারের উপর চাপাবো না। প্রতিটি পুরুষ ও মহিলা এখন থেকে প্রতি মুহূর্তে এই বোধ, এই আত্মসচেতনতা নিয়ে বাঁচুন যা কিছু তিনি করেছেন তা হ'ল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে ঐ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করবেন। ঈশ্বর ও বিবেককে সাক্ষী রেখে শপথ নিন, স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেবেন না এবং স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টায় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকবেন। যারা মরতে জানে তাঁরাই বাঁচতে জানে। যারা জীবন বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত তারাই জীবন হারায়। কাপুরুষ বা দুর্বলচিত্ত মানুষের জন্য স্বাধীনতা নয়।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই। এ পর্যন্ত জাতীয় দাবীর প্রতি আপনারা যে সমর্থন জানিয়েছেন আমি তার জন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। যে সব বিধি নিষেধ ও অসুবিধার মধ্যে আপনাদের কাজ করতে হচ্ছে আমি তা জানি। কিন্তু আমি এখন আপনাদের এই অনুরোধই জানাবো, যে শিকল আপনাদের বেঁধে রেখেছে আপনারা তা ছিঁড়ে ফেলুন। স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করায়, নেতৃত্ব দেওয়ায় সংবাদপত্রের গৌরব করার অধিকার রয়েছে। আপনাদের কলম আছে। সরকারের সাধ্য নেই তার কণ্ঠরোধ করে রাখে। আমি জানি ছাপাখানা প্রভৃতির মাধ্যমে আপনাদের বিরাট সম্পত্তি থাকতে পারে; সরকার পাছে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করে নেন, এ আশংকাও আপনাদের থাকতে পারে। সরকার ছাপাখানা ক্রোক করে নিতে পারেন এমন একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিতেও আমি আপনাদের বলছি না। তবে আমার কথা বলতে পারি, সরকার ছাপাখানা ক্রোক করে নেবেন একথা জেনেও আমি আমার কলমকে সংযত করতাম না। আপনারা তো জানেনই, অতীতে আমার ছাপা-খানা ক্রোক করা হয়েছে। পরে অবশ্য তা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদের চরম ত্যাগ স্বীকার করতেও বলছি না। আমি একটা মধ্যপন্থার কথা বলবো। আপনাদের উচিত হবে, আপনাদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি বাতিল করে দেওয়া এবং সরকারকে জানিয়ে দেওয়া যে বর্তমান বিধি নিষেধের মধ্যে আপনারা কলম ধরবেন না—ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলেই আবার আপনারা কলম ধরবেন। আপনারা স্যার ফ্রেডারিক পাকলকে বলতে পারেন যে আপনারা আর তাঁর নির্দেশ মাফিক কাজ করবেন না, বলতে পারেন যে তাঁর প্রেসনোট মিথ্যায় ভরা এবং আপনারা তা প্রকাশ করবেন না। আপনারা কংগ্রেসকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন এ কথাও আপনারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারেন। এ যদি আপনারা পারেন, তা হলে প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগেই আপনারা হাওয়া বদলে দিতে পারেন।

যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়ে, রাজন্যবর্গের কাছে আমি একটা সামান্য জিনিস চাইব। আমি রাজন্যবর্গের শুভাকাঙ্ক্ষী। আমার জন্মও একটি দেশীয় রাজ্যে। আমার পিতামহ যে ডান হাত দিয়ে তাঁর নিজের রাজাকে অভিবাদন জানাতেন, সেই হাতে অন্য রাজকে অভিবাদন জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু একটা কথা তিনি তাঁর প্রভুকে বলেন নি—আমার মনে হয় তাঁর বলা উচিত ছিল যে, তিনি মন্ত্রী হয়েও, তাঁর প্রভুর নির্দেশ সত্ত্বেও বিবেকবিরুদ্ধ কোনো কাজ করবেন না। আমি রাজন্যদের

নুন খেয়েছি—সুতরাং তাদের প্রতি কোনোরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। একজন বিশ্বস্ত সেবক হিসেবে আমার কর্তব্য হবে তাদের সতর্ক করে দেওয়া। আমি এখনও বেঁচে রয়েছি, যদি তারা ঠিক পথে চলেন, তাঁরা স্বাধীন ভারতে সম্মানজনক স্থান পেতে পারেন। জওহরলাল যে স্বাধীন ভারতের কথা ভাবছেন—সেখানে কোনো বিশেষ অধিকার বা কোনো সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকবে না। জওহরলাল মনে করেন, সমস্ত সম্পত্তি হবে রাষ্ট্রায়ত্ত। তিনি পরিকল্পিত অর্থনীতি চান। পরিকল্পনা অনুয়ায়ী ভারতের পুনর্গঠনই তাঁর কাম্য। জওহরলাল ভাবুক প্রকৃতির, আমি নই। আমি যে ভারতের কথা ভেবেছি—সেখানে রাজন্যবর্গ ও জমিদারদের স্থান রয়েছে। আমি সবিনয়ে রাজন্যবর্গকে অনুরোধ করবো তাঁরা যেন ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ করেন। তাঁরা তাদের সম্পত্তির মালিকানা ত্যাগ করে, প্রকৃত অর্থেই তার অছি হতে পারেন। আমি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখি। রাজন্যবর্গ তাঁদের জনগণকে বলতে পারেন, "আপনারাই এই রাজ্যের মালিক ও প্রভু, আমরা আপনাদের সেবক।" আমি রাজন্যবর্গকে জনগণের সেবক হতে এবং জনগণের কাছে তাদের সেবার হিসেব দিতে বলবো। সম্রাট রাজন্যবর্গকে ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু আমি চাইব রাজন্যবর্গ জনগণের কাছ থেকেই সেই ক্ষমতা পাক। এবং যদি তারা কোনোরূপ নির্মল আনন্দ পেতে চান, তবে জনগণের সেবক হিসেবেই তা পাবার চেষ্টা করতে পারেন। আমি চাই না রাজন্যবর্গ ভিক্ষুক হয়ে জীবন যাপন করুন। কিন্তু আমি জানতে চাই, আপনারা কি চিরদিন দাস হয়েই থাকবেন? বিদেশী শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার পরিবর্তে, আপনারা কেন আমাদের জনগণের সার্বভৌমত্ব মেনে নিচ্ছেন না? আপনারা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কাছে লিখতে পারেন, "জনগণ আজ জেগে উঠেছেন। যে ধ্বংসের মুখে বড় বড় সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে যায়, আমরা তাকে প্রতিরোধ করবো কী করে। সুতরাং আজ থেকে আমরা আমাদের জনগণের। তাদের সঙ্গে আমরা বাঁচবো, তাদের সঙ্গেই আমরা মরবো।" বিশ্বাস করুন আমি যে পথের প্রস্তাব করছি, তাতে সংবিধানবহির্ভূত কিছু নেই। আমি যতদূর জানি, সাম্রাজ্যশক্তি রাজন্যবর্গের উপর চাপ দিতে পারে, জবরদস্তি করতে পারে এমন কোনো চুক্তি নেই। অপর দিকে রাজ্যের জনগণও ঘোষণা করবেন যে, তাঁরা রাজন্যবর্গের প্রজা হলেও, ভারতীয় জাতিরই অংশ। যদি রাজন্যবর্গ জনগণের সঙ্গে তাঁদের মিলিয়ে নেন, তাহলে তাঁরাও তাদের নেতৃত্ব মেনে নেবেন, অন্যথায় নয়। যদি এই ঘোষণায় রাজন্যবর্গ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, যদি তাঁরা জনগণকে হত্যা করবার পথ বেছে নেন, জনগণ বীরত্বের সঙ্গে এবং অকম্পিত বক্ষে মৃত্যুকে বরণ করবেন; প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবেন না।

কোনো কিছুই গোপনে করা উচিত হবে না; এটা একটা প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এ সংগ্রামে গোপনীয়তা একটা পাপ। একজন স্বাধীন মানুষ কোনো গুপ্ত আন্দোলনে যুক্ত হতে পারেন না। তবে হয়তো এমন হতে পারে যে আমার বিরুদ্ধ উপদেশ সত্ত্বেও স্বাধীনতা অর্জনের পর আপনারা গোয়েন্দা বিভাগ রাখবেন। কিন্তু বর্তমান সংগ্রামে আমাদের প্রকাশ্যেই কাজ করতে হবে, পিছু না হেঁটে বুলেটের সামনে বুক পেতে দিতে হবে।

সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কেও আমার একটি কথা বলবার আছে। ইচ্ছে

করলে তাঁরা চাকুরী নাও ছাড়তে পারেন। স্বর্গত বিচারপতি রাণাডে পদত্যাগ করেন নি, তবে তিনি খোলাখুলি ভাবেই ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি কংগ্রেসের সদস্য। তিনি সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলেন—যদিও তিনি একজন বিচারপতি, তবুও তিনি একজন কংগ্রেসকর্মী এবং প্রকাশ্যেই তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দেবেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীকে বিচারের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করতে দেবেন না। কংগ্রেসের মধ্যেই তিনি সামাজিক সংস্কার সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেছিলেন। আমি সমস্ত কর্মচারীকে রাণাডের পথ অনুসরণ করতেই আহ্বান জানাবো এবং স্যার ফ্রেডরিক পাক্‌লের গোপন সার্কুলারের জবাবে কংগ্রেসের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করতে অনুরোধ জানাবো।

আপাততঃ আমি আপনাদের এই সব কাজই করতে বলবো। আমি এখন বড়লাটকে চিঠি লিখবো। যে সব চিঠি পত্র আদান প্রদান হবে তাও আপনারা দেখতে পাবেন। তবে এখনই নয়, বড়লাটের কাছ থেকে সেগুলি প্রকাশের অনুমতি পাবার পর। আপনারা অবশ্য ঐ চিঠিতে যে সব দাবী থাকবে তা আগেই সমর্থন করতে পারবেন। আমার কাছে একজন বিচারপতি এসেছিলেন। তিনি বললেন, ঊর্ধ্বতন মহল থেকে গোপন সার্কুলার এসেছে এবার আমবা কী করবে? আমি বলেছি, আমি যদি হতাম তবে ঐ সার্কুলার উপেক্ষা করতাম। আপনারা প্রকাশ্যেই সরকারকে জানিয়ে দিতে পারেন, "আমি গোপন সার্কুলার পেয়েছি। আমি অবশ্য কংগ্রেসেরই দলে। যদিও জীবিকার জন্য আমি সরকারের সেবা করে চলেছি তবুও আমি এই গোপন সার্কুলার মেনে নেব না এবং নির্দেশিত নোংরা পথ অনুসরণ করবো না।"

সৈন্যরাও এই বর্তমান কর্মসূচীর আওতায় আসবেন। আমি এই মুহূর্তে তাদের চাকরী ছাড়তে বা সৈন্যদল থেকে বেরিয়ে আসতে বলছি না। সৈন্যরাও জওহরলাল, মওলানা এবং আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁরা বলেছেন—"আমরা আপনাদের সঙ্গেই রয়েছি। সরকারী নির্যাতনে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।" এইসব সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আমি বলবো, আপনারা সরকারকে জানিয়ে দিতে পারেন যে "আমরা কংগ্রেসেরই অনুগামী। তবে আমরা আমাদের চাকরী ছাড়ছি না। যতদিন বেতন পাবো ততদিন আপনাদের সেবা করে যাবো। আমরা আপনাদের ন্যায়সম্মত আদেশও পালন করবো। কিন্তু নিজের দেশের মানুষের উপর গুলি ছুঁড়তে পারবো না।"

যাদের এটুকু করবার সাহস নেই, তাদের আমার কিছু বলবার নেই। তারা নিজেদের পথেই চলবেন। কিন্তু আপনারা যদি এটুকু করতে পারেন, তবে জেনে রাখুন, গোটা পরিবেশ উদ্দীপিত হয়ে উঠবে। সরকার যদি চান, বোমাবর্ষণ করতে পারেন। কিন্তু পৃথিবীর কোনো শক্তিরই সাধ্য হবে না আপনাদের আর পরাধীন করে রাখতে।

কিছুদিন পরে আবার ক্লাশে ফিরে যাবেন এই মনোভাব নিয়ে যদি ছাত্ররা এই সংগ্রামে যোগ দিতে চান, তাহলে আমি তাদের আমন্ত্রণ জানাবো না। তবে আপাততঃ, যতদিন না সংগ্রামের চূড়ান্ত কার্য্যসূচি তৈরী করছি—ছাত্ররা তাঁদের অধ্যাপকদের

বলতে পারেন, "আমরা কংগ্রেসের। আপনারা কংগ্রেসের পক্ষে, না সরকারের? যদি আপনারা কংগ্রেসের পক্ষে হন, আপনাদের পদত্যাগ করবার দরকার নেই। আপনারা নিজ নিজ পদে থেকেই আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্যে পরিচালিত করুন, সেইভাবে শিক্ষা দিন।" স্বাধীনতা সংগ্রামে সারা বিশ্বেই ছাত্রদের বিরাট অবদান রয়েছে।

প্রকৃত সংগ্রাম শুরু হওয়ার আগে, অন্তর্বর্তী যে সময়টুকু আমাদের হাতে রয়েছে, সেই সময় আমি যে সামান্য প্রস্তাব রেখেছি আপনারা যদি তা রূপায়িত করেন, আপনারা গোটা আবহাওয়া পাল্টে দিতে পারবেন—পরবর্তী পদক্ষেপের ভিত্তি তৈরী করতে পারবেন।

এখনও অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। ইতিমধ্যেই আপনাদের অনেকটা সময় নিয়েছি। আমাকে ইংরেজীতেও কিছু বলতে হবে। এত রাত্রেও যে ধৈর্য্য ও মনোযোগ সহকারে আপনারা আমার কথা শুনছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। প্রকৃত সৈনিকরাও এই-ই করতেন। গত ২২ বছর আমি আমার কণ্ঠ ও কলমকে সংযত রেখে শক্তি সংগ্রহ করেছি। যিনি শক্তির অপচয় ঘটান না, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী। সুতরাং তাঁকে সব সময়ে বাকসংযম করতে হবে। এই বছরগুলিতে সচেতনভাবে আমি এই প্রয়াসই করেছি। কিন্তু আজ এমন এক সময় এসে উপস্থিত, যখন আমাকে আপনাদের কাছে আমার হৃদয় মেলে ধরতে হলো। যদিও আপনাদের ধৈর্য্যের উপর চাপ পড়েছে—তবুও আমি তা করেছি এবং তার জন্য আমি দুঃখিতও নই। আপনাদের কাছে, এবং আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসীর কাছেই আমি আমার বক্তব্য রাখলাম।

(এ.আই. সি. সি. বৈঠকে ৮.৮.৪২ তারিখে গান্ধীজীর হিন্দী ভাষণ)

ভারত ছাড়—৩

যে সব কথা আমার মনকে আন্দোলিত করেছিল, --আমি যাদের সেবা করবার সুযোগ পেয়েছি, সেসব কথা তাদের কাছে বলতে বেশ অনেকটা সময় লেগে গেল। আমাকে এদের নেতা বা সামরিক পরিভাষায় সেনাপতি বলা হয়। আমি কিন্তু নিজেকে সেভাবে দেখি না। প্রেম ছাড়া অপরের উপর কর্তৃত্ব করবার আর কোনো অস্ত্র তো আমার নেই। আমার অবশ্য একটা লাঠি আছে, তাও এতই পলকা যে একটু চাপ দিলেই ভেঙ্গে যাবে। এটা শুধু আমার কাজেই লাগে। সুতরাং বৃহত্তম বোঝা বহন করবার জন্য ডাকা হ'লে এ ধরনের পঙ্গুর আনন্দিত হবার কথা নয়। সেনাপতি হিসাবে নয়, একজন বিনম্র সেবক হিসাবে যদি আমি নিজেকে আপনাদের সামনে হাজির করতে পারি, তাহলে আপনারাও এই বোঝার অংশ নিতে পারবেন। সেবায় যিনি শ্রেষ্ঠ, সমকক্ষদের মধ্যে তিনিই নেতা।

সুতরাং আমার মনে যে ভাবনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে আমি আপনাদের সঙ্গেই তা ভাগ করে নেবো। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আমার কথা বলছি, প্রথম পদক্ষেপ

হিসেবে আপনারা কী করবেন বলে আমি আশা করি, তাও জানাচ্ছি।

প্রথমেই বলে নিই, প্রকৃত সংগ্রাম আজ শুরু হচ্ছে না। সব সময় যেমন করে থাকি এবারেও আমাকে বেশ কিছু আনুষ্ঠানিক কাজ করে নিতে হবে। আমি স্বীকার করছি এই বোঝা প্রায় অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে। যেসব মহলে আমি আমার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছি, আমার প্রতি যাদের আস্থা নেই তাদেরই সঙ্গে আমাকে আলাপ-আলোচনা চালাতে হবে। আমি জানি, গত কয়েক সপ্তাহে আমার এক বিরাট সংখ্যক বন্ধুর কাছে আমার দাম এমন কমে গেছে যে আজ তারা শুধু আমার বুদ্ধিতেই নয়, সততাতেও সন্দেহ করছেন। আমার কাছে আমার বুদ্ধি এমন একটা সম্পদ নয়, যা আমি হারাতে পারি না। কিন্তু আমার সততা আমার এক পরম ঐশ্বর্য্য, এই ঐশ্বর্য্যকে কিছুতেই আমি হারাতে দিতে পারি না। তবে আমার মনে হচ্ছে হয়তো আমি তা সাময়িকভাবেই হারিয়েছি।

॥ সাম্রাজ্যের বন্ধু ॥

যে মানুষ সত্যানুসন্ধানী, যে নির্ভয়ে ও ছলনার আশ্রয় না নিয়ে আপন হৃদয়ের আলোকে দেশের ও মানবতার সেবা করতে চায় তার জীবনে এরকম ঘটে থাকে। গত ৫০ বছরে আমার অভিজ্ঞতাই এই। আমি মানবতার একজন বিনম্র সেবক, একাধিকবার সাধ্যমত আমি সাম্রাজ্যেরও সেবা করেছি। এবং এখানে আমি বিনা দ্বিধায় বলে নিতে চাই যে আমার গোটা জীবনে কখনও ব্যক্তিগত সুবিধা চাইনি। লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে আজ আমার যে বন্ধুত্ব রয়েছে সেইরকম বন্ধুত্বই আমি সব সময় ভোগ করে এসেছি। এই বন্ধুত্ব সরকারী সম্পর্কের সীমাকেও অতিক্রম করেছে। লর্ড লিনলিথগো আমাকে সমর্থন করবেন কিনা আমি জানিনা, তবে আমি মনে করি তাঁর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত বন্ধন রয়েছে। তিনি একবার তাঁর কন্যার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জামাতা, এ·ডি·সি., আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য মহাদেবের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব ছিল বেশী। লেডি আন্না এবং তিনিও আমার কাছে আসতেন। আন্না অনুগত ও প্রিয় কন্যা। আমি তাদের কল্যাণে আগ্রহ বোধ করেছি। আমি এই ব্যক্তিগত এবং পবিত্র সম্পর্কের কথা উল্লেখ করলাম শুধু এইটুকুই বোঝাতে যে আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধন কেমন। কিন্তু তবু আমি এখানে ঘোষণা করতে চাই যে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক—সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে লর্ড লিনলিথগোর বিরুদ্ধে আমরা যে কঠিন সংগ্রাম শুরু করতে চলেছি তাতে কখনই অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না। এই সংগ্রামের নীতি হ'ল অহিংসা। আর এরই ভিত্তিতে অগণিত মূক মানুষের শক্তি নিয়ে আমাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে হবে। যে বড়লাটের সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়া খুবই কঠিন কাজ। তিনি একাধিকবার আমার দেশবাসী সম্পর্কে আমার কথা বিশ্বাস করেছেন। আমি এই পরীক্ষাই আবার করতে চাই এবং তাতে তাঁর কৃতিত্বই উজ্জ্বল হবে। আমি সগর্বে এবং সানন্দে একথা উল্লেখ করছি। যে সাম্রাজ্য আমার আস্থা হারিয়ে ফেলেছে

সেই সাম্রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত হবার ঐকান্তিক আগ্রহেই আমি এসব কথা বলছি। যে ইংরেজ এই সাম্রাজ্যের ভাইসরয়, তিনিও তা জানেন। জানেন, এ সাম্রাজ্যে আমার আস্থা নেই।

॥ চার্লি এণ্ড্রুজ ॥

চার্লি এনড্রুজের পবিত্র স্মৃতিও আমার মনে জমা হয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে এনড্রুজের আত্মা আমায় ঘিরে রয়েছে। আমার কাছে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের প্রতীক। অধিকাংশ ভারতীয়ের চেয়ে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর ছিল। আমি তার আস্থাভাজন ছিলাম। আমাদের মধ্যে কোনো গোপনীয়তা ছিল না। প্রত্যেক দিন আমরা একে অপরের কাছে মনের কথা খুলে বলতাম। তার মনে যা ছিল, সামান্যতম দ্বিধা বা সংশয় না রেখে অকপটে তা প্রকাশ করতেন। এটা ঠিক যে তিনি গুরুদেবের বন্ধু ছিলেন কিন্তু তিনি গুরুদেবকে দেখতেন ভয়-ভক্তি-বিস্ময়ের চোখে। তার ছিল এই অদ্ভুত নম্রতা। কিন্তু আমার সঙ্গে তার ছিল নিবিড়তম বন্ধুত্ব। বহুবছর আগে গোখেলের কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। পিয়ারসন এবং তিনি মানুষ-ইংরেজের প্রথম সারির নিদর্শন। আমি জানি তাঁর আত্মা আমার কথা শুনছে।

কলকাতার মেট্রোপলিটনের কাছ থেকেও আমি একটি আন্তরিক অভিনন্দন পত্র পেয়েছি। আমি তাকে ঈশ্বরের সেবক বলে মনে করি। কিন্তু আজ তিনি আমার বিরোধী।

॥ বিবেকের কণ্ঠস্বর ॥

এই পটক্ষেপে আমি সারা বিশ্বের সামনে ঘোষণা করতে চাই, যদিও পাশ্চাত্যের বহু বন্ধু আমার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছেন, এবং সেজন্য আমার মাথা নত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তবুও তাদের বন্ধুত্ব ও ভালবাসার খাতিরেও আমি আমার বিবেকের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করবো না। আমার ভিতরে এমন কিছু রয়েছে যা চীৎকার করে যন্ত্রণা প্রকাশ করতে আমাকে বাধ্য করছে। আমি মানুষকে জানি। মনস্তত্ত্বও আমি কিছু কিছু পড়েছি। যাদের এধরনের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই জানেন এটা কী। আপনারা কীভাবে একে বর্ণনা করবেন আমি জানি না, কিন্তু, আমার হৃদয়ের গভীর থেকে যে স্বর উঠছে তা আমায় বলছে—"যদি তোমাকে একলা দাঁড়াতেও হয় তবুও তোমাকে গোটা বিশ্বের বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হবে। সারা বিশ্বের মানুষ তোমায় চোখ রাঙাতে পারে কিন্তু তবুও তোমাকে তাদের মুখোমুখি তাকাতে হবে। ভয় পেয়ো না। বিবেকের নির্দেশে বিশ্বাস রেখো।" ঐ বিবেকই বলছে, "বন্ধু, স্ত্রী এবং সবাইকে ত্যাগ করো কিন্তু যার জন্য তোমার জীবন ধারণ, যার জন্য তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে, তার প্রতি তোমার আনুগত্য প্রমাণ করো।" বিশ্বাস করুন বন্ধুগণ, আমি মৃত্যুর জন্য আগ্রহী নই, আমি ১২০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে চাই, ততদিনে ভারত স্বাধীন হয়ে যাবে। বিশ্ব স্বাধীন হবে।

॥ প্রকৃত স্বাধীনতা ॥

আপনাদের আমি বলে দিতে চাই যে আমি ইংল্যান্ড বা সেইমত আমেরিকাকেও স্বাধীন দেশ বলে মনে করি না। তারা নিজেদের ধাঁচে স্বাধীন; স্বাধীন—বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে বর্ণের ভিত্তিতে পরাধীন করে রাখতে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকা কি আজ এই জাতিগুলির স্বাধীনতার জন্য লড়ছে? যদি না হয় তাহলে আর আমাকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলবেন না। আপনারা আমার স্বাধীনতার আদর্শের সীমা টেনে দিতে পারেন না। ইংরেজ ও আমেরিকান শিক্ষককুল, তাঁদের ইতিহাস, তাঁদের অসাধারণ কাব্য সাহিত্য—কোথাও বলা হয়নি যে আপনি আপনার স্বাধীনতার ধারণাকে প্রসারিত করতে পারবেন না। স্বাধীনতার যে ধারণা আমার মনে রয়েছে তারই ভিত্তিতে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তাদের শিক্ষক ও কবিরা যে স্বাধীনতার বর্ণনা দিয়েছেন সে স্বাধীনতা তাদের অজানা। যদি তারা প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পেতে চান, তাদের ভারতে আসতে হবে। তবে গর্ব ও ঔদ্ধত্য নিয়ে এলে চলবে না, আসতে হবে সত্যানুসন্ধানের আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে। ২২ বছর যাবৎ ভারত এই মৌল সত্যের উপরই পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে।

॥ কংগ্রেস ও অহিংসা ॥

বহুদিন হলো—সূচনা পর্ব থেকেই কংগ্রেস অসচেতনভাবে সাংবিধানিক পন্থা হিসাবে পরিচিত অহিংসার আদর্শ গড়ে তুলেছে। দাদাভাই এবং ফিরোজ শা কংগ্রেসী-ভারতকে তাঁদের হাতের মুঠোয় রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁরাও বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁরা কংগ্রেসকে ভালবাসতেন। তারাই এর প্রভু ছিলেন। কিন্তু সর্বোপরি তারা ছিলেন প্রকৃত সেবক। হত্যা, গোপনীয়তা বা এই ধরনের অন্য কিছুকে তারা বরদাস্ত করতে পারতেন না। আমি স্বীকার করছি আমাদের কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বেশ কিছু আদর্শহীন ব্যক্তি আছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি গোটা ভারতবর্ষই আজ অহিংস সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আমি বিশ্বাস করি, কারণ, আমার প্রকৃতিই হলো মানুষের যে স্বভাবজ সততা সত্যকে উপলব্ধি করে এবং সংকটের সময়ও যা স্বপ্রকাশ থাকে তারই উপর নির্ভর করা। কিন্তু এতেও আমি যদি প্রবঞ্চিত হই তবু আমি পথভ্রষ্ট হব না; আমার বিশ্বাস অকম্পিত থাকবে। সূচনাপর্ব থেকেই কংগ্রেসের নীতির ভিত্তিই হল শান্তিপূর্ণ উপায়। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বরাজ এবং পরবর্তীকালে অহিংসা। দাদাভাই যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন, স্যালিসবেরী তাঁকে কৃষ্ণকায় বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু, ইংরেজ জনগণ স্যালিসবেরীকে হারিয়ে দেন। এবং তাদেরই ভোটে দাদাভাই পার্লামেন্টে গিয়েছিলেন। ভারত সেদিন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। ভারত আজ অবশ্য এসব বিষয় অতিক্রম করে গেছে।

॥ আমি এগিয়ে যাবো ॥

এই পটভূমিতে আমি চাই ইংরেজরা, ইউরোপীয়রা এবং মিত্র দেশগুলি তাদের হৃদয় অনুসন্ধান করে দেখুন—স্বাধীনতার দাবী জানিয়ে ভারত কী অপরাধ করছে।

অর্ধশত বছরের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ একটা সংগঠনকে আপনারা অবিশ্বাস করছেন। সাধ্যমত সর্ব উপায়ে বিশ্বের সামনে এই সংগঠনের প্রয়াসের অপব্যাখ্যা করে প্রচার করছেন, —আমি জানতে চাই আপনারা কি ঠিক করছেন? বিদেশী সংবাদপত্র, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, এমন কি চীনের যে জিনারেলসিমো এখনও বিজয়ী হননি তারই সাহায্য নিয়ে আপনারা যেভাবে যেনতেন প্রকারে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভাবে বিকৃত করে দেখাচ্ছেন, তা ঠিক হচ্ছে? জেনারেলসিমোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমার দোভাষী মাদাম সেকের মাধ্যমেই আমি তাকে জানি। তাঁকে আমার কিছুটা রহস্যময় বলে মনে হয়েছে, তবে মাদাম সেকের মাধ্যমেই তিনি আমাকে তার মনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বত্র আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। সবাই বলেছেন আমরা ভুল করছি, আন্দোলন সময়োপযোগী হচ্ছে না। ব্রিটিশ কূটনীতি সম্পর্কে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে কেননা এর দ্বারাই তারা এত দীর্ঘদিন এই সাম্রাজ্যকে অটুট রেখেছেন। কিন্তু আজ এই কূটনীতিকে, অন্য যারা এর অধ্যয়ন করছেন, একে কাজে লাগাচ্ছেন—এর সমস্ত কিছুই আমার কাছে দুর্গন্ধযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। এই পথে হয়তো তারা সাময়িক-ভাবে বিশ্বজনমতকে তাদের অনুকূলে আনতে পারবেন; কিন্তু ভারত ঐ জনমতের বিরুদ্ধে সেচ্চার হবে। সুসংগঠিত সমস্ত প্রচারণার বিরুদ্ধেই সে গর্জে উঠবে। আমিও এর প্রতিবাদ করবো। যদি সমগ্র মিত্রশক্তি আমার বিরোধিতা করে, গোটা ভারতবর্ষ যদি আমায় ত্যাগ করে তবুও আমি বলবো, "আপনারা ভুল করছেন। অহিংস উপায়েই ভারত অনিচ্ছুক হাত থেকে তার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবে।" শুধুমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের স্বার্থেই আমি এগিয়ে যাবো—স্বাধীনতা লাভের আগেই যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলেও অহিংসার ইতি ঘটবে না। অহিংস ভারত নতজানু হয়ে আজ তার দীর্ঘদিনের পাওনা স্বাধীনতা ফিরে পেতে চাইছে। কোন উত্তমর্ণ কি এমনভাবে কোনো ঘাতকের কাছে যায়? যদি চীন ও রাশিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতায় বাদ সাধে তাহলে অহিংসা তাদেরও মর্মান্তিক আঘাত হানবে। ভারত যখন ক্রুদ্ধ বিরোধিতার সম্মুখীন হয় তখনও সে বলে "আমরা তোমায় অন্যায়ভাবে আঘাত করবো না। সেটুকু ভদ্রতাজ্ঞান আমাদের আছে। আমরা অহিংসায় অঙ্গীকারবদ্ধ।" কংগ্রেসের নীতি কাউকে বিড়ম্বিত করে না। এ নীতির আমি প্রণেতা। তবুও আপনারা দেখেছেন আজ আমি শক্ত কথা বলি। কিন্তু আমি বলবো এটা আমাদের সম্মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যদি কেউ আমার গলা টিপে ধরেন তবে কি আমি মুক্ত হবার চেষ্টা করবো না? আমাদের আজকের ভূমিকায় কোনো অসঙ্গতি নেই।

॥ মিত্র শক্তির উদ্দেশ্যে আবেদন ॥

এখানে বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও রয়েছেন। তাদের মাধ্যমে আমি বিশ্ববাসীকে বলতে চাই, যে মিত্র শক্তি কোনো না কোনোভাবে ভারতকে তাদেরও প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার পেয়েছেন, তাঁরা এবার ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা

করবার এবং তাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেবার সুযোগ পেয়েছেন। যদি তারা এই সুযোগ হারান তবে তা সারা জীবনের মতো হারাবেন এবং ইতিহাসে লেখা হবে যে তারা যথাসময়ে ভারতের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেননি। এবং যুদ্ধে হেরে গেছেন। এদের বিরুদ্ধে সাফল্যের জন্য আমি সমগ্র বিশ্বের শুভেচ্ছা চাই। সম্মিলিত শক্তি তাদের করণীয়ের স্পষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যান, এ আমি চাই না। আমি চাই না, আজই তারা অহিংসার আদর্শকে গ্রহণ করুন এবং নিরস্ত্র হোন। ফ্যাসিবাদ এবং যে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমি লড়ছি তাতে মৌল পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশরা ভারত থেকে যা চান তাই কি পাচ্ছেন? তারা যেটুকু তাদের দাসত্বের আওতায় আনতে পেরেছেন ভারত থেকে সেইটুকুই মাত্র পাচ্ছেন। অথচ ভেবে দেখুন ভারত যদি স্বাধীন মিত্র হিসাবে এই যুদ্ধে অংশ নিত তবে কী বিরাট পার্থক্যই না ঘটতো। স্বাধীনতা যদি আসে, আজই আসতে হবে। আজ আপনাদের সাহায্য করবার যে ক্ষমতা রয়েছে তা যদি কাজে লাগাতে না পারেন তাহলে এই স্বাধীনতায় কোনো স্বাদ থাকবে না। কিন্তু যদি আপনারা কাজে লাগাতে পারেন, তবে দেখবেন, আজ যা অসম্ভব মনে হচ্ছে, স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোতে আগামীকাল তাই-ই সম্ভব হবে। ভারত যদি এই স্বাধীনতা অনুভব করতে পারে তাহলে সে চীনের জন্যও ঐ স্বাধীনতা চাইবে এবং এতে রাশিয়ার কাছে সাহায্য চাইতে ছুটে যাবার পথও খুলে যাবে। মালয় বা ব্রহ্মের মাটিতে কোনো ইংরেজ মরেন নি। কীভাবে আমরা পুরানো অবস্থায় ফিরে যাবো? আমি কোথায় যাবো, ৪০ কোটি ভারতীয়কেই বা কোথায় নিয়ে যাবো? নিজেরা স্বাধীনতার স্পর্শ না পেলে—স্বাধীনতা উপলব্ধি করতে না পেলে কী করে এই বিরাট সংখ্যক মানুষ বিশ্বমুক্তির আদর্শে উদ্দীপিত হবে? আজ এদের মধ্যে জীবনের কোনো স্পর্শ নেই—সমস্ত জীবনীশক্তি নিংড়ে বের করে নেওয়া হয়েছে। যদি এদের চোখে নতুন করে আলো জ্বালাতে হয় তবে স্বাধীনতা দিতেই হবে—আগামী কাল নয়, আজই।

॥ করবো, নয় মরবো ॥

পরিশেষে গান্ধীজী বলেন, আমি কংগ্রেসের নামে শপথ নিয়েছি, কংগ্রেস হয় করবে নয় মরবে।

(এ·আই·সি·সি-র বৈঠকে ৮.৮.৪২ তারিখে ইংরাজীতে গান্ধীজী প্রদত্ত ভাষণ)

ধর্মঘট

স্পষ্টতঃই এমন কোনো ধর্মঘট হওয়া উচিত নয় যার পিছনে যুক্তি নেই। অযৌক্তিক ধর্মঘটের সাফল্যও বাঞ্ছনীয় নয়। এধরনের ধর্মঘট বরং যাতে জনসাধারণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

জনসাধারণের আস্থাভাজন কোনো নিরপেক্ষ ব্যক্তির সমর্থন ছাড়া একটা ধর্মঘটের গুণাগুণ বিচার করবার কোনো উপায় জনসাধারণের নেই। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কখনও নিজেদের গুণাগুণ বিচার করতে পারেন না। সুতরাং বিভিন্ন পক্ষের গ্রহণযোগ্য একটা সালিশী বা বিচারবিভাগীয় নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। সাধারণভাবে, সালিশী ও বিচার বিভাগীয় নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকলে বিষয়টি জনসাধারণের সমক্ষে আসে না। অবশ্য এমন ঘটনাও ঘটতে থাকে যখন বদমেজাজী মালিকরা রোয়েদাদ অস্বীকার করেন বা বিপথগামী কর্মীরা তাদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে বলপ্রয়োগের দ্বারা বিষয়টির নিষ্পত্তি করে নেন।

আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানের দাবীতে যে ধর্মঘট ডাকা হবে তার পিছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। এ ধরনের মিশ্রণের ফলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তো সাধিত হয়ই না বরং ধর্মঘটী শ্রমিকরা, ধর্মঘটের দরুণ তাঁদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত না হলেও, বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়েন।

*　　*　　*　　*　　*

ধর্মঘটে যোগদানকারী কর্মীদের সমস্ত বৈধ উপায় নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটও ডাকা উচিত নয়।

*　　*　　*　　*　　*

রাজনৈতিক ধর্মঘটগুলিকেও তাদের নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। এই ধর্মঘটকে অর্থনৈতিক ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত করলে বা মিলিয়ে ফেললে চলবে না। অহিংস কার্যক্রমে রাজনৈতিক ধর্মঘটের সুনির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। যথেচ্ছভাবে এর আশ্রয় গ্রহণ করলে চলবে না। এমন পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যেতে হবে যাতে হিংসার সৃষ্টি না হয়।

শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট

ধর্মঘট হবে স্বতঃস্ফূর্ত, উদ্দেশ্য সিদ্ধির কৌশল হ'লে চলবে না। কোনরকম বাধ্য-বাধকতা আরোপ না করে যদি ধর্মঘট করা যায় তাহলে তাতে গুণ্ডাবাজি বা লুটতরাজের সম্ভাবনা থাকবে না। এধরনের ধর্মঘটের বৈশিষ্ট্য হবে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক পূর্ণ সহযোগিতা। একে শান্তিপূর্ণ হ'তে হবে এবং কোনোরকম জোর দেখানো চলবে না। জীবিকা অর্জনের জন্য ধর্মঘটীদের এককভাবে কিংবা অপরের সহযোগিতায় কিছু কাজ করতে হবে। এই ধরনের কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে আগেই ভেবে নিতে হবে। বলাই বাহুল্য, এমনি শান্তিপূর্ণ ফলপ্রসূ এবং সুদৃঢ় ধর্মঘটে গুণ্ডামি বা লুটতরাজের কোনো স্থান থাকবে না। এধরনের ধর্মঘট আমি দেখেছি। আমি কোনো অবাস্তব ছবি আঁকছি না।

অহিংস ধর্মঘট

সর্বত্রই ধর্মঘট হচ্ছে। আমেরিকা ইংল্যান্ডও বাদ নয়। কিন্তু ভারতে ধর্মঘটের একটা বিশেষ তাৎপর্য্য রয়েছে। আমরা একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় বাস করছি। ঢাকনাটা সরে গেলেই স্বাধীনতার হাওয়া প্রবেশ করবে। তখন ধর্মঘটের সংখ্যাও বেড়ে যাবে। এই ধর্মঘট এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ার মূল কারণ হলো এখানে অন্যান্য জায়গার মতই জীবন উৎকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। ধর্মের ভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে। এটা একটা অদ্ভুত অবস্থা। তবে, আধ্যাত্মিক ভিত্তি থাকলেও ধর্মঘট থাকবে। কারণ এটা ভাবা কঠিন যে ধর্ম সকলেরই জীবনের ভিত্তি হবে। সুতরাং এক দিকে যেমন শোষণের চেষ্টা চলতে থাকবে অপর দিকে তেমনি ধর্মঘটও চলতে থাকবে। তবে সে সময় এইসব ধর্মঘটের মূল চরিত্র হবে অহিংস। এ হবে এমন এক ধরনের ধর্মঘট যাতে কারো কোনো অনিষ্ট হবে না। বোধকরি এই ধরনের ধর্মঘটের দরুণ জেনারেল স্মাটস্ নতি স্বীকার করেছিলেন। জেনারেল স্মাটস্ বলেছিলেন 'যদি আপনি একজন ইংরেজকে আঘাত করতেন আমি আপনাকে গুলি করতাম। এমন কি আপনার দেশকর্মীদেরও তাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু এখন আমি আপনাকে কারারুদ্ধ করেছি এবং আপনাকে এবং আপনার স্বদেশীয়দের নতি স্বীকার করাবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি যদি পাল্টা প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা না করেন তাহলে আর কতদিন আমি এভাবে চলতে পারবো?' সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকায় কুলি বলে পরিচিত সমস্ত ভারতীয়দের প্রতিনিধি একজন সামান্য কুলির সঙ্গেই তাকে চুক্তিতে আসতে হয়েছিল।

সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে মতপার্থক্য

সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টরা বলে থাকেন যে তারা আজ অর্থনৈতিক সমতা আনবার জন্য কিছু করতে পারবেন না। তারা শুধু এর অনুকূলে প্রচার চালিয়ে যাবেন এবং মনে করেন এর ফলে ঘৃণা সৃষ্টি হবে, জমে উঠবে। তারা বলেন, যখন তারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা পাবেন তখন তারা এই অর্থনৈতিক ক্ষমতা কার্য্যকর করবেন। কিন্তু আমার পরিকল্পনায় রাষ্ট্র জনগণকে পরিচালিত করবে না, বা, তাদের উপর নিজের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেবে না, বরং রাষ্ট্র জনগণের ইচ্ছাকেই রূপ দেবে। অহিংসার মাধ্যমে আমি অর্থনৈতিক সমতা আনবো। ঘৃণার বিরুদ্ধে প্রেমের শক্তিকে সংহত করেই জনগণকে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে আনতে পারবো। গোটা সমাজ আমার মতে চলবে এর জন্য আমি অপেক্ষা করবো না, আমি নিজেই সোজাসুজি কাজ শুরু করবো। একথা বলাই বাহুল্য, আমি যদি ৫০টি মোটর-গাড়ীর বা দশ বিঘা জমিরও মালিক হই সে ক্ষেত্রে আমি আমার আদর্শ অর্থনৈতিক সমতা রূপায়ণের আশা করতে পারি না। সেজন্য আমি নিজেকে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের স্তরে নামিয়ে নিয়ে গেছি। গত ৫০ বছর বা তার বেশী সময় ধরে আমি এই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি আর সেজন্যই ধনীদের মোটরগাড়ী বা অন্যান্য সুবিধা ভোগ

করলেও আমি নিজেকে সবচেয়ে বড় কম্যুনিষ্ট বলে মনে করি। কারণ আমার উপর এসবের কোনো প্রভাব নেই। জনগণের স্বার্থের অনুকূল হ'লে এগুলি আমি এক মুহূর্তেই ছেড়ে দিতে পারি।

সত্যাগ্রহ—বাঁচা মরার শিল্পকলা

সত্যাগ্রহের মূল রয়েছে প্রার্থনায়। পাশব শক্তির নির্যাতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য একজন সত্যাগ্রহী নির্ভর করে থাকেন ঈশ্বরের উপর। তবে কেন আপনারা ব্রিটিশ বা আর কারো প্রবঞ্চনার ভয়ে সব সময় ভীত হবেন? যদি কেউ আপনাকে ঠকায়, তবে সে নিজেই সবচেয়ে বেশী ঠকবে। যে সংশয়বিদ্ধ নয়, ভীরু নয়, যাঁর মনোবল অত্যন্ত দৃঢ়—সত্যাগ্রহ সংগ্রামের তিনিই সৈনিক। সত্যাগ্রহ আমাদের বাঁচবার ও মৃত্যুবরণ করবার শিল্পকলা শেখায়। মরণশীলদের জীবন ও মৃত্যু দুই-ই অপরিহার্য। অন্তরশক্তি উপলব্ধির সচেতন প্রচেষ্টাই মানুষকে পশু থেকে আলাদা করেছে। প্রার্থনায় উচ্চারিত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ১৮টি শ্লোকে জীবন-শিল্পের গোপন কথা বলা হয়েছে। সেখানে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞার বর্ণনা দিয়েছেন; এই স্থিত প্রজ্ঞাই সত্যাগ্রহ।

জীবন-শিল্পের স্বাভাবিক পরিণতিই হলো মৃত্যুর শিল্প। সকলকেই মরতে হবে। বজ্রাঘাতে, হার্টফেল করে বা নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে একজনের মৃত্যু ঘটতে পারে। কিন্তু কোনো সত্যাগ্রহীর কাছে এ মৃত্যু কাঙ্ক্ষিত বা প্রার্থিত হতে পারে না। কর্তব্য সম্পাদন কালে প্রফুল্ল চিত্তে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়াই হলো সত্যাগ্রহীর কাছে মৃত্যুর শিল্পরূপ। এটা এমন একটা শিল্প যা মনে হয় বোম্বাইয়ের মানুষ এখনও শেখেনি। শত্রুকে আঘাত না করা বা শত্রুর প্রাণ না নেওয়ার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। শত্রুকে মরতে দেখেও চুপ করে বা নিষ্ক্রিয় থাকাটাও সত্যাগ্রহীর কাজ নয়। দরকার হলে জীবন বিসর্জন দিয়েও তাঁকে রক্ষা করতে হবে। ভারতের হাজার হাজার লোক যদি ঐ শিল্পকলায় অভ্যস্ত হয়, তা হলে ভারতের চেহারাই বদলে যাবে। কেউ আর অহিংসাকে দুর্বলতার সাজ বলে উপেক্ষা করতে পারবে না। তখন আমরা কদর্য্য ঘটনার দায়িত্ব দুর্বৃত্তদের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করবো না। আমরা দুর্বৃত্তদের নিয়ন্ত্রণে আনবো—তাদের মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারবো।

য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

১
য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা

পাঠকরা জানেন আমি পুরাতন অপরাধী। ১৯২২ সালের মার্চ্চে যে আমাকে বন্দী করা হয় তাহাই আমার জীবনে প্রথম কারাবাস নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনবার আমি অপরাধী হইয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তখন আমাকে দুর্দ্দান্ত কয়েদী জ্ঞানে এক জেল হইতে অন্য জেলে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেন; আর সেইজন্য জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা আমার খুবই হইয়াছিল। ভারতবর্ষে জেলে আসার পূর্ব্বে আমার ছয়টা জেলের সহিত পরিচয় হয়, ফলে এতগুলি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাহার চেয়েও বেশি জেলারের সংস্পর্শে আমাকে আসিতে হইয়াছে। সেইজন্য সেই দশই মার্চ্চের সুন্দর রাতে ভাই ব্যাঙ্কারের সহিত যখন আমাকে সবরমতী জেলে লইয়া যাওয়া হইল, তখন লোকের কোনও অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতায় যে প্রকার বোধ হয়, আমার তাহা কিছু হয় নাই। বরং আমার প্রায় এই রকমই মনে হইয়াছিল যে, প্রেমে আরো বেশি জয়ী হইবার জন্য এক ঘর বদলাইয়া অন্য ঘরে যাইতেছি।

আমার জেলে আসার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আলাদা ধরন ছিল; জেলে ত নয়, যেন কোনো উৎসবে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হিলি সঙ্জন, আশ্রমে না আসিয়া অনসূয়া বেনকে দিয়া খবর পাঠাইলেন যে, তিনি আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য ওয়ারেণ্ট লইয়া আশ্রমের দরজায় মোটরে অপেক্ষা করিতেছেন। আমার তৈরী হওয়ার জন্য যত সময় লাগে তাহা আমার ইচ্ছামত লইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। ভাই ব্যাঙ্কার যখন আশ্রম হইতে আহ্‌মেদাবাদে ফিরিতেছিলেন তখন তাঁহাকে রাস্তাতেই গ্রেপ্তার করা হয়। অনসূয়া বেনের দেওয়া খবর পাইয়া আমি তৈরী হইলাম। বাস্তবিক বলিতে গেলে, সকলেই জানিতাম যে, ওয়ারেণ্ট আসিবেই এবং ওয়ারেণ্টের জন্য অপেক্ষা করিয়া অবশেষে সকলকে শুইতে বলিয়া দিয়াছিলাম এবং নিজেও শোওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলাম। সেদিনই আমি দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করিয়া আজমীঢ় হইতে ফিরিয়াছি। এখানেই আমার খুব বিশ্বাসের পাত্র একজন বলিয়াছিলেন যে, আমাকে গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট আজমীঢ়ে পাঠান হইয়াছে। যে দিন ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, সেই দিনই আমি আহ্‌মেদাবাদ ফিরিতেছিলাম বলিয়া সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষের আমাকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা গ্রেপ্তার করার সুবিধা হয় নাই। ওয়ারেণ্টের খবর আসায় আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত হইলাম। দুইখানা কচ্ছ, দুইখানা কম্বল ও পাঁচখানা পুস্তক সঙ্গে লইলাম—ভগবদ্গীতা, আশ্রমভজনাবলী, রামায়ণ, কোরাণের রডওয়েলের অনুবাদ ও একখানা গিরিপ্রবচন। এই শেষোক্ত বইখানা ক্যালিফোর্ণিয়ার এক স্কুলের ছাত্রেরা এই বলিয়া আমাকে দিয়াছিল যে আমি যেন সব সময় এটি সঙ্গে রাখি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নসরবানজী ওয়াচা আমাকে সাদরে স্বাগত জানাইলেন এবং আমাকে এক প্রকাণ্ড পরিষ্কার কম্পাউণ্ডের মধ্যে এক কামরার ব্লকে লইয়া গেলেন। বারান্দায়

শোয়ার অনুমতি পাওয়া গেল। কয়েদীর পক্ষে ইহা একটা অসাধারণ লাভ বলিতে হইবে। এই স্থানের শান্তি ও পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতা আমার পছন্দ হইল।

পরদিন সকালে প্রাথমিক তদন্তের জন্য আমাদিগকে আদালতে লইয়া যাওয়া হইল। ভাই ব্যাংকার ও আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কোন প্রকারে আত্মপক্ষ সমর্থন করিব না, বরঞ্চ সরকারের দণ্ড দেওয়ার পথে বিঘ্ন না ঘটাইয়া সাহায্য করিব। ইহাতে প্রথম তদন্ত তাড়াতাড়ি শেষ হইল। কেস সেসনে সোপর্দ্দ হইল ও শীঘ্রই আমরা সমন লওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকায়, ১৮ই মার্চ্চ তারিখ স্থির হইল। আহ্‌-মেদাবাদের লোকেরা এই আচরণের মহত্ব বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই বল্লভভাই প্যাটেল কড়া নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, কোর্টের আশেপাশে কোনও ভীড় হইতে পারিবে না, কেহ কোনও প্রকারের সোরগোল করিতে পারিবে না। আদালত গৃহের মধ্যে দর্শক ছিল। কিন্তু সেজন্য পুলিশের কোনই অসুবিধা হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষেরা এই ব্যবস্থার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিলেন দেখিলাম।

মোকদ্দমা শুনানির পূর্বের এক সপ্তাহ, যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে কাটিল। সাধারণতঃ সকলকেই দেখা করার অনুমতি দেওয়া হইয়া থাকে। নিষিদ্ধ কিছু না থাকে এমন চিঠিপত্র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মারফতে আদান প্রদানের অনুমতিও ছিল। জেলের সমস্ত নিয়ম আমি সন্তোষের সহিত পালন করিতাম। সেইজন্য যে সপ্তাহকাল সবরমতীতে আমি ছিলাম তাহাতে জেলের আমলাদের সঙ্গে কোনো গোল ত হয়ই নাই, বরঞ্চ ভালবাসার সম্পর্ক হইয়াছিল। খান্‌বাহাদুর ওয়াচার সহৃদয় ব্যবহার ও ভদ্রতার অন্ত ছিল না। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়েই তিনি নিজের ভয় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি ভারতবর্ষে জন্মিয়াছেন বলিয়াই যেন বড় অপরাধ করিয়াছেন, ইহাই যখন তখন জানাইতেন এবং যদি ইংরাজ হইতেন তবে আমাদের জন্য অনেক কিছু করিতে পারিতেন— জানিয়া বা না জানিয়া এই রকম আভাস দিতেন। তিনি ভারতবাসী বলিয়া নিয়মানুযায়ী যে সকল সুবিধা করিয়া দেওয়া যায় তাহা করিতেও, কালেক্টর, জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল ও নিজের যে কোনও উচ্চতন কর্ম্মচারীর ভয় পাইতেন। তিনি জানিতেন যে, যদি তাঁহার বিরুদ্ধে কালেক্টর বা ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল দাঁড়ায় তাহা হইলে তাঁহাকে সাহায্য করার মত লোক সেক্রেটারিয়েট্‌ আফিসে কেহ নাই। অধীনতার ভূত তাঁহাকে পদে পদে পীড়া দিত। জেলের বাহিরের যে অভিজ্ঞতা, জেলের ভিতরেও, তাহার অপেক্ষা বেশি না হোক্‌, ততটা অধীনতার অভিজ্ঞতা সত্য হইয়া উঠিল। কোনও আমলাই তাহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে পারে না। তাহাদের যে শক্তি নাই তাহা নহে, তবে কেবল চাকুরী যাওয়ার বা 'ডিগ্রেড্‌' হওয়ার ভয় তাহারা ছাড়িতে পারে না। চাকুরী বজায় রাখিয়া যদি প্রমোশন পাইয়া যাইতে হয়, তবে তাহাকে খোসামোদ করিতেই হইবে। ভিতরেও উপরিওয়ালাকে খুসী রাখা একটা দেখিবার মত ব্যাপার। সবরমতীতে যাহা দেখিলাম তাহার ঠিক বিপরীত দেখিলাম কিন্তু য়েরোড়া জেলে আসিয়া। সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের কোনও ভয়ই রাখিতেন না। সেক্রেটারিয়েটে তাঁহার মতই এঁরও প্রভাব খাটে। কালেক্টরকে ত গণনার মধ্যেই আনেন না। আর ভারতীয় উপরিওয়ালার

হিসাবও তিনি রাখিতেন না। সেইজন্য যখনই নিজের হুকুম চালোনোর দরকার হইত, তিনি ডরাইতেন না; আর যখন হুকুম করা কঠিন তখনও তিনি অগ্রসর হইয়াই যাইতেন,পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। এই নিঃশঙ্কবোধ থাকার জন্যই ইউরোপীয়ান আমলারা অনেক সময় লোকমতের বিরুদ্ধে ও সরকারেরও বিরুদ্ধে, সমস্ত বিধি-নিষেধ ও হুকুম ফেলিয়া দিয়াই যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

মোকদ্দমার শুনানী ও দণ্ড সম্বন্ধে আমার কিছুই বলার নাই, কেননা লোকে এ সকলই জানেন। কেবল জজ ও এডভোকেট জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া, সকল আমলাই আমার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই উল্লেখ করা আবশ্যক। কোর্টের ভিতর ও কোর্টের আশেপাশে যে মুষ্টিমেয় লোক ছিলেন তাঁহারা যে অদ্ভুত সংযম ও আমার প্রতি যে অসীম প্রেম দেখাইয়াছেন তাহা কোনও দিন ভুলিতে পারিব না। ছয় বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড আমি লঘুদণ্ড মনে করি। কেননা ১২৪-এ ধারা অনুসারে যে কার্য্য বাস্তবিক দণ্ডনীয়, সে ক্ষেত্রে যদি আইন প্রয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে সেই ধারা অনুসারে যত বেশী সাজা দেওয়া যায়, তাহা দেওয়ার অধিকার বিচারকের আছে। আমি ত বারংবার এবং ইচ্ছা করিয়াই অপরাধ করিয়াছি। তাহা সত্বেও আমার প্রতি যে লঘু দণ্ড দেওয়া হইল তাহার কারণ, জজ যে আমাকে দয়া করিলেন একথা আমি বলিতে পারি না, কেন না আমি দয়া চাই নাই, তবে এই হইতে পারে যে, ১২৪এ ধারাটা হয় ত জজের পছন্দ ছিল না। আমি দেখিয়াছি যে, জজেরা যত পারেন কম সাজা দিয়া ঐ আইনের ধারাটার প্রতি তাঁহাদের বিরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ আইন অনুসারে পুরাপুরি অপরাধ করা হইয়াছে, কি করা হয় নাই একথা তাঁহারা বিচার করেন না। আমার বিচারকের নিকটেও ঐ দণ্ড ভারি বোধ হয় নাই। কেন না স্বর্গত লোকমান্যকেও ছয় বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

দণ্ড হইলে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামী বলিয়া আমাদিগকে জেলে ফিরাইয়া আনা হইল। আমাদের প্রতি ব্যবহারে কিছু বিশেষত্ব রাখা হয় নাই। কয়েকজন বন্ধু জেল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন, আনন্দের সহিত তাঁহাদের কাছে বিদায় লইলাম। অনুসূয়া বেন ও আমার স্ত্রী আমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় খুব সাহস দেখাইলেন। ভাই ব্যাঙ্কার ত সারা সময়টাই হাসিতেছিলেন। সকলে শান্তিতে বিদায় লইয়া গেলেন। ভাবিলাম যে, এখন কতকটা আরাম পাইব এবং আরাম পাওয়া সত্বেও দেশ-সেবা করিতে পারিব। আমার মনে হয় যে, দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করিয়া বড় বড় সভা-করায় যতটা দেশ-সেবা হয়, জেলের ভিতরের নির্জ্জনতায় তদপেক্ষা অধিক দেশ-সেবা হয়। কোনও সাথী যদি জেলে আসে তবে কার্য্যের ও সেবকের ক্ষতি হয় না একথাটা আমার সকলকে বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়। আমি অনেকবার একথা বলিয়াছি যে, কোনও অন্যায় দূর করার জন্য বিনা কারণে যে দুঃখ ভোগ করা যায়, তাহা সেই অন্যায় নিবারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। একথা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে একজন সাথী জেলে গেলে কিছুই ক্ষতি হয় না—এই প্রকার বিশ্বাস জন্মানো

চাই। মর্য্যাদা ও নম্রতার সহিত যে দুঃখ নীরবে সহ্য করা যায় তাহা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া যত সহায়ক হয়, তেমন আর কিছুই হয় না। এই কাজ কঠিন, কেন না ইহাতে কোনও সোরগোল নাই। একথা সকল সময়ই খাটে, কেন না ইহাতে কোনও মন্দ অভিপ্রায় থাকে না। উপরন্তু যদি আমরা খাঁটি কাজ করিতে চাই, তবে একজন সাথী চলিয়া গেলে আমাদের উৎসাহ বাড়া চাই এবং তাহা হইতে আমাদের কার্য্যশক্তিও বাড়া চাই। যে পর্য্যন্ত আমরা কোনও ব্যক্তিবিশেষের জায়গা পূরণ করিতে পারিব না—এই বিশ্বাস না যাইবে, ততদিন আমরা সুব্যবস্থিত কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। ব্যবস্থিত কার্য্য মানেই—সঙ্ঘের ভিতর যে ভাঙ্গন ঘটে তাহা সত্ত্বেও কার্য্য চালাইয়া যাওয়ার শক্তি। এই ভাঙ্গনের জন্য নিজের অথবা মিত্রদের উপর অন্যায় ভাবে যদি দুঃখ আসিয়া পড়ে তবে তাহাতে আমাদের আনন্দই বোধ করা উচিত এবং এ বিশ্বাস রাখা চাই যে, যে কার্য্যের জন্য দুঃখ বহন করিতেছি তাহা যদি সৎ হয়, তবে আমাদের দুঃখে সে কার্য্যের লাভই হইবে।

২

কয়েকজন আমলা

১৮ই মার্চ্চ শনিবার বিচার শেষ হইল। আর কিছু না হোক্ কয়েক সপ্তাহ সবরমতী জেলে একান্তে কাটাইতে পারিব এমন আশা করিয়াছিলাম। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, সরকার আমাকে দীর্ঘদিন কোন এক জায়গায় রাখিবেন না। কিন্তু হঠাৎ টানিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ২০শে তারিখে আমাকে এক স্পেশাল ট্রেণে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ট্রেণখানা পূর্ব্ব হইতেই দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছিল। আমাকে যে সবরমতী হইতে লইয়া যাওয়া হইবে, এ সংবাদ আমাকে মাত্র এক ঘণ্টাপূর্ব্বে দেওয়া হয়। যে কর্ম্মচারীদের প্রতি আমাকে স্থানান্তরিত করার ভার পড়িয়াছিল তাঁহাদের ভদ্রতার সীমা ছিল না। সারা রাস্তায় তাঁহারা আমার কোনও অসুবিধা হইতে দেন নাই। কিন্তু কিরকী ষ্টেশনে পা দিতেই আমি পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম এবং আর যাহাই হোক্, আমরা যে কয়েদীই একথা আমাদের অনুভব হইতে লাগিল। কালেক্টর অন্য দুইজন সঙ্গী লইয়া গাড়ি আসার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমাদিগকে কয়েদী-দের মোটর ভ্যানে প্রবেশ করানো হইল। উহাতে হাওয়া প্রবেশের জন্য পাশে ছিদ্র ছিল। ঐ গাড়ীটাকে যদি কদাকার নাও বলা হয়—তবে অন্ততঃ উহাকে “পরদা মোটর” বলা যায়, কেননা বাহিরের কিছুই দেখার উপায় ছিল না।

জেলে আমার সৎকার কেমন করা হইয়াছিল, ভাই ব্যাঙ্কারকে কেমন করিয়া আমার নিকট হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছিল, তাঁহার সহিত আবার কেমন করিয়া একত্র হওয়া গেল, আমার প্রথম বাহিরের লোকের সহিত সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য মজার কথা, হাকিম আজমল খাঁর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা হইতেই পাঠ করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। তিক্ত প্রসঙ্গ ক্রমশঃ কম হইয়া আসিতেছিল এবং

তখনকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল ডিল ও আমার মধ্যে সম্বন্ধ দ্রুত ভাল হইতে লাগিল।

আমার শারীরিক আবশ্যকতার দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। কিন্তু সে সবের মধ্যে এমন কিছু থাকিত যাহা সর্ব্বদাই পীড়া দিত। তিনি যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আমি যে কয়েদী একথা তিনি কখনও ভুলিতে পারিতেন না। তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও আমি কয়েদী, এ জ্ঞান আমার যে পুরোপুরি ছিল একথা তিনি মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি—আমি যে কয়েদী একথা আমি এক মুহূর্ত্তও ভুলিতাম না। তাঁহার প্রাপ্য মান আমি তাঁহাকে দিতাম, সেইজন্য তাঁহার ক্ষমতার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিরর্থক ছিল। অনেক বৃটিশ আমলার ভিতরে যে দুঃখদায়ক বৃথা অহঙ্কার দেখা যায়, তাহা তাঁহার ভিতরেও ছিল। তাঁহার এই দুর্ব্বলতার জন্য কয়েদীদের উপর তাঁহার অবিশ্বাস ছিল।

আমার কথা স্পষ্ট করিবার জন্য একটা মজার ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি যে সাধারণ খাদ্য খাই, তাহা না খাইয়া বিশেষ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত বলিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত চিন্তা জাগিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, আমি মাখন খাই! আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—আমি কেবল ছাগলের দুধের মাখনই খাইতে পারি। তিনি অমনি বিশেষ হুকুম করিলেন যে, ছাগলের দুধের মাখন তাড়াতাড়ি আনা চাই। মাখন আসিল। এখন কি দিয়া মাখন খাওয়া যায় সে প্রশ্ন উঠিল। আমি বলিলাম যে, কিছু আটা যেন দেন। তাহা দেওয়া হইল। কিন্তু এত মোটা আটা যে, উহা আমার হজম করিতে কষ্ট হইত। কিছু মিহি আটা আনার হুকুম হইল ও আমাকে ২০ তোলা করিয়া দেওয়া হইল। এত আটা দিয়া আমি কি করিব? আমার জন্য রুটি আমি নিজেই করিতাম, অথবা ব্যাঙ্কার করিয়া দিত। কিছুদিন পরে আমার মনে হইল যে, আমার মাখন বা আটা কিছুরই দরকার নাই। সেজন্য বলিলাম যে, আটা ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন ও মাখন বন্ধ করিবেন। কিন্তু কর্ণেল ডিল কি আর সে কথা শুনেন? যাহা দেওয়ার তাহা দেওয়াই হইতে লাগিল—যদি আমার কখনও খাওয়ার ইচ্ছা হয়! আমি বলিলাম যে, সাধারণের অর্থ এই ভাবে মিছামিছি নষ্ট করা হইতেছে। আমি ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমার নিজের অর্থের জন্য যেমন দরদ, সাধারণের অর্থের জন্যও তেমনি দরদ। তিনি অবিশ্বাসের হাসি হাসাতে আমি বলিলাম—"বাস্তবিক ইহা আমারি পয়সা।" চট্ করিয়া জবাব হইল—"সরকারী ট্রেজারিতে আপনি কত টাকা দেন?" আমি নম্রতার সহিত জবাব দিলাম—"আপনি সরকারের নিকট যে বেতন পান তাহা হইতে কিছু টাকা সরকারকে দেন, আর আমি ত আমার সম্পূর্ণ নিজেকেই দিয়াছি—আমার পরিশ্রম, আমার বুদ্ধি, আমার সর্ব্বস্ব"। তিনি অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

আমি যাহা সত্য মনে করিতাম তাহাই বলিয়াছিলাম। যিনি বাদশাহী মহলে বাস করিয়া বিশ হাজার টাকা মাহিনা পান, সেই ভাইস্‌রয় —তাঁহার বেতন যদি ইন্‌কামট্যাক্স মুক্ত না হয় বেতনের যে অংশ ট্যাক্স বলিয়া সরকারকে দিয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা, আমার মত যাহারা মাত্র সরকারের নিকট হইতে পেটভাতা লইয়া

মজুরী করিয়া থাকে তাহারা সরকারের জন্য অধিক দিয়া থাকে। যদি লক্ষ লক্ষ লোক মজুরী করে তবেই ভাইসরয় বা যাঁহারা শাসন-তন্ত্র চালান তাঁহারা, তাঁহাদের বেতন পাইতে পারেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অনেক ইংরাজ ও অনেক ভারতবাসী মনে করেন যে, তাঁহারা মজুর অপেক্ষা সরকারের অধিক সেবা করিয়া থাকেন এবং সরকারের কার্য্য সম্পাদনের জন্য তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট ভাগ দিয়া থাকেন। এখানে সরকার বলিতে তাঁহারা যাহাই মনে করুন তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু নিজেদের পুণ্যশীলতার এই আধুনিক ব্যাখ্যা অপেক্ষা আর অধিক ভুল অথবা মিথ্যা দাবি কদাচিৎ হইতে পারে।

এখন সেই কর্ণেল বাহাদুরের কথা বলি। কর্ণেল ডিলের অবিশ্বাসের উদাহরণটা আমি বুঝিয়া সুঝিয়াই দিয়াছিলাম। পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, আটা কি কর্নেল ডিলের গমন ও মেজর জোন্সের আগমন পর্য্যন্ত আমাকে জমাইয়া রাখিতে হইয়াছিল? কর্নেল ডিল জেলের অস্থায়ী ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল হইয়া গেলেন।

মেজর জোন্স ছিলেন কর্ণেল ডিল হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক। তিনি যেদিন আসিলেন সেদিন হইতেই কয়েদীদের মিত্র হইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ের কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। তিনি কর্ণেল ডিল অপেক্ষা কম জাঁকের সহিত আসিলেন। তাঁহার ভিতর আমলাগিরির ভাব একেবারেই ছিল না বলিয়া তাঁহার উপস্থিতি আনন্দ দিত। তিনি আমাকে মিত্রভাবে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার সবরমতী জেলের সঙ্গীরা আপনাকে তাহাদের নমস্কার জানাইয়াছেন। নিয়ম পালন করিতে তাঁহার খুব আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজের বড়াই দেখাইতেন না। মেজর জোন্স যেমন দম্ভ হইতে, পদগর্ব্ব হইতে মুক্ত ছিলেন সেরূপ দেশী কি ইউরোপীয় কর্ম্মচারী আমি দেখি নাই। তিনি নিজের ভুল স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। একবার তিনি একজন কয়েদীকে সাজা দেন। সে বেচারা রাজনৈতিক কয়েদী নয়, একেবারে নিতান্ত নিরাশ্রয় সাধারণ কয়েদী। পরে তাঁহার মনে হয় যে, সাজা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে। মনে হওয়া মাত্রই তিনি কয়েদীর টিকিটে এই উল্লেখযোগ্য মন্তব্য লিখিলেন—"আমার সাজা দেওয়ার জন্য অনুতাপ হইতেছে।"

কয়েদীরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের ছোট ছোট ডাক নাম দিয়া আশ্চর্য্যভাবে তাঁহাদের স্বভাবের খাঁটি বর্ণনা করিয়া থাকে। মেজর জোন্সের নাম ছিল "বহুৎ ভাল।" সকল আমলাদেরই ডাক নাম ছিল।

এখন আটা ও অন্য অনাবশ্যকীয় খাদ্য বাঁচাইয়া রাখার কথা বলিতেছি। যেদিন মেজর জোন্স দেখা করিতে আসিলেন সেইদিনই তাঁহাকে মিনতি করি যে, তিনি যেন আমার পক্ষে অনাবশ্যকীয় জিনিষ আমাকে না দেন। কর্নেল ডিল আমার কথা অবিশ্বাস করিতেন, কিন্তু মেজর জোন্স আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য মানিয়া লইয়া, কড়াকাড়ির জন্য আমি যে পরিবর্ত্তন করিতে চাহিলাম তাহাই করিতে দিলেন এবং একথা সন্দেহও করিলেন না যে, আমার মনে কোনও কলুষ আছে।

প্রথম প্রথম যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, তাঁহাদের মধ্যে জেলের ইন্‌স্পেক্টর

জেনারেল ছিলেন একজন। তিনি এত গর্ব্বিত যে, তাঁহার কাছে "হাঁ" কি "না" ছাড়া আর কিছু বলিলেই তাঁহার খারাপ লাগিত। তিনি অল্পভাষী ছিলেন, বেচারা কয়েদীরা তাঁহাকে দেখিলে ভয়ে কাঁপিত। অনেক আমলা ভাবে না বলিয়াই অনেক সময় ইচ্ছা না করিয়াও অন্যায় করিয়া বসে। তাঁহারা এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিতে পারেন না। কয়েদীদের কথা ধৈর্য্যের সহিত না শুনিয়া, তাহাদের নিকট সহজ সুশৃংখল কথাবার্ত্তা আশা করেন ও তেমন জবাব না পাইলে অন্যায় হুকুম দেন। সেই জন্য এই ইনস্পেক্টরের সাক্ষাৎকার অনেক সময়েই তামাশার ব্যাপার হয়, বরঞ্চ অনেক সময় তাঁহার তদন্ত দ্বারা অযোগ্য লোকের, অহংকারী অথবা খোসামুদে লোকের, লাভ হয়। যোগ্য লোকদের কথা, কোনও অল্পভাষী গরীব কয়েদীর কথা শোনার কেহই নাই। অনেক আমলাই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে জেলখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রোগ-রহিত করিয়া রাখা, কয়েদীদের পরস্পর মারামারি বন্ধ করা, তাহাদের পালাইয়া যাওয়া বন্ধ করা, তাহাদিগকে সুস্থ রাখা। ইহা ছাড়া আর কিছু করার নাই।

এই মনোভাব হইতে যে দুঃখদায়ক ফল হইয়া থাকে তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাইবে।

৩
কতকগুলি ভয়ংকর পরিণাম

জেলের আমলারা মনে করে যে কয়েদীদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখায়, তাহাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করিতে না দেওয়ায় ও তাহাদিগকে পলাইতে না দেওয়াতেই তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হইল। আমলাদের এই মনোভাবের যে ফল হয়, তাহা আমি এই অধ্যায়ে আলোচনা করিব। ভাল মন্দ অবস্থার এক পাল লোককে এক-মিশাল করিয়া রাখার জন্য জেল একটা খোঁয়াড়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীদিগকে ভাল খাইতে দেয় ও বিনা কারণে দণ্ড দেয় না, সে-ই সরকারের ও কয়েদীদের চক্ষে ভাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। উভয় পক্ষের কেহই ইহার বেশী আশা করে না। যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীদের সহিত কতকটা মানুষের মত ব্যবহার করে, তাঁহাকে কয়েদীদের ভুল বুঝা সম্ভব এবং সরকারও তাঁহাকে সেইজন্য অস্বাভাবিক ধরনের লোক গণ্য করিয়া অবিশ্বাস করিয়া থাকেন।

এই আবহাওয়ার ভিতরে যদি দুর্নীতি ও দুর্গতির আখড়া না হয় ত আর কি হইতে পারে? এখানে থাকিয়া কয়েদীদের ভাল হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অধিকাংশ স্থলেই তাহারা আগের চেয়ে খারাপ হয়। আমার মনে হয়, সারা জগতে জেলই এমন একটা সাধারণ জায়গা যেখানে জনসাধারণের খুব কম দৃষ্টি পড়ে। ফলে জেলের ব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণের কোনও হাত থাকে না। যখন কোনও খ্যাতনামা রাজনৈতিক কয়েদীকে জেলে রাখা হয়, তখনই জনসাধারণের কারা প্রাচীরের অন্তরালে কী হইতেছে তাহা জানার কৌতূহল হয়।

কয়েদীদের শ্রেণীভাগ কেবল কার্য্য-ব্যবস্থার সুবিধার জন্যই করা হইয়া থাকে। কয়েদীর পক্ষে কী অনুকূল তাহা দেখা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পুরাতন পাপীর সহিত যে ব্যক্তি কোনও নৈতিক অপরাধ না করিয়া কেবল আইনের ব্যতিক্রম করার জন্য জেলে আসিয়াছে তাহাকেও একত্রে এক ওয়ার্ডে একভাগে এবং একই ব্যারাকে রাখা হয়। বিভিন্ন চাল-চলনের ৪০।৫০ জন কয়েদীকে রোজ রাত্রে বারোঘণ্টা একত্র রাখার কথা কল্পনা করিয়া দেখুন। আমি জানি, একজন লোক পুরানো টিকিট ব্যবহার করার জন্য জেলে আসিয়াছে, তাহাকে পুরাতন ও ভয়ানক কয়েদীদের সহিত একত্র রাখা হইয়াছে। খুনী, স্ত্রীহরণকারী, ও চোর, আর যে ব্যক্তি কেবল নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী—ইহাদের সকলকে একত্র মিলাইয়া মিশাইয়া রাখা জেলের নিত্যকার ঘটনা।

কয়েদীদের দ্বারা যে কাজ করাইয়া লওয়া হয় তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি আছে যাহাতে অনেককে একযোগে কাজ করিতে হয়, যেমন জলের পাম্প চালানো। যাহারা ভাবপ্রবণ, এমন ধরনের লোককেও এই দলের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই রকম দলে সাধারণতঃ কয়েদীরা চলিতে ফিরিতে এমন খারাপ ভাষা ব্যবহার করে যে, শিষ্ট লোকের তাহাতে কর্ণপীড়া জাগে। এই দলের মধ্যে যাহারা কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করে তাহারা জানেও না যে, তাহাদের ভাষায় কিছু অশ্লীলতা আছে। কিন্তু যাহার এবিষয়ে অনুভব তীব্র তাহার পক্ষে ঐ ভাষা শোনায় অস্বস্তি হয়। এইরূপ, দলের উপর নজর রাখার জন্য কয়েদী-ওয়ার্ডার নিযুক্ত হয়। এইসকল ওয়ার্ডারও কয়েদীদের প্রতি অতিশয় কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করিয়া গালি দেয়, আর যদি রাগিয়া যায় তবে বেটন-পেটা করিতেও ছাড়ে না। বলা বাহুল্য যে, জেল আইন অনুসারে এই উভয় শাস্তি দেওয়ার তাহার কোনও অধিকার নাই, বরঞ্চ উহা জেলের নিয়মানুসারে খুবেই বেআইনী কাজ।

জেলের নিয়মবিরুদ্ধ কার্য্যের আমি লম্বা লিষ্টি দিতে পারি। একথা জেলের কর্ত্তাদেরও অজানা নয়। বরঞ্চ কেহ কেহ ইহাতে চোখ বুঁজিয়া থাকেন। একজন কুকথা সহ্য করিতে না পারিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রকম ভাষা ব্যবহার বন্ধ না করা হয় ততক্ষণ কাজ করিতে অস্বীকার করে। সৌভাগ্যবশতঃ মেজর জোন্স মাঝে পড়িয়া যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন, না হইলে কঠিন অবস্থা হইত।

অবশ্য এই ফল কেবল ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। এই প্রকার আর না হইতে পারে সেরূপ অবস্থা অবলম্বন করার কোন উপায় মেজর জোন্সের হাতে ছিল না। কেননা যে পর্যন্ত কয়েদীদিগকে তাহাদের নৈতিক অবস্থা অনুযায়ী ভাগ না করিয়া, মানুষ হিসাবে না দেখিয়া কেবল জেলের ব্যবস্থার সুবিধার জন্য ভাগ করা হইবে, সে পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিবে।

জেলে যেখানে প্রত্যেক কয়েদীর উপর দিনরাত্রি পাহারা রহিয়াছে, যেখানে কয়েদী কখনো ওয়ার্ডারের নজরের বাহিরেই যাইতে পারে না, সেখানে অপরাধ কেমন করিয়া হইতে পারে? কিন্তু কষ্টে কল্পনা করা যায় এমন কোন কোন ভয়ানক অপরাধও হইতে পারে ও হইয়াও থাকে। আর যাহারা অপরাধ করে সাধারণতঃ

তাহাদের কিছুই হয় না। ছোট ছোট চুরি, ঠকামি, ও ছোটবড় দাঙ্গা ত গণনার মধ্যেই নয়, আমি সৃষ্টিছাড়া অপরাধের কথাই বলিতে চাই।

ইহার বিবরণ দিয়া আমি পাঠককে আহত করিতে চাই না। আমার জেলের অনেক অভিজ্ঞতা থাকিলেও জেলে যে এমন অপরাধ হয় তাহা জানিতাম না। কিন্তু য়েরোড়ায়* আমার একাধিক দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা হইয়াছে। সৃষ্টিছাড়া অপরাধের অস্তিত্ব রহিয়াছে, এই জ্ঞান আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আহত করিয়াছে। এই অপরাধের বিষয় আলোচনায় সকল আমলাই আমাকে বলেন যে, জেলগুলি বর্তমান পদ্ধতিতে যতদিন চালানো হইবে, সে পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম হওয়া অসম্ভব। একথাও পাঠককে বলিয়া রাখি যে, ঐ ধরনের কুকর্মের শিকার যে হয়, সে প্রায় সব সময়েই তাহাতে অরাজী থাকে। আমি একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যদি জেলের ব্যবস্থার ভিতরে মনুষ্যত্বের স্থান থাকে, এবং জেলের আইন অনুসারেই কার্য্য চলে তবে ঐ ধরনের অপরাধ বন্ধ করা যায়। ভারতবর্ষের জেলে মোটের উপর ৪ লক্ষ কয়েদী বাস করে। এই কয়েদীগুলিকে একবার জেলে পুরিয়া দেওয়ার পর তাহাদের কী হইল সে খবর রাখা শাসন-কর্ত্তাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য নহে। অপরাধীকে যে সাজা দেওয়া হয় তাহা ত তাহার সংশোধনের জন্যই। সাধারণতঃ এই কথাই ধরিয়া লওয়া হয় যে, ব্যবস্থাপক সভা, জজ, ও জেলার দোষীকে এই আশাতেই সাজা দিয়া থাকেন যে, দোষীর সাজায় কেবল তাহাকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়াই হয় না, বরঞ্চ জেলে বন্ধ করায় স্বজন ও সমাজ হইতে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকায় তাহাকে অনুতপ্ত হইবারও অবকাশ দেওয়া হয় এবং সেই অনুতাপই দোষীকে পুনর্ব্বার দোষ করার প্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সাজা ভোগ পশুত্ব আরও বাড়ায়। জেলের ভিতর তাহাদের কখনও অনুতাপ করার, ভাল হওয়ার দিন আসে না। মানুষের মত করার কিছুই সেখানে নাই। দৃষ্টি-শোভার ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টা সপ্তাহে একবার দেখা দিয়া যান একথা সত্য। এই প্রকার কোনও ধর্ম-সভায় আমাকে লইয়া যাওয়া হয় নাই। তাহা হইলেও আমি এটুকু ত জানি যে, এই সভা সাধারণতঃ মিথ্যা আড়ম্বর মাত্র। উপদেষ্টারা মিথ্যাচারী একথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু যাহাদের সাধারণতঃ অপরাধ করিতে আটকায় না, তাহাদের কাছে সপ্তাহে একবার কয়েক মিনিটের জন্য প্রার্থনা বা উপদেশ দেওয়ায় কী ফল হইতে পারে? এমন আবেষ্টন সৃষ্টি করা দরকার, যাহাতে কয়েদীরা না জানিয়াই মন্দ অভ্যাস ত্যাগ করিয়া সৎ অভ্যাস গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু যে পর্যন্ত লাভজনক কাজ কয়েদীদিগকে দিয়া করাইয়া লওয়ার প্রথা থাকিবে, সে পর্যন্ত এই প্রকার বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করা অসম্ভব। কয়েদীদিগকে ওভারসিয়ার করার প্রথা সর্বাপেক্ষা অধিক দূষণীয়। যাহারা দীর্ঘ মেয়াদের সাজা পায় তাহারাই এই প্রকার ওভারসিয়ার হয়। তাহারা খুব বেশি অপরাধে অপরাধী। সাধারণতঃ গুণ্ডা ও নির্দয় প্রকৃতির লোকদিগকেই ওভারসিয়ার হিসাবে নির্বাচন করা হইয়া থাকে। ইহারাই সর্বাপেক্ষা বেশী নির্লজ্জ, সেইজন্য ঐ পদে উঠিতে

* য়েরোড়া গুজরাটি শব্দ। বাংলায় অনেকে বলেন যারবেদা জেল।

পারে। জেলে যে সকল অপরাধ হয় তাহার প্রায় সবগুলিতেই ইহারা থাকে। একবার দুইজন ওভারসিয়ার সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারের শিকার এক কয়েদীকে লইয়া মারামারি করে এবং তাহাদের মধ্যে একজন মারা পর্য্যন্ত যায়। জেলে তখন যে কী হইতেছিল সকলেই তাহা জানিত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করেন কেবল ঝগড়া ও রক্তপাত বন্ধ করার নিমিত্তই।

·অন্য কয়েদীরা কী কাজ করিবে তাহাও এই ওভারসিয়াররাই ঠিক করিয়া দেয়। তাহারাই কাজের তত্ত্বাবধান করে। তাহাদের হাতে যে সকল কয়েদীর ভার, তাহাদের চাল-চলনাদি সমস্তের জন্য তাহারাই দায়ী। বাস্তবিক ধরিতে গেলে, জেল-কর্তাদের হুকুম জারী ও তাহা মান্য করানোর দায়িত্ব এই কর্মচারী পদে প্রতিষ্ঠিত কয়েদীদের দ্বারাই পালিত হইয়া থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে যাহা আছে তাহা অপেক্ষাও খারাপ যে হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। ইহাই আমার স্থির বিশ্বাস যে, যেখানে পদ্ধতিটাই দোষ-যুক্ত এবং যেখানে সেই পদ্ধতির বশবর্তী হইয়া সর্বদা নিয়ম পালন করিলে ছোট হইয়া থাকিতে হয়, সেখানে লোকে সেই পদ্ধতিরই সাহায্যে সবল হইয়া নিয়মকানুন পদদলিত করে এবং নিঃসঙ্কোচে থাকে; সাধারণ লোকেরা স্বাভাবিক ভাবেই বাঁচার রাস্তা খোঁজে।

রান্না করার সমস্ত ভারই কয়েদীদের উপর। এই রান্নাও খারাপ এবং সেক্ষেত্রে ইচ্ছাপূর্বক পক্ষপাত হইয়া থাকে। যাহা কিছু কাজ—ধান ভানা, তরকারী উৎপাদন করা, রান্না করা ও পরিবেশন করা, এ সমস্তই কয়েদীদের দিয়া করানো হইয়া থাকে। মাপ অপেক্ষা কম খাদ্য দেওয়ার অভিযোগ, কাঁচা খাদ্য দেওয়ার অভিযোগ নিত্যকার ব্যাপার, আর তখন কর্মচারীদের নিকট হইতে একই জবাব পাওয়া যায় যে, তোমাদের খাবার ত তোমরাই রান্না করিতেছ, ভাল করিলে তোমরাই করিতে পার। যেন কয়েদীরা পরস্পর সব বন্ধু এবং তাহারা তাহাদের দায়িত্ব বুঝে!

যখন আমি একবার এই সকল যুক্তি দেখাইয়া আলোচনার শেষ পর্যায়ে পেঁাছাইয়াছি, তখন জবাব পাই যে, জেলের কোনও ব্যবস্থাতেই এমন খরচ করা পোষায় না। আলোচনা করিতে করিতে, আমি যে ভিন্ন মত পোষণ করি, তাহা দেখাইয়াও দিই। কুশলতার সহিত যদি নিয়ম রচিত হয়, তাহা হইলে জেলের ব্যবস্থা যে স্বাবলম্বী হইতে পারে, এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস অভিজ্ঞতা দ্বারা আরও দৃঢ় হইয়াছে। জেল ব্যবস্থার আর্থিক দিকটা আলোচনা করার জন্য আমি আর একটা অধ্যায় পরে লিখিবার আশা রাখি। এখন কেবল এইমাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাই যে, নৈতিক অন্যায় দূর করার প্রশ্নে খরচার কথা আনা কদাচ শোভা পায় না।

৪

রাজনৈতিক কয়েদী

"রাজনৈতিক ও সাধারণ কয়েদীর মধ্যে আমরা কোন প্রভেদ করি না, আপনার সম্বন্ধেও এরূপ কোনও প্রভেদ করা হয় ইহা ত আপনিও ইচ্ছা করেন না?"—গত বৎসরের শেষ ভাগে যখন জর্জ লয়েড য়েরোড়া আসিয়াছিলেন তখন তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। 'রাজনৈতিক' কথাটা আমি ভুল করিয়া বলিয়াছি—তাহারই জবাবে তিনি ঐ কথা বলিলেন। আমার ভুল হইয়াছিল বলা যায় না, কারণ গভর্ণর সাহেবের এই শব্দটা যে কানে বাধে তাহা আমি জানিতাম। তাহা হইলেও আমাদের অনেকেরই জেলের টিকিটে 'রাজনৈতিক' কথা লেখা থাকে। এই বিচিত্র ব্যাপারের যখন আমি সমালোচনা করি তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন যে, "ঐ ভেদটা আমাদের গোপনীয় ব্যাপার এবং কেবল কর্ত্তৃপক্ষের জানার জন্য। কয়েদীদের এই পার্থক্য দেখিতে নাই এবং এজন্য কোনও বিশেষ অধিকারও পাওয়া যাইতে পারে না।" স্যার জর্জ লয়েডের কথাগুলি আমার স্মরণে ছিল। সেই জন্য উহা হুবহু আমি উপরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কথাটার ভিতরে কামড় ছিল, কিন্তু উহার আবশ্যকতা ছিল না। তিনি জানিতেন যে, আমার কোনও দয়ার বা কোনও পার্থক্যের দরকার ছিল না। প্রসঙ্গ-ক্রমে এই বিষয়ে সামান্য কথা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বলার ভাব ছিল—"আইন ও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে অপরের সঙ্গে আপনার কোন গুণগত ভেদ নাই।" আশ্চর্য্য এই যে, যদিও কোনও কারণ ছিল না, তবু যখনই তত্ত্বগত দিক হইতে আপত্তি করা হইত, তখনই ব্যবহারে ভেদ করা হইত। কেবলমাত্র গোটাকত ব্যাপারেই রাজনৈতিক কয়েদীর ক্ষেত্রে এই পার্থক্য করা হইয়াছিল।

বস্তুতঃ ভেদ উঠাইয়া দেওয়া অসম্ভব। কয়েদী যে মানুষ একথা যদি না ভোলা হয়, তাহা হইলে কয়েদীর আচার ব্যবহার বুঝা ও সেই আচার ব্যবহারের সহিত তাহার কয়েদী-জীবনযাত্রার সামঞ্জস্য রাখা দরকার। এটা কিছু ধনী দরিদ্র বা শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে পার্থক্য করার প্রশ্ন নয়। বিভিন্ন অবস্থার ভিতরে পড়িয়া লোকের যে ভিন্ন আচার ব্যবহার সৃষ্টি হইয়াছে, কেবল সেই প্রশ্নই ইহাতে রহিয়াছে। এই সত্যকার ভেদ সহজভাবে স্বীকার করার বদলে বলা হয় যে, দোষীর একথা স্মরণ রাখা চাই যে, আইন কাহারও লজ্জা বাঁচাইয়া চলে না এবং গরীব হোক্, ধনী হোক্ বা গ্র্যাজুয়েট হোক্, চুরি করিলে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। কিন্তু শুদ্ধ আইনের এই অর্থ অচল। যদি বাস্তবিকই আইন ভেদ না করে, তাহা হইলেও প্রত্যেকের সহিত তাহার সহ্যশক্তি অনুসারে ব্যবহার করা চাই। যে চোর দুর্বল তাহাকেও ত্রিশ বেত মারিবে আর যে সবল তাহাকেও ত্রিশ বেত মারিবে, ইহাতে যেমন অপক্ষপাত ন্যায় নাই, বরঞ্চ দুর্বলের প্রতি বৈরিতা, ও সবল চোরের প্রতি পক্ষপাত রহিয়াছে; তেমনি শক্ত মাটির উপর ছোবড়ার বিছানায় পণ্ডিত মতিলালের মত লোককে শোওয়ানো—সমান ব্যবহার করা নয়, বেশি করিয়াই সাজা দেওয়া।

কয়েদীও মানুষ এই কথা যদি জেলের ব্যবস্থার ভিতর স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে

যে সংস্কারের বশবর্তী হইয়া লোককে জেলে দেওয়া হইতেছে সে ভাবই বদলাইয়া যায়। আঙ্গুলের টিপ লওয়া হোক্, আগে যে সকল অপরাধ করিয়াছে সেগুলি তাহার নামে লেখা হোক্, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীর অভ্যাস ও তাহার জীবন-যাত্রার বিবরণও নোট করিয়া লওয়া উচিত। যদি কর্ত্তৃপক্ষ কয়েদীদিগকে মানুষ মনে করেন, তবে তাঁহাদের যে প্রথা গ্রহণ করা উচিত তাহা 'ভেদকরা' বা 'পার্থক্য করা' নয়, বরঞ্চ উহাকে 'শ্রেণীভাগকরণ' বলা যায়। একরকমের শ্রেণীভাগ ত আজও বর্তমান আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সাধারণতঃ কয়েদীদিগকে লম্বা এক ঘরে ভিড় করিয়া রাখা হয়, কিন্তু যাহারা ভয়ঙ্কর অপরাধী তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক কুঠুরিতে রাখা হয়, আবার নির্জ্জন কারাদণ্ডের আসামীকে "আঁধার কুঠুরিতে" রাখা হয়, আবার যাহাদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইবে তাহাদিগকে "ফাঁসি-ডিগ্রীতে" রাখা হয়। তেমনি বিনাশ্রমে দণ্ডিতদের জন্য আলাদা স্থান আছে। পাঠকরা আশ্চর্য্য হইবেন যে, রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে বেশীর ভাগই ভিন্ন বিভাগে অথবা "আঁধার কুঠুরিতে" রাখা হয়। কাহাকে কাহাকেও আবার "ফাঁসি-ডিগ্রীতে"ও রাখা হয়। কিন্তু একথায় আমি কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অন্যায় করিয়া না ফেলি। এই বিভাগ ও কুঠুরিগুলির সম্বন্ধে যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, "ফাঁসি-ডিগ্রীর" মত কুঠুরিগুলি বিশেষ করিয়া খারাপ। কিন্তু তাহা নয়। য়েরোড়া জেলের সকল কুঠুরির গড়ন ভাল ও হাওয়া চলাচল করে। সব চাইতে বড় বাধা হইতেছে কুঠুরিগুলির চারিদিকের যে আবেষ্টন তাহাই।

শ্রেণীবিভাগ এখনো করা হয়, শ্রেণীবিভাগ না করিয়া উপায় নাই, এমত অবস্থায় উহা মনুষ্যত্বের অনুকূলই বা কেন করা হইবে না? আমার নির্দেশ অনুযায়ী যদি শ্রেণী বিভাগ করিতে হয়, তবে সমস্ত প্রথাই বদলাইয়া ফেলিতে হয় একথা আমি জানি। আর তাহাতে যে ব্যয় বেশী হইবে এবং নূতন প্রথা অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য নূতন লোকও আবশ্যক হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ যদিও খরচ বেশি হয় তবুও পরে খরচ কমিয়া যাইবেই। আমি যে পরিবর্তনের কথা বলিতেছি তাহাতে সর্বাপেক্ষা বেশি লাভ এই হইবে যে, অপরাধ কমিয়া যাইবে ও কয়েদীদের জীবন শুদ্ধ হইবে। জেল সংস্কার-গৃহই হইবে এবং এবং সংস্কারের জন্যই সে গৃহে কয়েদীরা আসিবে। এমন দিন আসিতে বিলম্ব আছে। কিন্তু পুরানো প্রথায় যদি মোহ-মুগ্ধ হইয়া না থাকি তাহা হইলে জেলকে এই প্রকার সংস্কারের স্থান করা বিশেষ শক্ত নয়।

আমার এখানে এক জেলারের সারগর্ভ কথা স্মরণ হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"যে সকল কয়েদীকে পুলিশী অনুসন্ধান ও রিপোর্ট করার জন্য জেলে রাখা হয়, তাহাদিগকে ভর্তি করার সময় আমি কতবার নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, ইহাদের সকলের অপেক্ষা আমি কতটা ভাল? ঈশ্বর জানেন যে, এখানে যে সকল কয়েদী আসে তাহাদের অপেক্ষা আমি কত গুরুতর অপরাধ করিয়াছি; তবে ব্যাপার এই যে এই বেচারারা ধরা পড়িয়াছে আর আমি বাঁচিয়া গিয়াছি।" এই জেলার মহাশয় যে কথা স্বীকার পাইয়াছেন আমাদের সকলেরই কি তাহা স্বীকার করিতে হইবে না? এ কথা কি সত্য নয় যে, যাহারা ধরা পড়িয়াছে তাহাদের

অপেক্ষা যাহারা ধরা পড়ে নাই তাহাদের মধ্যে অধিকতর অপরাধী আছে। যাহারা বাহিরে আছে সমাজ তাহাদের প্রতি আঙ্গুল নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দেয় না, কিন্তু যাহাদের ধরা না পড়ার মত চালাকি জানা নাই সেই বেচারাদের প্রতি নাক সিট্কাইবার অভ্যাস আমাদের বরাবর। আর এদিকে তাহারাই জেলে আসিয়া পাকা অপরাধী হইয়া যাইতেছে।

তত্ত্ব-হিসাবে স্বীকার করা হয় যে—"যতক্ষণ দোষ প্রমাণ না হয়, ততক্ষণ নির্দোষ গণ্য করা হইবে।" কিন্তু বাস্তবিক ব্যবহারের বেলায়, যাহারা কয়েদে আসিয়া পড়ে, লোকে তাহাদের প্রতি তিরস্কারের দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে। কেহ যদি অপরাধ করিয়াছে স্থির হয়, তাহা হইলেই সমাজ তাহাকে ত্যাগ করে। জেলের ভিতরেও তাহার অবস্থা যে হীন ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে এই শ্বাসরোধকর আবেষ্টন সাধারণতঃ ভোগ করিতে হয় না। কেন না তাহারা আবেষ্টনের বশবর্তী না হইয়া তাহার বিরুদ্ধেই দাঁড়ায় ও কতক পরিমাণে আবেষ্টনকেই উন্নত করে, আর সমাজও তাহাদিগকে কয়েদী বলিয়া মনে করে না। তাহারা বীর, তাহারা পরের হিতের জন্য ত্যাগ বরণ করিয়াছে বলিয়াই সম্মানিত হয়। জেলে তাহাদের যে কষ্টভোগ করিতে হয় তাহা লইয়া গীত রচিত হয় এবং কখনো কখনো অতিরিক্ত আদরে রাজনৈতিক কয়েদীর পতনও হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকে যতই রাজনৈতিক কয়েদীকে বাড়াইয়া তোলে, সরকারও ততই তাহাদের সহিত শত্রুতাচরণ করে। সরকার রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে সাধারণ কয়েদী অপেক্ষা বেশী ভয়ংকর মনে করে। একজন রাজ-কর্মচারী গম্ভীরভাবে বলিতেছিলেন যে, রাজনৈতিক কয়েদীরা সমস্ত সমাজের হানি করে, আর সাধারণ অপরাধীরা ত নিজেদেরই ক্ষতি করিয়া থাকে।

আর একজন রাজ-কর্মচারী আমাকে বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে পৃথক করিয়া রাখা ও তাহাদিগকে দৈনিক ও মাসিক পত্র না দেওয়ার হেতু এই যে, তাহারা যেন নিজেদের অপরাধটা বুঝিতে পারে। রাজনৈতিক কয়েদীরা ত জেলে আসিতে পারার জন্য অহংকার করে। আর, সাধারণ কয়েদীদের স্বাধীনতা নষ্ট হওয়ায় কষ্ট হয়, কিন্তু রাজনৈতিক কয়েদীদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সুতরাং সরকার যে রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে সাজা দেওয়ার জন্য অন্য কোনও উপায় অনুসন্ধান করিবেন তাহা স্বাভাবিক। আর সেইজন্য যে সকল সুবিধা তাহাদিগকে সাধারণতঃ দেওয়ার কথা, তাহা দেওয়া হয় না। সাপ্তাহিক টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান সোসাল রিফর্মার, সার্ভেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, মডার্ণ রিভিউ অথবা ইণ্ডিয়ান রিভিউ—আমি ঐ সব পত্র-পত্রিকা চাহিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে এই কথা বলা হইয়াছিল। দৈনিক পত্র পাঠ করার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া যে একটা কম সাজা দেওয়া হয় পাঠক একথা মনে করিবেন না। কেননা যাহাদিগকে সংবাদপত্র দেওয়া হয় না, তাহাদিগের নিকট উহা অন্ন অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় জিনিষ নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যদি ভাই মলজীকে সংবাদপত্র দেওয়া হইত তবে তাঁহার মাথা খারাপ হইত না। আমার কথা হইল, আমি যে অবস্থাতেই পড়ি, কোনও একটা সংস্কারের কাজ হাতে লইয়া ফেলি। কিন্তু যাহারা আমার

মত নয় তাহাদের অবস্থাটা কী? য়েরোড়া জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে ভয়ংকর কয়েদীদের সহিত এক সঙ্গে রাখা হইত, ইহাতে তাহাদের ক্ষতি না হইয়া যায় না। যাহারা কথায় কথায় বীভৎস শব্দ ব্যবহার করে, যাহারা অশ্লীল কথা ছাড়া অন্য কথা বলিতে জানে না, তাহাদের সহিত রাতদিন কাটানো ছেলেখেলা ব্যাপার নয়। যদি অন্য কয়েদীর উপর ভাল প্রভাব বিস্তার করার জন্য রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া এইভাবে এক সঙ্গে রাখা হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত। কিন্তু আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে আশা স্বপ্নের মতই অলীক। আমি বলিতে চাই যে, রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে দূষিত আবেষ্টনের মধ্যে রাখিয়া তাহাদিগকে অকারণ অধিক সাজা দেওয়া হয়। তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বিভাগে রাখা উচিত এবং তাহাদের বাইরের জীবনযাত্রার অনুকূল ব্যবহার তাহাদের সহিত করা উচিত।

এই অধ্যায়ে ও পরের অধ্যায়ে জেলের সংস্কার সম্বন্ধে যে কথা লিখিতেছি তাহার অন্যায় অর্থ সত্যাগ্রহীরা করিবেন না, এরূপ আশা করি। যে অসুবিধা তাঁহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে তাহার বিরোধ করা সত্যাগ্রহীর সাজে না। যত দুর্ব্যবহারই হোক্ না কেন, তাহা সহ্য করার প্রতিজ্ঞাই ত তাঁহারা লইয়াছেন। ব্যবহার যদি সদয় হয় তবে ভালই, আর যদি না-ই হয় তাহাতেই বা কি আসে যায়?

৫

সংস্কারের সম্ভাবনা

আমার অভ্রান্ত অনুভব যে, সংসারে ভাল দ্বারা মন্দ প্রতিরোধ করিলে ভাল হয়, মন্দের দ্বারা প্রতিরোধে মন্দই হয়। যদি মন্দের বিরুদ্ধে মন্দ খাড়া না করা হয়, তবে সে মন্দ বেকার হইয়া পড়ে এবং এইভাবে উহা পুষ্ট হইতে না পারিয়া মরিয়া যায়। মন্দ কেবল মন্দের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন ঋষিগণ এই সত্য জানিতেন। সেইজন্য তাঁহারা মন্দকে মন্দ দ্বারা প্রতিরোধ না করিয়া ইচ্ছা করিয়া ভাল করার চেষ্টা দ্বারাই প্রতিরোধ করিতেন এবং এইভাবে মন্দকে নাশ করিতেন। তাহা হইলেও মন্দ ত আজও চলিতেছে। তাহার কারণ এই যে, অনেকেই ইহার খোঁজ রাখে নাই। তবুও উহার মূলগত নিয়ম কর্মের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। আসল কথা এই যে, আমরা এত অলস যে, আমাদের সামনে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয় তাহা আমরা ঐশ নিয়ম অনুযায়ী সমাধান করার চেষ্টা করি না। আমরা ধরিয়া লই যে, এই নিয়ম পালন করার মত শক্তি আমাদের নাই। বাস্তবিক দেখিতে গেলে যখন ঐ নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হয়, তখন ঐ প্রকার করা ছাড়া আর কিছুই অধিক সহজ মনে হয় না। মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রভেদ ত এইখানেই। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত না করাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যতটা আমরা এই সত্য জানি না, এই সত্য অনুযায়ী আচরণ করার চেষ্টা করি

না, সেই পরিমাণে আমরা মনুষ্য দেহের কাঠামো ধারণ করিয়াও সত্য মানুষ নই। এই নিয়মের অন্যথা হইতেই পারে না। আমার এমন একটা দৃষ্টান্তও জানা নাই, যেখানে এই নিয়ম সত্য হইয়া উঠে নাই। আমার অভিজ্ঞতায় ত সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের নিকট হইতেও এই মনোভাব দেখাইয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদানই পাইয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার যতগুলি জেলে আমি ঘুরিয়াছি সব জায়গাতেই আমলারা আমার প্রতি প্রথম প্রথম বিরুদ্ধভাবাপন্ন থাকিতেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই শেষকালে আমার এক প্রকার মিত্রই হইতেন। তাঁহাদের তিক্ত ব্যবহারের জবাব আমি মিষ্ট ব্যবহার দ্বারা দিতাম। কেহ একথা মনে করিবেন না যে, আমি অন্যায়ের বিরোধিতা করিতাম না। বরঞ্চ আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসের কালে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক অখণ্ড লড়াই চালাইতে হইয়াছে একথা বলা যায়। এই লড়াইয়ে আমি অনেক অংশেই সফলতা পাইয়াছি। ভারতীয় জেলেও আমি দীর্ঘদিন থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাতেও এই অহিংসাত্মক ব্যবহারের প্রভাব যথার্থ ও চমৎকার-ভাবে আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। য়েরোড়া জেলের কর্মচারীদিগের সহিত কটু ব্যবহার করা ত আমার পক্ষে খুবই সোজা ছিল। উদাহরণস্বরূপ যখন সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হাকিম সাহেবের নিকট লিখিত আমার পত্রের অপমানসূচক সমালোচনা করেন, তখন ইচ্ছা করিলে তাঁহার মত করিয়াই তাহার জবাব আমি দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা করিলে আমি আমার নিজের কাছেই লঘু হইয়া যাইতাম এবং আমি যে একজন ঝগড়াটে দুর্দান্ত কয়েদী—এই ভুল বিশ্বাসই তাঁহার মনে দৃঢ় করিয়া দিতাম। কিন্তু হাকিমজীর নিকট পত্রে যাহা বর্ণনা করা হইয়াছিল পরবর্তী ঘটনার কাছে তাহা কিছুই না, একথা বলা যায়। সেই সকল ঘটনার কিছু কিছু আমি এখানে লিখিতেছি।

আমি জানিতাম যে, একজন গোরা ওয়ার্ডার আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিত। সকল কয়েদীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখাই তাহার কর্তব্য বলিয়া ধারণা ছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অজ্ঞাতসারে কোনও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাজও করিব না বলিয়া আমার সঙ্কল্প থাকায় আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমার ইয়ার্ডের সামনে দিয়া যাওয়ার সময় কেহ যদি আমাকে নমস্কার করে, তবে আমি প্রতিনমস্কার করিব; তাঁহাকে আরও বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমার যে খাদ্য বাঁচিবে তাহা আমার জন্য যে কয়েদী ওয়ার্ডার ছিল তাহাকে দিয়া দিব। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে আমার যে কথা হইয়াছিল তাহা সেই গোরা ওয়ার্ডার জানিত না। একদিন সে দেখিল যে, কোনও একজন কয়েদী আমাকে নমস্কার করিতেছে। আমিও প্রতিনমস্কার করিলাম। আমাদের উভয়কেই ঐ ভাবে দেখিলেও সে কেবলমাত্র কয়েদীটির টিকিট উঠাইয়া লইল। উহার মানে হইতেছে যে, ঐ বেচারাকে কর্তৃপক্ষের নিকট বিচারের জন্য হাজির করানো হইবে। আমি তখনই গোরা ওয়ার্ডারকে বলিলাম যে, সে আমারও নামে যেন রিপোর্ট করে; কেন না আমিও ঐ কয়েদীটির মতই সমান অপরাধী। সে আমাকে জবাব দিল—"আমাকে আমার কর্তব্য করিতেই হইবে।" এখন ঐ গোরা ওয়ার্ডার কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিয়া তাহাকে সাজা যাহাতে না দিতে পারে সেজন্য যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের

সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন সেই কয়েদীর ও আমার মধ্যে পরস্পর সেলাম করার কথা তাঁহাকে বলিলাম। সেই গোরার সম্বন্ধে কোনও কথা উল্লেখ করিলাম না। ঐ ওয়ার্ডার যখন ইহা দেখিল, তখন বুঝিল যে তাহার উপর আমার মনে কোনও বৈরিভাব নাই। সেইদিন হইতেই সে আমাকে সন্দেহ করা ত্যাগ করিল। বরঞ্চ আরো অগ্রসর হইয়া সে অন্যের প্রতি মিত্রভাবে আচরণ করিতে লাগিল।

সকল কয়েদীর মত আমারও প্রত্যহ কাপড় চোপড় ঝাড়িয়া কোনও দ্রব্য দেহে লুকানো আছে কি না তাহা দেখিয়া লওয়া হইত। ইহাতে আমার কখনো আপত্তি হয় নাই। মাসের পর মাস রোজ সন্ধ্যাবেলা কয়েদীদিগকে বন্ধ করার পূর্বে এই প্রকার নিয়মমত 'ঝাড়ুতি' লওয়া হইত। এক সময় এক জেলার আসেন যিনি সকলকেই তুচ্ছ করিয়া চলিতেন। আমার শরীরে আমার 'কচ্ছ' (ছোট বস্ত্র) ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেই জন্য আমার শরীর স্পর্শ করার তাঁহার কোনও কারণ ছিল না। তাহা হইলেও তিনি বিশেষ করিয়া আমার কোমর ও কোমরের নীচের ভাগ স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিতেন। একবার তিনি এই রূপ পরীক্ষা করার পরে আমার কম্বল ও অন্য জিনিষ উঠাইয়া উপর নীচ করিয়া দেখিলেন। জুতা পায়ে দিয়াও তিনি আমার জলের বাসন স্পর্শ করিলেন! এ সকলই আমার নিকট অসহ্য বোধ হইল। আমার ক্রোধ আমার সংযম নষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ আমি নিজেকে সংযত রাখিলাম এবং সহ্য করিলাম। আমি তাঁহাকে কিছুই বলিলাম না। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে রিপোর্ট করিব কিনা সে বিষয়ে ভাবিতে লাগিলাম। য়েরোড়া জেলে আমি নূতন আসি নাই। এখানে আসার দীর্ঘদিন পরে এই ঘটনা ঘটে। সেইজন্য তাঁহার এই ব্যবহার সম্বন্ধে রিপোর্ট করিলে তাঁহার কপালে খুব ভর্ৎসনা জোটার সম্ভাবনা ছিল।

অবশেষে আমি রিপোর্ট না করাই স্থির করিলাম। আমার মনে হইল যে, এই জাতীয় ব্যক্তিগত অপমান ও তুচ্ছ ব্যবহার আমার হজম করিয়া যাওয়াই ঠিক। আমি তাঁহার নামে নালিশ করিলে তাঁহার চাকুরীও যাইতে পারে—ইহাও অসম্ভব নয়। সেইজন্য রিপোর্ট না করিয়া তাঁহার সহিত কথা বলিলাম। তাঁহার ব্যবহার কী প্রকার পীড়াদায়ক তাহা তাঁহাকে বলিলাম। তাঁহাকে একথাও বলিলাম যে, তাঁহার নামে রিপোর্ট করার কথাও ভাবিয়াছিলাম এবং পরে সে সংকল্প ত্যাগ করিয়া কেন তাঁহার সহিত কথা বলাই ঠিক করিলাম। আমার কথা তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। আমি যে তাঁহার উপকার করিলাম এই বিশ্বাস তাঁহার হইল। তিনি একথাও স্বীকার করিলেন যে, তিনি অসমীচীন ব্যবহারই করিয়াছেন ও বলিলেন যে, আমার মনে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। বাস্! তারপর তিনি আর আমার নামও লইতেন না। সকল কয়েদীর প্রতিই তাঁহার ব্যবহার বরাবরের জন্য বদলাইয়া গিয়াছিল কিনা সে খবর আমি রাখি না।

কিন্তু চাবুক মারার ও তজ্জন্য উপবাস সম্বন্ধে আমার মধ্যস্থতা করার কালে এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ফল ফলিয়াছিল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত শিখ কয়েদীরা উপবাস আরম্ভ করে। তাহাদের ধর্মবস্ত্র (এক প্রকার কাছা) জেল-কর্তৃপক্ষ লইয়া গিয়াছিল। উহা ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত ও নিজেদের রান্না করিয়া

খাওয়ার অনুমতি না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহারা আহার করিবে না বলে। যখন এই উপবাসের সংবাদ পাইলাম, তখনই তাহাদের সহিত দেখা করিতে দেওয়ার অনুমতি চাই। কিন্তু আমাকে জবাব দেওয়া হয় যে, সে অনুমতি দেওয়া যায় না। আমি দেখিলাম যে, কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এই প্রকার অনুমতি দেওয়া তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাভিমানে লাগে ও জেল-নিয়ম পালন করা না-করার প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিক যদি জেলের কয়েদীদিগকে সাধারণ অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ বলিয়া ধরা হইত তবে ঐ দুইটি কথার একটাও উঠিত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হইত তাহা হইলে জেলকর্তাদের কতকটা মুস্কিল ও ত্রাস কম হইত, সাধারণের টাকা বাঁচিত এবং তদুপরি এত দিনের একটানা ক্লেশ-দায়ক উপবাস করা হইতেও সেই শিখ কয়েদীরা বাঁচিত।

অবশ্য ইহাও আমি বলিব যে, সেই শিখ কয়েদীদিগের সহিত যদিও আমি দেখা করিতে পারি নাই তবুও আমার 'তার' পাঠাইতে কিছুই আটকাইত না। এই 'তার' শব্দটার খাঁটি অর্থটা এইস্থানে বুঝাইয়া বলিতেছি। জেলের ভাষায় 'তার' করা অথবা 'বেতার খবর' করা মানে কর্ত্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এক কয়েদীর নিকট হইতে অপর কয়েদীর নিকট অননুমোদিত সংবাদ পাঠানো। সকল আমলারাই জেলের এই প্রথা জানে ও সে দিকটায় তাহারা চোখ ঠারিয়া চলিয়া থাকে। তাহারা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানিয়াছে যে, জেলের এইপ্রকার অনিয়ম বন্ধ করা অথবা উহার মূল হেতু রোধ করা তাহাদের শক্তির বাহিরে।

আমি নিজের সিদ্ধান্তের দিক দিয়া এই বিষয়টা ভাল করিয়াই ভাবিয়া দেখিয়াছি বলা চলে। আমার নিজের অভিপ্রায়ে কখনো এই প্রকার 'তার' পাঠাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। যতবার আমি ইহা করিয়াছি ততবারই জেলের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিয়াছি। আমার মনে হয়, ইহার ফলে জেলে কর্মচারীরা আমার প্রতি যে অবিশ্বাস পোষণ করিতেন তাহা দূর হয়। যদি প্রথমেই এই অবস্থা হইত, তাহা হইলে উপরের মত ঘটনায় আমার মধ্যস্থতার প্রার্থনা তাঁহারা মঞ্জুর করিতেন। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান ও উপরিওয়ালাগিরি কি করিয়া দেখানো চলিত?

উপরের ঘটনায় 'বেতার সংবাদ' দেওয়ার ব্যবস্থা করায় আমি সফল হইয়াছিলাম। শিখ কয়েদীদের উপবাস দীর্ঘদিন পরে শেষ হয়। আমার সংবাদ পাঠানোর ফলেই যে উহাদের অনশন শেষ হইয়াছিল,একথা অবশ্য বলা যায় না।

ঐ ঘটনায় দয়ার বশবর্তী হইয়া আমাকে উহাতে হাত দিতে হয়। দ্বিতীয় ঘটনা, যখন মুলসীপেটা-সত্যাগ্রহীদিগকে কম কাজ করার জন্য চাবুক মারা হইতেছিল সেই সময় ঘটে। এই দুঃখদায়ক ঘটনার কথা এখন সমস্ত খুলিয়া বলিতে পারিব না। এই কয়েদীদের মধ্যে অনেকে যুবক ছিল; হইতে পারে তাহাদের শক্তির অপেক্ষা কম কাজ তাহারা করিত। তাহাদিগকে পেষাই করার কাজ দেওয়া হইয়াছিল। যে কারণেই হোক্, এই মুলসীপেটা-কয়েদীদের অন্য স্বরাজী কয়েদীদের সামিল "রাজনৈতিক" বলিয়া গণ্য করা হইত না। কাজের ভিতরেও ইহাদের বেশীর ভাগ জাঁতা ঘুরাইতেই দেওয়া হইত। এক দিক দিয়া জেলের এই পেষাই কাজকে অহেতুক

নিন্দনীয় গণ্য করা হয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা ধারণাও বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে ইহা অতিশয় কঠিন কাজ। একথা ঠিক যে, যে কোনও খাটুনীই যদি চাপ দিয়া আদায় করিয়া লওয়া হয় ও সাজা বলিয়া গণ্য করা হয়, তাহা হইলে সহজেই যাহারা সেই কাজ অন্য সময় করে তাহাদের পক্ষেও তাহা উত্যক্তকর ও ত্রাসজনক হইয়া পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অন্তরাত্মার আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া জেলে আসিয়াছে, তাহাকে যে কাজই দেওয়া হোক্, তাহাই সম্মান ও আনন্দের বস্তু বলিয়া তাহার গণ্য করা সঙ্গত। যে প্রকারের পরিশ্রমই তাহাকে করিতে দেওয়া হোক্ না কেন, সেই কাজই করিয়া দেওয়ার জন্য তাহার শরীর মন নিয়োগ করা কর্তব্য।

মুলসীপেটার কয়েদীরা অথবা অন্য কয়েদীরা একটা দল হিসাবে আসে নাই। তাহাদের সকলের পক্ষেই জেলের এই অভিজ্ঞতা নূতন। তাহাদের এই অবস্থায় কর্তব্য কী—তাহাদের খুব বেশী কাজ করিতে হইবে, অথবা খুব কম কাজ করিতে হইবে, অথবা আদৌ কাজ করিতে হইবে কিনা একথা তাহারা ঠিক জানিত না। মুলসীপেটার কয়েদীদের অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন ভাব পোষণ করিত। এ বিষয়ে তাহারা কোনই বিচার করিত না একথাও বলা চলে। তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে অনেক তেজস্বী যুবক ছিল। তাহারা জো-হুকুম হওয়া বরদাস্ত করিবার লোক ছিল না। সেইজন্য তাহাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সর্বদাই ঠোকাঠুকি লাগিয়া থাকিত।

অবশেষে ব্যাপার এই রকম দাঁড়াইল: সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর জোন্স গরম হইয়া উঠিলেন। তিনি ধরিয়া লইলেন যে, ইহারা ইচ্ছা করিয়াই কাজ করে না। তিনি তাহাদের এই অভ্যাস দূর করাইবার জন্য তাহাদের ছয় জনকে চাবুক মারার হুকুম দিলেন। এই শাস্তির সংবাদে সমস্ত জেল চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রত্যেকেই জানিত যে জেলে কী ঘটিতেছে ও কেন ঘটিতেছে। আমার বেড়ার সামনে দিয়া লইয়া যাওয়ার সময় এই কয়েদীদিগকে আমি দেখিতে পাইলাম। আমার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। ইহাদের মধ্যে একজন আমাকে চিনিতে পারিয়া প্রণাম করিল, 'আঁধার ডিগ্রী'তে যে রাজনৈতিক কয়েদীরা ছিল তাহারা এই ঘটনার প্রতিবাদ করার জন্য হরতাল করা স্থির করিল।

মেজর জোন্সের গুণের প্রশংসা আগে করিয়াছি, এখন তাঁহার কার্যের দুঃখ-দায়ক সমালোচনা করিতে হইতেছে। মেজর জোন্স উন্নতচরিত্র এবং ন্যায়প্রিয়; সাধারণ কর্মচারী অপেক্ষা কয়েদীদের তিনি অধিক যত্ন লইতেন। তাহা হইলেও তিনি হঠাৎ কোনও কাজ করিয়া ফেলিতেন। সেই জন্য তাঁহার ইতিকর্তব্য নির্ণয়ে অনেক সময়ে তিনি ঠকিয়া যাইতেন। তবে ইহা বড় কথা নয়, কেননা তাড়াতাড়ি তিনি অনুতাপ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু চাবুক মারার মত সাজা, যাহা একবার দিয়া ফেলিলে আর শোধ্‌রানো যায় না, কাজেই এইভাবে খোলা-মেলা ভাবে চলা তাঁহার পক্ষে ঠিক নয়। আমি নরম ভাবে তাঁহার সহিত সকল বিষয় আলোচনা করিলাম। কিন্তু কয়েদী কাজ কম করিলে তাহার জন্য তাহাকে চাবুক মারা যে অনুচিত, একথা কোন দিক হইতে আলোচনা করিয়াই আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে একথাও বুঝাইতে পারিলাম না যে, কাজ কম

করিতেছে বলিয়া প্রত্যেকেই যে ইচ্ছাপূর্বক উহা করিতেছে, ইহা মনে করিয়া লওয়া ঠিক নয়। তিনি অবশ্য স্বীকার করিলেন যে, এরূপ স্থলে কর্মচারীদেরও দেখার দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে উহা হওয়ার এত কম সম্ভাবনা যে, তিনি তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য কর্মচারীদের ন্যায় মেজর জোন্সও চাবুক মারার মত সাজার উপযোগিতায় বিশ্বাস করিতেন।

এই ঘটনাকে অতিশয় গুরুতর গণ্য করিয়া তাহা প্রতিরোধের জন্য রাজনৈতিক কয়েদীরা উপবাস করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ইহা আমি জানিতাম। আমার মনে হইল, নিজেদের দিকটা ভাল করিয়া দেখিয়া, যে পর্য্যন্ত উপবাসের ঔচিত্য খুব প্রবল বলিয়া মনে না হয়, সে পর্য্যন্ত অনশন করা ঠিক নয়। আবার ইহাও বিবেচ্য যে, কয়েদীরা নিয়ম নিজের হাতে লইয়া নিজেরা নিজেদের বিচার করিতে পারে না। সেই-জন্য এই সকল ভাইদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়ার জন্য আমি পুনরায় মেজর জোন্সের নিকট অনুমতি চাই। এবারও পূর্বের মত অনুমতি পাওয়া গেল না। এই বিষয়ে কর্মচারীদের সহিত আমার পত্র বিনিময় আমি প্রকাশ করিয়াছি। যাঁহারা এই বিষয়ে ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উহাও পড়িয়া লইতে বলিতেছি।

আমাকে আবার 'বেতার সংবাদ' দেওয়ার আশ্রয় লইতে হইল। রাজনৈতিক কয়েদীদের একটা বড় অনশনের ঘটনা এই প্রকারে সংবাদ পাঠাইয়া বন্ধ করিতে পারিলাম বটে, কিন্তু উহা হইতে আর একটা দুঃখের কারণ উৎপন্ন হইল—তাহা এখানেই লিখিতেছি। ভাই জয়রাম দাস আমার এই সংবাদ জেল নিয়ম ভাঙিয়া পেঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এজন্য ভাই জয়রামদাসকে জেল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া রাজনৈতিক কয়েদীদের সহিত দেখা করিতে হয় এবং তিনি তাহাই করেন। রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে বিবেচনা করিয়াই বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাখা হইত। সেইজন্য ভাই জয়রামদাস নিজের ওয়ার্ড ত্যাগ করিয়া, কয়েদী ওয়ার্ডার ও গোরা জেলারের জ্ঞাতসারেই রাজ-নৈতিক সকল বিভাগেই গিয়া উপস্থিত হন। তিনি প্রহরীকে বলেন—"আমি জেল-নিয়ম ভঙ্গ করিতেছি তাহা আমি জানি, তোমারা আমার নামে রিপোর্ট করিও।"

সেই অনুসারে তাঁহার নামে রিপোর্ট হয়। মেজর জোন্স বলিলেন যে, জয়রামদাস যাহা করিয়াছেন তাহা শুভ ইচ্ছাতেই করিয়াছেন; তিনি নিজে এজন্য জয়রামদাসকে ধন্যবাদ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার নিকট জেল-নিয়ম ভঙ্গের রিপোর্ট নিয়মিত উপস্থিত হওয়ায় তিনি উহার নিয়মানুযায়ী বিচার না করিয়া পারেন না। তিনি ভাই জয়রামদাসকে ৭ দিনের নির্জন কারাবাসের দণ্ডাদেশ দেন। আমি একথা যখন জানিলাম, তখন মেজর জোন্সকে বলিলাম—"জয়রামদাসকে যে সাজা দেওয়া হইয়াছে আমাকেও অন্ততঃ ততটা দেওয়া উচিত।" তিনি বলিলেন—"জেল নিয়ম ভঙ্গের জন্য যদি আমার নিকট নিয়ম মত অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, সে ক্ষেত্রে তাহা আমি গ্রাহ্য না করিয়া পারি না। সেইজন্যই আমি জয়রামদাসকে সাজা দিয়াছি। জয়রামদাস যাহা করিয়াছেন সেজন্য আমি মোটেই অসন্তুষ্ট নই, বরঞ্চ আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি যে, তিনি সাজা পাওয়ার সম্ভবনা সত্ত্বেও রাজনৈতিক কয়েদী-দের অনশন বন্ধ করার জন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ফলে একটা গোলমাল ঘটা বন্ধ হয়।

আমাকে সাজা দেওয়া সম্বন্ধে তিনি বলেন—"আপনাকে সাজা দেওয়ার আমি কোন কারণ দেখিতেছি না। আপনি ত আপনার ওয়ার্ড ছাড়িয়া যান নাই। আর জয়রামদাস যে আপনার আজ্ঞানুসারেই গিয়াছেন এমন কথা নিয়ম মত আমার নিকট রিপোর্ট হয় নাই।" আমি তাঁহার যুক্তির মর্ম বুঝিতে পারিয়া আমাকে সাজা দেওয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিলাম না।

পরবর্তী অধ্যায়ে সত্যাগ্রহের দৃষ্টিতে ইহা হইতেও চমৎকার ও মহত্বপূর্ণ এক উদাহরণ দিতেছি। তাহার পর অহিংসাত্মক ব্যবহারের নৈতিক পরিণাম ও অনশনের নীতি সম্বন্ধে বিচার করিব।

৬

উপবাসের শাস্ত্রচর্চ্চা

পূর্বের অধ্যায়ে যে সময়ের ঘটনার কথা বর্ণনা করিয়াছি, সে সময় আমার কুঠুরী একটা ১১ কামরার এক ত্রিকোণাকার কম্পাউণ্ডে ছিল। এই কুঠুরীগুলিও আঁধার কুঠুরী বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু অন্য আঁধার কুঠুরী ও আমার কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা মোটা উঁচু দেওয়াল ছিল। আঁধার কুঠুরীর দিকে যাওয়ার রাস্তা ছিল আমার কম্পাউণ্ডের ফটকের সম্মুখ দিয়া। সেইজন্য এই রাস্তায় যে কয়েদীরা যাতায়াত করিত আমি তাহাদিগকে দেখিতে পাইতাম। বাস্তবিক দেখিতে গেলে এই রাস্তায় সারাদিন কয়েদীদের আনাগোনা চলিত। সেইজন্যই কয়েদীদের দিয়া খবরাখবর চালানো সহজ ছিল। চাবুক-মারার ঘটনার কিছুদিন পরে আমাকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বদলী করা হইল। এখানকার কুঠুরীগুলি আঁধার কুঠুরী অপেক্ষা বড় ও খুব হাওয়া যাতায়াতের পথ ছিল। আঙিনায় একটা সুন্দর বাগিচা ছিল। কিন্তু যখন আমরা আঁধার কুঠুরীতে ছিলাম, তখন আমরা সারাদিন আমাদের ফটকের সাম্‌নে কয়েদীদিগকে দেখিতে পাইতাম; সে সমস্তই বন্ধ হইয়া গেল, আমি একা পড়িলাম। এইজন্য আমার খালি খালি বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সেজন্য আমার নিজের কোনও দুঃখ হয় নাই। বরঞ্চ সম্পূর্ণ নির্জনতা পাইয়া অভ্যাস ও মননের জন্য সমস্ত সময়টাই দেওয়া গেল। এদিকে 'বেতার-সংবাদ' চলাচলের পথ খোলাই রহিল। কেন না যে পর্যন্ত কোনও না কোনও কয়েদী অথবা কর্মচারী আমাদের সহিত দেখা করিতে পারে, ততদিন এই প্রকার সংবাদ বন্ধ করা অসম্ভব। যতই উহা বন্ধ করিবার চেষ্টা হোক্ না কেন, কোনও না কোনও কয়েদী বা কর্মচারী আসিয়া কিছু বলিয়া যায়, যাহাতে জেলের ভিতরের ঘটনা সহজেই জানিতে পারা যায়।

এইভাবে একদিন প্রাতে শুনিলাম যে, মুলসীপেটার কয়েদীদিগকে কম কাজ করার জন্য চাবুক মারা হইবে। এই ঘটনার প্রতিবাদস্বরূপে অন্য সমস্ত মুলসীপেটা কয়েদীরাই উপবাস আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইজন আমার বহুকালের পরিচিত। একজন হইতেছেন দেব, অপরজন দস্তানে। দেব আমার সহিত চম্পারণে

কাজ করিতেন এবং তৎকালে তিনি একজন খুব নিষ্ঠাবান্, বিবেচক ও কুশল কর্মকর্তা বলিয়া গণ্য ছিলেন। ভূসাওয়ালের ভাই দস্তানেকে ত সকলেই জানেন। যাঁহারা চাবুক খাইয়াছেন ও উপবাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাই দেব একজন ছিলেন বলিয়া আমার যে কি দুঃখ হইল তাহা পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারেন। এই সময় আমার সাথীদের মধ্যে ছিলেন ভাই ইন্দুলাল ও ভাই মনসর আলি। তাঁহারাও একথা শুনিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তারপর সহানুভূতি দেখাইবার জন্য সকলেই উপবাস করিবেন বলিয়া প্রথমে স্থির করিলেন। কিন্তু তাহা করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিলাম যে, এই প্রকার উপবাসের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। আমরা দেখিলাম যে, চাবুক-মারার জন্য অথবা যে রাজনৈতিক কয়েদীরা উপবাস করিতেছে তাহাদের জন্য, নৈতিক দৃষ্টিতে অথবা অন্য কোনও কারণেই আমাদের দায়িত্ব নাই। উপযুক্ত সত্যাগ্রহী হিসাবে, জেলের সমুদয় কষ্ট, বেত খাওয়া ইত্যাদি সমস্ত অন্যায় সহ্য করাই আমাদের ধর্ম। এই অবস্থায় সত্যাগ্রহীর পক্ষে ভবিষ্যতে শাস্তি বন্ধ করার জন্য, এই প্রকার উপবাস করিতে প্রস্তুত হওয়া জেলের কর্মচারীর প্রতি এক প্রকার হিংসাভাব পোষণ করারই সমান। তাহা ছাড়া, কর্মচারীদের কার্য্যের ন্যায়-অন্যায় বিচার করার অধিকার কয়েদীর নাই। একাজ করিলে সমুদয় জেলের নিয়ম নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। আর যদি আমরা জেল-কর্মচারীদের উপর বিচারক হইয়াই বসি, তথাপি ন্যায় বিচার করার মত উপকরণ আমাদের হাতে নাই; থাকিতেও পারে না। এখন যাহারা উপবাস করিতেছে তাহাদের প্রতি সহানুভূতি বশতঃ যদি আমরাও অনশন করিতে চাই, সেক্ষেত্রে তাহাদের অনশনটা ন্যায়সঙ্গত কিনা তাহারও বিচার করার উপযুক্ত উপায় আমাদের কাছে কিছু নাই। উপরের যে কোনও একটা কারণ অনুসারেই, আমরা যদি অনশন করি, তাহা হইলে হঠকারীর মত কাজ করার দোষ ঘটে।

এই রকম মুস্কিল যখন, আমি আমার সাথীদিগকে বলিলাম যে, সকলের আগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিয়া এই বিষয়ে ঠিক অবস্থাটা জানা দরকার। এবারও যাঁহারা অনশন করিতেছিলেন তাঁহাদের সহিত পূর্বের মত একবার দেখা করার চেষ্টা করা দরকার। আমার মনে হইল যে, কয়েদী হইলেও, মানুষ হিসাবে আমরা এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারি না। যখন একটা অমানুষিক অন্যায় হইতে বসিয়াছে, তখন জেলের সাধারণ নিয়মানুসারে কয়েদী হইলেও, এই প্রকার ঘটনায় হস্তক্ষেপ করার আমাদের অধিকার আছে। এই বিষয়ে আমার ২৯-৬-২৩ তারিখের পত্র ৯-৩-২৪ তারিখের 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পত্র হইতেই এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে। পত্র ব্যবহার অনেক হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল গোপনীয় বলিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমার নাই। এই সমস্ত লেখালেখির ফলে জেল-কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিলেন যে, জেলের পরিচালনা কার্যে মিছামিছি আমার হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা নাই এবং একথাও বুঝিলেন যে, যাঁহারা উপবাস করিতেছেন তাঁহাদের দুই জনের সহিত দেখা করার প্রস্তাবে দয়ার ভাব ছাড়া আমার মনে আর কিছুই ছিল না। সেইজন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পুলিশের বড়কর্তা মিঃ গ্রিফিথের সম্মুখে ভাই দেব ও দস্তানের সহিত সাক্ষাৎ করার অনুমতি পাইলাম।

ই'হারা পূরা তেরদিন উপবাস করিতেছিলেন। তাহা সত্ত্বেও আমাকে দেখিয়া কাহারও সাহায্য না লইয়াই স্থির-পদক্ষেপে আগাইয়া আসিলেন এবং আনন্দ ও প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া আমার বক্ষ লগ্ন হইলেন। তাঁহারা যেমন বীর ছিলেন তেমনি প্রেম-প্রবণ ছিলেন। তাঁহাদের শরীর ভয়ানক শুকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু শরীর যেমন দূর্বল হইয়াছিল, আত্মা তেমনি দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদিগকে কথায় কথায় আমি হাসিয়া বলিলাম—"এখন ত মরণের দ্বারে আসিয়া পেঁাছাইয়াছ, কি বল?" তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন—"মোটেই না, আমরা যতদিন ইচ্ছা অনশন দীর্ঘ করিতে পারি, কেননা আমরা সত্যের উপর দাঁড়াইয়া আছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর যদি ভুল করিয়া থাক?" "তাহা হইলে ভুল স্বীকার করিব ও অনশন পরিত্যাগ করিব।" এই সময় তাঁহাদের মুখে চোখে এমন একটা তেজ আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, তাঁহারা যে অনেক দিন হইতে ক্ষুধার্ত রহিয়াছেন, বারবার আমার তাহা ভুল হইয়া যাইতেছিল।

তাঁহারা তাঁহাদের অনশনের কারণ স্বরূপ বলিলেন যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সাজা দেওয়া অন্যায় হইয়াছে এবং আরও বলিলেন যে, যতদিন তিনি ভুল স্বীকার না করেন ও ক্ষমা প্রার্থনা না করেন ততদিন অনশন চালাইয়া যাইবেন। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক হয় নাই বলিয়া আমি যুক্তি দিতে লাগিলাম। যে নৈতিক ভিত্তির উপর তাঁহাদের অনশন নির্ভর করে তাহার আলোচনা কালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজের ইচ্ছায় এবং নিজের স্বাভাবিক সৎস্বভাব-বশতঃ বলিয়া উঠিলেন—"আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত বলিতেছি যে, যদি আমার মনে হয় যে, আমি অন্যায় করিয়াছি, তবে অবশ্যই আপনাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আমি জানি—আমার অনেক সময় ভুল হয়। আমারা অনেক ভুল করিয়া থাকি। কিন্তু এই বিষয়টাতে যে সত্যই আমার ভুল হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না।" এদিকে আমার অনুনয় ত চলিতেই ছিল। আমি মিত্র-দিগকে জানাইলাম যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মনে, যে পর্য্যন্ত তাঁহার ভুল হইয়াছে এই বিশ্বাস না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলা ঠিক নয়। তাঁহার ভুল হইয়াছে এই ধারণা তাঁহার মনে জন্মাইবার পথ অনশন করা নহে। এই যুক্তি তাঁহারা স্বীকার করিলেন। ইহা ছাড়া সত্যাগ্রহী হিসাবে আমরা যদি দুঃখ সহ্য করিতে না চাই, তবে আমাদের নিজেদের বা ভাই বন্ধুদের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপই বা কি করিয়া অনশন করা যায়? অবশেষে তাঁহারা আমার যুক্তির সঙ্গতি বুঝিতে পারিলেন এবং কথার মাঝখানে মেজর জোন্স খোলা-মনে যাহা বলিলেন তাহাতে এই বুঝানো পূরা হইল। তাঁহারা অনশন ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন এবং অন্য কয়েদীদিগকেও অনশন ত্যাগ করাইবার ভার লইলেন। আমার দুধ হইতে তাঁহাদিগকে তখনি খানিকটা দেওয়ার জন্য মেজর জোন্সের অনুমতি চাহিলাম। উহা তখনি আনিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা দুধ পান করিতে স্বীকার পাইলেন, কিন্তু স্নান করিয়া অন্য অনশনকারী ভাইদের সঙ্গেই পান করিবেন বলিলেন। যতদিন ই'হাদের শরীর সুস্থ না হয়, ততদিন ই'হাদিগকে দুধ ও ফল দেওয়ার আদেশ মেজর জোন্স দিলেন। আনন্দের সহিত পরস্পরের হাত স্পর্শ করিয়া বিদায় লইলাম। ক্ষণকালের জন্য আমলারা আমলাগিরি ভুলিয়া গেলেন

এবং আমরা কয়েদীরাও যে কয়েদী একথাও ভুলিয়া গেলাম! কতক সময়ের জন্য, একটা যেন গোলমালের ভিতরে সকলেই মিত্র হইয়া গেলাম। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, মিত্রতার বিকাশ ঘটাইয়াই আমরা সফলকাম হইয়াছিলাম।

এই ভাবে অনশন যুদ্ধের শেষ হইল। মেজর জোন্স আমার নিকট স্বীকার করিলেন যে, তিনি অনশনের যত লড়াই লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এইটাই নির্মলতম। অনশনকারীরা কোনও ক্রমে লুকাইয়া খাদ্য না খাইতে পারে, সেজন্য তিনি খুব সাবধানতা লইয়াছিলেন। এবং তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এই অনশনের সময় সেভাবে তাহারা কোন খাদ্য পায় নাই। আমার মনে হইল যে, অনশনকারীদের ধাত যদি তিনি পূর্বে হইতে জানিতেন, তবে তাঁহাকে এত সাবধানতা লইতে হইত না।

এই ঘটনার স্থায়ী ফল এই হইল যে, সরকার হুকুম দিলেন, জেল কর্মচারীদের অপমান অথবা অনুরূপ কোনও ভয়ানক অপরাধ না ঘটিলে, প্রধান কর্তার অনুমতি ব্যতীত কয়েদীদিগকে চাবুক মারার সাজা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দিতে পারিবেন না। নিঃসন্দেহে এই সাবধানতা আবশ্যক ছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা যতটা পুরাপুরি থাকা দরকার তাহা দিলেও, যেখানে এমন সাজা দেওয়া হয় যে, তাহা আর ফিরাইয়া লওয়া যায় না, সে স্থলে খুব জ্ঞানী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতেও কম ক্ষমতা থাকা উচিত।

ভাই দস্তানে, দেব ও অন্য সত্যাগ্রহীদের উপবাস হেতু যে খুব ভাল ফল হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না উপবাসের হেতুতে যে ভুলই থাকুক না কেন, উপবাসের উদ্দেশ্য খুব উচ্চ ছিল। আর তাঁহারা যে উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ নির্মল ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, পরিণাম শুভ হইলেও, উপবাসটা নিন্দনীয় ছিল। যে শুভ পরিণাম তাহা উপবাসের ফল বলা যায় না। যাঁহারা উপবাস করিতেছিলেন তাঁহারা ভুল স্বীকার করার যে উত্তম মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যে উপবাস ত্যাগ করার সাহস দেখাইয়াছিলেন সেই জন্যই শুভ ফল হইয়াছিল। যে অবস্থায় আহার করিয়া জীবনধারণ করা অসম্মানজনক হইয়া পড়ে সেই অবস্থাতেই সত্যাগ্রহী উপবাসের আশ্রয় লয়। সেই অবস্থায় উহা ন্যায্য গণ্য হয়। এই হিসাবে কয়েদীর ব্যবহার সম্বন্ধে আমি বলি যে, যদি আমার ধর্মসম্বন্ধে স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়, জেলকর্মচারী একজন সাধারণ মানুষ হিসাবেও আমার সহিত ব্যবহার না করে, যেমন ধরুন আমার খাবার আমাকে ভালভাবে না দিয়া ছুঁড়িয়া দেয়, তাহা হইলে এই অবস্থায় ঐ প্রকার খাদ্য লইয়া বাঁচিয়া থাকা অতি বড় অপমান বলিয়া গণ্য হইবে। এ কথা না বলিলেও চলে যে, ধর্ম-সম্বন্ধীয় প্রতিবন্ধক বা অন্য অপমান এমনধারা হওয়া চাই যে, উহা যে কোনও কয়েদীর পক্ষেই পীড়াদায়ক। এই প্রকার সাবধানতার কথা বলার আবশ্যকতা আছে, কেন না অনেক সময় এই প্রকার ধর্মীয় আবশ্যকতা একটা ছুতা মাত্র হয় এবং বস্তুতঃ উহা জেলের কর্তাদিগকে উত্যক্ত করার জন্যই করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ হয় যে, যেখানে অপমানের কোনও কারণ নাই সেখানেও অপমান আছে বলিয়া ধরা হয়। যেমন, চিঠিপত্র জেলের নিয়ম বিরুদ্ধভাবে লুকাইয়া রাখার জন্য ধর্মপুস্তকের

আবশ্যকতার ভাণ করা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কাছে রাখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা শোভা পায় না। তেমনি সাধারণ কয়েদীর সহিত যে ব্যবহার জেলকর্তারা করিয়া থাকেন তাহা দ্বারা বিশেষভাবে আমাকেই অপমান করিয়াছেন মনে করিয়া আমিই বা কেন রুষ্ট হই? সত্যাগ্রহে ভণ্ডামির অবকাশ নাই। কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রে উপবাসীদিগের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদের কথা বুঝিয়া লওয়ার অবকাশ দিতে এবং যদি তাঁহাদের ভুল হইয়া থাকে তবে সে ভুল তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার অবকাশ দিতে সরকার যদি অস্বীকার করেন, তবে এমন অবস্থায় আমার উপবাস না করিয়া আর উপায় থাকে না। কেন না যখন আমি দেখিতে পাই যে, আমার রক্ষকেরা সাধারণ মানুষের যতটুকু দয়া-ধর্ম পালন করা দরকার তাহাই যদি করেন, তবে কতকগুলি লোককে অনাহারে মরা হইতে বাঁচাইতে পারা যায়, তবে সর্বপ্রযত্নে তাহারই ব্যবস্থা করিতে যাওয়া আমার ধর্ম হইয়া পড়ে; আর তাহাই না করিতে পারা পর্যন্ত নিজের জীবনযাত্রার জন্য আমি নিজেও অন্নগ্রহণ করিতে পারি না।

কয়েকজন মিত্র বলিলেন—"এত সূক্ষ্ম ভেদ করার প্রয়োজন কি? যদি আমরা জেলের বাহিরে রাজকর্মচারীদিগকে ত্যক্ত করিতে পারি, তবে জেলের ভিতরেই বা তাহা কেন করিব না? আপনি জেলকর্মচারীদের সহিত যে ব্যবহার করিতেছেন আমরা কেন তাহা করিব? অহিংসাত্মক থাকিয়া আমরা সকল রকমে কেন তাহাদের বিরোধিতা করিব না? একমাত্র আমাদের নিজেদের সুবিধা ছাড়া আর অন্য কি কারণে নিয়মাদি পালন করিব? জেল-ব্যবস্থাকে অচল করিয়া ফেলার অধিকার কি আমাদের নাই? আমাদের ইহাই কি কর্তব্য নয়? বল-প্রয়োগ না করিয়া যদি আমরা কর্মচারীদের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে সরকার বেশী লোক গ্রেপ্তার করিতে পারিবে না ও বেশী লোককে জেলে পুরিয়া দেওয়াও শক্ত হইয়া পড়িবে এবং অবশেষে বোঝাপড়া করিতে হইবে।" এই ধরনের যুক্তি খুব গাম্ভীর্য্যের সহিত আমার কাছে হাজির করা হয়। সেই জন্য পরবর্তী অধ্যায়ে উহা বিচার করিব।

৭

সত্যাগ্রহী কয়েদীর ব্যবহার

পূর্ব অধ্যায়ের শেষভাগে যে সকল যুক্তি কোন কোন মিত্র দিয়া থাকেন তাহা লিখিয়াছি। আর কিছু না হোক্, অনেকে উহা ন্যায্য মনে করিয়া থাকেন এবং ১৯২১ ও ১৯২২ সালে যখন হাজার হাজার লোক জেলে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা পুরাপুরি ঐ রকম ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াও ইহা আলোচনার যোগ্য।

প্রথম কথাই এই যে, বাহিরেও সরকারকে ত্যক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আচরণ যদি শুদ্ধ হয়, তবে তাহাতে সরকার বিরক্ত হয় কি না হয়, তাহা দেখার দরকার নাই। আমরা অসহযোগ করায় সরকারের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগিয়াছে

এবং হয়ত অন্য উপায়েও সরকার বিরক্ত হইত; কিন্তু আমরা যে আইন-সভা বয়কট করিয়াছি তাহা কেবল ধর্মকার্য্য জ্ঞানেই করিয়াছি। এমন কি যদি দেখা যায় যে, অসহযোগ করায় রাজপুরুষদের আনন্দই হয়, তাহা হইলেও অসহযোগ বন্ধ করিব না। সরকারের উপর অসহযোগের কী প্রভাব হয়, সে সম্বন্ধে আমরা উদাসীন, কেননা অসহযোগ দ্বারা সরকারের মনের উপর যে প্রভাবই হোক্ না কেন, শেষকালে উহাতে আমাদেরই কল্যাণ। কিন্তু সে ধরনের অসহযোগ ত জেলে সম্ভব নয়। আমরা জেলে কোনও স্বার্থসাধন করার জন্য ত আসি না, সরকার আমাদিগকে অপরাধী মনে করে, সেই জন্য জেলে ভর্তি করে। সেই জন্য আমাদের কর্তব্য হইবে যে, সরকার যত আদর্শ ব্যবহার আমাদের নিকট হইতে পাইতে চায়, ঠিক সেই প্রকার ব্যবহার করা। জেলের বাহিরে আমাদের উদ্দেশ্য হইল আদালত, আইনসভা, স্কুল ও উপাধি পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের কোনও মূল্য থাকিলেও তাহাদের সাহায্য না লইয়া আমাদের চলিয়া যাইতে পারে তাহাই দেখাইয়া দেওয়া। যদিও আমাদের মধ্যে সকলেই ইহা নাও বুঝিতে পারে, তবু এইরূপ কার্য্য বিরোধীপক্ষের হৃদয় পরিবর্তন ও তাহার বুদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারে না। ভণ্ডামি করিয়া সরকারকে ভয় দেখানো চলে না। অহিংসাত্মক আন্দোলনে গুণ্ডামির স্থান নাই।

আমি অনেকবার অসহযোগী কয়েদীকে যুদ্ধের কয়েদীর সহিত তুলনা করিয়াছি। তাহার কারণও আছে। একবার শত্রুর কবলে পড়িলে যুদ্ধের কয়েদীরা শত্রুর সহিত মিত্র ব্যবহার করে। যুদ্ধের কয়েদী কোনও সিপাই যদি শত্রুকে ঠকায়, তাহা অপমানজনক বলিয়া গণ্য হয়। সরকার সত্যাগ্রহী কয়েদীকে যুদ্ধের কয়েদী বলিয়া গণ্য না করিলেও তাহাতে ক্ষতি নাই। আমরা যদি যুদ্ধের কয়েদীর ন্যায় ব্যবহারই করি, তবে সরকার মান না দিয়া পারিবেন না। জেলকে আমাদের একটা নিরপেক্ষ সংস্থা বলিয়া গণ্য করা দরকার। সেখানে খানিকটা পর্যন্ত আমরা সরকারের সহিত সহায়তা করিয়া থাকি—করাও উচিত।

আমরা যদি ইচ্ছাপূর্বক জেলের নিয়ম ভঙ্গ করি এবং আবার সঙ্গে সঙ্গে জেলের দেওয়া দণ্ড এবং জেলকর্মচারীদের কঠিন ব্যবহার লইয়া অভিযোগ করি, তবে তাহা বড়ই অনুচিত ও অসম্মানজনক কার্য্য বলিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ ধরুন, তল্লাসীতে বাধা দেওয়া ও তর্ক করা, অপরদিকে কম্বলের নীচে অবৈধ বস্তু লুকাইয়া রাখাই বা কেমন করিয়া চলে? এই রকম অবস্থায় আমাদের অসত্য বলিতে হইবে, বা অন্য কোনও ঠকামি করার অধিকার আছে—এরূপ কথা সত্যাগ্রহ শাস্ত্র বলে না। জেলকর্মচারীদিগকে উত্যক্ত করিলে সরকার দমিয়া যাইবে ও বোঝা-পড়া করিতে আসিবে, এ প্রকার ভাবিলে সরকারকে হয় খুব ভালমানুষ বলিয়া সার্টিফিকেট দিতে হয়, অথবা সরকারকে বেকুব মনে করিতে হয়। অজ্ঞাতসারে সরকারের ভালমানুষির এই সার্টিফিকেট দেওয়ার মানে হয় এই যে, যদি কর্মচারীদিগকে খুব উত্যক্ত করা যায়, তবে সরকার তাহা মুখ বুজিয়া সহ্য করিবেন, এবং আমাদিগকে উপযুক্ত সাজা দেওয়ার সাহস করিবেন না বলিয়া পশ্চাৎপদ হইবেন। হাকিমদিগকেও এত বিচারশীল ও দয়ালু মনে করা হয় যে, কঠিন শাস্তি দেওয়ার

কারণ ঘটিলেও তাঁহারা আমাদিগকে কঠিন সাজা দিবেন না। বাস্তবিক ব্যাপার ত এই যে, তাঁহারা সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিতে ভ্রূক্ষেপও করেন না, এবং আবশ্যক-মত, আইন অনুযায়ী কেন, আইন-বিগর্হিত সাজা দিতেও ত্রুটি করেন না।

আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, যদি সত্যাগ্রহী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত খাঁটি 'সম্মানজনক ও সসম্ভ্রম ব্যবহার করে, তবে আমরা বিরোধী সরকারের সমস্ত বিরোধ জয় করিতে পারিব ও আর কিছু নাই হউক, এতগুলি সম্মানযোগ্য নির্দোষ লোককে জেলে ভর্তি করায় সরকারের যে ভুল হইয়াছে তাহা লজ্জার সহিত সরকারকে স্বীকার করিতে হইবে। সরকার কি এই কথাই বলেন না যে, আমাদের অহিংসা ও হিংসার মধ্যে একটা লুকোচুরি আছে? সেইজন্য যত বার আমরা হাঙ্গামা বাধাই, ততবারই কি আমরা সরকারের হাতে গিয়া পড়ি না?

এইজন্য সত্যাগ্রহী হিসাবে জেলে গিয়া আমরা নিম্নলিখিত রূপ আচরণ করিতে বাধ্য :—

১। অতিশয় সম্ভ্রান্ত আচরণ করা।

২। জেলের কর্মচারীদের সহিত জেলের ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা।

৩। সমস্ত উপযুক্ত নিয়ম পালন করিয়া অপর কয়েদীর দৃষ্টান্তস্থল হওয়া।

৪। অতি সাধারণ কয়েদী যাহা পায় না, এমন কোনও সুবিধা কেবল স্বাস্থ্যের খাতিরে ছাড়া অন্য কারণে না চাওয়া, বা কোনও প্রকার অনুগ্রহ না চাওয়া।

৫। উপরে যেমন বলিয়াছি, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোনও সুবিধা চাহিতে দ্বিধা না করা এবং না পাইলে অসন্তুষ্ট না হওয়া।

৬। যতটা কাজ এবং যে কাজ করিতে দেওয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণ শক্তি অনুযায়ী করিয়া যাওয়া।

এই প্রকারের ব্যবহার করিলে, সরকারের অবস্থা কণ্টকপূর্ণ হইয়া পড়িবে, সরকার ঠেকিয়া পড়িবেন। আমাদের প্রতি সরকারের বিশ্বাসের এত অভাব এবং আমরা যে সসম্ভ্রম ব্যবহার করিব সরকার তাহার এত কম আশা রাখেন যে, সসম্মান ব্যবহারের জবাব সসম্মানে দেওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন। সরকার আশা করেন যে, হাঙ্গামা হইবে, আর যদি হাঙ্গামা হয় তবে ডবল সাজা দিতে পারিবেন। কিন্তু অহিংসার কাছে নত হওয়া ছাড়া আর কোনও রাস্তার অনুসন্ধান তাঁহারা আজ পর্যন্ত পান নাই। সত্যাগ্রহীর জেলে আসার পশ্চাতে এই উদ্দেশ্য রহিয়াছে যে, সরকার যতই কষ্ট দিন্ না কেন নম্রতার সহিত তাহা সহ্য করিয়া দুঃখ বরণ করিয়া লইবে।

সত্যাগ্রহীরা বিশ্বাস করে যে, ন্যায়কার্য্যের জন্য নম্রতার সহিত সংকট সহ্য করার ভিতর এমন কতকগুলি গুণ বা শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যাহা তলোয়ারের শক্তি অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। এ সকল বলার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, সরকারের ব্যবস্থা যখন আত্মসম্মানের বিরোধী হয়, তখনও তাহার বিরোধ করা চলিবে না। উদাহরণ স্বরূপ, জেলের কর্তারা যদি গালি দেয়, অথবা আমাদের খাদ্য কুকুরের মত অযত্নে ফেলিয়া দেয় তবে মৃত্যুপণ করিয়াও তাহা প্রতিরোধ করা উচিত। অপমান করা অথবা গাল দেওয়া তাহাদের কর্তব্যের অঙ্গ নয়। সেইজন্য অপমান ও গালির বিরোধিতা করা উচিত। কিন্তু

তল্লাস করিতে দেওয়ার বিরোধিতা করিতে পারা যায় না, কেননা উহা জেলের নিয়মাবলীভুক্ত।

আমি নীরবে দুঃখ সহ্য করিতে বলিতেছি, তাহার অর্থ কেহ যেন এরূপ না করেন যে, সত্যাগ্রহীর ন্যায় নির্দোষ কয়েদীদিগকে সাধারণ কয়েদীদের সহিত থাকিতে দিলে তাহা লইয়া হৈ চৈ করা চলিবে না। কেবল কয়েদী হিসাবে কোনও সুবিধা চাওয়া অথবা অনুগ্রহ চাওয়া যায় না। পুরাতন অপরাধীদের সহিত থাকিতে আমাদের সন্তোষ অক্ষুণ্ণ রাখা চাই, আর তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের চরিত্র যদি শুদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আগ্রহ করিয়াই একত্র থাকার অনুমতি লইতে হয়। তবুও কেহ সংস্কারকরূপে সরকারের নিকট অবশ্যই এ আশা রাখিতে পারেন যে, সরকার এই অতিশয় স্বাভাবিক শ্রেণী বিভাগ নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন।

৮

জেলের অর্থশাস্ত্র

যাহাদের জেলের সামান্য অভিজ্ঞতাও আছে তাহারা জানে যে, সমস্ত বিভাগের মধ্যে জেলের পয়সাই সর্বাপেক্ষা বেশী নষ্ট হয়। হাসপাতালকেই সরকারের সর্বোচ্চ ব্যয়বহুল সংস্থা বলা হইয়া থাকে। জেলের অনেক জিনিষই খুব সাদাসিধা এবং খুব কাঁচা ধরনের হয়। জেলে মনুষ্য শ্রমের প্রাচুর্য। কিন্তু অর্থ ও প্রয়াসের সদ্ব্যবহারের পুরা অভাব রহিয়াছে। হাসপাতালে বিপরীত অবস্থা। কিন্তু উভয় সংস্থাই মানুষের ব্যাধির প্রতিকারের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। জেল মানসিক ব্যাধি ও হাসপাতাল শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য। মানসিক ব্যাধি অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় ও ব্যাধিগ্রস্তকে শাস্তির পাত্র বলিয়া ধরা হয়। শারীরিক ব্যাধি প্রকৃতির অনিশ্চিত বিপদ হইতে হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়, সেইজন্য পীড়িতকে অন্তরের সহিত যত্ন করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই প্রকার কোনও ভেদ করার প্রয়োজন নাই। মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি একই প্রকার কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। আমি চুরি করিয়াছি মানে, নীরোগ সমাজের পক্ষে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি। যদি আমার পেটের ব্যথা হয়, তাহা হইলেও আমি নীরোগ সমাজের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি। শারীরিক ব্যাধি হইলে তাহার জন্য নরম পথই লওয়া হয়। ইহার এক কারণ এই হইতে পারে যে, যাহারা শরীরের স্বাস্থ্যের নিয়ম-ভঙ্গ করে, তাহারা মনের স্বাস্থ্যের নিয়মভঙ্গকারী অপেক্ষা অধিক বার নিয়ম ভাঙিয়া থাকে। আবার উপরের বর্গের লোকের সামান্য চুরি করার অবকাশ নাই, আর যদি সামান্য চুরি চলিতে থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন-যাত্রায় ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এবং নিজেরাই আইনকর্তা বলিয়া তাঁহারা স্থূল চুরিকেই দণ্ড দিয়া থাকেন। তাহা হইলেও প্রতিক্ষণ তাঁহাদের এই জ্ঞান থাকে যে, তাঁহাদের নিজেদের সারশূন্যতা সম্বন্ধে কেহ কিছু না বলিলেও উহা দ্বারা সমাজের অনেক বেশী হানি হয়।

ইহাও দেখার যোগ্য যে, জেলের ও হাসপাতালের সংখ্যা খারাপ চিকিৎসার

জন্যই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হাসপাতালে রোগী কুলাইতে চায় না, কেননা যাহারা রোগী হইয়া আসে তাহাদিগকে আদর করা হয়। জেল লোকে ভরিয়া উঠে, কেন না কয়েদীদের সংশোধনের অযোগ্য মনে করিয়া সাজা দেওয়া হইয়া থাকে। যদি প্রত্যেক শারীরিক ও মানসিক রোগ ভুল হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করা হয়, প্রত্যেক রোগী অথবা কয়েদীকে লজ্জা দেওয়ার জন্য নয়, সোহাগ করার জন্য নয়, কিন্তু মায়া ও সমভাব হইতে যত্ন লওয়া হয়, তবে হাসপাতাল ও জেল দুইয়ের সংখ্যাই কমিতে থাকিবে।

নীরোগ সমাজের পক্ষে জেলের অপেক্ষা হাসপাতাল কিছু অধিক প্রয়োজনীয় নয়। উভয়েরই সমান আবশ্যকতা আছে। প্রত্যেক কয়েদীর ও প্রত্যেক রোগীর জেল হইতে ও হাসপাতাল হইতে বাহির হওয়া কালে, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের নিয়মের প্রচারক হইয়াই বাহির হওয়া উচিত।

এইখানেই আমি তুলনা স্থগিত রাখিব। পাঠকের নিকট একথা নূতন বলিয়া বোধ হইবে যে, জেলের ভিতরকার কার্পণ্য কঠোরতা দেখাইবার জন্যই করা হইয়া থাকে। জল তোলা, আটার জাঁতা চালানো, রাস্তা ও পায়খানা সাফ্ করা, রান্না করা ইত্যাদি সকল রকম কাজই কয়েদীর নিকট হইতে লওয়া হইয়া থাকে। তবুও জেল স্বাবলম্বী নহে। কেবল তাহাই নয়, ইহাদের পরিশ্রম হইতে ইহাদের খোরাকও উঠে না। কয়েদীরা যদিও এত পরিশ্রম করে, তবুও তাহাদের রুচিকর, অথবা তাহারা খাইতে ভালবাসে এমন ভাবে রান্না করা খাদ্য তাহাদিগকে দেওয়া হয় না। ইহার এক কারণ এই যে, যাহারা রান্না করে সাধারণতঃ তাহারা সে কার্যে কোনই আনন্দ পায় না। দয়াহীন তত্ত্বাবধানের অধীনে কাজ করায় তাহাদের এক রকম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। একথা ত সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, কয়েদীরা যদি সমাজ-সেবক হইত এবং নিজের ভাই বন্ধুদের কল্যাণে আনন্দ পাইত, তাহা হইলে আর তাহারা জেলে আসিত না। একথা বলা যায়, যদি অধিক বিবেকের সহিত ও সুনীতির সহিত কর্ম ব্যবস্থা করা যায়, তবে আজ জেলগুলি যেমন খরচার হেতু ও সাজা দেওয়ার আড্ডা হইয়াছে, তাহা না হইয়া স্বাবলম্বী সংস্কার-গৃহ হইত। জলটানা ও জাঁতা পেষাই ইত্যাদি কাজে কয়েদীদের যে ভয়ানক শারীরিক পরিশ্রম হয় আমি তাহা বাঁচাইতে চাই। জেলের ব্যবস্থা যদি আমার হাতে আসে, তবে আমি আটা বাহির হইতে কিনি, জল পাম্প দ্বারা তুলি এবং অন্য অনেক কাজে অনেক কয়েদীকে না লাগাইয়া, জেলকে কৃষিক্ষেত্রে, সূতাকাটা ও তাঁত বোনার কারখানায় পরিণত করি। ছোট জেলে কেবল চরকা ও তাঁত রাখি। এখনো অনেক সেন্ট্রাল জেলে তাঁত চলে। বেশীর ভাগের মধ্যে কেবল চরকা ও পিঞ্জন প্রবেশ করাইতে হয়। অনেক জেলে ত যত ইচ্ছা তুলা সহজেই উৎপন্ন করা যায়। ইহাতে রাষ্ট্রীয় গৃহশিল্পও লোকপ্রিয় হইয়া পড়ে, জেলও স্বাশ্রয়ী হইয়া যায়। সকল কয়েদীর পরিশ্রমের ফল পাওয়া যায়, আর এদিকে এখন যে একটা শত্রুভাবের উত্তেজনা জেলের মধ্যে আছে, তাহা থাকে না।

য়েরোড়া জেলের সঙ্গে একটা ছাপাখানা চলে। এই ছাপাখানা বেশীরভাগই কয়েদীদের পরিশ্রমেই চলিয়া থাকে। এই প্রকার ছাপাখানায় যদি বাহিরের কাজ লওয়া

হয়, তবে অন্যায় প্রতিযোগিতা করা হয় একথা বলিব। যে সকল জেল, ফ্যাক্টরী বা কারখানার সহিত প্রতিযোগিতা করে, সে সকল জেল যে সহজেই লাভ করে, ইহা দেখাই যায়। কিন্তু আমি বলি যে এই প্রকার অন্যায় প্রতিযোগিতায় না নামিলেও জেলখানাকে স্বাশ্রয়ী করা যায় এবং যাহারা কাজ করে তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা শিল্প শিখিয়া যায় যে, জেল হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার পরেও একটা স্বাধীন উপজীবিকা লইতে সক্ষম হয় এবং সম্মানিত নাগরিক-জীবন যাপন করিতে উৎসাহিত হয়।

কয়েদীদের দ্বারা লোক সমাজের যাহাতে ক্ষতি না হয়, সে জন্য আমি ত কয়েদীদের আশে পাশে যতটা সম্ভব বাড়ীর মত আবেষ্টনই রচনা করিয়া ফেলিতাম। আরও ইচ্ছা, তাহার আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করার, বই পাওয়ার ও শিক্ষা গ্রহণ করার পথও আমি তাহার নিকট খুলিয়া দিতাম। কয়েদীকে যে এখন অবিশ্বাস করা হয় তাহার বদলে তাহাকে বিশ্বাস করিতাম। সে যেমন কাজ করিতে পারে সেই কাজই তাহাকে দিতাম। তাহার ইচ্ছামত তাহার খোরাক কাঁচা অথবা রান্না করিয়া দিতাম।

সাজার কাল নির্দিষ্ট না করিয়া অনেক স্থলেই আমি অনির্দিষ্ট করিতাম। উহার কারণ এই যে, সমাজ রক্ষার জন্য ও কয়েদীকে সংশোধন করার জন্য যতক্ষণ কয়েদীকে জেলে রাখিতে হয়, তাহার এক ঘণ্টা বেশীও তাহাকে রাখিতাম না।

আমি জানি যে, এই সকল করিতে হইলে সমস্ত সংস্থাটা অবসর মত রচনা করিয়া তুলিতে হয় এবং এখন যেমন সৈনিক বিভাগ হইতে ছাড়প্রাপ্ত লোককে জেলার করা হয়, তাহা না করিয়া অন্য লোক জেলে লাগাইতে হয়। আমার ইহাও বিশ্বাস যে, এই পরিবর্তন করার জন্য খরচাও কিছু বেশী করিতে হয় না।

এখনকার জেলখানা দুর্দান্তদিগের জন্য আরামখানা আর সাধারণ সোজা লোকদের জন্য জুলুমখানা। বেশীরভাগ কয়েদীই ত সোজা লোক। যে দুর্দান্ত তাহার কিছুরই অভাব হয় না, আর বেচারা সোজা লোক, যাহা না হইলে চলে না তাহাও সে পায় না। আমি জেলের যে সামান্য চিত্র আঁকিলাম, তদনুসারে যে দুর্দান্ত সে যদি সুখের আশা রাখে তবে আগে তাহাকে সিধা হইতে হইবে। এবং সিধা ও নির্দোষ কয়েদী, যতটা পারা যায় অনুকূল আবেষ্টন পাইতে পারিবে। বিশ্বস্ততা প্রশয় পাইবে ও দাঙ্গাবাজী দণ্ডিত হইবে।

খোরাকী দেওয়ার পরিবর্তে তাহাদের নিকট হইতে কাজ লওয়া হইবে বলিয়া কয়েদীদের আলস্য থাকিবে না এবং জেলেই কৃষি ও তাঁতের শিল্প থাকার জন্য, আজকাল পর্য্যবেক্ষণাদির জন্য যে ভারি খরচা হয় তাহাও কমিয়া যাইবে।

৯
কয়েদী ওয়ার্ডার

কয়েদীদিগকে ওয়ার্ডার বা পাহারাওয়ালা-কর্মচারীর পদে নিয়োগের কথা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। এই প্রথা খারাপ ও দুর্নীতির প্রশ্রয়দায়ক বলিয়া আমি মনে করি। জেলের কর্মচারীরাও একথা জানেন। তাঁহারা বলেন যে, ব্যয় কমাইবার জন্য উহা করিতে হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, কয়েদী-ওয়ার্ডারের সাহায্য না লইলে, বর্তমানে যত কর্মচারী রাখা হয়, তাহা দিয়া জেলের পরিচালনার কার্য্য সুব্যবস্থায় নির্বাহ করা যায় না। যে ধরনের জেল-সংস্কারের পরিকল্পনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে, সেই ধরনের পরিবর্তন না করা পর্য্যন্ত অতিরিক্ত খরচা না বাড়াইয়া কয়েদী-ওয়ার্ডার নিয়োগের প্রথা রহিত করা যায় না।

যাহা হউক এই অধ্যায়ে জেলের সংস্কার-সম্বন্ধে আর আলোচনা করিতে চাই না। আমাদিগকে পাহারা দেওয়ার জন্য ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সকল কয়েদী-ওয়ার্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের সহিত আমার মধুর সম্পর্কের কথাই এই অধ্যায়ে বলিব।

ভাই ব্যাংকার ও আমাকে য়েরোড়া জেলে বদলী করার পরে আমাদের জন্য একজন (কয়েদী) ওয়ার্ডার ও একজন (কয়েদী) ফাল্তু ছিল। ফাল্তু মানে চাকর। প্রথম যে কয়েদী-ওয়ার্ডারের সংগে পরিচয় হয় তাহার নাম ছিল হরকরণ। সে পাঞ্জাবের একজন হিন্দু। তাহার খুন করার অপরাধে সাজা হইয়াছিল। তাহার কথানুসারে, সে সংকল্প করিয়া খুন করে নাই—হঠাৎ ক্রোধের বশে খুন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার জীবিকা ছিল ছোট-খাট দোকানদারি। তাহার চৌদ্দ বৎসরের জেল হয়, তাহার মধ্যে সে নয় বৎসর খাটিয়াছে। এখন একরকম বুড়ো হইয়া গিয়াছিল। জেলের জীবন তাহাকে পীড়িত করিতেছিল। সে সব সময়ই চিন্তা করিত ও খালাস পাওয়ার জন্য উন্মুখ ছিল। সেই জন্য সে মন-মরা হইয়া থাকিত ও খিটখিটে ছিল। নিজের উচ্চ পদের সম্বন্ধে তাহার বেশ জ্ঞান ছিল। যাহারা তাহার কথা শুনিত ও সেবা করিত, তাহাদের প্রতি সে মাতব্বরি করিত। যাহারা তাহার বিরুদ্ধে যাইত তাহাদিগের উপর গুণ্ডামি করিত। তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিলে তাহাকে খুনে বলিয়া মনে হইত না। সে বেশ দ্রুত উর্দু পড়িতে পারিত। তাহার মনটা ধর্মের দিকে ছিল ও উর্দু ভজন গাহিতে ভালবাসিত। য়েরোড়া লাইব্রেরীতে কয়েদীদের জন্য কিছু দেশী ভাষায় বই—হিন্দি, উর্দু, মারাঠী, গুজরাটি, সিন্ধি, ক্যানারি, তামিল ইত্যাদি রাখা হইত। হরকরণ জেল-নিয়মের বিরুদ্ধে একটু আধটু চোরাই মাল লুকাইয়া রাখা কিছু খারাপ মনে করিত না। এ কাজে সে বেশীর ভাগ লোকের সহিত একমত ছিল। জেলে একটু আধটু চুরি না করা বেকুবি, একটু বাড়াবাড়ি সাধুতা ফলানো বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। জেলে যে এই অলিখিত আইন অনুসরণ না করে তাহার মুস্কিল। তাহাকে ত একঘরে করা হয়ই, তাহার উপরেও আরো কিছু করা হয়। যদি জেলের সব মাটিটা ২২ ইঞ্চি পরিমাণ খুঁড়িয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে বসুন্ধরা কয়েদীদের অনেক গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ করিয়া দিবেন, অনেক চামচ, ছুরি,

বাসন, সিগারেট, সাবান বাহির হইয়া পড়িবে। হরকরণ একজন সব চাইতে পুরানো কয়েদী বলিয়া, অন্য সকল কয়েদীর মাল-যোগানদার ছিল। যদি কোনও কয়েদীর কিছু আবশ্যক হইত, তবে হরকরণ তাহা যোগাইত। আমার রুটি ও নেবু কাটার জন্য ছুরির আবশ্যক। হরকরণের নিকট হইতে লইলে হরকরণই উহা আমাকে দিতে পারিত। আর যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে অনুমতি লওয়া ইত্যাদি হাঙ্গামা করিয়া আমি পাইতে চাই, তা সে আমার ইচ্ছা। তবে সে পথে ধমক খাইতেও আমাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যখন আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জমিয়া গিয়াছিল, তখন সে তাহার আশ্চর্যজনক কাণ্ডকারখানার গল্প করিত। কেমন করিয়া সে জেল-কর্তৃপক্ষকে এড়াইত, কেমন করিয়া সে নিজের জন্য বা অপরের জন্য ভাল খাবার যোগাড় করিত, কেমন করিয়া কয়েদীরা সুকৌশলে যাহা তাহাদের দরকার হয় তাহা যোগাড় করিয়া লয় এবং তাহার মতে এই সকল কৌশল না খাটাইয়া কেন চলেই না, এ সমস্তই সে পুঙখানুপুঙখভাবে এবং খুব রসাইয়া আমাকে বুঝাইত। কিন্তু ঐ সমস্ত কৌশলের কথায় আমার কোনও আগ্রহ নাই দেখিয়া এবং তাহার দলে যোগ দেওয়ার আমার ইচ্ছা নাই বুঝিতে পারিয়া, সে আকাশ হইতে পড়িল। সে আমাকে বলিয়া যে বেকুবি করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা কতকটা শোধরাইয়া লইতে পরে চেষ্টা করিয়াছিল এবং সে যে আমার দিকটা বুঝিতে পারিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আর ঐ ধরণের অবৈধ কাজ করিবে না, ইহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, সে অনুতাপের ভান করিয়াছিল। যেন কেউ মনে না করেন যে, জেল কর্তৃপক্ষেরা এই সমস্ত নিয়ম বহির্ভূত কার্যের সংবাদ রাখেন না। এ খোলাখুলি জানা। জেল কর্মচারীরা যে শুধু একথা জানেন তাহাই নহে, যে সকল কয়েদীরা একটু সুখ-সুবিধা পাওয়ার জন্য ঐ সকল কার্য করে, তাহাদের জন্য মনে মনে সহানুভূতিও পোষণ করেন। ঐ কর্মচারীরা "আমিও বাঁচি অপরেও বাঁচুক" এই নীতিতে বিশ্বাস করেন। যে কয়েদী তাহার উপরিওয়ালাদের সামনে উপযুক্ত আচরণ করে, তাঁহাদের কথা মানিয়া চলে, সঙ্গীদের সহিত ঝগড়া করে না, এবং কর্মচরীদিগকে বেগ দেয় না, সে নিজের সুবিধার জন্য যেমন ইচ্ছা নিয়ম ভঙ্গ করিয়া যাইতে পারে।

তবে হরকরণের সহিত প্রথম পরিচয় তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। সে জানিত, আমরা 'পদস্থ' কয়েদী। কিন্তু সেই বা কম কি। বস্তুতঃ সে ত একজন জেল-কর্মচারীরই সামিল। সে এত দীর্ঘদিন সৎভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে যে, এখন খাতির করিয়া বেড়াইবার পাত্র নয়। এই জেলে আসার পরদিনই ব্যাঙকারকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল। হরকরণ তাহার ক্ষমতার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আমার উপর প্রয়োগ করিল। আমাকে এটা করিতে নাই, সেটা করিতে নাই—সেই সাদা লাইনটা যাহার কথা আমি হাকিমজীর পত্রে উল্লেখ করিয়াছি—সেটা যেন আমি পার না হই। কিন্তু সে যাহা বলিতেছে বা করিতেছে, তাহাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন ভাবই আমার মনে ছিল না। হরকরণের সহজ ও ছেলেমানুষী বিধি-নিষেধের দিকে মন দেওয়ার আমার সময়ই ছিল না, আমি আমার নিজের পাঠাভ্যাস ও অন্য কাজে এত নিবিষ্ট-মন হইয়া ছিলাম। তাহার কাজে আমার সাময়িক আমোদ অনুভব হইত। হরকরণ তাহার ভুল দেখিতে পাইল। সে যখন দেখিল যে, তাহার বাড়াবাড়িতে আমি

ক্ষুব্ধ হই না, সেদিকে মনোযোগই দিই না, তখন সে কী করিবে ঠাহর করিতে পারিল না। এইরূপে একটা পরিণামের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। এ অবস্থায় তাহার পক্ষে যে একমাত্র পথ খোলা ছিল সে সেই পথই গ্রহণ করিল। সে যখন দেখিল যে আমি তাহার ব্যবহারে সাড়া দিই না, তখন সেই আমার ব্যবহারে সাড়া দিতে লাগিল। আমার অহিংস-অসহযোগের দরুণ তাহাকে সহযোগী হইতে হইল। সর্ব প্রকারের অহিংস-অসহযোগ, সে দুই ব্যক্তি বা সমাজ বা দুই গভর্ণমেণ্টের ভিতরেই হোক্, অন্তিমে হৃদয়ের সহযোগে পর্যবসিত হইলেই হইবে। সে যাহা হোক হরকরণের সহিত আমার বন্ধুত্ব জমিয়া গেল। যখন ব্যাঙ্কারকে আমার নিকটে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তখন সে এই সম্পর্কে শেষ তুলি বুলাইয়া দিল। শঙ্করলালের জেলের ভিতর অনেক কাজ ছিল, তাহার মধ্যে একটা ছিল, আমাকে যত পারে লোকের কাছে ফাঁপাইয়া তোলা। সে ভাবিত যে, হরকরণ ও অপর লোকেরা আমার মহত্ব যে কত বড় তাহা বুঝিতে পারে নাই। দুই তিন দিনের মধ্যে আমি দেখিলাম যে, আদুরে শিশুর অবস্থায় আমি পরিণত। আমার নিজের কামরা ঝাড়ু দেওয়া আমার মহত্বের উপযোগী নয়, অথবা আমার নিজের কম্বল শুখাইতে দেওয়া, সে আমাকে করিতে দেওয়া যায় না। ইহার পূর্বেও হরকরণ জাগ্রতভাবে আমার প্রতি মনোযোগ দিত, এখন তাহার মনোযোগ অতিরিক্ত বিড়ম্বনার বিষয় হইল। আমার কিছুই করার উপায় নাই—গামছাটা কাচাও না। যদি হরকরণ কাচার শব্দ শুনিত তবে, খোলা স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া হাত হইতে গামছা কাড়িয়া লইয়া যাইত। জানি না কেন, কর্তারা হয়ত ভাবিয়াছিলেন, হরকরণ অন্যায় কিছু করিতেছে, কিম্বা ইহা নিতান্ত আকস্মিক যোগাযোগ, আমাদিগকে ব্যথা দিয়া হরকরণকে স্থানান্তরিত করা হইল। এই বিচ্ছেদে আমাদের অপেক্ষা তাহারই কষ্ট বেশী হইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে খুব মজায় তাহার দিন কাটিত। তাহার আহার্য প্রচুর জুটিত, উহা খোলাখুলি ভাবে আমাদের খাদ্যাংশ হইতেই পাইত, তাহার উপর বন্ধুরা যে ফল দিতেন তাহাও ছিল। আমাদের যশের কথা তখন রটিয়া গিয়াছিল; আমাদের সঙ্গে হরকরণ থাকার জন্য অন্য কয়েদীর চক্ষে তাহারও মান বাড়িয়া গিয়াছিল।

যখন আমাকে কুঠুরীর বাহিরে শোওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তখন কর্তারা আমাকে একটিমাত্র প্রহরীর হাতে ফেলিয়া রাখা অত্যন্ত বিপদজ্জনক মনে করেন। হয়ত আইনই আছে যে কয়েদীর কুঠুরীটি খুলিয়া রাখা হইবে তাহার জন্যে রাত্রে দুইজন পাহারাদার আবশ্যক। এমনও হইতে পারে যে, আমার রক্ষার্থেই অতিরিক্ত একজনকে দেওয়া হইয়াছিল। যে কারণেই হোক্, রাত্রিতে পাহারার জন্য আর একজন ওয়ার্ডার মোতায়েন হয়। তাহার নাম সাবাস খাঁ। আমি হেতু অনুসন্ধান করি নাই, কিন্তু হইতে পারে হিন্দু হরকরণের পাল্টা ঠিক রাখার জন্য একজন মুসলমান দেওয়া হইল। সাবাস খাঁ খুব বলিষ্ঠ বেলুচি। সে হরকরণের সমসাময়িক ছিল এবং তাহাদের পরস্পর ভাল জানা শোনা ছিল। সাবাস খাঁও খুনের দায়ে জেলে আসিয়াছিল। সে যে দলের লোক তাহাদের একটা হাঙ্গামায় ব্যাপারটি ঘটে। সাবাস খাঁ যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। তাহার গঠন দেখিয়া আমার কেবলই শৌকত আলির কথা মনে হইত। সাবাস খাঁ প্রথম দিন আসিয়াই আমাকে স্বস্তির কথা বলিল। সে

বলিল—"আমি মোটেই আপনাকে পাহারা দিব না, আমাকে বন্ধুর চক্ষে দেখিবেন এবং আপনার যাহা খুসী করিবেন। আমি কখনও আপনার কোনও কাজে বাধা দিব না। আপনার জন্য যদি কিছু করা আবশ্যক হয়, তাহা করিতে পাইলে আমি আনন্দিত হইব।" সাবাস খাঁ কথায় যাহা বলিয়াছিল, কাজেও তাহাই করিয়াছিল। সে অনুক্ষণ ভদ্র আচরণ করিত। সে জেলের সুস্বাদু জিনিস খাওয়ার জন্য আমাকে প্রলুব্ধ করিত এবং আমি খাই না বলিয়া আন্তরিক দুঃখ পাইত। সে বলিত—"জানেন, আমরা যদি একটু-আধটু এই সব খাবার টাবার না পাই, তাহা হইলে ত রোজ রোজ একই খাদ্য খাইতে খাইতে জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িবে। আপনার মত লোকের কথা আলাদা, আপনারা ধর্মের জন্য আসিয়াছেন। তাহাতেই আপনারা টিঁকিয়া থাকিতে পারেন। আর আমরা আসিয়াছি অপরাধ করিয়া, আমাদের ইচ্ছা ত যত সকালে পারি ফিরিয়া যাই।"

সাবাস খাঁ জেলারের প্রিয়পাত্র ছিল। একবার তাহার কথা বলিতে গিয়া আগ্রহাতিশয্যে বলেন—"দেখুন না, এই সাবাস খাঁকে। আমি ত ইহাকে একজন খাঁটি ভদ্রলোক বলিয়া মনে করি। একবার ক্রোধের বশে সে খুন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার জন্য ইহার অনুতাপ রহিয়াছে। আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, জেলের বাহিরে সাবাস খাঁর মত বেশী লোক নাই। সব কয়েদীই অপরাধী, এ কথা মনে করা ভুল। আমি সাবাস খাঁকে খুব বিশ্বস্ত ভদ্র বলিয়া দেখিয়া আসিতেছি। যদি আমার হাত থাকিত, তবে তাহাকে কালই খালাস দিতাম।" জেলার ঠিক বলিয়াছিলেন। সাবাস খাঁ সৎলোক, আর ঐ জেলে সাবাস খাঁই একা সৎলোক নয়। তবে, এখানেই বলি যে, সাবাস খাঁ জেলে আসার দরুণ সৎলোক হয় নাই, সে পূর্ব হইতেই সৎলোক ছিল।

জেলের ইহাও একটি প্রথা যে, কোনও কয়েদীকে একই কাজে দীর্ঘ দিন রাখা হইবে না, কেবল অদল-বদল হয়। এটা একটা আবশ্যকীয় সাবধানতা। বর্তমান প্রথায় কয়েদীদের ভিতর সৌহার্দ্য বাড়িতে দিতে নাই। সেইজন্য আমাদের অনেক কয়েদী-ওয়ার্ডারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। মাস দুই পরে সাবাস খাঁর স্থানে আদনকে দেওয়া হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এই ওয়ার্ডারের সহিত পাঠকের পরিচয় করাইব।

১০
কয়েদী ওয়ার্ডার—২

আদন ছিল সোমালি সেনা। সে বৃটিশ সৈন্য-দলে যুদ্ধের সময় যোগ দিয়াছিল এবং সেখান হইতে পলাইয়া যাওয়ার জন্য দশ বৎসরের কারাদণ্ড পাইয়াছে। এডেনের জেল-কর্তৃপক্ষ তাহাকে এখানে বদলি করিয়াছেন। যখন আমরা আসিয়াছি, তখন আদনের চার বৎসর জেল খাটা হইয়া গিয়াছে। সে নিরক্ষর বলিলেই হয়। সে কষ্টে কোরাণ পড়িতে পারিত, কিন্তু উহা দেখিয়া লিখিতে যদিও বা পারিত, নির্ভুল

নকল করিতে পারিত না। সে খুব তাড়াতাড়ি উর্দু বলিতে পারিত এবং উহা শিখিতে তাহার আগ্রহ ছিল। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি লইয়া তাহাকে উর্দু শিখাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু অক্ষর পরিচয় করা তাহার কাছে বড়ই কঠিন লাগায় সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিল। তাহা হইলেও সে তীক্ষ্ম সূচ্যগ্রবুদ্ধির অধিকারী ছিল। ধর্ম বিষয়ে খুব অনুরাগ ছিল তাহার। সে ধর্ম-ভক্ত মুসলমান। সে নিয়মিত নমাজ পড়িত—মধ্যরাত্রেও নমাজ পড়িত। কখনো রোজা বাদ দিত না। তাহার হাতে মালা সবসময়েই থাকিত। যখন অবসর পাইত কোরাণ আবৃত্তি করিত। সে আমার কাছে হিন্দুদের ব্রত উপবাসের কথা, অহিংসার কথা শুনিত। সে সকল সময়ই খুব ভদ্রভাব দেখাইত, কিন্তু কখনও লুটাইয়া পড়িত না। সে ছিল সাহসী পুরুষ। তাহার উত্তেজিত হইয়া উঠার স্বভাব ছিল, সেই জন্য সে প্রায়ই ফাল্তু বা অন্য ওয়ার্ডারের সহিত কলহ করিত। সে জন্য কখনো কখনো আমাদিগকে মধ্যস্থের কাজ করিতে হইত। সৈনিক বলিয়াও বিচারের বশ বলিয়া মধ্যস্থের আদেশ মানিয়া লইত, কিন্তু সে তাহার দিকের কথাটা খুব সাহসের সহিত এবং সুসংলগ্নভাবে বলিতে পারিত। আদনই সবচেয়ে বেশী দিন আমাদের সহিত থাকে। আদনের ভালবাসার কথা আমি মনে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। সে আমার দিকে খুব নজর দিত। আমার কখনও অসুখ হইলে সে বিমর্ষ হইত এবং আমার কী প্রয়োজন হইবে তাহা সে আগে-ভাগেই ঠিক করিয়া রাখিত। সে কোনও খাটুনিই আমাকে খাটিতে দিত না। তাহার খুব ছাড়া পাওয়ার, অন্ততঃ এডেনের জেলে বদলী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আমি খুব চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার জন্য দরখাস্ত লিখিয়া দিতাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ বিষয়টা এডেনের কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করিত। তাহাকে আশা দেওয়া হইয়াছিল যে, বছরের শেষভাগে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। তাহার জন্য যে সামান্য কিছু করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতেই একটা গভীর ব্যক্তিগত আকর্ষণ জন্মিয়া যায়। আদনকে যখন ঐ জেলের অন্যত্র বদলি করা হয়, তখন আমাদের বিদায় বিষাদময় হয়। জেলে যখন আমি ধোনা ও সুতাকাটার ব্যবস্থা করিতেছিলাম তখন, আদনের একটা হাত খারাপ হইলেও, ঐ কাজে খুব সহায়তা করিয়াছিল। সে পাঁজ তৈয়ারীর জন্য খুব খাটিত। এই কাজ পছন্দ করিত এবং উহাতে খুব দক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল।

সাবাস খাঁর বদলে যেমন আদন আসে, তেমনি হরকরণের বদলে আসে ভিক্তুয়া। জানিলাম, ভিক্তুয়া মারাঠী মহার বা অস্পৃশ্য। ইহাতে আশ্চর্য ও আনন্দিত হই। আমাদের যত ওয়ার্ডারের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ভিক্তুয়াই ছিল সব চাইতে পরিশ্রমী। পাঠকগণ হয়ত আশ্চর্য হইবেন যে, অস্পৃশ্যতার ব্যাধি জেলের ভিতরেও প্রবেশলাভ করিতে পারে। বেচারা ভিক্তুয়া—সে অনেক ইতস্ততঃ না করিয়া আমাদের কুঠুরীতে ঢুকিতে পারিত না। সে আমাদের বাসন ছুঁইত না। আমরা শীঘ্রই তাহাকে একথা বুঝাইয়া স্বস্তি দিলাম যে, অস্পৃশ্যতা আমরা মানি না এবং উহা দূর করিয়া দেওয়ার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। শঙ্করলাল তাহাকে বিশেষ করিয়া আপনার করিয়া লয়, এবং আমাদের সঙ্গে তাহার যে সহজ সম্বন্ধ, সেই বোধ, অনুভূতি তাহার মনে জাগাইয়া তোলে। শঙ্করলাল তাহার সহিত এতটা নিকট সম্প-

র্কিত হইয়া পড়ে যে, শঙ্করলাল রাগ করিয়া একটা কথা বলিলে ভিত্তয়ার অভিমান হইত এবং এমন কি অনেক সময় শঙ্করলালকে ক্ষমা চাহিতে হইত। শঙ্করলাল ভিত্তয়াকে পাঠাভ্যাসে লাগায় ও সুতা কাটা শিক্ষা দেয়। ফলে ভিত্তয়া অল্প দিনের মধ্যেই পাকা কাটুনী হইয়া গেল এবং তাহার এই কাজ এত পছন্দ হইল যে, সে জেলের বাহিরে গিয়া তাঁতবোনা শিখিয়া তাহাতেই জীবিকা উপার্জন করিবে মনে ভাবিল।

আমি জেলে থাকা কালে প্রাতঃকালে ৪-১৫ মিনিটের সময় গরম জল ও নেবু খাওয়ার অভ্যাস করিয়াছিলাম। শঙ্করলাল আমার জল গরম করিয়া দেওয়ায় আমি আপত্তি করাতে, সে ভিত্তয়াকে কৌশল শিখাইয়া দিল। কয়েদীরা যদিও সকালেই উঠে, তবুও অতটা সকালে তাহাদের মাদুর (উহাই তাহাদের শয্যা) ছাড়িয়া বড় উঠিতে চায় না। ভিত্তয়া কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধুর কথা মানিয়া লইল। তবে সকাল ৪টায় ভিত্তয়াকে ডাকিয়া দেওয়ার কাজ ছিল শঙ্করলালের। ভিত্তয়াকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া খালাস দেওয়া হয়। সে যখন যায় তখন আদন ঐ কাজের ভার লইল। আমাকে ত সে কাজ করিতেই দিবে না। তারপর ব্যাঙ্কার মুক্তি পাইলেও এই ধারাটা বজায় রাখা হইয়াছিল। প্রত্যেক ওয়ার্ডার যাওয়ার বেলায়, যে নূতন আসিত তাহাকে সকল কাজকর্ম ও কৌশল বুঝাইয়া দিত। বলাই বাহুল্য, সকাল বেলায় এই প্রকার জল গরম করা কয়েদীর নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে পড়ে না। বলিতে গেলে কয়েদীরা যখন ওয়ার্ডার হয় তখন তাহাদের আদৌ কাজ করার কথা নয়, তাহারা কেবল হুকুম করিবে।

সকল বন্ধুর সহিত একদিন না একদিন বিচ্ছেদ হইবেই, ভিত্তয়ার সহিতও বিদায়ের দিন আসিল। তাহাকে ব্যাঙ্কার খদ্দরের টুপি, ধুতি, সার্ট ও কম্বল দিয়াছিলেন। সে যাইবার বেলা প্রতিজ্ঞা করে যে, বাহিরে গিয়া খদ্দর ছাড়া আর অন্য কিছুই পরিবে না। আশা করি, বেচারা ভিত্তয়া যেখানেই থাকুক, নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছে।

ভিত্তয়ার পরে আসে থামু। সেও মহারাষ্ট্রবাসী ছিল। থামু নরম প্রকৃতির ওয়ার্ডার ছিল। তাহার কাজ লইয়া ঠেলিয়া অগ্রসর হওয়ার অভ্যাস ছিল না। তাহাকে যাহা বলা হইত তাহা সে করিত, কিন্তু নিজেকে যে খাটাইতে হইবে এমন কোনও বিশ্বাস তাহার ছিল না। সেই জন্য আদনের সহিত তাহার বনিত না। তবে থামু ভয়কাতুরে হওয়ায় শেষকালে আদনের সব কথাই মানিয়া লইত। সকলেরই এমনি মজায় দিন কাটিতেছিল—আমাদেরও কাটিতেছিল—যে থামু কিছুতেই আমাদিগকে ছাড়িতে রাজি ছিল না। সেই জন্য সে বদলী হওয়ার চাইতে বরং আদনের চাপ সহিয়া যাইতেই প্রস্তুত ছিল। থামু, আদন আসার অনেক পরে আসায়, আদন আমাদের কাছে থামুর অপেক্ষা পুরাতন ছিল। জেলের মত ছোট জায়গাতেও এই পুরাতন বলিয়া অলীক মর্যাদা কেমন সৃষ্টি হইয়া থাকে! য়েরোড়া আমাদের কাছে একটা জগৎ ছিল, বরঞ্চ একথাও বলা যায় যে, উহাই আমাদের সমগ্র জগৎ ছিল। প্রত্যেক কথা কাটাকাটি, মানাইয়া লইয়া চলায় অনুমাত্র বাধাও, জেলে এক একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার; সারাদিন, কখনো দিনের পর দিন, উহা লইয়া আন্দোলন চলে। যদি জেল-কর্তারা কয়েদীদের নিজেদের জন্য একটা জেল-সংবাদ প্রকাশিত হইতে

দিতেন, তাহা হইলে তাহার গ্রাহক সকল কয়েদীই হইত। আর আজকালকার দিনে বাইরের একটা বড় ভোজ-পার্টির সংবাদ লোকে যেমন আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকে, জেলের মধ্যেও তেমনি আজকার ভাল রসুইয়ের সংবাদ বা ভাল তরকারী কোটার সংবাদ সমান আগ্রহের সহিত কয়েদীরা পড়িত; বাইরে যেমন কোনও বড় যুদ্ধের কথা লোকে পড়ে, জেলেও তেমনি কয়েদীদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি, পরে মারামারি এবং অন্তিমে সুপারিন্টেন্ডেন্টের কাছে বিচারের কাহিনীও সমান আগ্রহের সহিত পঠিত হইত। আমি আইন-পরিষদের সদস্যদিগকে একটা কথা বলিতে পারি যে, তাঁহারা যদি যশ চাহেন তাহা হইলে এই মর্মে একটা আইনের খসড়া উপস্থিত করিতে পারেন যে, জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেলের কর্তৃপক্ষের শাসনাধীনে জেলের ভিতরে কয়েদীদের দ্বারা পরিচালিত এবং কেবল কয়েদীদেরই সংবাদপত্র চালাইতে দিতে পারিবেন।

এখন থামুর কথায় আসা যাক্। যদিও সে থস্থসে তবুও সে তাহার আগেকার ওয়ার্ডারদের মতই কর্মক্ষম ছিল। সে চরখা খুব সহজেই গ্রহণ করিয়াছিল। সপ্তাহকাল মধ্যে সে আমার চেয়েও মিহি সুতা কাটিতে শিখিল। একমাস পরে এই ছাত্র, শিক্ষককে অনেক পিছনে ফেলিয়া গেল। থামু এত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল যে, থামুর শ্রেষ্ঠতার জন্য আমার হিংসাই হইত। থামুর দ্রুত উন্নতি দেখিয়া আমার নিকট একথাও স্পষ্ট হইল যে, আমার এই মন্থর-গতি আমার নিজেরই একটা অক্ষমতা এবং যে কোনও সাধারণ লোক, খুব বেশী সময় লইলেও, এক মাসের মধ্যেই ভাল সুতা কাটা শিখিতে পারে। আমি যত লোককে শিখাইয়াছিলাম, তাহারা সকলেই আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। যেমন ভিত্তয়ার বেলায় হইয়াছিল, তেমনি থামুর বেলাতেও চরখা তাহার এক সুন্দর সাথী হইয়া পড়ে। এই চরখার মৃদু গুঞ্জনে আত্মীয়-বিরহের দুঃখ তাহারা ভুলিতে পারিত। পরবর্তী কালে থামুর প্রাতঃকালীন প্রথম কাজই ছিল চরখা কাটা। সে দিনে ৪ ঘণ্টা করিয়া সুতা কাটিত।

আমাদিগকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে লইয়া যাওয়ার পর অনেকগুলি পরিবর্তন হইল—ওয়ার্ডার পরিবর্তন তাহার মধ্যে অন্যতম। প্রথম আদনকে বদলি করা হয়। যদিও সে ইহা পছন্দ করে নাই এবং আমরাও করি নাই, তথাপি সে ইহা বীরের মতই গ্রহণ করিয়াছিল। তারপর আসিল থামুর পালা। বেচারা একেবারে বসিয়া পড়িল। সে বলিতেছিল যে, আমি তাহাকে এখানে রাখার জন্য যেন চেষ্টা করি। কিন্তু আমি তাহা করিতে পারি না। উহা করা আমার ন্যায়াচরণ বহির্ভূত হইবে। কর্তৃপক্ষ তাহাকে যেখানে খুসী বদলি করিতে পারেন। আদন ও থামুর পরে আসিল কুন্তী বলিয়া এক গুর্খা ও গঙ্গাপ্পা নামে এক কানাড়ী। গুর্খাকে সকলে গুর্খা বলিত। সে প্রথমটা বড় মিশিত না, পরে বেশ মিশুক হইয়াছিল। প্রথম প্রথম সে ঠাহর করিতে পারে নাই যে, সে কেমন জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছে। হয়ত সে ভাবিয়াছিল যে, সামান্য কিছুতেই আমরা রিপোর্ট করিয়া তাহাকে মুস্কিলে ফেলিব। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, তাহাকে মুস্কিলে ফেলার ইচ্ছা আমাদের নাই, তখন হইতেই সে আমাদের নিকটতর হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাকেও শীঘ্রই বদলি করা হইল। জেলের চিঠির ভিতরে আমি গঙ্গাপ্পার কিছু বর্ণনা করিয়াছি। সে বয়স্ক লোক ছিল। সুক্ষ্মভাবে

নিয়ম পালন করা ও নিজ কর্তব্য সম্বন্ধে তার সজাগভাব দেখিয়া আমি মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতাম। কর্তৃপক্ষ তাহাকে যে কাজ করিতে বলিত, সে সারা হৃদয় দিয়া তাহা সম্পন্ন করিত। তাহার না করিলেও চলে এমন সকল কাজও সে হাতে লইত। সে কখনো অলসভাবে বসিয়া থাকিত না। আমার সাথীদের জন্য চাপাটি তৈরী করিতে শিখিয়া লইয়া সে তাহা তৈরী করিয়া দিত। আমার প্রতি তাহার ব্যক্তিগত অনুরাগ আমি কদাচ ভুলিতে পারিব না। কোনও স্ত্রী বা ভগ্নী গঙ্গাপ্পার চেয়ে বেশী মনোনিবেশ সহকারে সেবা করিতে পারে না। সে সর্বদা জাগিয়া থাকিত। আমার কখন কী দরকার হইবে তাহা আগে হইতেই বুঝিয়া তাহা করিয়া রাখিতে আনন্দ পাইত। আমার সকল জিনিস-পত্র যাহাতে নিখুঁতভাবে সাফ্ থাকে তাহা সেই দেখিত। আমার অসুখের সময়, সে আমার খুব ভাল করিয়াই শুশ্রূষা করিয়াছিল; কেননা সে-ই সকলের অপেক্ষা বেশী করিয়া উহাতে মন দিয়াছিল। যখন আমাকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বদলি করা হয়, তখন আমার সহিত শ্রীযুক্ত মনসুর আলী ও শ্রীযুক্ত যাজ্ঞিক প্রার্থনায় যোগ দিতেন। মনসুর আলীকে নির্দিষ্ট সময়মত মুক্তি দেওয়ার জন্য এলাহাবাদে পাঠানো হয়। শ্রীযুক্ত যাজ্ঞিকের ভক্তভাব অপেক্ষা অধিকতর ও তীব্রতর দার্শনিক চিন্তন দরকার বলিয়া তিনি প্রার্থনায় যোগ দেওয়া ছাড়িয়া দিলেন। গঙ্গাপ্পা মনে করিল যে, এই বন্ধুরা না থাকায় আমি প্রার্থনার সময় নিঃসঙ্গ বোধ করিব। প্রথম যেদিন সে দেখিল যে, আমি একা প্রার্থনায় বসিয়াছি, সে নীরবে আসিয়া আমার সম্মুখে বসিল। একথা বলাই বাহুল্য, গঙ্গাপ্পার আচরণের ভিতরে যে সূক্ষ্ম ভদ্রভাবের প্রেরণা ছিল তাহার মহত্ব আমি অনুভব করিলাম। গঙ্গাপ্পার পক্ষে উহা স্বাভাবিক, সহজ-সিদ্ধ, অনায়াসলব্ধ কাজ হইয়াছিল। যাহাকে ভাষায় ধর্ম বলে সে অনুযায়ী ঐ কাজ ধার্মিক বলা যায় না। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা অনুসারে উহা সত্যই ধার্মিক কাজ ছিল। আমার এই প্রার্থনা-সভায় কাহাকেও ডাকিতে আমি স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করিতাম। আমার জন্য কেহ আসে তাহা আমি ইচ্ছা করিতাম না। আমার নিঃসঙ্গ বোধ হইত না। সেই সময়টাতে আমি সবচেয়ে বেশী করিয়া ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করিতাম। কেহ আসিলে সে আমাকে সঙ্গ দান করুক, এ ইচ্ছা আমার হইত না; আমি ইচ্ছা করিতাম যে, সেও আমার সহিত ঈশ্বরের সঙ্গ অনুভব করুক। সেই জন্য ওয়ার্ডারদিগকে ডাকিতে আমি বিশেষভাবেই ইতস্ততঃ করিতাম। আমি মনে করিতাম যে, তাহারা হয়ত কেবল নিয়ম রক্ষার জন্যও আসিতে পারে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করিতাম যে, যদি তাহাদের সত্যই প্রার্থনায় যোগ দিতে ইচ্ছা হয় তবেই যেন আসে। গঙ্গাপ্পার বেলায় তাহার কতকটা মিশ্রিত মনোভাব ছিল। আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম বলিয়া তাহার কৃপাভাব ছিল, আবার আমার সহিত ঐ পবিত্র আধ ঘণ্টাকাল কাটাইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল। আমি যাহা উচ্চারণ করিতাম তাহার মধ্যে রামনাম ব্যতীত অবশ্য সে আর কোনও শব্দই বুঝিত না। গঙ্গাপ্পার দেখাদেখি আর একজন কয়েদী-ওয়ার্ডার—অন্নাপ্পাও এই প্রার্থনা-সমাজে আকৃষ্ট হয় এবং পরে মিঃ আবদুল গণিও যোগ দেওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হন। আমার মনে হয় গঙ্গাপ্পার প্রার্থনায় যোগ দেওয়ার মধ্যে যে অনাড়ম্বরতা ছিল, তাহাতেই মিঃ আবদুল গণি আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন।

পাঠকরা লক্ষ্য করিবেন যে, এই কয়েদী-ওয়ার্ডারদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা একটানা প্রীতিদায়ক ছিল। উহাদের চেয়ে অধিকতর নিষ্ঠাপরায়ণ সঙ্গী ও বিশ্বস্ত সেবক আমি আশা করিতে পারিতাম না। বেতনভোগী লোক দ্বারা কেবল জোড়া-তালি দিয়া কাজ চালাইতে পারা যাইত, একমাত্র বন্ধুরাই ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজ এই সকল লোককেই অপরাধী ও সমাজ-বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য করে। কেননা তাহাদের সাজা পাওয়ার দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে। পূর্বে যে জেলারের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আমি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, আমাদের জেলের ভিতরে এমন অনেক লোক রহিয়াছে, যাহারা বাইরের অনেক লোকের চাইতে ঢের ভাল। পাঠক, এইবার বুঝিতে পারিবেন যে, যখন আমি শুনিলাম যে,আমাকে খালাস দেওয়া হইয়াছে, আর আমার এই সাথীরা, যাহারা আমাকে এত প্রেম-আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে এবং যাহাদিগকে আমার মতে জেলে আটকাইয়া রাখার কোনই হেতু নাই, তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, তখন আমি যেন হৃদয়ে তীব্র বেদনা বোধ করিলাম।

আর একটা কথা বলিয়াই গঙ্গাপ্পার নিকট হইতে দুঃখের সহিত আমি বিদায় লইব। গঙ্গাপ্পা তাহার সীমা কখনও লঙ্ঘন করিত না, সে সূতা কাটিত না। সে বলিত, সে কাটিতে পারে না। তাহার আঙ্গুলের সে কৌশল ছিল না। কিন্তু সে চরখার ঘর সাফ্ রাখিত, আমার চরখা সাফ্ করিয়া রাখিত এবং সমস্তটা সময় তুলা রৌদ্রে দেওয়ার ও তুলা সাফ্ করিয়া পিঞ্জনের উপযোগী করার জন্য খরচ করিত।

কারাগারের যে সকল মধুর স্মৃতি সঞ্চিত রহিয়াছে, আমার মনে হয় যে, তাহার মধ্যে কয়েদী-ওয়ার্ডারদের স্মৃতি সব চাইতে বেশী দিন মনে থাকিবে।

১১

আমার পড়া

ছেলেবেলায় স্কুল-পাঠ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছু পড়িতে আমার বড় ভাল লাগিত না। আমার চিন্তার সামগ্রী উহা হইতেই পাইতাম। কেন না আমার পক্ষে স্কুলে যাহা পড়িতাম কার্য্যতঃ সেই পড়া স্বাভাবিক ছিল। বাড়িতে পড়া আমার বড়ই অপ্রীতিকর লাগিত। না পড়িলে চলে না বলিয়াই বাড়িতে পড়িতাম। ইংলণ্ডে থাকা কালেও পরীক্ষার পাঠ্য ব্যতীত আর কিছু না পড়ার অভ্যাসটাই বলবৎ ছিল। কিন্তু জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়া আমি দেখিলাম যে, সাধারণ জ্ঞান পাওয়ার জন্য আমার পড়া দরকার। কিন্তু আমার জীবনের প্রথমকার দিকটাতে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা গিয়াছে। তখনকার কাথিয়াওড়াড়ের পলিটিক্যাল এজেণ্টকে লইয়া উহার সূচনা হয়। সেই জন্য লেখাপড়া করার আমার সময় বড় হয় নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে আমাকে নামিয়া পড়িতে হইয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও একটা বছর পাঠ করার সময় পাইয়াছিলাম। ১৮৯৩ সালটা আমি ধর্মচর্চায় কাটাই। এই

সময়টার পড়া সেই জন্য কেবল ধর্মবিষয়েই ছিল। ১৮৯৪ সালের পর একটানা পড়ার সময় যাহা পাই তাহা কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার জেলেই মিলিয়াছিল। আমি এই সময়, পাঠ করার জন্য একটা রুচিই যে কেবল পাইয়াছিলাম তাহা নহে. আমি সংস্কৃত জ্ঞান বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলাম এবং তামিল, হিন্দি ও উর্দু ভাষাও শিখিতেছিলাম। তামিল ভাষার প্রয়োজন ছিল, কেননা সেখানে অনেক তামিলের সহিত আমার যোগ ছিল; আর উর্দুর দরকার ছিল, কেননা অনেক মুসলমানের সহিত কাজ ছিল। পড়ার জন্য ক্ষুধা দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে বাড়িয়া যায় এবং যখন শেষবারে দক্ষিণ আফ্রিকায় জেল হইতে আমার মেয়াদ ফুরাইবার আগেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আমি ব্যথিত বোধ করি।

সেই জন্য যখন ভারতে আবার সুযোগ আসিল, তখন এই অবকাশটা আমি সাদরে বরণ করিয়া লইলাম। আমি য়েরোড়াতে এমন একটা পাঠের ক্রম ধর-কাট করিয়া ছকিয়া লইলাম যাহা ছয় বৎসরেও শেষ করা সম্ভব হইবে না। প্রথম তিন মাস আমার একটা অনির্দিষ্ট ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষ সময়ের উপযুক্ত হইয়া অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইবে ও জেলের দরজা খুলিয়া ফেলিবে। কিন্তু আমি শীঘ্রই জানিলাম যে, তাহা হওয়ার নয়। আমি তখনই দেখিলাম যে, এখনও অন্ততঃ বৎসর পাঁচেক নীরব, কঠিন, গঠনমূলক কাজ করা আবশ্যক হইবে। পূর্ণ স্বরাজ প্রাপ্তি, অথবা অন্ততঃ শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজ দ্বারা মুক্তি লাভ করা ব্যতীত, শীঘ্র মুক্তি পাওয়ার আমার কোনই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সেই জন্য ৫৪ বৎসরের ভগ্ন শরীরে, বৃদ্ধের মত নয় ২৪ বৎসরের জোয়ানের মত পড়িতে বসিয়া গেলাম। আমার সময়ের প্রতি মিনিট হিসাব করিয়াই যাপন করিতে লাগিলাম। আমি সময়কালে বাহির হইলে উর্দু ও তামিল ভাল রকম শিখিয়া ও ভাল সংস্কৃত অভিজ্ঞ হইয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইল না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার অসুস্থতার জন্য সময়ের আগেই মুক্তি লাভ করার ফলে, আমার পাঠের পরিকল্পনা পূর্ণ করা গেল না। যাহা হোক্ নিম্নলিখিত তালিকা হইতে আমার পাঠের কতকটা ধারণা পাঠকরা করিয়া লইতে পারিবেন।

ইংরাজি

১। স্কটল্যাণ্ডের কেম্ব্রিজ ইতিহাস, ২। দি মাষ্টার এণ্ড হিজ টিচিং, ৩। আর্ম অফ্ গড্, ৪। ক্রিশ্চিয়ানিটি ইন্ প্র্যাক্টিস্, ৫। দি ওয়ে টু বিগিন্ লাইফ্, ৬। ইণ্ডিয়ান্ এডমিনিষ্ট্রেশন্ (ঠাকোর), ৭। ট্রিপ্ টু দি মুন্ (লুসিয়ান), ৮। ন্যাচুরাল্ হিষ্ট্রি অফ্ বার্ডস্, ৯। বাইবেল্ ভিউ অব দি ওয়ারল্ড্ মাস্টারস্, ১০। সিকার্স আফটার গড্ (জন ফেরর), ১১। ষ্টোরিজ ফ্রম দি হিষ্টরি অব রোম, ১২। টম ব্রাউনস স্কুল ডেজ্, ১৩। উইজডম্ অফ্ দি এনসেষ্টরস, ১৪। হিষ্টরি অফ ইণ্ডিয়া, ১৫। ফাইভ্ নেশানস্, ১৬। ইকোয়ালিটি (এডোয়ার্ড বেলামী), ১৭। সেণ্ট পল ইন গ্রীস, ১৮। দি ষ্ট্রেঞ্জ কেস অফ ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড, ১৯। পিট (লর্ড রোজবেরী), ২০। জাঙ্গল্ বুক (কিপলিং), ২১। গেটের ফার্উষ্ট, ২২। লাইফ্ অফ জন হাউয়ার্ড, ২৩। ড্রপ্ড ফ্রম দি ক্লাউড্স (জুলস্

ভারণে), ২৪। লাইফ অব কলম্বস (আরভিং), ২৫। ফাইভ এম্পায়ার্স (উইলবার-ফোর্স), ২৬। টেলস অফ এনসেন্ট রোম্, ২৭। দি ক্রুসেডস্, ২৮। গিবনস্ রোম্ ২৯। কবীরস্ সংগস্ (টাগোর), ৩০। সুপার সেন্সুয়াল লাইফ (জেকব ভিমেন), ৩১। প্রো ক্রাইষ্ট এট এক্লিজিয়া, ৩২। গ্যালিসিয়ান, ৩৩। ফিলোক্রিষ্টস্, ৩৪। প্রেম মিত্র, ৩৫। দি গস্পেল এন্ড দি প্লাউ, ৩৬। আওয়ারসেলভস্ এন্ড দি ইউনিভার্স, ৩৭। হোয়াট ক্রিশ্চয়ানিটী মিন্স টু মি, ৩৮। স্টেপস্ টু ক্রিশ্চয়ানিটী, ৩৯। মাই ফিলজফি এন্ড রিলিজিয়ন (ট্রাইন), ৪০। সাধনা (রবীন্দ্রনাথ), ৪১। উপনিষদ (ম্যাক্সমুলর), ৪২। আউট লাইনস্ অব হিষ্টরি (ওয়েলস), ৪৩। বাইবেল, ৪৪। সায়েনস অফ পিস (ভগবান দাস), ৪৫। ব্যারাক রুম ব্যালাড্স্ (কিপলিং), ৪৬। ইভলিউশন অফ সিটীজ (গডিজ), ৪৭। শিখ্স্ (গোকুলচন্দ্র) ৪৮। এথিকস্ অফ ইসলাম, ৪৯। সোশ্যাল ইভলিউশন (কিড), ৫০। আওয়ার হেলেনিজ হেরিটেজ, ৫১। গীতা (অরবিন্দ ঘোষ), ৫২। এলিমেণ্টস্ অফ্ সোসিয়লজি, ৫৩। সোসাল এফিসিয়েন্সী (ফেরবানী), ৫৪। মেসেজ অফ মহম্মদ (বাডিয়া), ৫৫। মেসেজ অফ ক্রাইস্ট (বাডিয়া), ৫৬। সেইন্টস্ অফ্ ইস্লাম (হাসান), ৫৭। আরলি জোরোষ্ট্রীয়ান্স্ (মোল্টন), ৫৮। ম্যান এন্ড সুপারম্যান (শ), ৫৯। হিস্ট্রী অফ্ সিভিলিজেশন (বাক্ল), ৬০। অটোবাইয়োগ্রাফী অফ্ কাউন্টেস্ টলষ্টয়, ৬১। ভেরাইটিজ অফ্ রিলিজিয়াস এক্সপিরিয়েন্সস্, ৬২। অরিজিন এন্ড ইভলিউসন অফ রিলিজিয়ন (হপকিনস), ৬৩। হিষ্ট্রী অফ ইউরোপিয়ান মরাল্স (লেকি), ৬৪। ফ্রীডম এন্ড গ্রোথ, (হোম্স), ৬৫। এভোলিউশন অফ ম্যান (হেকেল), ৬৬। কোরাণ (মহম্মদ আলীর ইংরাজী অনুবাদ), ৬৭। রাজযোগ (বিবেকানন্দ), ৬৮। কনফ্লুয়েন্স অফ রিলিজিয়ন্স, ৬৯। মিষ্টিরিজ অফ্ ইস্লাম (নিকলসন), ৭০। গস্পেল অফ বুদ্ধ (পল কেরস)। ৭১। লেকচার্স অন বুদ্ধিজম্ (রিজ ডেভিস), ৭২। স্পিরিট অফ ইসলাম (আমির আলি), ৭৩। মডার্ণ প্রবলেম্স (লজ), ৭৪। মহম্মদ (ওয়াশিংটন আরভিং), ৭৫। হিষ্ট্রি অফ দি স্যারাসেন্স (আমির আলি,), ৭৬। হিষ্ট্রি অব সিভিলাইজেসন ইন ইউরোপ (গিজো), ৭৭। রাইজ অফ দি ডচ্ রিপাব্লিক, ৭৮। মিউজিংস অফ সেইন্ট থেরিসা, ৭৯। বেদান্ত (রাজম আইয়ার), ৮০। রোজি ক্রিশ্চিয়ান মিষ্টিরিজ, ৮১। ডায়ালগস্ অফ প্লেটো, ৮২। শাক্ত ও শক্তি (উড্রুপ), ৮৩। কোরাণ (রুডের ভাষান্তর), ৮৪। আবস্তা (দাদায়ানজী), ৮৫। ঈশোপনিষদ (অরবিন্দ ঘোষ)।

গুজরাটী

১। মিসরকুমারী (বাংলা নাটকের অনুবাদ), ২। চন্দ্রকান্ত, ৩। পাতঞ্জল যোগদর্শন (প্রঃ কণিয়া), ৪। বাল্মীকি রামায়ণ, ৫। মহাভারত—১৮ পর্ব্ব, ৬। গিরিধর কৃত রামায়ণ, ৭। শ্রীমদ্ভগবৎ (গুজরাটী অনুবাদ), ৮। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত (জাভেরীর ভাষান্তর), ৯। কৃষ্ণচরিত (চিন্তামন রাও), ১০। লোকমান্যের গীতা রহস্য,১১। সরস্বতীচন্দ্র, ১২। মনুস্মৃতি, ১৩। জ্ঞানেশ্বরী, ১৪। গীতা (শ্রীনথুরাম শর্ম্মা), ১৫। ষড়দর্শন, ১৬। শাঙ্কর ভাষ্য, ১৭। শ্রীমৎ রাজচন্দ্র, ১৮। হিমালয়নো

প্রবাস,১৯। সীতাহরণ, ২০। বুদ্ধ অনে মহাবীর, ২১। রাম অনে কৃষ্ণ, ২২। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২৩। পূর্বরঙ্গ, ২৪। জয়া অনে জয়ন্ত, ২৫। প্রাচীন সাহিত্য (রবীন্দ্রনাথ), ২৬। কালাপাণির্নি কথা, ২৭। অর্থশাস্ত্র (বিদ্যাপীঠ), ২৮। গীত-গোবিন্দ (কেশবলাল ধ্রুব), ২৯। মুক্তধারা (রবীন্দ্রনাথ), ৩০। নৌকাডুবি (ডুবন্তবহান, রবীন্দ্রনাথ), ৩১। ভগবতী সূত্র (অসম্পূর্ণ)।

হিন্দী

১। সত্যাগ্রহ অউর অসহযোগ, ২। তুলসী রামায়ণ, ৩। কঠবল্লী (ভাষাটীকা), ৪। সত্যার্থপ্রকাশ, ৫। স্যাদবাদ মঞ্জরী, ৬। উত্তরাধ্যায়ণ সূত্র।

উর্দু

১। উর্দু বাচন মালা, ২। ঔস্বএ মহালা, ৩। পয়গম্বরের জীবনচরিত (শিল্পী), ৪। অল ফারুক (শিল্পী), ৫। অল কলাম (শিল্পী)।

মারাঠী

১। উপনিষদ-ভাষ্য ২৪ খানা (প্রঃ ভানু), ২। মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম (বিনোবা)।

পাঠক মনে করিবেন না যে, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সমস্ত পুস্তক পড়িয়াছি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে অকেজো এবং জেলের বাহিরে হইলে আমি পড়িতাম না। আবার কতকগুলি জানা অজানা বন্ধুরা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং আমার বোধ হইয়াছিল যে, অন্ততঃ তাঁহাদের প্রতি প্রীতিবশতঃ আমার সেগুলি পড়িয়া যাওয়া উচিত। য়েরোড়া জেলের ইংরাজী পুস্তকের সংগ্রহ মন্দ বলা যায় না। ইহার মধ্যে কতকগুলি বেশ ভাল বই আছে, যেমন—ফ্ররারের সিকার্স আফটার গড্, লুসিয়ানের ট্রিপস্ টু দি মুন অথবা জুলস্ ভার্ণের ড্রপ্‌ড ফ্রম দি ক্লাউড্‌স্, এগুলি নিজ নিজ বিষয়ে অতি উত্তম পুস্তক। ফ্রারারের বইখানা আগ্রহ উদ্দীপক, ইহাতে মার্কস অরেলিয়াস, সেনেকা, এবং এপিক্‌টেটাসের জীবনের উচ্চতর দিক্‌টা প্রদর্শিত হইয়াছে। লুসিয়ানের বইখানা সুন্দর শিক্ষাপ্রদ ব্যঙ্গ চিত্র। জুলস্ ভারণে গল্পের রূপে বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। তাঁহার পদ্ধতি অননুকরণীয়।

অনেক খৃষ্টীয় বন্ধু আমার প্রতি খুব অনুকম্পা দেখাইয়াছেন। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে, আমেরিকা, ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ হইতে বই পাইয়াছিলাম। তাঁহাদের সদিচ্ছার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে তাঁহাদের অনেকগুলি বই পড়িয়াই আমি তৃপ্তি পাই নাই। আমি যদি তাঁহাদের উপহার সম্বন্ধে কিছু মিষ্ট কথা বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে সুখী হইতাম। কিন্তু যদি আমার মনে সে ভাব না থাকে, তবে তাহা বলা ন্যায়ও হইবে না, সত্যও হইবে না। খৃীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাচীন বা গোঁড়া গোষ্ঠী অনুমোদিত পুস্তকগুলিতে আমি কোনও সন্তোষ পাই না। যীশুর জীবনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বস্তুতঃ গভীর। তাঁহার নীতিশিক্ষা, তাঁহার সাধারণ জ্ঞান, তাঁহার ত্যাগ—এ সকলের জন্য আমার অতিশয় শ্রদ্ধা রহিয়াছে। যীশু যে শরীরধারী

ভগবান, এই প্রকার গোঁড়া খৃষ্টানী মতে আমার বিশ্বাস নাই, অথবা তিনিই যে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র সে কথা আমি স্বীকার করি না। একের পুণ্যে অপরে গ্রহণ করিতে পারে—এই মতবাদ আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। যীশুর আত্মত্যাগ আমাদের সকলের কাছে আত্মত্যাগের এক আদর্শ। আমাদের প্রত্যেককেই উদ্ধারের জন্য ক্রুশ-বিদ্ধ হইতে হইবে। 'পিতা' 'পুত্র' 'পবিত্র প্রেতাত্মা' ইত্যাদি খৃষ্টধর্মের কথাগুলির আমি আক্ষরিক অর্থ করি না। এসমস্তগুলিই রূপকভাবে ব্যবহৃত শব্দ। "সারমন অন দি মাউণ্ট" পর্বতোপরি প্রদত্ত খৃষ্ট প্রবচনের যে সঙ্কীর্ণ অর্থ করা হয় তাহা আমি গ্রহণ করি না। নিউটেষ্টামেণ্টে যুদ্ধের সমর্থক কিছু আছে—এমন সন্ধান আমি পাই নাই। জগতে যত শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বা জন-শিক্ষক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যীশুখৃষ্টকে একজন শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বলিয়া আমি মনে করি। তাহা হইলেও আমি বাইবেলকে যীশুর জীবন ও শিক্ষার এক অভ্রান্ত ইতিহাস বলিয়া মনে করি না। আর আমি নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রত্যেক কথাই ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া মানি না। পুরাতন ও নূতন টেষ্টামেণ্টের ভিতর মৌলিক ভেদ রহিয়াছে। পুরাতন টেষ্টামেণ্টের ভিতর কতকগুলি গভীর সত্য নিহিত থাকিলেও, আমি উহাকে নূতন টেষ্টামেণ্টের মত মান দিতে পারি না। আমি নূতন টেষ্টামেণ্টকে কতকাংশে পুরাতন টেষ্টামেণ্টের বিস্তার, এবং কতক অংশে উহার বর্জন বলিয়া মনে করি। তাহা ছাড়া, নূতন টেষ্টামেণ্টকেও আমি ঈশ্বরের শেষ কথা বলিয়া ধরি না। জগতে সমস্তই যেমন ক্রম-প্রগতির নিয়ম অনুযায়ী চলিতেছে, ধর্মসম্বন্ধে আমার ধারণাও তদ্রূপ। একমাত্র ঈশ্বরই অপরিবর্তনশীল এবং তাঁহার বাক্য মনুষ্যের মধ্য দিয়া কথিত হইয়া থাকে বলিয়া, বক্তার পবিত্রতার ক্রম অনুযায়ী ঐ বাক্য কমবেশী বিকৃত হইয়া থাকে। সেইজন্য আমার বন্ধুদিগকে এবং হিতাকাঙ্ক্ষীদিগকে আমি যেমন, তেমনিভাবেই আমাকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহাদের ইচ্ছা, আমি তাঁহাদের মত ভাবি ও হই; এই ইচ্ছার মধ্যে যে প্রেমভাব রহিয়াছে, তাহাকে আমি সম্মান করি। আমি মুসলমান ভাইদিগের সম্বন্ধেও সেই সম্মানের ভাব পোষণ করিয়া থাকি। আমি আমার নিজ ধর্মের মতই এই দুই ধর্মকেও সমান সত্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমার নিজ ধর্ম আমাকে সম্পূর্ণ সন্তোষ দেয়। আমার উন্নতির জন্য যাহা আবশ্যক সে সকলই আমি ইহাতেই পাই। এই ধর্ম আমাকে এই কথা শিক্ষা দেয় যে, আমি যেমন বিশ্বাস করি অপরেও সেইমত বিশ্বাস করুক,এমত প্রার্থনা যেন না করি, বরং যেন ইহাই প্রার্থনা করি— যে যে-ধর্মে আছে সেই ধর্মেই যেন সে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য খৃষ্টান ও মুসলমানের জন্য আমার নিরন্তর প্রার্থনা হইল যে, তাঁহারা যেন উন্নততর খৃষ্টান, উন্নততর মুসলমান হইতে পারেন। আমি একথা জানিয়াছি, আমি বুঝিয়াছি যে, ঈশ্বর আমাদিগকে আমরা কী তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন,—জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমরা কোন্ নাম বা দলের নাম লইয়া পরিচয় দিই সে কথা জিজ্ঞাসা করেন না, অর্থাৎ আমরা কী করি তাহাই তিনি দেখেন। তাঁহার কাছে কর্মই সবটা, কর্মের উপর যে বিশ্বাসের ভিত্তি নয়, তাহার কোনও মূল্য নাই। তাঁহার কাছে কর্ম দ্বারাই বিশ্বাসের পরিচয়। এই অবান্তর আলোচনার জন্য পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আমার

খৃষ্টান বন্ধুগণ জেলে বাসকালে আমাকে যে খৃষ্ট-ধর্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তক দ্বারা একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহারা আমার ধর্মজীবনের জন্য যে ঔৎসুক্য পোষণ করেন অন্ততঃ তাহার জন্যও, আমার মন খুলিয়া বলা দরকার বোধ করিয়াছি।

আমার মহাভারত ও উপনিষদ, রামায়ণ ও ভাগবত না পড়িলেই চলিত না। উপনিষদ পড়িয়া বৈদিক ধর্মের মূল জানার জন্য আমার পিপাসা বাড়ে। ইহার বিশাল কল্পনাসমূহ আমাকে তীব্রতম আনন্দ দিয়াছে। উহাদের আধ্যাত্মিকতায় আমার হৃদয় তৃপ্ত মানিয়াছে। প্রফেসর ভানু উপনিষদের বিস্তর টীকা দিয়াছেন, সমস্ত শাঙ্কর ভাষ্য দিয়াছেন এবং অন্য ভাষ্যেরও সার দিয়াছেন। তথাপি আমি উপনিষদের সব কথা বুঝিতে পারি নাই। অথবা সকল বিষয়ে রস পাই নাই। মহাভারত আমি একটানা ইহার পূর্বে পড়ি নাই। পূর্বে যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহা এখান সেখান হইতে মাত্র। ইহার প্রতি আমার মন বিরূপই হইয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, উহা কেবল অসম্ভব রক্তারক্তির কথা, লম্বা টানা-বোনা কাহিনী, যাহা পড়িতে গিয়া কেবল ঘুম পাইবে। এখন আমি জানিয়াছি যে, উহা ঠিক নয়, আমার ভুল ধারণা। প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠার ঐ প্রকান্ড খন্ডগুলি দেখিয়া আমার ভয় হইত! উহা একবার আরম্ভ করিয়া শেষ করার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়াও পড়িয়াছিলাম। কিন্তু কোনও কোনও অংশবাদে এতই মনোমুগ্ধকর লাগিয়াছিল যে, উহা প্রায় চার মাস পড়ার পর শেষ করিয়া আমার মনে হইল যে, উহাকে একটা বাছা বাছা উজ্জ্বল রত্ন পরিপূর্ণ সিন্ধুকের সহিতও তুলনা করিলেও কম করা হয়। কেননা সে রত্নের পরিমাণ ও মূল্যের সীমা রহিয়া গিয়াছে। বরঞ্চ উহার তুলনা অফুরন্ত ধনরত্ন-সম্পন্ন সেই খনিরই সহিত করা যায়, যেখানে যতই গভীর দেশে প্রবেশ করা যায় ততই মূল্যবান রত্ন আবিষ্কৃত হইতে থাকে। মহাভারত আমার কাছে ঐতিহাসিক ফিরিস্তি নহে। ইতিহাস হিসাবে ইহার মূল্য কিছু নাই। ইহাতে শাশ্বত সত্য রূপকের আকারে দেওয়া আছে। কবির উদ্দেশ্য হইতেছে—ভাল ও মন্দ, জড় ও চেতন, ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে যে শাশ্বত যুদ্ধ চলিতেছে তাহারই বর্ণনা করা, এবং সেই জন্য তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা গ্রহণ করিয়াছেন ও নিজ প্রয়োজন অনুসারে তাহাদিগকে দেবতা ও দানব গড়িয়াছেন। ইহা যেন একটা প্রবাহিণী নদী, তাহার গর্ভে যাহা কিছু আসিয়া পড়িতেছে উহার সহিত যুক্ত হইয়া যাইতেছে এবং কতক ঘোলা জলও আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা একটা মাথার পরিকল্পনা। কিন্তু সময়ের আক্রমণে ইহার কত অংশ ধ্বংস হইয়াছে, আবার প্রক্ষিপ্ত জিনিষও প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহা এতদূরে গড়াইয়াছে যে, কতটা আদত, আর কতটা প্রক্ষিপ্ত তাহা বলা শক্ত। ইহার শেষ যেমন করিয়া করা হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সাংসারিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ অসারতাই ইহাতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। অবশেষে দেখা গেল, এক ব্রাহ্মণ যে তাহার শেষ গ্রাসটাও ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে দান করিয়াছিল তাহার দানের তুলনায় এত বড় জমকালো মহাযজ্ঞও কিছুই না। ধার্মিক পান্ডবদের জন্য এক দুঃখ ছাড়া আর কিছুই বাকি রহিল না। মহাশক্তিমান কৃষ্ণ অসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জন-বহুল ও শক্তি-বহুল যাদবেরা নিজেদের পাপের

জন্য নিজেরাই কাটাকাটি করিয়া অগৌরবজনক মৃত্যুলাভ করে। অজেয় অর্জুন তাহার হাতে গাণ্ডীব থাকিতেও একদল ডাকাতের হাতে পরাজিত হন। পাণ্ডবেরা রাজসিংহাসন এক বালকের জন্য রাখিয়া গৃহত্যাগ করেন। স্বর্গের পথে একজন ছাড়া আর সকলেরই মৃত্যু হয়। যুধিষ্ঠির, যিনি ধর্মেরই কলেবর স্বরূপ তাঁহাকেও বিপদে পড়িয়া মিথ্যা আচরণ করার জন্য একবার নরকের পূতিগন্ধ ভোগ করিতে হয়। কর্ম ও ফলের অমোঘ নিয়ম অবিচল গতিতে নিজ ধারায় চলিতেছে। মহাভারতের সম্বন্ধেই কথা আছে যে, "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"—উহা যথার্থ।

১২

আমার পড়া—২

আমার সারা মন মহাভারত যেমন আকৃষ্ট করিয়াছিল, উর্দুও তেমনি করিয়াছিল। যতই আমি অগ্রসর হইতেছিলাম, আমার আগ্রহ ততই বাড়িতেছিল। আমি অনেকটা হাল্কাভাবেই উর্দু পড়া আরম্ভ করি, মনে করি, দুই তিন মাসেই উর্দুতে পণ্ডিত হইয়া যাইব। কিন্তু অল্প দিনেই দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিলাম যে, উহা হিন্দী হইতে স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পার্থক্য বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু ইহা আবিষ্কার করিয়া আমার উর্দু শিখিবার ও উর্দু সাহিত্য পড়ার জেদ আরও বাড়িয়া গেল। সেই জন্য আমি দিনে প্রায় ৩ ঘণ্টা করিয়া উর্দু পড়ার জন্য দিতে লাগিলাম। উর্দু লেখকরা ইচ্ছা করিয়াই—যে সকল শব্দ হিন্দু-মুসলমান ব্যবহারে প্রচলিত রাখিয়াছেন, সেগুলি ত্যাগ করিয়া পাশী বা আরবী শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ ব্যাকরণ ত্যাগ করিয়া আরবী বা পাশী ব্যাকরণ ইহাতে প্রবেশ করাইয়াছেন। ফলে হইয়াছে কী, যে স্বদেশী সেবকের মুসলমান চিন্তা-ধারার সহিত যোগ রাখার ইচ্ছা হইবে, তাহাকে উর্দু একটা ভিন্ন নূতন ভাষা বলিয়া পড়িতে হইবে। আমি জানি, হিন্দী লেখকরাও ঠিক এমনি ধারাই করিয়াছেন। তবে আমার একথাও মনে হইয়াছিল যে, এই ভেদ-ভাব খুব বেশী ভিতরে প্রবেশ করে নাই এবং হয়ত উহা একটা সাময়িক ঝোঁক মাত্র। আমি দেখিতেছি যে, যদি আমাদের একটা সাধারণ রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দী ও উর্দুর সংমিশ্রণে গড়িতে হয়, তাহা হইলে এই দুইটি প্রবাহ যাহা এখন বিভিন্নমুখী হইয়া চলিয়াছে, তাহা এক করার জন্য দীর্ঘ দিন ধরিয়া চেষ্টা করিতে হইবে। কঠিন হইলেও আমার এই মত যে, হিন্দুদের পক্ষে সাহিত্যিক শিক্ষা পূর্ণ করার জন্য সাহিত্যিক উর্দু জানা চাই। তেমনি মুসলমানদেরও সাহিত্যিক হিন্দী জানা চাই। যদি গোড়ায় আরম্ভ করা যায়, তবে এ কাজ কঠিন নহে। এই প্রকার পাঠে অর্থাগমে সাহায্য না হইতে পারে, পাশ্চাত্য দেশের জ্ঞান-সম্পদ পাওয়ার সাহায্য না হইতে পারে, কিন্তু জাতীয়তাবোধের দিক হইতে ইহার মূল্য অতুলনীয়। উর্দু ভাল করিয়া পড়ার জন্য আমি লাভবান হইয়াছি। আমার এখনো ইচ্ছা হয়, যদি উর্দু পাঠ সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম!

আমি দুই বৎসর পূর্বে মুসলমানদের মন যেমন বুঝিতে পারিতাম তাহা অপেক্ষা

এখন অধিক বুঝিতে পারি। আমি উর্দু সাহিত্যের ধর্মের দিকটায় প্রবেশ করার জন্য ব্যগ্র ছিলাম, সেইজন্য যেমনি আমার সামর্থ্য হইল, আমি উর্দু ধর্ম-পুস্তক পাঠে প্রবৃত্ত হইলাম। মৌলানা হজরত মোহানি, মিঃ মনসুর আলিকে "মহম্মদের সহকর্মীদের জীবনের দুই একটি অধ্যায়" দিয়াছিলেন। তখন আমি উর্দু পড়িতে-ছিলাম বলিয়া মনসুর আলি বইয়ের খণ্ডগুলি আমাকে পড়িতে দেন। আমি খুব শ্রমসহকারে বইগুলি পাঠ করিলাম। এই বইগুলিতে পুনরুক্তি রহিয়াছে এবং সংক্ষেপে লিখিলে বুঝারও সুবিধা হইত, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি উহাতে খুব রস পাইয়াছিলাম। কেন না উহাতে পয়গম্বরের অনেক সঙ্গীদের কর্ম সম্বন্ধে জানিতে পারিয়াছিলাম। কেমন করিয়া কোন্ মন্ত্রবলে তাঁহাদের জীবন ধারার পরিবর্তন হয়, তাঁহারা পয়গম্বরের প্রতি কীভাবে ভক্তি দেখাইতেন, তাঁহারা কেমন করিয়া সাংসারিক সম্পদের বিষয়ে বিরাগী হইলেন, কেমন করিয়া তাঁহারা ক্ষমতার ব্যবহারও জীবনযাত্রা সরল করার জন্যই করিতেন, তাঁহারা কাঞ্চনের লোভ কেমন করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যাহা পবিত্র মনে করিতেন, তাহার জন্য জীবনকে কেমন করিয়া তৃণসম গণ্য করিতেন—এ সমস্ত এত সুক্ষ্মভাবে বর্ণনা করা আছে যে, তাহা পাঠে শ্রদ্ধা জাগে। এখনকার ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিদের সহিত তাঁহাদের জীবন তুলনা করিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়। সঙ্গীদের কথা সারিয়া আমি পয়গম্বরের দিকেই মন দিলাম। মৌলানা শিবলীর বই দুইখানা খুব প্রশংসনীয় রচনা; তবে সঙ্গীদের বিষয়ে বইটি সম্বন্ধে আমি যে অভিযোগ করিয়াছি, ইহার বিষয়েও তাহাই খাটে। কিন্তু তাহা হইলেও যে পুরুষের জীবনের ঘটনাবলীর পশ্চিমদেশীয়রা একবাক্যে নিন্দা করিয়াছে ও ভর্ৎসনা করিয়াছে, একজন মুসলমান তাহা কীভাবে লইয়াছেন তাহা পাঠে আমি রস পাইতেছিলাম। যখন আমি দ্বিতীয় খণ্ডখানা শেষ করিলাম তখন আমার মনে দুঃখ হইল যে, সেই মহৎ জীবন সম্বন্ধে পড়া শেষ হইল। এই জীবনে এমন ঘটনা আছে যাহা আমি বুঝি না, যাহা আমি বুঝাইতে পারি না। কিন্তু আমি সমালোচক বা অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে ইহা পাঠ করি নাই। আজ যিনি শত লক্ষ লোকের মনের উপর অবিসম্বাদী প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশসমূহ জানার আমার ইচ্ছা ছিল। আমি এই দুই খণ্ড পুস্তকে তাঁহার প্রভাবের যথেষ্ট হেতু খুঁজিয়া পাইলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, তরবারির বলে ইসলাম তখনকার দিনে লোকের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। উহার হেতু পয়গম্বরের সম্পূর্ণ অহং-শূন্যতায়, প্রতিজ্ঞা পালনের দৃঢ়তায়, তাঁহার সঙ্গী ও অনুচরদিগের প্রতি তীব্র প্রেমে, তাঁহার দক্ষতায়, তাঁহার নির্ভীকতায়, এবং ঈশ্বরে ও নিজের জীবন-ব্রতে একান্ত বিশ্বাসে। এইগুলিই সম্মুখের সমস্ত বিঘ্ন দূর করে, তরবারি নহে। কোনও মানুষকে, তিনি পয়গম্বরই হোন্ আর অবতারই হোন্, আমি পূর্ণ পুরুষ মনে করি না বলিয়া পয়গম্বরের জীবনের প্রত্যেক ঘটনা সমালোচকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করাইবার চেষ্টা করা আমার পক্ষে দরকার করে না। আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, শত লক্ষ লোকের মধ্যে তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করিয়া চলিতে চাহিতেন এবং যিনি দরিদ্রভাবেই দেহত্যাগ করেন, যিনি তাঁহার মাটির দেহের জন্য

কোন জমকাল সমাধি-মন্দিরের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না, এবং যিনি মৃত্যু-শয্যাতেও তাঁহার পাওনাদারদের তালিকার কথা ভুলেন নাই। আজ আমাদের চতুর্দিকে যে হেয় অসহিষ্ণুতা ও সন্দেহজনক উপায়ে ধর্ম গ্রহণ করানোর ব্যাপার চলিতেছে, তাহার জন্য পয়গম্বরের শিক্ষাকে যেমন দায়ী করা যায় না, ঠিক ,তেমনিভাবেই হিন্দুদের আজকালকার অধোগতি ও অসহিষ্ণুতার জন্য হিন্দুধর্মকেও দায়ী করা যায় না।

পয়গম্বরের জীবনচরিতের পর আমি অজেয় উমরের জীবনী পড়ি। উমরের উন্নত জীবনের স্মৃতিতে আমার মাথা নত হইয়া পড়ে। আমি যখন দেখি যে তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে, পড়শীদিগের জাঁকজমক অনুকরণ করার জন্য মন্দ বলিতেছেন, যখন দেখি যে, তিনি পথে চলিতে চলিতে খৃষ্টীয়দিগের গির্জায় এইজন্য উপাসনা করিতেছেন না যে, পাছে কোনও দিন উহা মসজিদ বলিয়া লোকে দাবী করিয়া বসে, যখন দেখি যে, তিনি পরাজিত খৃষ্টানদিগকে খুব উদার সর্ত দিতেছেন, যখন আমার স্মৃতিপটে একথা উদয় হয় যে, তিনি বলিতেছেন যে, ইসলাম ধর্মাবলম্বী কোনও একজন অনধিকারী লোকের কথাও সম্রাটের লিখিত বিধানের সমান মূল্যবান, তখন আমি তাঁহাকে সম্মান দান করি। তাঁহার ইচ্ছা শক্তি ছিল বজ্র-কঠোর। তিনি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতের বেলায় যাহা করিতেন, নিজের কন্যার বেলাতেও ঠিক সেইরূপ আচরণই করিয়াছিলেন! এই যে আমাদের চতুর্দিকে ভাঙা হইতেছে, মন্দির অপবিত্র করা হইতেছে, হিন্দুদের গান-বাজনার প্রতি চিন্তাহীন অসহিষ্ণুতা দেখানো হইতেছে, ইহার হেতু আমি বুঝিতে পারিতেছি। এই সমস্ত কাজ একজন শ্রেষ্ঠতম সম্রাটের জীবনের বিকৃত অর্থ ধরিয়া লইয়াই করা হইতেছে। আমার মনে হয় যে, এই মহৎ ও ন্যায়পরায়ণ পুরুষের কৃতিত্বসমূহ মুসলমান জনসাধারণের নিকট বিকৃত করিয়া দেখানো হইতেছে। আমি জানি যে, আজ যদি তিনি মৃত্যুর পরপার হইতে ফিরিয়া আসিতেন, তবে তিনি ইসলামের তথাকথিত অনুচরদিগের যে সকল কাজের দ্বারা মহান উমরকে রূঢ়ভাবেই ব্যঙ্গ করা হয়, তাহা অস্বীকার করিতেন।

এই চিত্তাকর্ষক অধ্যয়নের পর, আমি দর্শন সম্বধীয় পুস্তক 'আলকালম' গ্রহণ করি। এগুলি বুঝা কঠিন। ইহার ভাষা বিশেষভাবে শাস্ত্রীয়। তবে মিঃ আবদুল গণির জন্য অপেক্ষাকৃত সহজে উহা পড়িতে পারি। আমার দুঃখ হয় যে, এই বইগুলির অর্দ্ধেক পড়ার পরই অসুস্থতার জন্য আমার পাঠ বন্ধ হয়।

ইংরাজী বইয়ের মধ্যে গিবনের বইখানাকে সহজেই প্রথম স্থান দিতেছি। এই বইখানা আমাকে অনেক ইংরাজ বন্ধু অনেক বৎসর পূর্বেই পড়িতে বলিয়াছিলেন। আমি জেলে গিবন পড়িব বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। আমি পড়িয়া সুখী হইয়াছি। আমার কাছে ইতিহাসও আধ্যাত্ম অর্থ-যুক্ত। একটা নগরের নাগরিকরা কেমন করিয়া একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, গ্রন্থকার যেমন তাহা দেখাইয়াছেন তেমনি উহার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কাছে আত্মার ইতিহাসও ধরা পড়িয়া যায়। গিবন ত ছোট খাট জিনিস লইয়া ঘাঁটেন নাই। তিনি ঘটনার বৃহৎ সম্ভার পাঠকের সম্মুখে তাঁহার অতুলনীয় দক্ষতার সহিত সাজাইয়া ধরিয়াছেন।

তিনি প্যাগান, খৃষ্টান ও ইসলামীয়—এই তিন তিনটা সভ্যতা বিশদভাবে আলোচনা করিয়া পাঠককে তাহা হইতে নিজের মন্তব্য গঠন করিতে স্বাধীনতা দিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার নিজের যে মন্তব্য তাহার প্রতি বাধ্য হইয়াই মন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি নিজের কাজের বিশেষ মর্যাদা রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি ঘটনাগুলি সাজাইয়া ধরিয়া পাঠককে নিজেই বিচার করিতে বলিতেছেন।

মোটলে আর এক ধরণের। গিবন একটা শক্তিমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মোটলে একটা ছোট প্রজাতন্ত্র হইতে খুঁজিয়া তাঁহার মনের মতন নায়ক বাহির করিয়া লইয়াছেন। একটা শক্তিমান সাম্রাজ্যের কাহিনীকে ফুটাইয়া তোলার জন্যই বীর পুরুষদের প্রয়োজন গিবনের হইয়াছে, মোটলের প্রজাতন্ত্রের কাহিনী একটি জীবনকে ফোটাইয়া তোলার জন্যই প্রয়োজন হইয়াছে। এই প্রজাতন্ত্র উইলিয়াম দি সাইলেন্টের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে।

এই দুইখানার সঙ্গে রোজবেরীর পিটের জীবনীও যুক্ত করিতে হয়। আর তাহা হইলে হয়ত পাঠকও আমার সহিত একথা স্বীকার করিবেন যে, ঘটনা ও কল্পনার মধ্যে ব্যবধান বড়ই সূক্ষ্ম। এবং ঘটনারও দুইটা দিক অন্ততঃ আছে, অথবা আইন-জীবীরা যেমন বলিয়া থাকেন—ঘটনাগুলিও একরকমের মতবাদ মাত্র। যাহা হোক্‌ মানব জাতির ক্রম-পরিণতিতে ইতিহাসের কী মূল্য, সে সম্বন্ধে আমার মতবাদের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিব না। আমি এই প্রবাদটা বিশ্বাস করি, যে জাতির ইতিহাস নাই তাহারা সুখী। আমার এটা একটা প্রিয় কল্পনা যে, আজ ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি, আমাদের হিন্দু পূর্ব্বপুরুষরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াই এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন এবং সামান্য ঘটনার উপর তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। মহাভারত এমনি এক সৃষ্টি। আর আমি গিবন ও মোটলেকে মহাভারতের ছোট সংস্করণ বলিয়া মনে করি। মহাভারতের অমর অথচ অজ্ঞাত স্রষ্টা, তাঁহার কাহিনীর ভিতরে যথেষ্ট অলৌকিকত্ব সংযোজিত করিয়া পাঠককে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, পাঠক যেন তাঁহার কথা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করেন। এদিকে গিবন ও মোটলে পাঠককে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে মিথ্যাই চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহারা যাহা বলিতেছেন ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল, অন্যরূপ নহে। লর্ড রোজবেরী ইতিমধ্যে অবতীর্ণ হইয়া বলিতেছেন যে, পিট যে বাক্য বলিয়াছিলেন তাঁহার বাটলারও (ভৃত্য) তাহার বিরোধিতা করিতেছে। এই সমস্ত কাহিনীর ভিতর সার হইতেছে এই যে, "নাম ও রূপে গ্রহণযোগ্য বিশেষ কিছু নাই, তাহারা আসে ও যায়। যাহা স্থায়ী তাহা ঘটনালিপিবদ্ধকারী ঐতিহাসিককে এড়াইয়া যায়। সত্য, ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত।"

১৩

আমার পড়া—৩

একখানা ছোট মূল্যবান পুস্তক একজন প্রিয় বন্ধু পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেটির কথা বলিতে ভুলিব না। বইখানার নাম "সুপারসেনসুয়াল লাইফ," জেকব ভীমেনের লেখা। আমি ইহা হইতে কয়েকটি বিশেষ সুন্দর স্থান টুকিয়া রাখিয়াছি, সেই জন্য ইহার উল্লেখ করিতেছি। যথা :—

"আর কিছু নয় তোমারই কান ও চোখ বাধা দিতেছে, সেই জন্যই ঈশ্বরকে দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছ না।"

"যদি তুমি তোমার অন্তরতম স্বভাব হইতে শাসন না করিয়া, কেবল বাহ্যতঃ শাসন কর, তাহা হইলে তোমার শাসন পাশব ধরণের অথবা জড়।"

"তুমিই সকল দ্রব্যের ন্যায় এবং তোমার অসম কিছুই নাই।"

"যদি তুমি সকল জিনিসের সমান হইতে চাও, তবে সকল জিনিসই ত্যাগ করিতে হইবে!"

"তোমার হাত ও পা'কে কাজ করিতে দাও। তোমার চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইয়া থাকুক।"

"স্বর্গ হইতেছে—ইচ্ছা শক্তিকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের প্রেমের অভিমুখী করা।"

"নরক হইতেছে—ইচ্ছাশক্তিকে কোপের পথে লওয়া।" আমি আমার নোট বই পাল্টাইতে গিয়া দেখিতেছি যে, ইহাতে অন্য কতকগুলি বই হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃতি রহিয়াছে। সত্যাগ্রহীদের উপযোগী এই একটা—

"যাহারা ঘৃণা, পরিহাস ও গালি সহ্য করিতে পারে না এবং শান্ত থাকিয়া যে সত্য তাহাদের পালন করা উচিত তাহা হইতে বিচ্যুত হয়, তাহারাই ক্রীত-দাস।

তাহারাই ক্রীত-দাস যাহারা দুই তিনজন মাত্র লোকের সংগ লইয়া সৎপথে থাকিতে সাহস করে না।"—লোয়েল

(টম্ ব্রাউনের স্কুল-স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত)

আর একটা ঐ বিষয়েরই উক্তি উদ্ধৃত করা হইতেছে ক্লন্ড্-ফিল্ডের "ইসলামের রহস্যবাদী ও সাধু" হইতে—

শাহাজাহানের ক্রোধ হইতে সুফি শা মোলা শাকে পলায়ন করিতে বলিলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন যে, "আমি ত ভণ্ড নই যে, পলাইয়া বাঁচিব। আমি সত্যই বলিয়া থাকি। আমার কাছে জীবন ও মৃত্যু সমান। আমার আর এক জন্মেও আমার রক্তে শূল রঞ্জিত হোক্। আমি জীবন্ত, আমি শাশ্বত। আমার নিকট হইতে মৃত্যু হটিয়া যায়। আমার জ্ঞানই যে মৃত্যুকে পরাজিত করিয়াছে! যেখানে সমস্ত রং মুছিয়া যায় সেই লোকেই আমার আবাস-ভূমি।"

মনসুরী হল্লাজ বলিলেন "শৃঙ্খলিত লোকের হাতটা কাটিয়া ফেলা সহজ, কিন্তু আমার সহিত ঈশ্বরের যে যোগ তাহা ছিন্ন করা শক্ত।"

লোয়েল হইতে আর একটা উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যাঁহারা মালাবারের

আর্ত্তদিগকে দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যথোপযুক্ত মনোবৃত্তি লইয়াই দান করিতে পারিবেন।*

"আমরা আর্ত্তের জন্য যে আর্ত্তি ভাগ করিয়া লই, তাহাতেই ঈশ্বরের খাদ্য রাখা হয়। আমরা যাহা দিই তাহাতে হয় না, আমরা যে দুঃখ ভাগ করিয়া লই তাহাতেই হয়। ব্যক্তির চিত্তহীন দান—সে ত বৃথা। যে ভিক্ষার সহিত নিজেকেও দেয়, সে তিনজনকে খাওয়ায়—নিজেকে, ক্ষুধার্তকে এবং আমাকে।"

যাঁহারা অহিংসাবাদে বিশ্বাস করেন, নিম্ন উক্তি তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ় করিবে। "কাহারও মন্দ ইচ্ছা করা, মন্দ করা, মন্দ বলা, মন্দ চিন্তা করা একেবারেই সকলের পক্ষে বিনা অন্যথায় নিষিদ্ধ,"—টারটুলিয়ান।

(জে, ব্রিয়ারলি'র "আমরা ও বিশ্ব" হইতে উদ্ধৃত)

সর্ব্বশেষে আমি শিখ ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিব। এগুলি কানিংহাম, ম্যাকাউলিফ এবং গোকুল চন্দ্র নারাঙ্গের লেখা। এই বইগুলি সমস্তই তাহাদের দিক দিয়া ভাল। এখন যে শিখদের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলিতেছে, তাহা শিখদের পূর্ব্ব ইতিহাস এবং গুরুদের জীবনী না জানিলে বুঝা কঠিন। কানিংহামের বইখানায় শিখ-যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্যন্ত সহানুভূতির দৃষ্টিতে ঘটনাবলী সংগৃহীত রহিয়াছে। ম্যাকাউলিফ্-এর বইটি গুরুদিগের জীবন ইতিহাস এবং উহাতে তাঁহাদের অনেক লেখাও উদ্ধৃত করা আছে। এখানা বেশ সুন্দর ছাপা। ইংরাজের অতিমাত্র প্রশংসা থাকায় ও শিখ ধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইবার বিশেষ প্রয়াস করায় এই বইটির মূল্য কমিয়া গিয়াছে। গোকুল চন্দ্র নারাঙ্গ-এর বইটিতে ওই দুটি বইয়ে যে সকল কথা নাই তাহা দেওয়া আছে।

পাঠ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্ব্বে, আমার ছাত্র-পাঠকদের এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিব যে, নিয়মিত অনুশীলন দ্বারা কেমন করিয়া শুষ্ক জিনিসকেও রসাল করিয়া তোলা যায়। আমার নিজের ব্যবহারের জন্য ও অভ্যাসের সুবিধার জন্য আমার একখানা গীতার শব্দানুক্রমণিকা করার ইচ্ছা ছিল। শব্দগুলি নোট করিয়া তাহার স্থান লেখা ও নির্ঘণ্ট দুই দুইবার করিয়া করা বিশেষ রসদায়ক কাজ নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম যে আমি জেলে গেলে উহা করিব। আবার এদিকে ঐ কাজে অধিক সময় দিতেও আমার মন চাহিত না। আমার কর্ম্ম-তালিকায় একেবারে ফাঁক ছিল না। আমি স্থির করিলাম যে, প্রত্যহ ২০ মিনিট করিয়া সময় দিয়া যাহা করা যায় ততটা করিব। অত অল্প সময়ের জন্য ঐ কার্য্য করায় উহা ভারস্বরূপ হইত না। উপরন্তু আমি প্রতিদিন ঐ সময়ের প্রতীক্ষা করিতাম। যখন পুনরায় নির্ঘণ্ট করার সময় আসিল, তখন ত কার্য্যটা হৃদয়গ্রাহী হইয়া পড়িল। যাঁহাদের কৌতূহল আছে, তাঁহারা নিজেদের জন্য এই কাজ কেমন করিয়া করিতে হয় সে সমস্যা পূরণ করিয়া দেখিতে পারেন। প্রথম নির্ঘণ্টকালে শব্দগুলি আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজানো গেল। কিন্তু শব্দগুলি কেমন করিয়া আবার বর্ণানুক্রমিক

* এই সময় মালাবার বন্যার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হইতেছিল।

ভাবে সাজানো হইবে তাহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িল। আমি কখনো কোষ রচনা করি নাই। সেইজন্য আমাকে নিজের জন্য পথ বাহির করিয়া লইতে হইল। আমি পথ আবিষ্কার করিতে পারিয়া সন্তোষলাভ করিলাম। আর উপায়টাও এমন ছিল যে, উহা খুব রসদায়ক হইয়া পড়িল। উহা পরিষ্কার, দ্রুত ও অভ্রান্ত উপায় ছিল। এই সমস্তটা কাজে আমার প্রায় আঠার মাস লাগিয়াছিল। আমি এখন গীতার এই শব্দানুক্রমণিকা হইতে কোন্ শব্দ কোথায় কতবার ব্যবহার হইয়াছে জানিতে পারি। আর ইহার একটা অর্থও আছে। যদি গীতা-বিষয়ে আমার চিন্তা লিখিয়া ফেলিতে পারি, তাহা হইলে আমার চিন্তা ও বর্ণানুক্রমণিকা জনসাধারণকে উপহার দেওয়া যাইবে।

পরিশিষ্ট

জেলের চিঠি

আমার ইচ্ছা ছিল যে, জেলে থাকা কালে জেল-কর্তৃপক্ষের সহিত আমার যত চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আমার "জেল অভিজ্ঞতার" অংশ হিসাবে প্রকাশ করিব। আমার শরীর ভাল থাকিলে ও সময় হইলেই জেল অভিজ্ঞতা লেখার ইচ্ছা আছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে উহা লেখা সম্ভব নহে। এদিকে বন্ধুরা কাল বিলম্ব না করিয়া চিঠিগুলি প্রকাশ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আমি স্বীকার করি। সেই জন্য 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র পাঠকবর্গকে উহার কতকটা অংশ এই খণ্ডে উপহার দিতেছি। হাকিমজীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার প্রধান বিষয়গুলি পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতার বেলাতেও খাটে। তবে জেলের-কর্তৃপক্ষের প্রতি ন্যায়ের অনুরোধে একথা বলিতে হইবে যে, আমার শারীরিক সুবিধার কথা যদি ধরা যায়, তবে ক্রমশঃই অধিকতর সুব্যবস্থা করা হইতেছিল। আমার কাছে ভাই ব্যাঙ্কারকে ফিরাইয়া দেওয়ায় আমার আনন্দ হয়। হাকিমজীর চিঠিতে গণ্ডী টানিয়া আমাকে বেড়াইতে অনুমতি দেওয়ার যে কথাটার উল্লেখ করিয়াছি, পরে তাহা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল। তখন আমরা দুইজন সমস্ত আঙ্গিনাটাতেই হাঁটিতে পারিতাম। ভাই ব্যাঙ্কারের মুক্তির পর আমি কিছু না বলিতেই, তখনকার সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট মেজর জোন্স গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া আমার নিকট মিঃ মনসুর আলি সোক্তাকে সঙ্গী হিসাবে থাকিতে দেন। এই সুবিবেচনার কার্য্যে আমি খুব বাধিত হইয়াছি। মিঃ মনসুর আলি আমার কেবল প্রিয় সঙ্গীই ছিলেন না, তিনি আমার উর্দু শিক্ষকও হ'ন। অল্পকাল পরেই মিঃ ইন্দুলাল যাজ্ঞিক আসিলেন এবং আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন। মেজর জোন্স তাহার পর আমাদিগকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করেন। সেখানে বাসের বন্দোবস্ত শ্রেষ্ঠতর ছিল এবং সামনের বাগানটাও মন্দ ছিল না। মিঃ মনসুর আলি সোক্তা খালাস হওয়ার পর, মেজর জোন্সের পরবর্ত্তী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ণেল মুরে গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া মিঃ আবদুল গণিকে আমার সঙ্গী করিয়া দেন। মিঃ আবদুল গণি আমার ও মিঃ যাজ্ঞিকের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন এবং এতদুপরি তিনি উর্দু শিক্ষক হিসাবে মিঃ মনসুর আলির স্থান গ্রহণ করিয়া আমার উর্দু লেখা ভাল করার খুব চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যদি আমার অসুস্থতা এই কার্য্যে বিঘ্ন না ঘটাইত, তবে তিনি আমাকে মোটামুটি ভাবে উর্দুতে পণ্ডিত করিয়া দিতেন। আমার শারীরিক সুবিধার কথা ধরিতে গেলে, গভর্ণমেণ্ট ও জেল-কর্তৃপক্ষ আমাকে সুখী রাখবার জন্য যতটা পারেন তাহা করিয়াছিলেন। আর আমি যে মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়াছি, তাহার জন্য জেল-কর্তৃপক্ষ অথবা গভর্ণমেণ্ট—কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাকে নিজের রুচি অনুযায়ী খাদ্য পছন্দ করিয়া লইতে দেওয়া হইয়াছিল। মেজর জোন্স ও কর্ণেল

ম্যুরে এবং মেজর জোন্সের পূর্ব্ববর্তী কর্ণেল ডালজিয়েল—প্রত্যেকেই আমাকে খাদ্য সম্বন্ধে সকল বাছাবাছিই করিতে দিতেন।

ইউরোপীয়ান জেলারেরাও আমার প্রতি খুব নজর দিতেন এবং ভদ্র ব্যবহার করিতেন। আমার একটা ঘটনার কথাও মনে নাই যখন তাঁহারা রূঢ়ভাবে আমার কার্য্যে বাধা দিয়াছেন। এমন কি যখন তাঁহারা জেলের সাধারণ নিয়ম অনুসারে তল্লাসী লইতেন, আমি তাহা সন্তুষ্টচিত্তেই করিতে দিতাম। তাঁহারাও বিবেচনার সহিত, এবং অনেকটা দায়ে পড়িয়া উহা সম্পন্ন করিতেন। মানুষ হিসাবে মেজর জোন্স ও কর্ণেল ম্যুরের সম্বন্ধে আমি উচ্চ ধারণা পোষণ করি। আমি যে কয়েদী একথা তাঁহারা আমাকে কদাচ অনুভব করিতে দেন নাই।

আমার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের জেল সম্বন্ধে হৃদয়হীন নীতির যে কথা আমি হাকিমজীকে পত্রে লিখিয়াছি, সে সকল কথার কোনও পরিবর্ত্তন করার নাই। আমি ঐ পত্রে যাহা কিছু লিখিয়াছি পরবর্ত্তী ঘটনায় তাহাই আরও সমর্থিত হইয়াছে। আমি আমার জেল-অভিজ্ঞতার সবটা লিখিয়া ফেলিলে তখন পাঠক এ কথার প্রমাণ পাইবেন। এই পত্রাবলী হইতে জেল-কর্ত্তৃপক্ষ, এমন কি সরকারও, আমার শারীরিক সুখ সুবিধার ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি করিয়াছিলেন, একথা যেন পাঠকেরা না মনে করেন—এখানে ইহাই বলিতে চাই।

আমাদের ভার যে সকল কয়েদী-ওয়ার্ডারের উপর দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমাকে পাহারা না দিয়া তাহারা আমাকে ও আমার সঙ্গীদিগকে সকল প্রকারে সাহায্য করিয়াছে। ঘর সাফ্ করা ইত্যাদি কোনও কাজই তাহারা আমাদিগকে করিতে দিত না। আমি জেলের অভিজ্ঞতা লেখাকালে ইহাদের বিষয় আরো বলিব। কিন্তু এখানে গঙ্গাপ্পার নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে আমার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শুশ্রূষাকারী হইয়াছিল। তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ, আমার সকল অভাব পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া রাখার শক্তি, দিনে রাত্রে যখনই হোক্ আমাকে শুশ্রূষা করার জন্য তাহার ব্যগ্রতা, তাহার প্রেমপূর্ণ স্বভাব, তাহার নিখুঁত সততা, এবং জেলের সাধারণ নিয়ম ও প্রথা অনুসরণ করিয়া সে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি আশ্চর্য্য হই, এমন উন্নত চরিত্রের লোককে সমাজ কেমন করিয়া দণ্ড দিতে পারে, এবং গভর্ণমেণ্টই বা কেমন করিয়া এমন লোককে জেলে রাখিতে পারেন! গঙ্গাপ্পা নিরক্ষর। সে রাজনৈতিক কয়েদী নয়। তাহার খুনের অপরাধে, কি অমনি একটা কিছু অপরাধে সাজা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আর বেশী বলিব না। এ সকল কথা আমি ভবিষ্যতে বলার জন্য রাখিয়া দিলাম। গঙ্গাপ্পার ন্যায় অনেক কয়েদীকে, আমার সম্মান জানাইবার জন্যই আমি গঙ্গাপ্পার নাম এখানে উল্লেখ করিলাম।

পুণা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪
'ইয়ং ইণ্ডিয়া', ২৮শে ফেব্রুয়ারী।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

১নং পত্র

য়েরোড়া জেল
১৪ই এপ্রিল, ১৯২২

প্রিয় হাকিমজী,

কয়েদীদিগকে তিনমাসে একবার দেখা করিতে দেওয়া হয়, আর ঐ সময়ের মধ্যে একখানা পত্র লিখিতে বা একবার পত্র পাইতে দেওয়া হয়। দেবদাস ও রাজাগোপালাচারীর সহিত আমার একবার দেখা হইয়াছে। এখন একখানা চিঠি লেখার যে অনুমতি আছে, তদনুযায়ী আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি।

আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, ব্যাঙ্কারকে ও আমাকে ১৮ই মার্চ্চ শনিবার দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়। সোমবার রাত্রি ১০টার সময় আমরা সংবাদ পাইলাম যে, আমাদিগকে কোনও অজ্ঞাত স্থানে সরাইয়া লওয়া হইবে। রাত্রি ১১-৩০ মিনিটের সময় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে সবরমতী ষ্টেশনে স্পেশাল ট্রেনে তুলিলেন। রাস্তায় খাওয়ার জন্য আমাদিগকে এক ঝুড়ি ফল দেওয়া হয় এবং সমস্ত পথে আমাদের খুবই যত্ন লওয়া হয়। সবরমতী জেলের ডাক্তার, স্বাস্থ্যের জন্য ও আমার ধর্ম-প্রয়োজনবশতঃ যে খাদ্যে আমি অভ্যস্ত আমাকে সেই খাদ্যই দিয়াছিলেন এবং প্রয়োজন বলিয়া ডাক্তারি কারণে ব্যাঙ্কারকে দুধ ও রুটি দিয়াছিলেন। যে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন তিনি পথে সেই জন্য ছাগলের ও গোরুর দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

আমাদিগকে কিরকিতে নামাইয়া, একটা কয়েদীর গাড়ীতে করিয়া জেলে আনা হয়, সেই স্থান হইতেই এই পত্র দিতেছি।

পূর্ব্বকার কয়েদীদের নিকট হইতে, আমি য়েরোড়া জেলের সম্বন্ধে খারাপ অভিমত শুনিয়াছি। সেই জন্য আমার পথ কঠিন হইবে বলিয়া প্রস্তুত ছিলাম। আমি ব্যাঙ্কারকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, যদি আমার সুতা-কাটা বন্ধ করা হয়, আমাকে তবে খাওয়াও বন্ধ করিতে হইবে, কেননা আমি নূতন বৎসরে প্রতিজ্ঞা লইয়াছি যে, প্রতিদিন অন্ততঃ আধঘণ্টা করিয়া সুতা কাটিব; কেবল যখন অসুস্থ বা পথে থাকিব, তখন বাদ যাইতে পারিবে। সেই জন্য, আমাকে খাওয়া ত্যাগ করিতে দেখিলে যেন সে আহত না হয়, অথবা একটা ভ্রান্ত সহানুভূতি হইতে যেন আমার সহিত যোগ দিতে না চায়। সে আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছিল।

জেলে আমরা অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছাইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন যে, আমাদের সঙ্গে যে চরখা আছে ও যে ফল আছে তাহা লইতে পারিব না, তখন আমরা আশ্চর্য্য হইলাম না। আমি বলিলাম যে, সুতা-কাটা আমার একটা ব্রত এবং আমাদের দুই জনকেই সবরমতীতে সুতা কাটিতে দেওয়া হইত। তখন আমাদিগকে বলা হয় যে, য়েরোড়া সবরমতী নহে। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে একথাও বলিয়াছিলাম যে, আমাদের দুইজনকেই সবরমতীতে ফাঁকায় শুইতে দেওয়া হইত। কিন্তু এ জেলে তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

প্রথম অনুভব প্রীতিদায়ক হইল না। কিন্তু আমি মোটেই বিচলিত হই নাই।

সোমবারের উপবাসের পর মঙ্গলবারের অর্দ্ধেক উপবাসে আমার কোনও ক্ষতি হইল না। তবে ব্যাঙ্কারের যে অসুবিধা হইয়াছিল, তাহা আমি জানি। তাহার রাত্রে ভয় করে, কেহ কাছে শোওয়া দরকার। আর এই হয়ত তাহার জীবনে কষ্টের প্রথম অভিজ্ঞতা। আমার সম্বন্ধে আর কী বলার আছে, আমি জেলের পুরানো পাখী।

পরদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন। আমি তখন দেখিলাম যে, প্রথম অনুভূতিতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর আমি ন্যায়-বিচার করি নাই। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় তিনি তাড়াতাড়ির মধ্যে ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আমাদিগকে জেলে প্রবেশ করানো হয় এবং কাল আমার চরখা সঙ্গে লওয়ার অনুরোধ তাঁহার কাছে অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল। তিনি আজ বুঝিতে পারিলেন যে, আমার চরখা রাখার জন্য অনুরোধটা কেবল অবুঝপনা নহে, উহাতে ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, আমার ধার্ম্মিক প্রয়োজন আছে। তিনি ইহাও দেখিলেন যে, ইহাতে প্রায়োপবেশন করার প্রশ্ন উঠে নাই। তিনি হুকুম দিলেন—চরখাগুলি যেন আমাকে ফেরৎ দেওয়া হয়। তিনি ইহাও বুঝিলেন, যে খাদ্য আমাদের দুইজনকে দেওয়া হইত তাহাতে আমাদের আবশ্যক ছিল।

আমি যতদূর দেখিয়াছি, এই জেলে শারীরিক প্রয়োজনের দিকে ভাল রকমই দৃষ্টি দেওয়া হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও জেলার উভয়েই কার্য্যকুশল ও ভদ্র বলিয়া আমার মনে হয়। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার আমি কোনও মূল্য দিই না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও জেলারের সহিত আমার প্রীতির সম্পর্ক, কয়েদী ও তাহার রক্ষকের মধ্যে অন্ততঃ যতটা থাকিতে পারে, তাহা আছে।

কিন্তু এটা দেখিতে পাইতেছি যে, মানুষের মত ভাবটা এই জেলে সর্ব্বাংশে না হোক্ অনেকাংশেই অনুপস্থিত। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে বলেন যে, আমার প্রতি যে ব্যবহার করা হইতেছে, সকলের প্রতিই সেই ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

য়েরোড়ার জেল-কমিটিতে কলেক্টর, একজন ধর্ম্মযাজক ও আরও কয়েকজন লোক ছিলেন। আমাদের আসার ঠিক পরদিন ঘটনাক্রমে তাঁহারা আসেন। কমিটির সদস্যগণ আমাদের প্রয়োজন কী জানবার জন্য আসিলেন। আমি বলিলাম যে, মিঃ ব্যাঙ্কারের স্নায়বিক দুর্ব্বলতা আছে, সেই জন্য তাঁহাকে যেন আমার সহিত থাকিতে দেওয়া হয় ও তাঁহার সেল্‌টা যেন খোলা রাখা হয়। যে অবজ্ঞার সহিত ও যে হৃদয়হীনতার সহিত আমার এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। সদস্যগণ যখন আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবেন, তখন একজন বলিয়া উঠিলেন "নন্‌সেনসিকাল্" ('আহম্মুকি)। তাঁহারা মিঃ ব্যাঙ্কারের গত জীবনের কথা কিছুই জানিতেন না, অথবা তাঁহার সামাজিক অবস্থা বা চাল-চলনের কিছুই খবর রাখিতেন না। আমার কাছে যাহা একটা স্বাভাবিক অনুরোধ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে বিষয়ে খোঁজ করা ও বুঝা তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। ব্যাঙ্কারের নিকট, তাঁহার খাদ্য হইতেও, তাঁহার রাত্রিতে ভাল নিদ্রা বেশী আবশ্যক ছিল। এই দেখাশুনার এক ঘণ্টা পরেই একজন ওয়ার্ডার আসিয়া ব্যাঙ্কারকে অন্যত্র লইয়া যাওয়ার হুকুম জানাইল। মায়ের কাছ হইতে একমাত্র সন্তানকে কাড়িয়া লইয়া গেলে তাহার যেমন অবস্থা হয়,

আমি সেইরূপ অনুভব করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃই ব্যাঙ্কারকে আমার সহিত একত্র গ্রেপ্তার করা হয় এবং একত্র বিচার করা হয়। সবরমতীতে আমি জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখিয়াছিলাম যে, যদি ব্যাঙ্কারকে আমার সহিত থাকিতে দেওয়া হয়, তবে তাহা ভদ্রতা বলিয়া গণ্য করিব এবং তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের সাহায্য হইবে। আমি ব্যাঙ্কারের সহিত গীতা পড়িতেছিলাম, আর সে আমার দুর্ব্বল শরীরের যত্ন লইতেছিল। মিঃ ব্যাঙ্কারের কয়েক মাস পূর্ব্বে মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি বলেন যে, তাঁহার ছেলেকে আমার হাতে রাখিয়া মরিতে পারায় তাঁহার স্বস্তি বোধ হইতেছে। এই মহানুভব মহিলা জানিতেন না যে, তাঁহার পুত্রকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করায় আমার অক্ষমতা কত বেশী! ব্যাঙ্কার যখন আমার নিকট হইতে গেল, তখন আমি তাহাকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ করিলাম এবং তাহাকে আশ্বাস দিলাম যে, ঈশ্বর তাহাকে দেখিবেন ও রক্ষা করিবেন।

তাহার পর হইতে তাহাকে আমার নিকট আধ ঘণ্টার জন্য আসিতে দেওয়া হয়; সে ধুনিতে জানে, আমাকে ধোনা শিখাইতে আসিয়া থাকে। তাহাকে একটি ওয়ার্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে ও ধোনাই ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে কথা না হয়, সে সতর্কতা সে লয়।

আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেলকে রাজি করাইতে চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে মিঃ ব্যাঙ্করকে আমার সহিত যে কয় মিনিট থাকিতে দেওয়া হয়, তখন যেন গীতা পাঠ করিতে দেওয়া হয়। আমার এই অনুরোধ বিবেচনার অধীন রহিয়াছে।

জেল-কর্তৃপক্ষের প্রতি সুবিচারের জন্য একথা বলিতে হইবে যে মিঃ ব্যাঙ্কারের শারীরিক সুবিধার দিকে ভাল ভাবেই দেখা হইতেছে। তাহার চেহারা মোটেই খারাপ হয় নাই। তাহার সেই বিহ্বলতা কমিয়া আসিতেছে।

আমার সঙ্গে সাতখানা বই রাখার জন্য, আমার যত কিছু বাক্‌কুশলতা, তাহা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হইয়াছে। এই সাতখানার মধ্যে পাঁচখানা হইতেছে কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক, অপর দুইখানার মধ্যে একখানা পুরাতন অভিধান, যেটির আমার কাছে খুব কদর, আর একখানা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দেওয়া উর্দু শিক্ষার পুস্তক। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর কড়া হুকুম আছে যে, জেলের লাইব্রেরীর বই ছাড়া অন্য বই কয়েদীদিগকে দেওয়া হইবে না। আমাকে বই পাইতে হইলে উহা লাইব্রেরীকে দান করিয়া, পরে লাইব্রেরী হইতে আনিয়া পড়িবার সুযোগ লওয়ার অবকাশ দেওয়া হয়। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সবিনয়ে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, অন্য বহির সম্বন্ধে না হয় তাহা করা যায়, কিন্তু আমার ধর্ম্মপুস্তকগুলি উপহার স্বরূপ জেলকে দান করিয়া দেওয়া, অথবা কেহ প্রীতিভরে আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা দিয়া ফেলা, আমার কাছে ডান হাতখানা দিয়া ফেলার মতই ঠেকিবে। ঐ কয়খানা বহি আমাকে রাখিতে দিতে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও না জানি সুপারিশ করার কত কৌশল প্রয়োগ করিতে হইয়াছে।

আমাকে এখন বলা হইয়াছে যে, আমি নিজের খরচায় (পিরিয়ডিক্যাল)

সাময়িক পত্র আনিতে পারি। আমি বলিয়াছিলাম যে, সংবাদপত্রও ত পিরিয়ডিক্যাল বা সাময়িক পত্র। তাঁহার কাছে কথাটা ঠিক মনে হইলেও, তাঁহার সন্দেহ ছিল যে, সংবাদপত্র জেলের ভিতর আনিতে দেওয়া যাইবে কিনা। "বম্বে ক্রনিক্‌ল্‌" চাওয়ার মত সাহস আমার হয় নাই, কিন্তু আমি "টাইমস অফ ইণ্ডিয়া" সাপ্তাহিকখানার কথা বলিলাম। কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে উহা অত্যন্ত রাজনৈতিক বলিয়া মনে হইল। আমি "পুলিশ সংবাদ" "টিটবিট" বা "ব্ল্যাক উডে"র নাম করিলে পাইতে পারিতাম। কিন্তু এ বিষয়টা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের এক্‌তিয়ারের বাহিরে। সাময়িক বলিতে যে কী বুঝায়, তাহা হয়ত স-কাউন্সিল লাট সাহেবকে স্থির করিতে হইবে।

তারপর একটা ছুরি ব্যবহার করার কথা। আমাকে রুটি সেঁকিয়া লইতে হয়, তাহা না হইলে আমার হজম হয় না। আমাকে সেই জন্য রুটি কাটিয়া লইতে হইবে। নেবু খাইতে হইলে তাহাও আমাকে কাটিতে হইবে। কিন্তু ছুরি এক মারাত্মক অস্ত্র, কয়েদীর নিকট উহা রাখা বিশেষ বিপজ্জনক। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলি যে, তিনি আমাকে হয় ছুরি ব্যবহার করিতে দিতে পারেন, আর নয়ত আমার রুটী ও নেবু ব্যবহার করা বন্ধ করিতে পারেন। অবশেষে আমার কলম-কাটা ছুরিখানা আমাকে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইল। উহা আমার কয়েদী-ওয়ার্ডারের নিকট থাকিবে, যখনই আমার আবশ্যক হইবে, সে উহা আমাকে দিবে। প্রতি সন্ধ্যায় উহা জেলারের নিকটে যায় ও প্রতি সকালে কয়েদী-ওয়ার্ডারের কাছে আসে।

কয়েদী-ওয়ার্ডার কী পদার্থ তাহা হয়ত আপনি জানেন না। যে সকল কয়েদীর দীর্ঘ দিনের মেয়াদ, সদাচরণের জন্য তাহাদের ওয়ার্ডারের পোষাক পরিতে দেওয়া হইতে পারে এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানে কিছু দায়িত্বের কাজও থাকিবে। এই রকম একজন ওয়ার্ডার দিনের বেলায় আমার পাহারায় থাকে। সে খুনের দায়ে আসিয়াছিল। আর একজন অতিরিক্ত ওয়ার্ডার, যে রাত্রে আসে, তাহাকে দেখিয়া আমার সৌকত আলির কথা মনে হয়। যখন শেষকালে ইনস্পেক্টর জেনারেল আমার কামরা খোলা রাখার অনুমতি দিলেন, তখন এই রাত্রির অতিরিক্ত পাহারা বসানো হইল। এরা কখনো আমার কোন বিঘ্ন ঘটায় নাই। আমিও বাক্যালাপ করি না।

আমি একটা ত্রিকোণ ব্লকে আছি। এই ত্রিকোণের যে বাহুটা বেশী দীর্ঘ, তাহা পশ্চিম দিকে ও তাহাতে ১১টা সেল্‌ বা কুঠুরী আছে। এই আঙ্গিনায় একজন আরব স্টেটের (অনুমান করি) কয়েদী আছেন। তিনি হিন্দুস্থানী বলিতে পারেন না। আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ আরবী ভাষা জানি না, সেই জন্য আমাদের বাক্যালাপ প্রাতঃকালীন নমস্কার বিনিময়েই সীমাবদ্ধ থাকে। এই ত্রিভুজের পাদদেশ হইতেছে একটা বড় নিরেট দেওয়াল এবং সব চাইতে ছোট বাহু হইতেছে একটা কাঁটা-তারের বেড়া, আর তাহার পরেই একটা বড় খোলা জায়গা। এই ত্রিভুজের ভিতর একটা খড়ির দাগ টানা আছে, যাহার ওপারে আমার যাইবার অধিকার নাই। ইহাতে আমি ব্যায়ামের জন্য প্রায় ৭০ ফুট স্থান পাইতাম। ক্যাণ্টনমেণ্ট-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ খাম্বাটা একজন পরিদর্শক, তিনি পরিদর্শন করিতে আসিলে একদিন তাঁহাকে, মানুষের

মত ব্যবহারের অভাবের উদাহরণস্বরূপ ঐ সাদা খড়ির লাইনের কথা বলিয়াছিলাম। তাঁহার কাছেও এই গণ্ডী ভাল লাগে নাই এবং তিনি সেই প্রকার রিপোর্ট করেন। এখন সমস্ত দৈর্ঘ্যটাতেই আমি বেড়াইতে পারি, তাহাতে প্রায় ১৪০ ফুট হয়। আবার এখন উহার পরে যে ফাঁকা জায়গা আছে, সেইদিকে আমার নজর পড়িয়াছে। কিন্তু ওটা ব্যবহার করিতে দেওয়া, হয়ত অতিরিক্ত ভাবে মানুষের মত ব্যবহার করা হইবে। যাহাই হোক্ সাদা রেখার গণ্ডীটা যাওয়াতে, তার-কাঁটাটাকেও অন্ততঃ আমার ব্যায়ামের জন্য অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে এই প্রশ্নটা বড় গোলমেলে, তিনি এ বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য সময় লইয়াছেন।

আসল কথা এই যে, আমি হইতেছি নিঃসঙ্গ কয়েদী। আমার কাহারও সহিত কথা বলিতে নাই। ধারওয়াড়ের কতকগুলি কয়েদী এই জেলে আছেন। বেলগাঁওয়ের স্বনামধন্য গঙ্গাধর রাও, সুক্কুরের সংস্কারক ভীমরুল বেগরাজ, বোম্বাইয়ের একজন সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিত, ইঁহারা সকলেই এই জেলে আছেন। তাঁহাদের কাহাকেও আমি দেখিতে পাইনা। আমি যদি তাঁহাদের সঙ্গেই থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহাদের কী ক্ষতি হইত তাহা আমি জানি না। তাঁহারা আমার অবশ্য কোন ক্ষতিই করিতে পারিতেন না। আমরা পলাইবার ফন্দী ত করিতে পারিব না! আমরা যদি তেমন ষড়যন্ত্র করিতাম, তাহা হইলে কর্তারা ঠিক সন্তুষ্ট হইতেন! আমার মতবাদ দ্বারা তাহাদিগকে বিগড়াইয়া দেওয়ার কথা যদি ধরা যায়, তবে তাঁহারা ত আগে থেকেই বীজাক্রান্ত হইয়া আছেন। আমি কেবল তাঁহাদিগকে চরখা কাটায় বেশী উৎসাহিত করিতে পারিতাম।

আমি আমার নিঃসঙ্গতার কথা আপনাকে বলিয়াছি, কিন্তু সেজন্য আমি অভিযোগ করিতেছি না। আমি তাহাতে খুসীই আছি। স্বভাবতঃই আমি একান্তে থাকিতে ভালবাসি। নীরবতা আমাকে আনন্দ দেয়। আর আমি লেখাপড়া করিতে পারিতেছি, তাহাতে আমার তৃপ্তি হয়। বাহিরে তাহা করিতে পারিতাম না।

কিন্তু সকল কয়েদীই নিঃসঙ্গতা পছন্দ করিতে পারেন না। ইহা এত অনাবশ্যক ও এত অমানুষিক! আসল ত্রুটি হইল, ভুল শ্রেণীবিভাগে। সমস্ত কয়েদীকেই বস্তুতঃ একটা ভাগে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যত রকমের পুরুষ ও নারী জেলে আসে, তাহাতে কোনও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই, যদি তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করার অধিকার না থাকে—সুবিচার করিতে পারেন না; সেই জন্য কয়েদীদের দেহের পরিচর্য্যা করার কাজই তিনি করেন এবং দেহের ভিতরস্থ মানুষকে অবহেলা করেন।

ইহার উপর আবার একথাও ধরিতে হইবে যে, জেলগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহৃত হইতেছে, সেইজন্য জেলে আসার পরেও রাজনৈতিক কয়েদীকে উত্ত্যক্ত করার কাজ চলিতে থাকে।

আমার জেল-জীবনের বৃত্তান্ত, আমার দিনচর্য্যা জানাইয়া পূর্ণ করিব। কুঠুরীটা বেশ সুন্দর, পরিষ্কার ও হাওয়া চলাচল করে। আমি বাহিরে শুইতে অভ্যস্ত, সেই জন্য বাহিরে শোওয়ার অনুমতি দিয়া একটা বিশেষ অনুগ্রহ করা হইয়াছে। আমি প্রত্যহ ৪টায় উঠি। আশ্রমের লোকেরা শুনিয়া সুখী হইবে যে, আমি অভ্রান্ত অনুক্রমে প্রাতঃকালীন স্তোত্র আবৃত্তি করি এবং যে সকল ভজন

কণ্ঠস্থ আছে তাহাও আবৃত্তি করি। প্রাতে ৬৷৷৹টায় পড়িতে আরম্ভ করি। আমাকে আলো দেওয়া হয় না। সেইজন্য প্রাতঃকালে যখন নজর চলার মত আলো ফোটে, তখন হইতেই পড়া আরম্ভ করি। রাত্রি ৭টায় পড়া শেষ করি, কেন না তারপর বাতি না হইলে লেখাপড়া করা যায় না। রাত্রি ৮টায় নিয়মিত আশ্রম-প্রার্থনা আবৃত্তির পর শুইয়া পড়ি। আমি যাহা পাঠ করি তাহার মধ্যে রহিয়াছে—কোরাণ, তুলসী-রামায়ণ, খৃষ্ট-ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক, যেগুলি মিঃ ষ্ট্যাণ্ডিং দিয়াছিলেন এবং উর্দু শিক্ষা। এই সকল পাঠ করার কাজে ছয় ঘণ্টা যায়। সুতাকাটা ও তুলা ধোনায় ৪ ঘণ্টা দিই। যখন আমার কাছে অল্পমাত্র পাঁজ ছিল, তখন আধ ঘণ্টা করিয়া মাত্র সুতা কাটিতাম। জেল-কর্ত্তারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কিছু তুলা দিয়াছেন। তুলাটা বড়ই খারাপ, বোধ হয় নূতন ধোনা-শিক্ষার্থীর ইহাতে উপকার হইবে। আমি এক ঘণ্টা ধোনায় দিই, ৩ ঘণ্টা সুতা কাটি। অনসূয়া-বাঈ, ও পরে মগনলাল পাঁজ পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এখন আর পাঁজ চাই না। তাঁহাদের কেহ একজন কিছু সাফ তুলা পাঠাইতে পারেন। একবারে এক সেরের বেশী না হয়। আমি নিজেই নিজের পাঁজ করিয়া লইতে চাই। আমার মনে হয়, প্রত্যেক কাটুনীরই পাঁজ করিতে শিক্ষা করা দরকার। আমি একবার মাত্র দেখাইয়া দেওয়াতেই ধুনিতে শিখিয়াছি। ধোনা, সুতাকাটা অপেক্ষা কঠিন কাজ, কিন্তু শেখা সহজ।

সুতাকাটা আমাকে পাইয়া বসিতেছে। আমি যেন প্রতিদিন দীনতম লোকের নিকটে এবং তাহাতেই যেন ঈশ্বরের নিকটে পেঁৗছাইতেছি। ঐ চার ঘণ্টা আমি দিনের সর্বাপেক্ষা লাভদায়ক সময় বলিয়া মনে করি। আমার শ্রমের ফল চক্ষের সম্মুখেই দেখিতে পাই। এই চার ঘণ্টায় একটা অপবিত্র চিন্তাও আমার মনে প্রবেশ করে না। যখন আমি গীতা কোরাণ, বা রামায়ণ পড়ি, তখন মন এদিকে সেদিকে যায়, কিন্তু যখন সুতা কাটি বা ধনুক চালাই তখন মন স্থির থাকে। আমি জানি যে, সকলের ইহা হয় না, হইতে পারে না। আমি চরখাকে এই দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য-মুক্তির সহিত এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়াছি যে, ইহার প্রতি আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ হইয়াছে। আমার মনের মধ্যে এখন একটা রীতিমত দ্বন্দ্ব চলিতেছে, একদিকে সুতা-কাটা অপর দিকে পড়া। আর যদি আগামী চিঠিতে আমি লিখি যে, আমার সুতাকাটা আরও বাড়িয়াছে, তাহা হইলে আমি আশ্চর্য হইব না।

মৌলনা আবদুল বারি সাহেবকে অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন যে, তাঁহাকে আমার সহিত সুতাকাটার প্রতিযোগিতা করিতে বলি। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি কেবল সুতাকাটা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে এই মহান্ কার্য অনেকে কর্তব্য হিসাবে হাতে লইবে।

আশ্রমের লোককে জানাইয়া দিবেন, যে প্রথম পাঠখানা লিখিব বলিয়াছিলাম তাহা শেষ হইয়াছে। আমার মনে হয় যে, আমাকে ঐখানা পাঠাইয়া দিতে অনুমতি দেওয়া হইবে। আমি আশা করি, ধর্মসম্বন্ধে যে পাঠ্য লিখিব বলিয়াছিলাম তাহাও হয় ত শেষ করিতে পারিব, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহও শেষ করিতে পারিব।

সুবিধার জন্য আমি এখন তিনবার আহার না করিয়া দুইবার আহার করিতেছি। আমি যথেষ্ট পরিমাণে খাইতেছি। খাদ্য-বিষয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সর্বপ্রকার সুবিধাই

দিতেছেন। গত তিন দিন হইতে তিনি আমাকে ছাগলের দুধের মাখন যোগাড় করিয়া দিতেছেন; আমি চাপাটি নিজের মত দুই একদিনেই করিয়া লইতে পারিব।

আমাকে একেবারে নূতন দুইখানা গরম পুরু কম্বল ও একটা ছোবড়ার মাদুর ও দুইখানা চাদর দেওয়া হইয়াছে। একটা বালিশও দেওয়া হইয়াছে। উহার আবশ্যক ছিল না। আমি আমার বাড়তি কাপড় বা বই বালিশের বদলে ব্যবহার করিতাম। রাজাগোপালাচারীর সহিত কথাবার্তা বলার ফলেই বালিশ দেওয়া হইয়াছে। স্নানের জন্য আবরু আছে, প্রত্যহই তাহা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। আর একটা কামরা, অন্য আবশ্যক না থাকিলে, আমাকে কাজ করার ঘর বলিয়া দেওয়া হয়। পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা খুব ভাল আছে।

বন্ধুরা যেন আমার সম্বন্ধে মোটেই ব্যস্ত না হন। আমি একেবারে পাখীর মত আনন্দে আছি। আমি একথাও মনে করি না যে, বাহিরে থাকিলে যত কাজ করিতে পারিতাম, তাহা অপেক্ষা এখানে কম প্রয়োজনীয় কাজ করিতে পারিতেছি। এখানে থাকাতেই আমার একটা ভাল নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা হইতেছে। সহকর্মীদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটা প্রয়োজনও ছিল। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমরা একটা অখণ্ড প্রাণবন্ত সমষ্টিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছি, না এ কেবল একজনের খেলা, দুইদিনের তামাসা। আমার মনে কোনও সন্দেহই নাই। সেই জন্য বাহিরে কী হইতেছে তাহা জানার জন্য আমার ঔৎসুক্যও নাই। আমার প্রার্থনা যদি সত্য হয় যদি দীন হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে তাহা উত্থিত হইয়া থাকে, তবে আমি জানি যে, তাহার ফল আমার বিক্ষিপ্ত কর্ম অপেক্ষা শত গুণে বেশী।

দাশ মহাশয়ের স্বাস্থ্যের জন্য আমি ব্যস্ত আছি। আমি তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণীর প্রতি এই অভিযোগ করিতেছি যে, তিনি আমাকে তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবর দিতেছেন না। আমি আশা করি, মতিলালজীর হাঁপানী সারিয়া গিয়াছে।

আপনি শ্রীমতী কস্তুরী-বাঈকে বুঝাইয়া দিবেন, তিনি যেন আমার সহিত দেখা করার কথা না ভাবেন। দেবদাস যখন দেখা করিতে আসে তখন একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটে। আমকে যে সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতেছে তাহা সে সহ্য করিতে পারে না। এই গর্বিত ও অনুভূতিপ্রবণ বালক ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলে। আমি অতি কষ্টে তাহাকে শান্ত করি। তাহার বুঝা উচিত ছিল যে, আমি কয়েদী এবং সুপারিন্টেন্ডেন্টের সামনে আমার বসার কোনও অধিকার নাই। রাজাগোপালাচারী ও দেবদাসের জন্য বসার আসন দেওয়া যাইতে পারিত, দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি জানি, অসম্মান করার ইচ্ছাতেই যে ঐরূপ করা হইয়াছিল তাহা নহে। আমি মনে করি, এই প্রকার দেখা করার সময় সুপারিন্টেন্ডেন্টের তত্ত্বাবধান করা প্রথা নয়। কিন্তু ইনি কোনও ঝক্কির মধ্যে যাইতে চাহেন না। শ্রীমতী গান্ধী আসিলে আর একবার এই কাণ্ড হয়, তাহা আমি চাই না। তাহা ছাড়া আমাকে বসার একটা আসন দেওয়ার বিশেষ অনুগ্রহ করা হোক্, ইহাও আমি চাই না। আমি নিশ্চয় জানি, দাঁড়াইয়া থাকাই আমার পক্ষে শোভনীয়। আমাদের কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে, তারপর হয়ত দেখা যাইবে যে, ইংরেজ আমাদের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে এবং আন্তরিকতার সহিত, আমাদের জীবনের প্রত্যেক স্তরেই ভদ্র ব্যবহার করিবেন।

কেহ দেখা করিতে আসুক, সে জন্য আমার কোনই আগ্রহ নাই। আমি ইচ্ছা করি যে, বন্ধুগণ ও আত্মীয়রা নিজেদের সংযত রাখিবেন। তবে কাজের জন্য দেখা করা যখন আবশ্যক, তখন প্রতিকূল অবস্থা হোক্ আর নাই হোক্, দেখা করিতে হইবে।

আমি আশা করি, ছোটানি মিঞা তাঁহার দেওয়া সেই চরখাগুলি পাঁচমহল, পূর্ব খান্দেশ ও আগ্রার মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। আগ্রা হইতে যে মিশনারী মহিলা আমাকে পত্র দিয়াছিলেন তাঁহার নাম মনে পড়িতেছে না। কৃষ্ণদাসের স্মরণ থাকিতে পারে।

উর্দু শিক্ষার বহিখানা শীঘ্রই শেষ করিয়া ফেলিব। একখানা ভাল উর্দু কোষ এবং আপনার বা ডাক্তার আনসারীর পছন্দ মত কোনও একখানা বই পাঠাইলে খুসী হইব।

সৈয়বকে বলিবেন যে, তাঁহার বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। আপনি অতিরিক্ত খাটিতেছেন না, সেরূপ আশা করা অসম্ভব। আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর কাজের চাপের মধ্যেও আপনাকে সুস্থ রাখিবেন।

প্রত্যেক কর্মীর প্রতিই আমার ভালবাসা নিবেদন করিতেছি।

আপনাদের একান্ত
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

২নং পত্র

৮৬৭৭ নং কয়েদীর নিকট হইতে

বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট সমীপে—

কয়েদীর বন্ধু হাকিম আজমল খাঁর নিকট লিখিত কয়েদীর পত্র, যাহা সরকার কিছু আদেশ সহ ফেরৎ দিয়াছেন এবং যাহা য়েরোড়া জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কয়েদীর বক্তব্য এই যে, উক্ত আদেশের নকল চাহিলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন যে, কয়েদীকে উহার নকল দেওয়ার কোনও অধিকার তাঁহার নাই।

কয়েদী ঐ আদেশের একখণ্ড নকল-প্রার্থী এবং কয়েদী উহা তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে পাঠাইতে চাহেন, যেন তাঁহারা জানিতে পারেন যে, কী অবস্থায় কুশল সংবাদ সহ পত্র কয়েদী তাঁহাদের লিখিতে পারেন নাই। কয়েদী এতদ্বারা ঐ আদেশের নকল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দিতে বলার জন্য আবেদন করিতেছে।

কয়েদীর যতদূর মনে আছে, তাহাতে সরকার ঐ পত্র ঠিকানা মত পাঠাইয়া দিতে অস্বীকার করার যে হেতু দেখাইয়াছেন তাহা এই : (১) ঐ পত্রে কয়েদীর নিজের কথা ছাড়া অন্য কয়েদীর উল্লেখ আছে, (২) ঐ পত্র হইতে রাজনৈতিক বাদ-প্রতিবাদ

আরম্ভ হইতে পারে। প্রথম দফার উত্তরে কয়েদী জানাইতেছে যে, উহাতে কয়েদীর ব্যক্তিগত অবস্থা ও কুশল সম্পর্কিত প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য প্রসঙ্গ নাই।

দ্বিতীয় দফা সম্বন্ধে কয়েদী সবিনয়ে নিবেদন করিতেছে যে, প্রকাশ্য বাদ প্রতিবাদ হইবে এই আশঙ্কাকেই একজন কয়েদীর তিন মাসে একবার করিয়া তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে ব্যক্তিগত সংবাদ দেওয়ার যে অধিকার আছে, তাহা হইতে বঞ্চিত করার উপযুক্ত কারণ বলা যায় না। এই যে হেতু দেখানো হইয়াছে, ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ কয়েদীর মতে বড়ই বিপজ্জনক। উহার নির্গলিতার্থ হইল যে, ভারতীয় জেল-খানা সরকারের একটা গুপ্ত বিভাগ। কয়েদীর প্রতিবাদ এই যে, ভারতীয় জেলখানা একটা প্রকাশ্য সরকারী বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের মতই লোক-মতের সমা-লোচনার অধীন।

কয়েদী দাবী করে যে, উক্ত পত্রখানায় ব্যক্তিগত কথার প্রসঙ্গই রহিয়াছে। নিজের সম্বন্ধে সংবাদ পুরা করার জন্য, অপর কয়েদীর কথার উল্লেখ রহিয়াছে। যদি কোনও ভুল উক্তি থাকে বা অতিরঞ্জিত উক্তি দেখাইয়া দেওয়া হয়, তবে কয়েদী তাহা সংশোধিত করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু সরকার যে ভাবে বলিয়াছেন, সেই ভাবে কাটা ছেঁড়া করিয়া পত্রখানা পাঠাইলে বন্ধুদিগকে, তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ভুল ধারণা দেওয়া হইবে। সেই হেতু, যে সংশোধন আবশ্যক হইতে পারে, তাহা করাইয়া সরকার যদি ঐ পত্র পাঠাইতে না চাহেন, তবে কয়েদীও ত্রৈমাসিক কুশল সংবাদ-সহ পত্র দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করে না। গবর্ণমেণ্ট যে বাধা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা মানিয়া লইলে, পত্র লেখার অধিকারের কোনও সার্থকতা থাকে না।

য়েরোড়া জেল।
১২ই মে, ১৯২২

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

৩নং পত্র

য়েরোড়া জেল
১২ই মে, ১৯২২

প্রিয় হাকিমজী,

আমি গত ১৪ই এপ্রিল আপনাকে একখানা দীর্ঘ পত্র লিখি, তাহাতে আমার সমস্ত সংবাদ দিয়াছিলাম। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, তাহাতে দেবদাস ও শ্রীমতী কস্তুর-বাঈয়ের জন্যও সংবাদ ছিল। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি আদেশ দিয়াছেন যে, উহার প্রধান অংশ বাদ না দিলে উহা পাঠানো যায় না। সরকার কেন পাঠাইলেন না, তাহার হেতুও জানাইয়াছেন। কিন্তু সরকার সে আদেশের নকল না দেওয়ায়, তাহা আপনাকে পাঠাইতে পারিতেছি না এবং যাহা মনে আছে তাহাও আপনাকে লিখিতে পারিতেছি না।

আমি গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহারা যে হেতু দেখাইয়াছেন, তাহার সারবত্তা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। আমার পত্রে যদি কোনও ভুল বা অত্যুক্তি থাকে, তবে তাহা শুদ্ধ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি, আর আমি সরকারকে একথাও জানাইয়াছি যে, যদি কাটাকাটি না করিয়া পত্র না দেওয়া যায় তবে নিয়মানুযায়ী পত্র লেখারও আমার কোন ইচ্ছা নাই। ঐ প্রকার লেখার মূল্যও কিছু বিশেষ থাকে না। যদি সরকার তাঁহার আদেশ না বদলান, তবে আপনার বা অন্য বন্ধুদের নিকট জেল হইতে আমার এই শেষ পত্র।

আশা করি, আপনি কুশলে আছেন।

একান্ত আপনার
মোঃ কঃ গান্ধী—কয়েদী নং ৮৬৭৭

৪নং পত্র

য়েরোড়া জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সমীপে,

মহাশয়,

আমার তিনটি বিষয় কিছুদিন হইতে বিচারাধীন রহিয়া গিয়াছে।

(১) গত মে মাসে আমি হাকিমজীকে নিয়মানুযায়ী ত্রৈমাসিক পত্রখানি লিখিয়াছিলাম। যে সকল আপত্তিজনক অংশ উহাতে আছে তাহা বাদ না দিলে, সে চিঠি পাঠানো হইবে না বলা হইয়াছে। আমি, ঐ আপত্তিজনক অংশসমূহ আমার নিজের ব্যক্তিগত বিষয় বলিয়া, উহা বাদ দিতে অস্বীকার করিয়া সরকারকে লিখি যে, আমি যদি আমার নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানাইতে না পারি, তবে আমার বন্ধুদের নিকট পত্র লেখার যে অধিকার দেওয়া আছে, আমি তাহার ব্যবহার করিব না। এই সঙ্গে আমি একখানা সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিয়া আমার বন্ধুকে জানাই যে, সরকার যতক্ষণ পত্র লেখায় বাধা নিষেধ তুলিয়া না লইতেছেন, ততক্ষণ আর পত্র দিব না। এই দ্বিতীয় পত্রখানাও সরকার পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। এই দ্বিতীয় পত্রখানাও প্রথম পত্রখানারই মত আমি ফেরৎ চাহিয়াছি।

(২) কর্ণেল ডালজিয়েলের নিকট হইতে একখানা গুজরাটী পাঠ্যপুস্তক লেখার অনুমতি পাইয়া এবং উহা প্রকাশিত করার জন্য আমার বন্ধুদের পাঠাইয়া দেওয়ায় কোনও আপত্তি হইবে না জানিয়া, আমি প্রাইমারখানা লিখি। একখানা পত্র সহ ঐ বহিখানা, পত্রের ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে কর্ণেল ডালজিয়েলকে দিই। সরকার ঠিকানামত এ বহিখানাও পাঠাইয়া দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। হেতু দেখাইয়াছেন যে, কয়েদীরা যখন জেল খাটিতেছে, সে সময়ে তাহাদিগকে বই প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় না। বইয়ের উপর আমার নাম, প্রকাশক বা গ্রন্থকর্তা হিসাবে থাকে, এমত আমি ইচ্ছা করি না। যদি আমার নামের সহিত কোন প্রকারে যুক্ত না থাকিলেও বহিখানা প্রকাশ করিতে দিতে না পারা যায়, তবে উহা যেন আমাকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

(৩) সরকার অনুগ্রহপূর্বক জানাইয়াছিলেন যে, আমি সাময়িক পত্র পাইতে পারি। 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিক, 'মডার্ণ রিভিউ' কলিকাতার উচ্চাঙ্গের মাসিক ও 'সরস্বতী' হিন্দি-পত্র—এই কয়খানা পাওয়ার জন্য আমি অনুমতি চাই। কিন্তু কেবল শেষের খানার জন্য অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অপর দুই-খানার সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই। আমি সে সম্বন্ধে সরকারের সিদ্ধান্ত প্রতীক্ষা করিতেছি।

য়েরোড়া জেল
১২ই আগষ্ট ১৯২২

বিনীত
মোঃ কঃ গান্ধী

৫নং পত্র

য়েরোড়া জেল

য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে—

মহাশয়,

সরকার যে আমাকে 'মডার্ণ রিভিউ' দিতে চাহেন নাই সে সম্বন্ধে আমি জানাইতেছি যে, গত সপ্তাহে আমার স্ত্রীর সহিত যে বন্ধুরা আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিলেন যে, কয়েদীদিগকে মাসিকপত্র দেওয়া যায় এ কথা সরকার বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। যদি একথা ঠিক হয়, তবে আমি "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" নামক মিঃ ন্যাটেসান সম্পাদিত মান্দ্রাজের মাসিক পত্রখানা পাওয়ার জন্য পুনরায় আবেদন করিতেছি।

বিনীত
মোঃ কঃ গান্ধী

('ইণ্ডিয়ান রিভিউ' পত্রখানা দেওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়)

৬নং পত্র

য়েরোড়া জেল
২০ ডিসেম্বর, ১৯২২

য়েরোড়ার জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপেষু

মহাশয়,

আপনি আমাকে কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন যে, যাঁহারা আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খাঁ ও মগনলাল গান্ধীকে আমার সহিত দেখা করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

মিঃ মগনলাল গান্ধী আমার খুব নিকট আত্মীয়, আমার 'পাওয়ার অফ এটর্ণী' তাঁহার নামে রহিয়াছে এবং আমার সুতা-কাটা, তাঁত-বোনা ও কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষা-কার্যের ভার তাঁহার উপর রহিয়াছে। আমি অনুন্নত জাতির মধ্যে যে কাজ করিয়া থাকি, তাহার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে।

পণ্ডিতজী ও হাকিমজী রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে ছাড়াও, আমার সহিত ব্যক্তিগত সখ্যে বন্ধ এবং আমার শুভার্থী। আমি আশা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সরকারের নিকট হইতে জানিয়া লইবেন যে, পণ্ডিত মতিলাল, হাকিম আজমল খাঁ ও মগনলাল গান্ধীকে কেন দেখা করার অনুমতি দেওয়া হইল না।

আমি দেখিতেছি, কয়েদীদের বন্ধুদের সহিত দেখা করার সম্বন্ধে যে জেল-বিধি আছে, তদনুযায়ী উক্ত তিন ভদ্রলোক তাঁহাদের কয়েদী-বন্ধুদের সহিত দেখা করার যোগ্য।

আমার সহিত দেখা করিতে দেওয়া সম্বন্ধে সরকারের অভিপ্রায় কী তাহা যদি জানিতে পারা যায়, তবে জানিতে চাই যে, সরকারের মতে কাহাদের সহিত আমি দেখা করিতে পারি, আর কাহাদের সহিত পারি না। আর আমি ইহাও জানিতে চাই যে, সাক্ষাৎকালে, আমি রাজনৈতিক বিষয়ের অতিরিক্ত যে সকল কার্য্যের সহিত সংশিলষ্ট ছিলাম তাহার সম্বন্ধে সংবাদ জানিতে পারি কি না।

বিনীত

মোঃ কঃ গান্ধী

৭নং পত্র

য়েরোড়া জেল

২০শে ডিসেম্বর, ১৯২২

য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমীপে—

মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, সরকার আমাকে "বসন্ত" ও "সমালোচক" নামে দুইখানি মাসিক পত্র, কোনও হেতু না দর্শাইয়াই দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

সরকার কয়েদীদিগকে সাময়িক পত্র দেওয়ার জন্য যে আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তদনুযায়ী এই প্রত্যাখ্যান পাইয়া আমি আশ্চর্য হইয়াছি! আমি যতদূর জানি, সরকারের আদেশ হইতেছে এই যে, যাহাতে চলতি রাজনৈতিক সংবাদ থাকে না সেই প্রকার সাময়িক পত্র দেওয়া হইবে। আমি "সমালোচক" পত্রখানার সহিত তত পরিচিত নহি। কিন্তু আমি "বসন্ত" পত্রখানার সহিত সুপরিচিত। সমাজ-সংস্কারক বলিয়া সুবিখ্যাত রাও বাহাদুর রমণ ভাই সম্পাদিত, গুজরাটী সাহিত্যের এই আদর্শ পত্রিকাখানাতে, যাঁহারা কোনও না কোনও রকমে সরকারের সহিত সম্পৃক্ত, তাঁহারাই

প্রধানতঃ লিখিয়া থাকেন। রাজনৈতিক ঘটনাকে রাজনীতি হিসাবেই আলোচিত হইতে, অথবা রাজনৈতিক সংবাদ ইহাতে থাকিতে আমি দেখি নাই। তবে হইতে পারে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের প্রত্যাখ্যানের অন্যরূপ হেতু আছে, অথবা "বসন্ত" ও "সমালোচক" কাগজ দুইখানাই এখন রাজনৈতিক হইয়া গিয়াছে। আপনি কি দয়া করিয়া ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যানের হেতু জানিয়া লইবেন? আমি এইটুকু জানাইয়া রাখিতে চাই যে, যদি আদেশের পরিবর্তন না করা হয়, তাহা হইলে গুজরাটি সাহিত্যের সহিত আমার সংস্পর্শ রাখার সুযোগ হইবে না।

আপনার একান্ত অনুগত
মোঃ কঃ গান্ধী

৮নং পত্র

য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল।
৪-২-২৩

সুপারিন্টেন্ডেন্ট, য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আপনি গতকাল আমাকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল আমার ২০শে ডিসেম্বরের পত্রের জবাবে জানাইয়াছেন—কয়েদীদের সাক্ষাৎ করার সম্বন্ধে জেল-বিধির অনুশাসন অনুযায়ী আপনার হাতেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া রহিয়াছে।

এই জবাবে আমি চকিত হইয়াছি এবং আমার স্ত্রী ও শ্রীমতী ধীমতরাম গত ২৭শে জানুয়ারী আমার সহিত দেখা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথা উহার বিপরীত।

আমার স্ত্রী বলেন যে, সাক্ষাতের প্রার্থনা সম্পর্কে আবেদন করিয়া তাঁহাকে উত্তরের জন্য ২০ দিন অপেক্ষা করিতে হয়। আমার অসুস্থতার জনরব শুনিয়া, তিনি আমাকে দেখার আশায় পুনায় আসিয়াছিলেন। এই জন্য গত সপ্তাহের প্রথম ভাগে তিনি, শ্রীমতী বসুমতী ধীমতরাম, মিঃ মগনলাল গান্ধী, তাঁহার ১৪ বৎসরের কন্যা রাধা ও ছগনলাল গান্ধীর পুত্র ১৮ বৎসর বয়স্ক প্রভুদাসকে লইয়া, দেখা করিতে জেল-গেটে উপস্থিত হন। প্রভুদাসের পিতাও সাক্ষাৎ করার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু অসুস্থ বলিয়া আসিতে পারেন নাই। আমার স্ত্রী জেল-দরজায় আসিয়া দেখা করার আবেদন করেন। আপনি তাঁহাদের বলেন যে, আপনার দেখা করিতে দেওয়ার অধিকার নাই এবং আপনি তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দরখাস্ত সরকারের নিকট পাঠাইয়াছেন এবং তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। মগনলাল বিশেষ অনুরোধ করায় আপনি বলেন যে, আপনি ইনস্পেক্টর জেনারেলের নিকট টেলিফোন করিয়া জানিয়া লইবেন। আপনি হয়ত অনুমতি আনিতে পারেন নাই, কেননা তাঁহারা দেখা না করিতে পারিয়া ফিরিয়া যান।

গত মাসের ২৭শে আমার স্ত্রী বলেন—আপনি তাঁহাকে টেলিফোন করিয়া জানান যে, আপনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই মর্ম্মে জবাব পাইয়াছেন যে, তিনি এবং আর ৩ জন, যাঁহাদের নাম প্রথম দরখাস্তে ছিল, তাঁহারা দেখা করিতে পারেন। ইহাতে ছেলে মেয়ে দুইটী, রাধা ও প্রভুদাস বাদ যায়।

যদি আপনার নিজ ইচ্ছামত দেখা করিতে দেওয়ার অধিকার সরকার আপনাকে দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উপরে যে সব ঘটনার কথা লেখা হইল, সেগুলি পুনরায় পাল্টাইয়া দেখিতে হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি আমার স্ত্রীর কথা বুঝিতে ভুল করি নাই। তাহা ছাড়া, যদি আপনার ইচ্ছামতই হইত তাহা হইলে রাধা ও প্রভুদাস বাদ পড়িত না।

যদি আপনি, সরকারের জবাব ও আমার স্ত্রীর উক্তির ভিতর গোলটা কোথায় তাহা দেখাইয়া দেন ও আমার নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির জবাব দেন তবে বাধিত হইব।

(১) গতবৎসর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, হাকিম আজমল খাঁ ও মগনলাল গান্ধীকে আমার সহিত দেখা করিতে না দেওয়ার কারণ কী?

(২) ভবিষ্যতে কাহাকে আমার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে, কাহাকে হইবে না?

(৩) এই প্রকার সাক্ষাৎকালে, রাজনীতির বহির্ভূত আমার অন্যান্য কার্য্য, যাহা আমার প্রতিনিধিরা চালাইতেছেন, সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে পারা যাইবে কিনা?

যদিও আমি একথা বিশ্বাস করিতে চাই না যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের সহিত যে ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা অপমানজনক।

আমি আশা করিব, এইরূপ ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না।

আপনার একান্ত অনুগত
মোঃ কঃ গান্ধী

৯নং পত্র

যেরোড়া জেল
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩

প্রিয় মিঃ জোন্স,

এখানা ব্যক্তিগত পত্র। কেননা, ইহাতে যাহা লিখিতেছি তাহা আমার কয়েদী-সত্তার বাহিরের জিনিস। আর যদি আপনি মনে করেন যে, আপনি ইহা সরকারী পত্র বলিয়া না মানিয়া পারেন না, তবে অবশ্য সে ভাবেও লইতে পারেন।

গতকাল প্রাতঃকালে আমি আর্ত্ত চীৎকার শুনিতে পাই। আশেপাশের কতক-গুলি লোক চাবুক মারা হইতেছে বলিয়া চেঁচাইতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে, ৪।৫ জন চটের পোষাক পরা যুবককে মার্চ্চ করাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে।

একজনের পিঠ খোলা ছিল। তাহারা সকলেই খুব ধীরে ধীরে ও উপুড় হইয়া চলিতেছিল। দেখিলাম তাহারা ব্যথায় কাতর। তাহারা আমাকে নমস্কার করিল। আমি প্রতি নমস্কার করিলাম। আমি ধরিয়া লইলাম যে, ইহাদিগকেই চাবুক মারা হইয়াছে। সেই দিনই, আমি একজন সম্ভ্রান্ত লোককে বেড়ী লাগানো অবস্থায় যাইতে দেখি। তিনি নমস্কার করিলেন। আমার নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াও আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কে। তিনি বলিলেন—তিনি মুলসীপেটার লোক। আমি জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কি কষাহত লোকদের জানেন? তিনি বলেন যে, তিনি সকলকেই জানেন, তাহারা সকলেই মুলসীপেটার লোক।

এই চিঠি লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা কাজ করিতে চাহিতেছে না তাহাদের সহিত দেখা করার অনুমতি আমি পাইতে পারি কি না, তাহাই জানিয়া লওয়া। যদি আমি দেখি যে, তাহারা ভুল করিয়া, বা বিচার না করিয়া ঐ প্রকার করিতেছে, তবে তাহাদের সব কিছু পুনরায় বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতে চাই এবং অনুরোধ করিয়া হয়তো কৃতকার্য্য হইতে পারি। সত্যাগ্রহ কয়েদীদের সমস্ত জেল-আইন পালন করিতে বলে, প্রদত্ত কাজ করিতে ত অবশ্যই বলে। বস্তুতঃ সত্যাগ্রহী জেলে আসিলেই তাহার প্রতিরোধের অবসান ঘটে। বিশেষ হেতুতে, যেমন, ইচ্ছাকৃত-ভাবে হীন ব্যবহার করা হইলে প্রতিরোধ পুনরায় আরম্ভ করা যাইতে পারে। যদি উহারা নিজেদের সত্যাগ্রহী বলিতে চায়, তবে এ সকল কথা আমি উহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

আমি জানি যে, সাধারণতঃ কয়েদীদের জেলের পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করিতে, কী মধ্যস্থতা করিতে দেওয়া হয় না। আমার এই পত্রের অনুরোধের অনুকূলে উত্তর আশা করার একমাত্র হেতু এই যে, ইহা সাধারণ মনুষ্যত্বের কাজ। আমি জানি যে, যদি কোনও প্রকারে সম্ভব হয় তবে, আপনি যাহাতে কষাঘাত না করিয়া চলে তাহাই করিবেন। আমি তাই একটা সম্ভাবনার বিষয় বিনীতভাবে আপনাকে জানাইতেছি। আমার এই প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করিলে আমি বাধিত হইব।

বিনীত
মোঃ কঃ গান্ধী

১০নং পত্র

য়েরোড়া জেল
১২ই ফেব্রুয়ারী

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আমি এইমাত্র শুনিলাম যে, মিঃ জয়রামদাস জন কতক মুলসীপেটাকয়েদীর সহিত কথা বলার জন্য দণ্ডিত হইয়াছেন। আমি দণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া

এই পত্র লিখিতেছি না। আমি লিখিতেছি এই অনুরোধ করিয়া যে, যেন আমাকেও সমান অথবা অধিকতর দণ্ড দেওয়া হয়। আমার এই অনুরোধে কলহের ভাব নাই। যদি বলা যায়, বলিব, আমি ধর্ম্মভাব হইতেই ইহা লিখিতেছি। কেননা, নিয়মভঙ্গটা বস্তুতঃ জয়রামদাস অপেক্ষা আমার দ্বারাই বেশী হইয়াছে। আমি জয়রামদাসকে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যেন কোনও মুলসীপেটার লোক পাইলে তাহাকে বলেন যে, যদি তাহারা সত্যাগ্রহী হয়, তবে তাহারা কাজ করিতে অস্বীকার করিতে পারে না। আমার কোনও অনুরোধ জয়রামদাস প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না। আপনি তাঁহার সহিত যদি আজ দেখা করেন, তবে তিনি সকল কথা আপনাকে বলিবেন। আমি তাঁহাকে এইরূপই উপদেশ দিয়াছি। আর আমাদের মধ্যে যে কথা হইয়াছে, তাহা আমি কালই আপনাকে বলিতাম। কাল বলিতাম, কেননা আমার মৌনদিবস বলিয়া সোমবার আপনি আমাকে দেখিতে আসেন না। আমি আপনাকে নিশ্চয় করিয়া জানাইতেছি যে, আমি শাস্তি পাইলে তাহা ভুল বুঝিব না। বস্তুতঃ যদি অপরাধই হইয়া থাকে, তবে বেশী অপরাধী আমি। আমি সাজা না পাইয়া কম অপরাধী সাজা পাইলে, আমি দুঃখিত হইব।

বিনীত
মোঃ কঃ গান্ধী

(সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই পত্রের উত্তরে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং বলেন যে, তাঁহার জয়রামদাসের প্রতি কোনই ক্রোধ নাই। যাহা জয়রামদাস করিয়াছেন, তাহা খোলাখুলি ভাবেই করিয়াছেন। কিন্তু জেলের বিধান ভঙ্গ করার দরুণ, তাঁহাকে সাজা না দিয়া উপায় নাই। আমি প্ররোচিত করিয়াছি বলিয়া তিনি সাজা দিতে পারেন না। আমি আমার ওয়ার্ড ছাড়িয়া সত্যাগ্রহীদের সহিত কথা বলিতে যাই নাই, সেই জন্য তিনি আমাকে সাজা দিতে পারেন না। জয়রামদাস মুলসীপেটার লোকদের সহিত কথা বলায় একটা বিশ্রী ব্যাপার কিছু ঘটিতে পারে না।)

১১নং পত্র

য়েরোড়া জেল
১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আমি দেখিতেছি যে, কয়েকজন মুলসীপেটার কয়েদীকে কষাঘাত করা হইয়াছে। তাহারা কাজ করিতে চায় নাই এবং ইচ্ছা করিয়া কম কাজ করিতেছে, ইহাই হেতু।

যদি তাহারা সত্যাগ্রহী হয়, তবে জেলের নিয়ম অবমাননাকর বা অন্যায় না হইলে তাহা পালন করিতে বাধ্য এবং তাহাদের যে কাজ দেওয়া হয় তাহা

সাধ্যানুযায়ী সম্পন্ন করিতেও তাহারা অবশ্যই বাধ্য। সেইজন্য যদি তাহারা কাজ না করিতে চায়, অথবা তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ না করে, তবে জেলের নিয়ম ভংগ করা ছাড়াও, নিজেদের সদাচরণের যে নিয়ম তাহারা গ্রহণ করিয়াছে তাহাও ভাঙ্গা হয়। আমার নিশ্চয় মনে হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ যদি বেত্রাঘাত না করিয়া তাহাদের অনুরোধ করিয়া কাজ করাইতে পারেন তবে বেত্রাঘাত করিবেন না, এবং তাঁহারা ইহাও চাহেন যে, কয়েদীরা সাজার ভয়ে কাজ না করিয়া যুক্তি মানিয়াই চলিবে। আমার মনে হয়, লোকগুলি আমার কথা শুনিবে। আমি সেইজন্য আপনাকে অনুরোধ করি যে, আপনার সমক্ষে, মুলসীপেটার যে সমস্ত লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক জেলের নিয়ম ভাঙ্গে তাহাদের সহিত আমাকে দেখা করিতে দেওয়া হোক্। তাহা হইলে তাহারা যদি নিজেদের সত্যাগ্রহী বলে, তাহাদের কর্ত্তব্য কী তাহা বুঝাইয়া দিতে পারি।

আমি জানি, কয়েদীদের সাধারণতঃ জেল-ব্যবস্থায় সাহায্য করিতে অথবা জেল পরিচালনার কাজে মধ্যস্থ হইতে দেওয়া হয় না। কিন্তু উপরোক্ত ঘটনায়, মনুষ্যত্বের দাবীর প্রয়োজনে, জেলের দৈনন্দিন কাজ চালাইবার রীতি অন্যথা করা যায় বলিয়া আমি মনে করি।

বিনীত

মোঃ কঃ গান্ধী

(ইহার উত্তরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন যে, সরকার আমাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন। কিন্তু উহা তাঁহারা গ্রহণ করিতে অসমর্থ।)

মোঃ কঃ গান্ধী

১২নং পত্র

য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল :
২৩শে ফেব্রুয়ারী

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আজ আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমার এই মাসের ৪ঠা তারিখের পত্রের উত্তরে সরকার বলিয়াছেন যে, আমার স্ত্রীর অসুবিধা হওয়ার জন্য সরকার দুঃখিত এবং আমার চিঠির অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে সরকারের বক্তব্য হইল, সরকার কয়েদীর সহিত সাধারণভাবে জেল-নিয়ম লইয়া আলোচনা করিতে পারেন না। আমার স্ত্রীর অসুবিধার জন্য সরকারের দুঃখ করার সৌজন্য আমার নিকট প্রীতিকর বোধ হইয়াছে।

আমার চিঠির অন্য বিষয়ের উত্তরে সরকার যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, কয়েদী বলিয়া আমি যে জেলের নিয়ম লইয়া আলোচনা

করিতে পারি না, তাহা আমি জানি। সরকার যদি আমার ৪ঠা তারিখের পত্রখানা আবার পড়েন, তবে দেখিবেন যে, আমি জেল-নিয়ম আলোচনা করিতে চাই নাই। বরঞ্চ আমার ভবিষ্যৎ আচরণের জন্য ও আমার মঙ্গলের জন্য, জেলের কোনও বিশেষ নিয়মের প্রয়োগ সম্বন্ধে খবর জানিতে চাহিয়াছি। আমি ধরিয়া লইতেছি যে, কয়েদী এই প্রকার সংবাদ চাহিতে ও পাইতে পারে। যদি আমাকে ভবিষ্যতে আমার স্ত্রী অথবা বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে হয়, তবে আমার জানা দরকার যে, কাহার সহিত আমি দেখা করিতে পারি, কাহার সহিত পারি না। তাহ হইলে আশা-ভঙ্গ হইতে হয় না, অথবা সম্ভবতঃ হীন আচরণও পাইতে হয় না।

আমার অবস্থাটা আমি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে চাই। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার অনেক বন্ধু আছেন, যাঁহারা আমার আত্মীয়দের সমানই আপনার। আমার কাছে যে সব বালকরা বড় হইতেছে, তাহারা আমার ছেলেদেরই মত। আমার এমন সহকর্ম্মীও আছেন, যাঁহারা আমার সহিত একই গৃহে বাস করেন এবং আমার রাজনীতির বাইরের কর্ম-ক্ষেত্র বা পরীক্ষার সহিত যাঁহারা যুক্ত। আমার স্ত্রীর সহিত স্ত্রী বলিয়াই দেখা করি না, তিনি আমার সহকর্ম্মী বলিয়াই প্রধানতঃ দেখা করি। আর যাঁহাদের সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাদের সহিত রাজনীতির বাহিরে আমার অন্যান্য কর্মোদ্যোগ লইয়া যদি না কথা বলিতে পারি, তবে ঐ সাক্ষাতে আমার কোনও আগ্রহ থাকে না। তাহা ছাড়া কেন পণ্ডিতজী, হাকিমজী এবং মিঃ মগন লালকে আমার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইল না, তাহাও জানার আমার আগ্রহ হয়। তাঁহারা যদি অভদ্র আচরণ করিতেন, অথবা আমার সহিত রাজনৈতিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বাদ দেওয়ার কারণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু নাম করা যায় না, এমন কোনও কারণে তাঁহাদিগের দেখা করিতে দিতে যদি বাধা দেওয়া হইয়া থাকে, তবে অন্ততঃ আমার স্ত্রীর সহিত দেখা করাটা আমি বন্ধ করিতে পারি। আত্মসম্মান ও ভদ্রতা সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা, আমার ইচ্ছা, সরকার তাহা জানিয়া রাখুন এবং তাঁহারা যেন তাহার মর্যাদা রাখেন।

আমার কাহারও সহিত রাজনৈতিক আলোচনা করার ইচ্ছা নাই, রাজনৈতিক সংবাদ পাঠাইতে ত ইচ্ছা নাই-ই। সরকার ইচ্ছা করিলে, যাঁহাকে ইচ্ছা এই সাক্ষাৎকার কালে আমাদের সামনে রাখিতে পারেন; আর যদি সরকার ইচ্ছা করেন, তবে আমাদের কথোপকথনের সর্টহ্যাণ্ড নোটও লওয়াইতে পারেন। তবে কারাগারের নিয়মের বহির্ভূত কোনও কারণে যদি আমার বন্ধু ও আত্মীয়দের দেখা করিতে দিতে অস্বীকার করা হয়, তবে আমি তাহার সম্ভাবনা বন্ধ করিতে চাহিলে আমাকে মার্জনা করিতে হইবে। আমার অবস্থা আমি স্পষ্ট করিয়া খুলিয়া বলিয়াছি। গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে এই পত্র চলিতেছে। আমি সরকারকে, ছেঁদো কথা না বলিয়া একটা সোজা জবাব শীঘ্র দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত
মোঃ কঃ গান্ধী

১৩নং পত্র

য়েরোড়া সেন্ট্রাল কারাগার
২৩শে ফেব্রুয়ারী,১৯২৩

সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, আমার গত মাসের ৪ঠা তারিখের পত্রের জবাবে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল বলিতেছেন যে, আমাকে 'বসন্ত' ও 'সমালোচক' নামে পত্রিকা দুইখানি দেওয়া যায় না। আমি বিনীতভাবে বলিতেছি যে, সে কথা ঐ চিঠি লেখার পূর্বেই আমি জানিতাম। যদি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল ঐ চিঠি আবার পড়াইয়া লন তবে দেখিবেন যে, আমি সেকথা জানিতাম এবং আরো দেখিবেন যে, আমি না দেওয়ার হেতু জানিতে চাহিয়াছিলাম। ঐ পত্রে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, ঐ পত্রিকাগুলিকে, চল্‌তি রাজনৈতিক সংবাদ থাকে বলিয়াই কি বন্ধ করা হইল, অথবা অন্য কোনও কারণে বন্ধ করা হইল। আমি আমার অনুরোধ পুনরায় বিনীত ভাবে জ্ঞাপন করিতেছি এবং শীঘ্র উত্তর পাইলে বাধিত হইব।

বিনীত—
মোঃ কঃ গান্ধী

১৪নং পত্র

য়েরোড়া সেন্ট্রাল কারাগার

সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়াছেন যে, ইন্সপেক্টর জেনারেল আমার ২৩শে তারিখের পত্রের জবাবে জানাইয়াছেন যে, 'বসন্ত' ও 'সমালোচক' সম্বন্ধে অভিমত উপযুক্ত ক্ষমতা-সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ দিয়াছেন এবং আমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে, সরকারের পূর্বের চিঠির শেষ প্যারা দেখিতে বলিয়াছেন।

এবার ইন্সপেক্টর জেনারেল দ্রুত উত্তর দেওয়ায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, কিন্তু তিনি যে ধরণ লইয়াছেন সে জন্য বড়ই দুঃখানুভব করিতেছি। সরকার যে, কোন্ পত্রিকা দেওয়া হইবে তাহা স্থির করার অধিকারী, সে বিষয়ে আমি কখনো প্রশ্ন করি নাই এবং সরকারের পূর্বের পত্রের শেষ অংশে যাহা আছে, তাহা দেখিতে বলাতেও আমার কিছুই বোধগম্য হইল না। তাহাতে এই কথাই আছে যে, কয়েদী সরকারের সহিত জেল-আইন লইয়া তর্ক করিতে পারে না। আমি ত ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের সঙ্গে তেমন কিছু করি নাই! আমি কেবল তাঁহার অভিমতের হেতু

জিজ্ঞাসা করিয়াছি। আমি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যখন তিনি এখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তখন তিনি আমার হইয়া 'মডার্ণ রিভিউ' চাহিয়াছিলেন এবং গবর্ণমেণ্টও উহা না দেওয়ার হেতু জানাইয়াছিলেন। আমি একথা বলিতে চাই যে, বর্তমান বিষয়টাও উহা হইতে কোনও ক্রমেই ভিন্ন নহে।

তাহা ছাড়া, ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল আমার সহিত কথা-বার্তার ফলে নিশ্চয়ই জানেন যে, এই ধরণের পত্রিকা দেওয়ায় অস্বীকৃতি, আমি ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া সাজার উপর অতিরিক্ত সাজা বলিয়া গণ্য করি। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাজা দেওয়া হইলেও, সাজা পাওয়ার হেতু জানিতে পারা দরকার।

ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনপূর্ব্বক, আমি বিনীত নিবেদন করিতেছি যে, সরকার যাহাদের জেলে আনেন, ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল তাহাদের প্রতি এমন দায়িত্বহীন স্পর্দ্ধার মনোভাব পোষণ করিতে পারেন না। তিনি যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, তখন তিনি আমাকে এই কথাই ভাবিতে শেখান যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে জেল আইন সন্দেহাতীতভাবে বলবৎ রাখা যেমন তাঁহার কাজ, কয়েদীদের যে অধিকার আছে তাহা যাহাতে বজায় থাকে, সেটা দেখাও তেমনি তাঁহার কাজ। তিনি আমাকে ইহাও ভাবিতে শেখান যে, জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েদীদের অভিভাবক স্থানীয়। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল হইতেছেন কয়েদীদের উচ্চতর অভিভাবক এবং সেই কারণে কয়েদীদের ন্যায্য অধিকারের জন্য, যখন সরকার কয়েদীদের স্বার্থের দিকে নজর দেন না, তখন সরকারের কাছে তিনিও জেদ করিতে পারেন। কয়েদীও প্রত্যাশা করে যে, তিনি কয়েদীর ন্যায়-প্রশ্ন না এড়াইয়া তাহাকে যথা-সম্ভব ন্যায্য কারণ দিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

এই পত্র ব্যবহার চালাইতে আমার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু ঠিক হোক্ আর ভুলই হোক্, আমার ধারণা যে, কয়েদীদেরও কতকগুলি অধিকার আছে, যেমন স্বচ্ছ হাওয়া, জল, খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকার। তেমনি আমারও, যে মানসিক খাদ্যে আমি অভ্যস্ত তাহা পাওয়ার অধিকার আছে। আমি কোনই অনুগ্রহ চাইতেছি না। আর যদি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল মনে করেন যে, কোনও একটা দ্রব্য বা সুবিধা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তবে তাহা প্রত্যাহার করিতে পারেন। কিন্তু এই পত্রিকা পাওয়াটা আমি উপযুক্ত খাদ্য পাওয়ার মত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আমি সেই জন্য সবিনয়ে তাঁহাকে জানাইতেছি যে, তিনি যেন আমার উহার কারণ জানিতে চাহিয়া আবেদন করাকে, দুর্ভাগ্যক্রমে এতদিন তাঁহার পত্রে যে, মনোভাব প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে, সেই প্রকার ঔদাসীন্যের সহিত না তাহা দেখেন।

বিনীত

মোঃ কঃ গান্ধী

(ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল কর্ণেল ডালজিয়েল অতঃপর নামিয়া আসেন এবং জবাব দেন যে, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।—মোঃ কঃ গান্ধী)

১৫নং পত্র

য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল
১৬ই এপ্রিল

সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার সহিত আজ দেখা করিতে আসিয়াছে। আমার গত ২৩শে ফেব্রুয়ারীর চিঠির কী উত্তর দিয়াছেন, তাহা যদি দেখা সম্ভব হয়, তবে দেখিতে চাই। সেই জবাব হইতে বুঝিব যে, আমার পত্রের মর্ম্ম অনুযায়ী আমার ছেলের সহিত দেখা করা উচিত কিনা। আপনি জানেন, আজ আমার মৌন দিন। বেলা ২ টার সময় মৌনতা ভাঙ্গিবে।

বিনীত
মোঃ কঃ গান্ধী

(ঐ পত্র আদানপ্রদানের ফলে সরকার অবশেষে এই কারণ দর্শান যে, সাধারণের হিতকল্পে সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতে আমি কাহারও সহিত দেখা করিতে চাই, তবে আমি নাম দিলে সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট সেগুলি সরকারের নিকট পাঠাইবেন। শেষ পর্য্যন্তও, যাঁহারা আমার সহিত দেখা করিতে চাহিতেন, তাঁহাদের সকলের নাম সরকারের নিকট পাঠানো হইত। সরকার অস্বীকার করা সত্ত্বেও, আমার বেলায়, আর যাহারা আমার সহিত থাকিত তাহাদের বেলায়, সাক্ষাৎ করিতে দেওয়ার ক্ষমতা সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের ছিল না—আর সকলের বেলাতেই তাঁহার এই ক্ষমতা ছিল।)

মোঃ কঃ গান্ধী

১৬নং পত্র

য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল
১লা মে, ১৯২৩

সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, য়েরোড়া সেন্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আপনি অনুগ্রহ করিয়া, কয়েদীকে স্পেশ্যাল ডিভিসনে ভাগ করার নিয়ম দেখাইয়াছেন এবং আমি স্পেশ্যাল ডিভিসনে আছি, একথা জানাইয়াছেন। আমার মত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী এখানে আরও আছেন, যেমন শ্রীযুত কাউজলগী, জেরামদাস, ভানসালী, যাঁহারা আমার চাইতে কিছু বেশী অপরাধী নহেন এবং যাঁহারা বাহিরে থাকা কালে আমার অপেক্ষা সমাজে হয়ত শ্রেষ্ঠতর স্থান অধিকার করিতেন এবং যাঁহারা নিশ্চয়ই, আমি যে জীবনে অভ্যস্ত তদপেক্ষা অনেক

আরামের জীবন যাপন করিতেন। এই সব কয়েদী স্পেশ্যাল বিভাগে না থাকিলে, জেলের ঐ বিধানের সুযোগ লইবার সুবিধা থাকিলেও, আমি উহা গ্রহণ করিতে পারিব না। আমার নাম স্পেশ্যাল বিভাগ হইতে কাটিয়া দিলে সুখী হইব।

বিনীত
মোঃ কঃ গান্ধী

১৭নং পত্র

য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল
২৮শে জুন, ১৯২৩

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আজ প্রাতে শুনিলাম যে, ছয়জন মুলসীপেটা-কয়েদীকে কম কাজ করার জন্য বেত্রাঘাত করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ঐ 'অপরাধেই' আর একজন কয়েদীকে চাবুক মারা হইয়াছে। আজিকার সংবাদ আমাকে বিচলিত করিয়াছে এবং আমার মনে হইতেছে, ইহার ফলে আমি কিছু একটা করিয়া বসিতে বাধ্য হইতে পারি। কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি কিছুই করিতে চাই না। আর, কিছু করার পূর্ব্বে, আপনার প্রতি আমার কর্ত্তব্য বশতঃ, আমি এই সাজা দেওয়ার সম্বন্ধে ঠিক খবরটা আপনার নিকট হইতে জানা দরকার মনে করি। এতদ্বারা তাহাই জানিতে চাহিতেছি।

আমি জানি যে, কয়েদী হিসাবে আমার এইপ্রকার সংবাদ জানিতে চাওয়ার কোনও অধিকার নাই। কিন্তু মানুষ হিসাবে ও জন-সেবক হিসাবে আমি এই সংবাদ চাই।

বিনীত
মোঃ কঃ গান্ধী

১৮নং পত্র

য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল
২৯শে জুন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

মহাশয়,

গতকাল মুলসীপেটার কয়েকজন কয়েদীকে চাবুকমারা সম্বন্ধে আপনাকে যে পত্র দিয়াছিলাম, তদুত্তরে সমস্ত সংবাদ দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে ও ইনস্পেক্টর জেনারেলকে ধন্যবাদ দিতেছি।

আপনার স্মরণ আছে যে, কয়েকমাস পূর্ব্বে ঐ সাজা আর কয়েকজন

মুলসীপেটা কয়েদীকে দেওয়া হইয়াছিল। তখন আমি সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, উহাদিগকে জেলের নিয়মানুবর্ত্তিতা বুঝাইবার জন্য আমাকে যেন উহাদের সহিত মিশিতে দেওয়া হয়।

গবর্ণমেণ্ট আমার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ দিয়া, আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন ঐ বিষয় লইয়া আর আমি পীড়াপীড়ি করি নাই। সে কেবল এই আশায় যে, আর হয়ত ঐ কয়েদীদিগকে চাবুক-মারার ঘটনা ঘটিবে না। কিন্তু আমার আশা সফল হয় নাই এবং আমি যে বারের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পরও একাধিকবার চাবুকমারা হইয়াছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, যদি আমি কয়েদীদের সহিত দেখা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কারাবাসকে ঠিকভাবে গ্রহণ করার জন্য তাহাদের বুঝাইতে পারিতাম। তাহা ছাড়া, তাহারা কাজ করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া যে কথাটা শুনি, সে সম্বন্ধেও কথা বলিতে পারিতাম। সময় সময় যাহাতে আমি ঐ প্রকার বুঝাইতে পারি, সেজন্য আমাকে তাহাদের সঙ্গে থাকিতে দিতে অনুরোধ করি। যদি তাহা সম্ভব না হয়, তবে যতবার দরকার হয়, কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাই।

আমি জানি যে, কয়েদী হিসাবে এই প্রকার অনুমতি আমি চাহিতে পারি না; কিন্তু আমি সসম্মানে জানাইতেছি যে, আমি মানুষ হিসাবে মানুষকে সেবা করার জন্য এইপ্রকার অনুমতি চাহিতেছি। আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি যে, যদি চাবুক না মারিয়া চলে, তবে সরকার কয়েদীদিগকে চাবুক মারিতে চাহেন না। সাধারণ কয়েদী সম্বন্ধেই একথা খাটে। আর, ইহারা ভুল করিয়া হোক্, বা ঠিক করিয়া হোক্, নিজেদের বিবেকের অনুরোধেই জেলে আসিয়াছে। চাবুক মারায় আমার যে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে, এ কথা বলিলে তাহারা আমার ব্যথা বুঝিবে ও আমি বিশ্বাস করি যে, আমাকে কয়েদীদের সহিত থাকিতে দিলে চাবুক মারার আবশ্যক হইবে না।

আমি আশাকরি, সরকার আমার চিঠি হইতে আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া উহাতে সাড়া দিবেন এবং আমাকে সেবা করিতে দিতে অস্বীকার করিয়া, আমাকে কোনও একটা কর্ম্ম-পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবেন না। আমি ঐ প্রকার করিলে, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও উহা সরকারের পক্ষে ঝঞ্ঝাটের কারণ হইতে পারে।

কারাবাস কালে, সরকারকে কোনও প্রকার ঝঞ্ঝাটে না ফেলিয়া যাহাতে চলিতে পারি, তাহাই আমার ইচ্ছা।

এই ব্যাপার লইয়া জনকতক কয়েদী অনশন করিতেছে, সেইজন্য যত শীঘ্র সম্ভব উত্তর দিতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত

মোঃ কঃ গান্ধী

(এই বিষয়ের বাকি পত্রগুলি জনসাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম না। না করার হেতু লইয়াও আলোচনা করিতে চাই না। কিন্তু একথা বলিতে পারি যে, আমাকে দুইজন প্রধান অনশনব্রতীর সহিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইনস্পেক্টর জেনারেলের

সমক্ষে দেখা করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ফলে এই হয় যে, যাঁহারা অনশনব্রত লইয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম শ্রীযুক্ত দেব ও দস্তানে, আমি যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলাম তাহার সার্থকতা স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের দীর্ঘ উপবাস তৎক্ষণাৎ অবসান করেন।

সরকার, ঐ চাবুকমারার হেতু ও তাহার পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহ অনুসন্ধান করিয়া বলেন যে, অতঃপর জেল-কর্ম্মচারীকে আক্রমণ করার মত বিশেষ ঘটনা ছাড়া, জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর সরকারের অনুমতি না লইয়া চাবুক মারার আজ্ঞা দিতে পারিবেন না। আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, মেজর হুইটওয়ার্থ জোন্স সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত সংবাদ রটিয়াছিল যে, তিনি একজন অমানুষ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার আচরণ অমানুষিক। আমার মতে, চাবুক-মারাটা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পক্ষে বিষম বিচার-ভুল হইয়াছিল, ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। মেজর জোন্স অনেক সময় তাড়াতাড়ি কাজ করিতেন, কিন্তু আমার জ্ঞাতসারে কখনো হৃদয়হীন ছিলেন না। বরঞ্চ আমি তাঁহার সম্বন্ধে, যে সকল কয়েদী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে, যাহা শুনিয়াছি তাহাতে তিনি খুব সহানুভূতিপরায়ণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। সকল সময় কয়েদীদের কথা শুনিতেন এবং যে সকল নিম্নতর কর্ম্মচারী কয়েদীদের উপর কোন প্রকার দুর্ব্ব্যবহার করিত, তাহাদিগের প্রতি কঠোর ছিলেন। তাঁহার এই সদ্‌গুণটি ছিল যে, তিনি নিজের ভুল স্বীকার করিতেন। এই গুণটা আমলাদের মধ্যে বড় দেখা যায় না। আবার এদিকে নিয়মানুবর্ত্তিতার উপর তিনি খুব জোর দিতেন এবং যে ব্যক্তি নিয়ম মানাইতে ব্যস্ত, অথচ ধৈর্য্যহীন, সে প্রায়ই ভুল করিয়া ফেলে। তাহার ভুলগুলি বুদ্ধির ভুল—হৃদয়ের ভুল নহে। কথাটা এই যে, চাবুকমারার ক্ষমতা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হাতে রাখা কদাচ উচিত ছিল না। সেই ক্ষমতা তুলিয়া লওয়া হয়। কিন্তু তাহা আরো পূর্ব্বে লওয়াই উচিত ছিল। জেলের ব্যবস্থার বিশেষ বিবরণ ও এই বেত্রাঘাতের আলোচনা ভবিষ্যতে করিব বলিয়া, এখন বাকী রহিল।)

মোঃ কঃ গান্ধী

১৯নং পত্র

য়েরোড়া সেণ্ট্রাল কারাগার
১৫ই জুলাই

বহুসম্মানিত বোম্বাইয়ের গভর্ণর মহোদয় সমীপে—

মহাশয়,

গত সোমবারের বাক্যালাপের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনি সরকারের বিধান প্রস্তুত ও দণ্ডহ্রাস করার ক্ষমতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে যতই ভাবি, ততই আপনি যে ভুল করিয়াছেন তাহা মনে হয়। এই যে কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, ইহা সরকারের তরফ হইতে

যথার্থ প্রয়োজনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা কেবল সাধারণের চাপে অনিচ্ছাকৃত, অতএব কাগজী সংস্কার। কিন্তু আপনি বলিয়াছেন যে, আইনতঃ সশ্রম কারাদণ্ডের কয়েদীকে শ্রেণীবিভক্ত করিতে ও দণ্ড মাপ করিতে সরকারের ক্ষমতা নাই, তাহা যদি সত্য হয়, তবে আমি এ বিষয়ে সরকারের সম্বন্ধে যে ধারণা করিয়া রাখিয়াছি, সরকারের কাজে যে মতলব আছে বলিয়া দেখিতেছি, সে ধারণা আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে। উহা ত্যাগ করিতে আমার আরও ভাল লাগিবে, কেননা আপনি বলিয়াছেন যে, আপনি নিজেই ঐ বিধানের খসড়া করিয়াছেন। আমি বরাবরই আপনার সম্বন্ধে এই ধারণা রাখিয়াছি যে, আপনি দুর্ব্বল হস্তে কোনও কাজ করেন না এবং যখন আপনার জন-মত গ্রাহ্য করার ইচ্ছা হয় না, তখন গ্রাহ্য করিতেছেন এরূপ দেখান না। এই জন্য, সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগের সুবিধা, আপনি কেবল বর্ত্তমান আইনের জন্য দিতে পারেন নাই,—ইহাই যদি হয়, আমি সুখী হইব।

কিন্তু যদি আপনার আইন-বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা বলেন যে, আপনি যাহা করণীয় মনে করিয়াছেন আইনে তাহা করিতে বাধা নাই, তাহা হইলে নিম্নলিখিত দুই কর্ম্মের কোন একটি করিবেন।

(১) আমাকে ও আমার যে সঙ্গীদিগের কথা আপনাকে বলিয়াছি, তাঁহাদের 'বিশেষ শ্রেণী' হইতে বহিষ্কৃত করিবেন অথবা (২) যে সকল সশ্রম কয়েদী আমাদেরই মত জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত, তাঁহাদের 'বিশেষ শ্রেণী' ভুক্ত করিবেন।

আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পত্রের সহিত আমার গত ১লা মে তারিখের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট লিখিত পত্রখানা পাঠ করিবেন।

আপনার অনুগত ভৃত্য
মোঃ কঃ গান্ধী

(এই পত্রখানা গভর্ণর বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর লেখা হয়। ঐ সাক্ষাৎ-কালে, আমার কিছু বলার আছে কিনা, তিনি জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, আমি শ্রেণীবিভাগের কথা বলি। আমি যাহা বলি তাহার অর্থ এই যে, স্পেশ্যাল ডিভিসনের বিধি কেবল মন ভুলানো ব্যাপার। উহা লোককে কেবল এই বলিয়া ঠকাইবার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, রাজনৈতিক কয়েদীদের তাহাদের জীবনযাত্রার অনুকূল অবস্থায় থাকিতে দেওয়ার জন্য একটা কিছু করা হইল। কিন্তু যতদূর সম্ভব দৃঢ়তার সহিত গবর্ণর বলেন যে, সশ্রম কয়েদীদের বিশেষ শ্রেণীবিভাগের ভিতর ফেলার ক্ষমতা আইন অনুসারে তাঁহার নাই। যখন তাঁহার আইন জ্ঞান সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করি, তিনি বলেন যে, তাঁহার জানার কথা, কারণ তিনি নিজে ঐ বিধান প্রস্তুত করিয়াছেন। গবর্ণর মহাশয়ের কর্ম্মপ্রবণতায় আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম যে, তিনি বিধান রচনা করার মত এতটা বিশেষ কাজের প্রতিও নিজে মনোযোগ দেন; কেননা সাধারণতঃ ঐ ধরণের কাজ আইন-কর্মচারীদের হাতেই ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। যদিও অব্যবহারে আমার আইনের জ্ঞানে মরিচা ধরিয়া

গিয়াছে, তথাপি যখন গভর্ণর দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, আইন তাঁহাকে অ-শ্রম কয়েদীর পক্ষে যে ক্ষমতা দিয়াছে সশ্রম কয়েদীর বেলায় তাহা দেয় নাই এবং কয়েদী-দের দণ্ডকাল কমাইবার অধিকারও দেয় নাই, তখন আমি ঐ দুই বক্তব্যের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজিয়া লইতে পারিলাম না। সেই জন্যই উপরোক্ত পত্র লেখা হয়। জবাবে যাহা পাইলাম তাহা হইতে জানিতে পারি যে, গভর্ণর বাহাদুরের ভুল হইয়াছিল। গভর্ণরের আবশ্যকীয় ক্ষমতা আছে এবং তিনি অ-শ্রম ও সশ্রম কয়েদীদের উপর প্রয়োগ করিয়া বিধান বদলাইবার পথ দেখিতে পাইতেছেন না। কাজেই আমি যে সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই ঠিক; স্পেশ্যাল ডিভিসন বা বিশেষ শ্রেণী লোককে ভুলাইবার জন্যই করা হইয়াছে।)

মোঃ কঃ গান্ধী

২০নং পত্র

য়েরোড়া সেণ্ট্রাল কারাগার
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

মহাশয়,

সরকারের নিকট, আমার সহিত দেখা করার জন্য যে নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আজ আপনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, সরকার এখন আমার সাক্ষাৎকারীদের সংখ্যা কমাইয়া মাত্র দুইজনে আনিয়াছেন এবং আগামী ত্রৈমাসিক সাক্ষাৎকালে, কেবল দেবদাস গান্ধী ও নারাণদাস গান্ধী দেখা করিতে পারিবেন।

এতাবৎ সরকার আমার সহিত পাঁচ জনকে সাক্ষাৎ করিতে দিয়াছেন, সেই জন্য এবার সংখ্যা কমাইয়া দুই জন করায় আমি বিস্মিত হইয়াছি। তথাপি আমি এই সিদ্ধান্তে সুখীই হইয়াছি, কেননা শ্রীযুক্ত যাজ্ঞিক আমার সহিত একত্রই থাকেন এবং তাঁহাকেও অনুরূপ অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে। যদি খারাপ না দেখাইত, তাহা হইলে আমি কেবল একা এই সুবিধা ভোগ করিতেছি বলিয়া, উহা গ্রহণ করিতে নিজেই বিরত হইতাম।

কিন্তু কেবল নারাণ ও দেবদাস গান্ধীকেই সাক্ষাৎ করিতে দেওয়ার ব্যাপারটা ভিন্ন অবস্থায় পড়িতেছে। ইহা হইতে যদি ইহাই বুঝায় যে, অতঃপর আমাকে কেবল আমার আত্মীয়ের সঙ্গেই দেখা করিতে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা ছাড়া আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে প্রতি তিন মাসে দুই বার দেখা করার যে সাধারণ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি গ্রহণ করিব না। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, কোন্ লোককে দেখা করিতে দেওয়া যাইবে তাহা সরকার বরাবরের মত স্থির করিয়া ফেলিবেন। আমি পূর্ব-পত্রসমূহে যে সমস্ত যুক্তি দিয়াছি, সেগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া সরকারকে ক্লান্ত করিতে চাই না। আমি কেবল এই কথা জানাইব, যে তিন জনের নাম পাঠানো হইয়াছিল তাঁহা-

দের ইতিপূর্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু আমার সেই সকল বন্ধু, যাঁহাদের আমি সহোদর ভাই-এর মত জ্ঞান করি, তাঁহাদের সহিত যদি দেখা করিতে না পারি, তবে কাহারও সহিতই সাক্ষাৎ করা আমার চলিবে না।

আপনি যে নির্দেশের কথা জানাইয়াছিলেন, তাহা স্থির করিতে সরকারের এক পক্ষ লাগিয়াছে। আমি এইবার শীঘ্র উত্তরের প্রত্যাশা করি। ইহাতে, যাঁহারা আমার সহিত দেখা করার জন্য উৎসুক তাঁহাদের ও আমার—এই উভয় পক্ষকেই অনাবশ্যক অনিশ্চিয়তার ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না।

বিনীত

মোঃ কঃ গান্ধী

২১নং পত্র

য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

১২ই নভেম্বর, ১৯২৩

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, য়েরোড়া সেণ্ট্রাল জেল

মহাশয়,

আপনি যখন আমার সংগী মিঃ আব্দুল গণিকে বলেন যে, জেলের বিধি অনুসারে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট যে খোরাকের হার ধরা আছে, তাহার অতিরিক্ত ব্যয়ে খোরাক দিতে পারেন না—তখন আমি আপনাকে জানাই যে, আপনার পূর্ববর্তী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ও আমার সমস্ত সংগীকেই নিজ ইচ্ছানুযায়ী খোরাক পরিবর্তন করিতে দিতেন। আমি আপনাকে ইহাও বলি যে, মিঃ আব্দুল গণিকে যে সুবিধা দেওয়া হইবে না, তাহা আমার গ্রহণ করিতে বিসদৃশ ঠেকিবে এবং আমি বলি যে, আমার খোরাকও এমন করা হোক্, যাহাতে যে হারে মিঃ আব্দুল গণিকে দেওয়া হইবে, তাহা সেই হারের মধ্যেই থাকে। আপনি তখন বলেন যে, আমি যাহা খাইতেছিলাম তাহা যেন খাইতে থাকি। ইন্স্পেক্টর জেনারেলের এই জেল পরিদর্শনে শীঘ্রই আসার কথা আছে, তিনি আসিলে আমি তাঁহার সহিত এ বিষয়ে কথা বলিতে পারিব। আমি আজ দশ দিনের উপর অপেক্ষা করিলাম। আমি দেখিতেছি, আমার মনের শান্তি রক্ষার জন্য আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। বিশেষতঃ আমার ত নিজের জন্য ইন্স্পেক্টর জেনারেলের সহিত কিছু আলোচনা করার নাই। মিঃ আব্দুল গণির সম্বন্ধে আপনার নির্দেশের বিরুদ্ধেও আমার কোনই অভিযোগ নাই। আমি দেখিতেছি, আমার সংগীকে যদি আপনার সাহায্য করার ইচ্ছা থাকে, তবু আপনার তাহা করার ক্ষমতা নাই। আমার ইহাও ইচ্ছা নয় যে, জেলের খাদ্য সম্বন্ধে যে বিধান আছে তাহার পুনঃ সংস্কার করা হোক্। আমাকে যে সব বিশেষ অনুগ্রহের সুবিধা দেওয়া হয়, কেবল তাহাই আমি পরিত্যাগ করিতে চাই। আপনি বলিয়াছেন যে,, আমার খাদ্যের হার হয়ত আপনার পূর্ববর্তী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, চিকিৎসকের দৃষ্টিতে আমার প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ আমি একথা জানি

যে তাহা নয়। আমি এই জেলে আসার পর হইতে প্রায় একই খাদ্য পাইয়া আসিতেছি। আর বিশেষ কথা এই যে, আমাকে ও আমার সঙ্গীদের খরচার কথা না ধরিয়াই আমাদের খাদ্য পছন্দ করিয়া লইতে দেওয়া হইত।

আমি সেই জন্য আগামী বুধবার হইতে কমলালেবু ও কিসমিস খাওয়া ত্যাগ করিব। তাহা হইলেও, যে বাঁধা হার আছে, আমার খাদ্য তদতিরিক্ত হইয়া যাইবে। আমি ঠিক বুঝি না যে, আমার দুই সের ছাগদুগ্ধের প্রয়োজন কিনা। কিন্তু আপনি আমাকে আমার খাদ্য পরিবর্তন করিয়া নির্দিষ্ট হারের ভিতর ফেলায় সাহায্য না করা পর্যন্ত, আমি অনিচ্ছাতেও দুই সের করিয়া ছাগদুগ্ধ ও দুইটিমাত্র টক লেবু গ্রহণ করিতে থাকিব।

আমি একথা আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি,, কোনও কলহের মনোবৃত্তি লইয়া খাদ্য কমাইতেছি না।......আমি কেবল আমার অন্তরের শান্তির জন্য এই পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করি এবং এই কাজে আপনার সহানুভূতি ও সম্মতি প্রার্থনা করি।

বিনীত

মোঃ কঃ গান্ধী

(পাঠকরা, এই চিঠির ভিতর যে অর্থ নাই তাহা যেন ইহা হইতে খুঁজিয়া না বাহির করেন। চিঠির মর্ম-বিষয় জানিতে দেওয়ার জন্যই চিঠিখানি প্রকাশ করা হইল, কেননা ইহা লইয়া অনেক কথা, অনেক জল্পনা হইয়াছে। একথা বলা হইয়াছে যে, আহার্য ত্যাগ করাতেই আমার শরীর নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য একথা স্পষ্ট করা দরকার যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আব্দুল গণির খাদ্য দেওয়া সম্বন্ধে আমার অনুরোধ পালনে অস্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ আমি আহার্য কমাই নাই। ইহা ছাড়া স্পেশ্যাল ডিভিসনের কয়েদী বলিয়া মিঃ গণি বাহির হইতে খাদ্য আনিতে পারিতেন। কিন্তু আমি, যাজ্ঞিক ও আব্দুল গণি স্থির করিয়াছিলাম যে, আমাদের বাহির হইতে খাদ্য আনা ঠিক হইবে না। সেইজন্য আমার খাদ্য কমানোর ফলের জন্য কর্তৃপক্ষকে কোনও ক্রমেই দায়ী করা যায় না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল আমাকে খাদ্য ত্যাগ করার সংকল্প ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য অনুনয় করিয়াছিলেন। উহা ত্যাগ করায় যে বিষম বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহাও তাঁহারা আমাকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু মানসিক শান্তির জন্য আমাকে বিপদের আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও খাদ্য ত্যাগ করিতে হয়।......)

মোঃ কঃ গান্ধী

নারী
ও
সামাজিক অবিচার

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

উপেন্দ্রকুমার রায়

১৫

১

নারী-জীবনের নবজাগরণ

নারী-সমাজের উন্নতি-সাধন বলিতে আমরা কী বুঝি, তাহা জানা আবশ্যক। উন্নতির কথা বলিলেই অবনতি ঘটিয়াছে বুঝা যায় এবং তাহা হইলেই আমাদের আরও বিবেচনা করিতে হয়, কী কারণে এবং কী ভাবে সেই অবনতি ঘটিল। এই বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণকালে আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, বর্তমানে যে সব আন্দোলন চলিতেছে তাহা জনসাধারণের অতি ক্ষুদ্রতম অংশেই নিবন্ধ। বিশাল আকাশের তুলনায় প্রকৃতপক্ষে উহা একটি বিন্দুর মতো। কোটি কোটি নর-নারী এই আন্দোলনের তিলমাত্রও জানে না। এই দেশের শতকরা ঠিক পঁচাশি জন লোক তাহাদের চারিদিকে কী ঘটিতেছে তাহা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া নিরীহভাবে তাহাদের জীবন কাটাইয়া দেয়। এই সকল অজ্ঞ নর-নারী তাহাদের আপনাপন কাজগুলি নিখুঁত ভাবেই করিয়া যায়। উভয়ের শিক্ষা বা শিক্ষার অভাব একই প্রকারের। একে অন্যকে যথাযথরূপেই সাহায্য করিতেছে। তাহাদের জীবন যদি কোনরূপে অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, বাকী শতকরা পনের জনের জীবনের অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। 'ভগিনী-সমাজের' আমার ভগিনীগণ যদি আমাদের জনসাধারণের এই শতকরা পঁচাশি জনের জীবনের ধারা সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, নারী-সমাজের উন্নতি বিধানের প্রকৃষ্ট পন্থা নিরূপণ করিবার যথেষ্ট উপকরণ তাহার মধ্যে পাইবেন।

আমি যাহা বলিতে যাইতেছি তাহা উক্ত শতকরা পনের জন সম্বন্ধেই। তাহা হইলেও নারী ও পুরুষের সাধারণ অসুবিধাগুলির আলোচনা করা এক্ষেত্রে অবান্তর হইবে। আমাদের বিবেচ্য বিষয়, পুরুষদের সহিত তুলনায় নারী-সমাজের উৎকর্ষ সাধন। আইন-কানুন অধিকাংশই পুরুষের হাতে গড়া এবং স্বয়ংপ্রণোদিত ব্যবস্থায় পুরুষ সব সময় ন্যায় ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় নাই। আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির যে সকল দোষ প্রকৃতিগত ও মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে, নারী-সমাজের উন্নতি সাধনে আমাদের অধিকাংশ প্রচেষ্টা সেই সেই দোষগুলি দূর করিবার জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে। সেই চেষ্টা কে করিবে এবং কীরূপে করিবে? আমার বিনীত মত এই যে, সেই চেষ্টা করিতে হইলে আমাদিগকে তৈয়ারি করিতে হইবে সীতা দময়ন্তী এবং দ্রৌপদীর মতো পূতচরিত্রা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আত্মসংযমশীলা নারী। সেইরূপ নারী-জীবন গঠন করিতে পারিলে এই সকল ভগিনীরা অতীতযুগের তাহাদের আদর্শস্থানীয়া মহিলাদের মত হিন্দুসমাজের নিকট অনুরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারিবে। তাহাদের কথার শক্তি শাস্ত্রবাক্যের ন্যায় বলবৎ হইবে। স্মৃতিশাস্ত্রে তাহাদের সম্বন্ধে এখানে-সেখানে যে সকল অশ্রদ্ধেয় ইঙ্গিত রহিয়াছে, সেগুলির জন্য আমরা লজ্জিত হইব এবং সমাজচিত্ত হইতে তাহা

শীঘ্রই মুছিয়া যাইবে।

অতীতে হিন্দুধর্মে এরূপ যুগপরিবর্তন ঘটিয়াছে; ভবিষ্যতেও তাহা ঘটিবে এবং তদ্দ্বারা আমাদের ধর্মবিশ্বাস আরো নির্মল, আরো দৃঢ় হইবে। আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন এই সমিতি শীঘ্রই এই শ্রেণীর নারীজীবন গঠনে সমর্থ হয়।

...এখন আমরা আলোচনা করিব চেষ্টা করিলে সাধারণ স্ত্রীলোক কীরূপে কত-দূর অগ্রসর হইতে পারে। তাহাদের প্রথম চেষ্টা হইবে, যত বেশী সংখ্যক সম্ভব স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের বর্তমান দুর্গতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা। শুধু বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখাইলে এইরূপ চেতনা জাগানো যাইতে পারে, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, আমি তাঁহাদের মধ্যে নহি। কেবল লেখাপড়া শিক্ষার উপর নির্ভর করিতে হইলে আমাদের উদ্দেশ্যসাধন অনিশ্চিতভাবে পিছাইয়া যাইবে; প্রতি পদে আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি যে অতি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। প্রথমে লেখাপড়ার ভিতর দিয়া কোন শিক্ষা না দিয়াও আমরা আমাদের নারী-সমাজকে তাহাদের বর্তমান দুর্গতির বাস্তব অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি। সমান মানসিক শক্তি লাভ করিয়া নারী পুরুষের সহচরী হইবার মর্যাদা লাভ করে। পুরুষের কাজের অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। পুরুষের স্বাতন্ত্র্যের যতখানি অধিকার, তাহারও ঠিক তাহাই রহিয়াছে। তাহার নিজ কর্মের পরিবেশের মধ্যেও নারী সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ার অধিকারিণী, যেমন পুরুষ তাহার নিজ কর্মক্ষেত্রে পাইয়া থাকে। ইহাই হওয়া উচিত স্বাভাবিক অবস্থা—শুধু লেখা-পড়া শিখিবার ফলরূপে নয়। কেবল কুপ্রথার বলে নিতান্ত মূর্খ ও অপদার্থ পুরুষ-গণও নারীদিগের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, যাহার যোগ্যতা তাহাদের নাই এবং যাহা তাহাদের থাকাও উচিত নয়। আমাদের নারী-সমাজের হীন অবস্থার জন্যই আমাদের অনেক আন্দোলনের গতি মধ্যপথে থামিয়া যায়। অনেক অনুষ্ঠান ফলপ্রসূ হয় না; যে ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায়ে যথেষ্ট মূলধন খাটায় না, সেই অতিচতুর ও গণ্ডমূর্খ ব্যবসায়ীর অদৃষ্টের ন্যায়ই আমাদেরও তেমন পরিণাম ঘটে।

কিন্তু যদিও লিখন, পঠন ও অঙ্ককষা এই তিন বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া অনেক ভাল ও হিতকর কাজ করা সম্ভবপর, তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঐ সকল বিষয়ের জ্ঞান ব্যতিত সব সময় আমাদের চলে না। এই জ্ঞান আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত ও তীক্ষ্ণ করে এবং ভাল কাজ করিবার শক্তি বাড়াইয়া দেয়। এই তিন বিষয়ের জ্ঞানের মূল্য আমি কখনও অস্বাভাবিকরূপে বেশী দিই না; আমি শুধু ইহার যথাযথ স্থান নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। সময় সময় ইহা আমি দেখাইয়াছি যে, নিরক্ষরতার দোহাই দিয়া নারীদের সমান অধিকার হইতে বঞ্চিত করার কোন সঙ্গত যুক্তি পুরুষের নাই। কিন্তু তাহাদের এই সকল স্বাভাবিক অধিকার দাবী করিবার এবং সেগুলি বুদ্ধিমত্তার সহিত পরিচালনা করিবার এবং সেগুলি আরও বাড়াইবার ক্ষমতা অর্জন করিবার জন্য নারীদের শিক্ষালাভ করা অত্যাবশ্যক; এবং এইরূপ শিক্ষা ব্যতিত লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করাও অসম্ভব। অনেক বই পাঠ করিয়া আমরা নির্দোষ আমোদ লাভ করিতে

পারির, কিন্তু লেখাপড়া না জানিলে আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইব। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে শিক্ষাবিহীন মানব ও পশুর মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নয়। কাজেই শিক্ষা পুরুষের ও নারীর পক্ষে সমান প্রয়োজন। তবে ইহা বুঝায় না যে, উভয়ের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয় ও প্রণালী ঠিক একই রকম হইবে। প্রথমতঃ ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় প্রবর্তিত শিক্ষার পদ্ধতি ভ্রমপূর্ণ এবং অনেক বিষয়ে দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। পুরুষ ও নারীদিগের পক্ষে এই শিক্ষা বর্জনীয়। এই শিক্ষার বর্তমান দোষগুলি বিদূরিত হইলেও আমি ইহাকে সব দিক দিয়া নারীদের পক্ষে উপযুক্ত মনে করিব না। পুরুষ ও নারী স্বকীয় মর্যাদা ও অধিকারাদি সম্বন্ধে সমান হইলেও তাহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাহারা একে অন্যের সহায়কারী এক অতুলনীয় যুগল; একে অন্যের সহযোগিতায় পূর্ণতা লাভ করে এবং সেইজন্য একজন না থাকিলে অন্যজনের অস্তিত্বও কল্পনা করা যায় না; ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয় যে, যাহা কিছু এক পক্ষের অধিকারাদি ব্যাহত করে তাহা উভয়ের সর্বনাশ সমানভাবে আনয়ন করিবে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে কোন পরিকল্পনা তৈয়ারি করিবার সময় এই মৌলিক সত্যটি আবশ্যই সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। দম্পতিযুগলের বহির্জগতের কাজে পুরুষই সর্বেসর্বা এবং সেইজন্যই এই সকল বিষয়ে তাহার অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অপর পক্ষে পারিবারিক জীবনের কাজকর্ম সর্বতোভাবে নারীর এক্তিয়ারের অন্তর্গত এবং সেইজন্য গৃহস্থালী এবং সন্তানগণের লালন-পালন ও শিক্ষা সম্বন্ধে নারীদিগের সমধিক জ্ঞান থাকা উচিত। তবে ইহা নয় যে, জ্ঞান নির্দিষ্ট কোন সীমার ভিতর আবদ্ধ থাকিবে এবং জ্ঞানের কোন কোন শাখা কাহারও অপরিজ্ঞাত থাকিবে; কিন্তু যদি শিক্ষা-ব্যবস্থা এই সকল মৌলিক নীতির বিশ্লেষণ ও যথাযথ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে পুরুষ ও নারীর পূর্ণ জীবন বিকশিত হইতে পারে না।

আমাদের মেয়েদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কিনা সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে চাই। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, সাধারণ জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য আমাদের স্ত্রী ও পুরুষদিগকে যে ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানলাভ করিতেই হইবে এমন নয়। ইহা সত্য, জীবিকা উপার্জনের জন্য এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদানের জন্য ইংরাজী জানা প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি না যে মেয়েদের জীবিকা উপার্জনের জন্য কাজ করিতে হইবে অথবা তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিতে যাইবে। যে কয়েকজন অল্পসংখক স্ত্রীলোক ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছা করেন, অথবা যাঁহাদের ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহারা পুরুষদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে খুব সহজেই তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন। স্ত্রীলোকদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করিলে আমাদের নিরুপায় অবস্থার মেয়াদ বাড়াইয়াই দেওয়া হইবে। আমি প্রায়ই পড়ি এবং লোককেও বলিতে শুনি যে, ইংরাজী সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার স্ত্রীপুরুষ সকলেরই জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এইরূপ মনোবৃত্তির ভিতর কিছু বুঝিবার ভুল আছে। পুরুষের জন্য ঐ রত্নভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া স্ত্রীলোকের জন্য তাহা বন্ধ করিবার ইচ্ছা কাহারও নাই। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তোমাকে

সারা পৃথিবীর সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে বাধা দিতে পারে, যদি তোমার সেদিকে অনুরাগ থাকে। কিন্তু যখন শিক্ষার ধারা কোন সমাজবিশেষের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পরিকল্পিত হয়, সাহিত্যানুরাগী মুষ্টিমেয় লোকের প্রয়োজন সেই শিক্ষা-ব্যবস্থায় তুমি মিটাইতে পার না। আমাদের স্ত্রী ও পুরুষদিগকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য এখনকার চেয়ে অল্প সময় ব্যয় করিতে বলায় আমার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তাঁহারা উহা হইতে সম্ভবতঃ যে আনন্দ লাভ করিবেন তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হোন। কিন্তু আমি এই মত পোষণ করি যে, যদি আমরা আরও স্বাভাবিক প্রণালী অবলম্বন করি, তবে তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এবং অল্প আয়াসে সেই আনন্দ লাভ করিতে পারি। পৃথিবীর সাহিত্য সুন্দর সুন্দর অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ; কিন্তু এই সকল ভাবসম্পদ্ সবই ইংরেজী ছাঁচে গড়া নয়। অন্যান্য ভাষাও অনুরূপ উৎকৃষ্ট সাহিত্যের গর্ব যথেষ্ট করিতে পারে; আমাদের সাধারণ লোকেরা যাহাতে এইগুলি সমস্তই পাইতে পারে তাহা করিতে হইবে এবং যদি আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষিত সমাজ নিজ নিজ ভাষায় সেগুলির অনুবাদের ভার গ্রহণ করেন তবেই তাহা সম্ভব হয়।

কিন্তু শিক্ষার একটি পরিকল্পনা ঐভাবে করিলেই আমাদের সমাজ হইতে বাল্য-বিবাহের ব্যাধি দূরীভূত হইবে না অথবা আমাদের নারীদের সমান অধিকার প্রদান করা হইবে না। এখন আমরা সেই সকল মেয়েদের বিষয় বিবেচনা করিব যাহারা বলিতে গেলে বিবাহের পর বহির্জগত হইতে অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহারা সম্ভবতঃ বিদ্যালয়ে ফিরিয়া আসিবে না। অতি অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ দিবার পাপ অর্জন করিয়া তাহাদের মায়েরা পরবর্তীকালে তাহাদের পাপাচরণ সম্বন্ধে অবহিত হইলেও, তাঁহারা কন্যাদিগকে আর শিক্ষা দিতে পারেন না অথবা তাহাদের নিরানন্দ জীবনকে অন্যরূপে আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারেন না। যে পুরুষ একটি অল্প-বয়স্কা মেয়েকে বিবাহ করেন, তিনি কোন মহান্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া উহা করেন না,—নিছক ভোগবৃত্তির বশীভূত হইয়াই করেন। এই সকল বালিকাদিগকে কে রক্ষা করিবে? এই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব পাইলে স্ত্রীলোকদের সমস্যারও সমাধান হইবে। ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাই একমাত্র সম্ভবপর উত্তর। অবশ্য তাহার স্বামী ছাড়া এ বিষয়ে তাহাকে সহায়তা করার আর কেহ নাই। একটি বালিকাবধূ তাহার স্বামীকে পথে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে, ইহা আশা করা বৃথা। অতএব এই কঠিন কাজ আপাতত কিছুকাল পুরুষের উপরই ফেলিতে হইবে। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হইত, তবে বালিকাবধূদের সংখ্যা গণনা করিতাম এবং তাহাদের স্বামীদের সন্ধান নিতাম এবং তাহাদিগকে ভালরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে বালিকাবধূগণের সহিত তাহাদের অদৃষ্ট জড়িত করিয়া তাহারা কী ভীষণ অপরাধ করিয়াছে এবং তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতাম যে যতদিন পর্যন্ত শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের পত্নীগণকে সন্তানধারণ ও সন্তানদিগকে উপযুক্তরূপে লালনপালন করিবার জন্য সমর্থ করিয়া তুলিতে না পারিবে, ততদিন তাহাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না এবং সেই সময় পর্যন্ত তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্ম-চারীর ন্যায় সংযত জীবন যাপন করিতে হইবে।

'ভগিনী-সমাজের' সভ্যদের সম্মুখে আত্মনিয়োগের বহু ফলপ্রসূ কর্মক্ষেত্র মুক্ত রহিয়াছে। সেই কর্মক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই ক্ষেত্রে মনো-নিয়োগ করা যায় তাহা হইলে সমাজসংস্কার বিষয়ে বড় বড় আন্দোলনগুলি বর্তমানে স্থগিত রাখিয়া, স্বরাজ-প্রতিষ্ঠাকল্পে অনেক কাজ করা যায়; এবং সেই সম্বন্ধে মৌখিক কিছু বলিবার আবশ্যকতাও হয় না। যখন ছাপাখানার অস্তিত্ব ছিল না, বক্তৃতাদি দ্বারা প্রচার করার ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ ছিল, এবং বর্তমানে ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার মাইল ভ্রমণের স্থলে যখন দিনে মাত্র ২৪ মাইল অতিকষ্টে ভ্রমণ করা সম্ভবপর হইত, তখন আমাদের আদর্শসকল প্রচার করিবার একটিমাত্র উপায় ছিল, আমাদের নিত্যদিনের অনুষ্ঠানগুলি নিখুঁত ভাবে সম্পাদন করা; তাহার ফল অমোঘ। আমরা বর্তমানে যতই বায়ুবেগে ইতস্ততঃ যাতায়াত করিতেছি বক্তৃতা দিতেছি, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ততই আমরা আমাদের আদর্শ হইতে বহুদূরে গিয়া নিরাশার ক্রন্দনে বায়ুমণ্ডল ব্যথিত করিয়া তুলিতেছি। অন্ততঃ আমার এই ধারণা যে, বর্তমান কালে অমাদের প্রতিদিনের নিখুঁত কর্মানুষ্ঠানগুলিই, অতীতের ন্যায়, জনমতের উপর বহুসংখ্যক বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর হইবে। আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা এই—তোমাদের এই 'ভগিনী-সমাজের' সভ্যগণ যাহা কিছু অনুষ্ঠান করুক, তাহা যেন নীরব নিষ্কাম আড়ম্বরহীন কর্মের মাহাত্ম্য লাভ করে।

(১৯১৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী বোম্বাই 'ভগিনী-সমাজের' বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে গান্ধীজীর দেওয়া (গুজরাটিতে) ভাষণ হইতে)।

২

নারী-জীবন স্বপ্রতিষ্ঠ কর

মাদ্রাজের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক ডাঃ এস্. মথুলক্ষ্মী রেড্ডি আমার অন্ধ্র দেশের বক্তৃতাগুলিকে ভিত্তি করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহা হইতে নিম্নের কৌতূহলজনক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"বেজোয়াড়া হইতে গুণ্টুর ভ্রমণকালে আমাদের লোকদের প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের এবং সংস্কারাদির উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য-গুলি আমার খুব ভাল লাগিয়াছে।

"আমার বিনীত নিবেদন এই যে, মেয়ে ডাক্তার হিসাবে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু আপনার সম্মতি নিয়া বলিতে চাই যে, যদি শিক্ষাই প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সংস্কার, জনসাধারণের উন্নততর স্বাস্থ্যবিধানে সহায়তা করে, তবে এই ফল লাভ করিতে গেলে একমাত্র নারীদের শিক্ষার দ্বারাই নারী-সমাজের উন্নয়ন সম্ভব।

"বর্তমান সামাজিক পরিবেশে আপনি কি মনে করেন না যে খুব কম নারীই শিক্ষার, শরীর ও মনের পূর্ণতা লাভের এবং সর্বাঙ্গীণ আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া থাকেন?

"আপনি কি মনে করেন না লোকাচার এবং কৌলিক অন্ধসংস্কারের চাপে তাহাদের ব্যক্তিত্ব পর্যন্ত নির্মমভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে?

"বাল্য-বিবাহ কি শারীরিক, মানসিক, এমনকি আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকার বিকাশের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে না?

"বালবধূ ও শিশুমাতাগণের দারুণ যাতনা এবং সমাজের বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তা নারীদের দুর্বহ দুঃখরাশি কি আশু প্রতিকারের অপেক্ষা করে না?

"ধর্মের নামে যে কুপ্রথা অল্পবয়স্কা নির্মল কুমারীদিগকে অধঃপাতিত ও পাপপঙ্কিল জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে, হিন্দু-সমাজের পক্ষে সেগুলি অনুমোদন বা উপেক্ষা করিবার কোন যুক্তি আছে কি?

"আপনি কি ইহা মনে করেন না যে সামাজিক অত্যাচারের ফলেই—যে শক্তি ও সাহস, যে স্বাধীন চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা প্রাচীন ভারতে মৈত্রেয়ী, গার্গী, সাবিত্রী প্রমুখ নারীদের প্রবুদ্ধ করিয়াছিল, এবং যাহা আজও ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, থিওজফিসমাজভুক্ত বহু নারীকে প্রবুদ্ধ করিতেছে, তাহা মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রে ব্যতিত ভারতের নারী-সমাজে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে? এই শেষোক্ত সমাজগুলি তো অর্থহীন প্রথা, গতানুগতিক ক্রিয়াকাণ্ড এবং আচারাদির শৃঙ্খলমুক্ত হিন্দুধর্মই বটে।

"জাতীয়দলের সভ্যগণ (আমি কংগ্রেসের কথাই বলিতেছি) কি এই সকল সামাজিক ব্যাধির আশু প্রতিকারের জন্য জ্বলন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইবেন না? এই ব্যাধিগুলিই তো আমাদের জাতীয় দুর্বলতার মূলে নিহিত এবং বর্তমান অবনতির একমাত্র কারণ। অথবা যে দাসত্ব-শৃঙ্খল নারীগণকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে নারী-সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য জনসাধারণকে অন্ততঃ শিক্ষিত করিতে দেশসেবকগণ কি বদ্ধপরিকর হইবেন না? ইহা করিতে পারিলে নারীগণ তাহাদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি পূর্ণ-ভাবে লাভ করিতে পারিবে, সাহস এবং বিচার-বিবেকের বিশেষ পরিচয় দিবার সুযোগ পাইবে; সর্বোপরি স্ত্রীরূপে এবং মাতারূপে ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রাগণের চরিত্র ও দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নত করিয়া জাতীয় জীবন গঠনের, পরিচালনার এবং শিক্ষার পবিত্র কর্তব্য প্রকৃষ্টরূপে সম্পাদন করিতে পারিবে।

"যদি কংগ্রেসের সভ্যগণ ইহা বিশ্বাস করেন যে স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার এবং যদি তাঁহারা সেই স্বাধীনতা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিয়া অর্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাঁহারা কি সর্বপ্রথমেই তাঁহাদের নারীগণকে কুপ্রথা ও কুলগত কুসংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন না? এই সকল অত্যাচার ও কুসংস্কার তাহাদের সর্বতোমুখী পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে এবং এই সভ্যগণের হাতেই প্রতিকারের উপায় রহিয়াছে।

"আমাদের কবি, সাধু ও সন্ন্যাসিগণ ঐ একই সুরে গাহিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'যে জাতি ও যে দেশ নারীকে সম্মান করে না সেই জাতি ও সেই দেশ কখনও বড় হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। তোমাদের জাতি যে এতটা অবনত তাহার প্রধান কারণ এই যে, তোমরা মহাশক্তির জীবন্ত প্রতীক—

নারীগণকে কোন সম্মান প্রদর্শন কর না। যদি দেবমাতৃকার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি স্বরূপ নারীগণকে উন্নত না করিতে পারো তবে ইহা জানিও যে তোমাদের উন্নত হইবার অন্য উপায় নাই।'

"স্বর্গীয় গুণালঙ্কৃত তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীও একই ভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

"কাজেই আমি বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনার ভ্রমণকালে স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃত এবং সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত উপায় অবলম্বন করিবার জন্য পুরুষদের প্রবুদ্ধ করুন।"

প্রশ্নগুলির উত্তর এই : কংগ্রেসসেবিগণ এই দায়িত্বভার তাঁহাদের স্কন্ধে নিবেন এই আশা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ডাক্তার মথুলক্ষ্মীর আছে। অনেক কংগ্রেস-সেবী ব্যক্তিগতভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে এইরূপ বহু কাজ করিতেছেন। আপাত-দৃষ্টিতে যতদূর দেখা যায়, অনেক গভীর দেশে এই সকল ব্যাধির প্রকৃত মূল নিহিত। কেবল স্ত্রীশিক্ষা-ব্যবস্থার দোষেই যে এই সকল গলদ দেখা যায়, এমন নহে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল নীতি সবটাই কলুষিত, বিকৃত আদর্শ দ্বারা পরিচালিত। পক্ষান্তরে সামাজিক বিশেষ বিশেষ রীতিনীতির কেবল দোষ প্রদর্শনের দ্বারা আমাদের সামাজিক ব্যাধির উপশম সম্ভব নয়; এই ব্যাধির মূলে রহিয়াছে আমাদের মানসিক জড়তা—দোষ ত্রুটি দেখিয়াও তাহার প্রতিকার চেষ্টাতে আমরা সর্বদাই বিমুখ থাকি। এবং ভারতের জনসংখ্যার শতকরা পনের জন, যাহারা শহরবাসী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত, তাহাদের সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত অভোযোগগুলি খাটে। গ্রামবাসী জনগণের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই এবং বিধবাবিবাহের প্রতিকূলে কোন নিষেধও দেখা যায় না। ইহা সত্য যে তাহাদের অন্যান্য ব্যাধি আছে এবং সেগুলি দ্বারা তাহাদের উন্নতি প্রতিহত হয়।

কিন্তু প্রয়োজন হইতেছে শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ওলটপালট করিয়া জন-সাধারণের উপযোগী আর একটি শিক্ষাব্যবস্থা উদ্ভাবিত করা। শিশুগণের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমভাবে নিরক্ষর যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধজনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে স্বীকৃত হয় নাই। এইরূপ একদেশিক শিক্ষাব্যবস্থা কোনও মতে চলনসই হইতে পারে না। অধিকন্তু যে শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষার স্বাভাবিক সর্বোচ্চ স্থান নাই, তাহা সমস্যা সমাধানের সীমারেখাও স্পর্শ করিতে পারে না। ব্যাপক সংস্কার করিতে হইলে শিক্ষিতসমাজের মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হওয়া আবশ্যক। ডাক্তার মথুলক্ষ্মীকে আমি এই কথাই বলিতে চাই, যে অল্পসংখ্যক শিক্ষিতা মহিলাগণ ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্যশিক্ষার শিখরদেশ হইতে ভারতের সমতলভূমিতে নামিয়া আসিতে হইবে। নারীর প্রতি অবহেলা এবং তাহাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য পুরুষগণ নিঃসন্দেহরূপে দোষী এবং তাহাদিগকেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; কিন্তু যে সকল নারী কুসংস্কার বর্জন করিতে পারিয়াছেন এবং এই অন্যায় অবিচার সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই গঠনমূলক শিক্ষাসংস্কার-কাজ করিতে হইবে। নারীগণের মুক্তি, ভারতের শৃঙ্খল-মোচন, অস্পৃশ্যতানিবারণ, জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন এবং অনুরূপ

সমস্যা সকলের সমাধান করার অর্থই হইতেছে,—শিক্ষিত সমাজের গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া পল্লীজীবনের পুনর্গঠন ও সংস্কারসাধনের জন্য ঐকান্তিক প্রয়াসী হওয়া।

[ইয়ং ইন্ডিয়া, ২৩-৫-'২৯]

৩
সমাজে নারীর স্থান

একজন চারুশীলা বন্ধু, যিনি এযাবৎ দাম্পত্যজীবনের প্রলোভন কৃতকার্য্যতার সহিত উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, লিখিতেছেন :—

"গতকল্য মালবারী হলে একটি নারীসম্মিলনের অধিবেশন হয়। সেই সভায় অনেক সারগর্ভ বক্তৃতা দেওয়া হয় এবং অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপরাহ্নে আলোচ্য বিষয় ছিল সারদা আইন। আপনি মেয়েদের বিবাহের বয়স আঠারো হইবে এই মত পোষণ করেন জানিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছি। অপর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবে উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। এই বিষয়ে 'নবজীবন' ও 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকা দুটিতে যদি আপনি একটি কড়া প্রবন্ধ লিখিতেন তবে কত উপকার হইত। জন্মগত অধিকার লাভ করিবার জন্য নারীদের ভিক্ষা চাহিতে বা বিবাদ করিতে হইবে কেন? মায়ের সন্তান হইয়া পুরুষগণ যখন উচ্চ কণ্ঠে নারীদিগকে "দুর্বলতর জাতি" বলিয়া অভিহিত করেন এবং উদারতার সহিত তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য "দান করিতে" আশ্বাসবাণী প্রচার করেন, তখন সে সব শুনিতে কেমন অদ্ভুত ঠেকে এবং উহা মর্মান্তিক উপহাস বলিয়াও মনে হয়। "দান করা" এই অর্থহীন প্রলাপের তাৎপর্য কী? শুধু পশুবল প্রয়োগ করিয়া বেআইনিভাবে বলপূর্বক গৃহীত বিষয় লোককে ফিরাইয়া দিবার উৎসাহের মধ্যে "উদারতা" বা "নারীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের পৌরুষ" কোথায়? নারী কোন্ বিষয়ে পুরুষ হইতে হীন? পিতৃধনে তাহাদের অধিকার পুরুষ হইতে কম হইবে কেন? ইহা সমান না হওয়ার কারণ কী? দিন দুই পূর্বে কয়েকজন ব্যক্তির সহিত এই বিষয়ে আমরা খুব উত্তেজনার সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলাম। একজন মহিলা বলিলেন, "আমরা আইনের কোন পরিবর্তন চাই না। আমবা বেশ সন্তুষ্ট আছি। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ন্যায়সঙ্গত যে পুত্র বেশী অংশ পাইবে, কারণ তাহার দ্বারা পরিবারের নাম ও অতীতগৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে; পুত্রই পরিবারের মুখ্য অবলম্বন।" আমরা বলিলাম "মেয়ের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা?" একটি সুদর্শন পাতলা চেহারার যুবক উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ও, অপর-জন তাহার তত্ত্বাবধান করিবে।" এইখানেই আসল কথা। ঐ "অপর-জন",—সর্বদাই ঐ "অপর জন"। এই অপর-জন হচ্ছে একটি আগন্তুক উৎপাত স্বরূপ! অপর-জন থাকিবে কেন! ইহা কেন মানিয়া লওয়া হইবে যে অপর-জন থাকিবেই? তাদের কথার ভাব এই, মেয়ে একবস্তা মালের মতো, যতদিন "এই অপর-জন" না আসে ততদিন পিতৃগৃহে তাকে কৃপা করিয়া স্থান দেওয়া হইবে, আসিলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাকে

অম্লানচিত্তে তার হাতে সমর্পণ করা যাইবে। যদি আপনি মেয়ে হইতেন তবে কি আপনি পাগল হইয়া যাইতেন না?"

—নারীর উপর পুরুষের অত্যাচারের গুরুত্ব বুঝিবার জন্য স্ত্রী-জন্ম নিয়া আমার পাগল হওয়ার প্রয়োজন দেখি না। অত্যাচারের প্রাগুক্ত তালিকার মধ্যে উত্তরাধিকারের আইনকে আমি সর্বনিম্ন স্থান দিয়া থাকি। উত্তরাধিকার আইন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা হইতে বহু পরিমাণে গুরুতর সামাজিক ব্যাধি সারদা বিলের আলোচ্য বিষয়। নারীগণের অধিকারাদি সম্বন্ধে আমার মনোভাব অনমনীয়। পুরুষগণ আইনগত যে সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে, আমার মতে নারীগণেরও সেই সব অধিকার লাভের যোগ্যতা রহিয়াছে। কন্যা ও পুত্রগণকে আমি সম্পূর্ণ সমান পদবীতে রাখিয়া চলিব। নারীগণ তাহাদের শক্তি যখন উপলব্ধি করিতে অরম্ভ করিবে,—যে পরিমাণে তাহারা শিক্ষালাভ করিবে, সেই পরিমাণে তাহারা নিশ্চয়ই নিজ অধিকার লাভের চেষ্টা করিবে—তখন স্বভাবতঃই তাহারা যে সকল বৈষম্যের দ্বারা নিপীড়িত, সেগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।

কিন্তু আইন সম্বন্ধীয় বৈষম্য দূর করার দ্বারা ব্যাধির সাময়িক উপশম মাত্র হইবে। আসলে অত্যন্ত গভীর দেশে রহিয়াছে এই ব্যাধির মূল; পুরুষপ্রকৃতির ক্ষমতা ও যশোলিপ্সার ভিতর এবং ততোধিক গভীরভাবে রহিয়াছে স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক কামজ আকর্ষণের মধ্যে। পুরুষ সর্বদাই ক্ষমতালিপ্সু। সম্পত্তির পূর্ণাধিকার এই ক্ষমতা প্রদান করে। পুরুষ এই ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া মৃত্যুর পরও যশঃ আকাঙ্ক্ষা করে। যদি পরবর্তীরা সকলেই সম অংশীদার হয় তাহা হইলে সম্পত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইবেই এবং যদি ক্রমশঃ তাহা ঘটে তবে সেই যশঃ লাভ সম্ভবপর হয় না। এইজন্যই সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরই অধিকাংশ স্থলে সম্পত্তি বর্তিয়া থাকে।

অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই বিবাহ হয়; আইন তাঁহাদের বিরুদ্ধে হইলেও তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণের ক্ষমতা ও বিশেষ বিশেষ স্বাধিকারের অংশীদার। তাঁহারা শক্তিমান স্বামীর সহধর্মিণী বলিয়াও আরও কত কিছুতে বিশেষ গৌরব বোধ করেন; স্বামীর প্রতিষ্ঠায় আনন্দ তাঁদের মনেও বেশ ভালোই জাগে;—যদিও স্ত্রীপুরুষের অধিকারের বৈষম্য বিষয়ে মৌখিক আলোচনায় তাঁরা খুব মুখরা হন, কিন্তু তাহা কাজে পরিণত করার সময় তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া এই আন্দোলনে যোগ দিতে বিমুখ হইয়া পড়েন। কাজেই যখন আমি স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রকার আইনগত বাধানিষেধ রদ করিবার বিষয় অনুমোদন করি, আমি ভারতের শিক্ষিতা নারীগণকে উহার মূল কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বলি। নারী ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার প্রতীক। কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদের আবির্ভাবে সমাজ পবিত্রীকৃত হইবে; পুরুষের উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সঞ্চয়বৃত্তি প্রতিরুদ্ধ হইবে। তাঁহারা জানিয়া রাখুন কোটি কোটি লোকের এমন সম্বল থাকে না, যা তাঁহারা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীকে দিয়া যাইতে পারেন। তাঁহাদের জীবন হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনিকের পক্ষে একেবারে কোন পৈত্রিক সম্পত্তি না থাকাই শ্রেয়ঃ। পিতামাতা সকল সন্তানকে সমানভাবে যে প্রকৃত সম্পদ

দিতে পারেন তাহা হইতেছে তাহাদের চরিত্রগঠনের এবং প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধা। পিতামাতাগণ তাঁদের ছেলে-মেয়েদের এমনভাবে আত্মনির্ভরশীল করিতে চেষ্টা করিবেন, যেন নিজের পরিশ্রম ও যত্নে তাহারা সদ্‌ভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়। নাবালক সন্তানগণের লালনপালনের ভার তখন স্বাভাবিক নিয়মেই বয়স্ক পরবর্তীদের উপর পড়িবে। ধনিগণ তাঁহাদের সন্তানগণকে পৈত্রিক সম্পত্তির ক্রীতদাসে পরিণত করিবার অযোগ্য বাসনার পরিবর্তে তাহাদিগকে যদি আত্মনির্ভরশীল করিবার জন্য শিক্ষাদানের সাধু সংকল্প গ্রহণ করেন তবে তাঁহাদের সন্তানগণের বর্তমান অক্ষমতা ও অকর্মণ্যতা অনেকটা দূরীভূত হইতে পারে। পৈত্রিক সম্পত্তি মৌলিক আত্মপ্রচেষ্টার পরিপন্থী; প্রাপ্ত পিতৃসম্পদ অলসতা ও বিলাসিতার আনুষঙ্গিক ভোগলালসা পরিপুষ্ট করে। নবজাগ্রত নারীগণের কর্তব্য হইবে যুগাগত ব্যাধিগুলিকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহাদের মূলে উৎসাদিত করা।

স্ত্রীপুরুষের পারস্পরিক কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অভীপ্সা হইতেই যে উভয়ের অধিকার-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে সে বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক করে না। নারী তাহার নিজের অজ্ঞাত সূক্ষ্মকৌশলজালে জড়াইয়া নানাভাবে পুরুষকে বশীভূত এবং প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা করিয়াছে। সেই ধারায় পুরুষও অনুরূপ অজ্ঞাতসারে নারীকে তাহার উপর আধিপত্য স্থাপনে ব্যর্থ ও বিফল করায় প্রয়াসী হইয়াছে। ফলে সৃষ্টি হইয়াছে একটি অচল অবস্থা। এই ভাবে দেখিতে গেলে, ভারতমাতার সুশিক্ষিত কন্যাগণের হস্তক্ষেপের মুখ চাহিয়া রহিয়াছে এই একটি গুরুতর সমস্যা। তাঁহাদের পশ্চিম প্রণালী অনুকরণ করিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ উহা সেখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী সন্দেহ নাই। তাঁহারা ভারতীয় প্রতিভা এবং ভারতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী প্রণালী অবলম্বন করিবেন। আমাদের কৃষ্টিতে যাহা ভাল তাহা রক্ষা করিয়া এবং যাহা হেয় এবং অবনতির কারণ তাহা বিনা দ্বিধায় বর্জন করিয়া তাঁহারা আত্মশক্তির বলে সমাজকে সংযত পবিত্র করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহা সীতা, দ্রৌপদী, সাবিত্রী দময়ন্তীগণের কাজ; বিলাসমগ্না, পৌরুষধর্মী এবং তথাকথিত প্রগতিশীল নারীদিগের নহে।

[ইয়ং ইন্ডিয়া, ১৭-১০-'২৯]

৪

স্মৃতিশাস্ত্রে নারী

একজন সংবাদদাতা বেজোয়াদা হইতে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান স্বরাজ্য' পত্রিকার একখণ্ড আমাকে পাঠাইয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর স্থান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ ইহাতে আছে। বিনা পরিবর্তনে আমি উহা হইতে নিম্নের অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম :—

"স্ত্রী সর্বদাই পতিকেই ঈশ্বর-জ্ঞানে ভক্তি করিবে, যদিও স্বামী চরিত্রহীন, ইন্দ্রিয়সেবী এবং সদ্‌গুণরহিত হয়। (মনু ৫।১৫৪)

"নারীগণ তাহাদের স্বামীর কথানুযায়ী চলিবে। ইহা তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৮)

"স্ত্রীলোকের পৃথক যজ্ঞ, আচার-নিয়ম বা উপাসনাদি নাই। স্বামীর সেবা করিয়া স্ত্রী স্বর্গে উচ্চস্থান লাভ করে।

(মনু ৫।১৪৫)

"যে স্ত্রী স্বামীর জীবতকালে উপাসনা করে, যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম করে, সে স্বামীর জীবন স্বল্পায়ু করিয়া দেয়। সেই স্ত্রী নরকে যায়। যে স্ত্রী পবিত্র উদক পান করিতে চায়, সে স্বামীর পাদদ্বয় অথবা সর্বাঙ্গ ধৌত করিয়া সেই জল পান করিবে এবং সে পরলোকে সর্বোচ্চস্থান লাভ করিবে।

(অত্রি ১৩৬।৩৭)

"স্বামীগৃহ ছাড়া স্ত্রীর উচ্চতর জগৎ নাই। যে স্ত্রী স্বামীকে অসন্তুষ্ট করে, মৃত্যুর পর সে তাহার নিকট যাইতে পারে না। কাজেই সে কখনও স্বামীকে অসন্তুষ্ট করিবে না।

(বশিষ্ঠ ২১।১৪২)

"যে স্ত্রী তাহার পিতৃপরিবারের গর্ব করে, এবং স্বামীর আদেশ অমান্য করে, তাহাকে রাজা বিশাল জনতার সম্মুখে কুকুর দ্বারা ভক্ষণ করাইবে।

(মনু ৮।৩৭১)

"স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীর দেওয়া অন্ন কেহ ভোজন করিবে না। এরূপ স্ত্রীকে ইন্দ্রিয়পরায়ণা জানিবে।

(অঙ্গিরস ৬৯)

"স্বামী কদাচারী, মদ্যপায়ী অথবা শারীরিক ব্যাধিযুক্ত হইলে যদি স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয় তবে তিন মাসের জন্য তাহার মূল্যবান বস্ত্রাদি ও রত্নালঙ্কার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দূরে রাখিতে হইবে।

(মনু ২০।৭৮)"

—ইহা ভাবিতে দুঃখ হয়, যে সকল পুরুষ নারীর স্বাধীনতা নিজের স্বাধীনতার ন্যায় জ্ঞান করেন এবং যাঁহারা নারীকে জাতির মাতৃস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের শ্রদ্ধাকর্ষণের অযোগ্য এই সকল নীতিবাক্য স্মৃতিশাস্ত্রে রহিয়াছে; ইহা আরো পরিতাপের বিষয়, যে পত্রিকা গোঁড়া হিন্দুসমাজের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতে এই সকল বাক্য ধর্মের সমর্থনকল্পে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য স্মৃতিসমূহে অনেক বাক্য আছে, যাহাতে নারীকে উপযুক্ত মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে এবং এই সকল শাস্ত্রকার নারীকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছেন।

প্রশ্ন উঠে, —সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র লইয়া কী করা যায়, যাহার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী এবং নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তিসমূহ একই সঙ্গে বিদ্যমান? আমি বহুবার ইতঃপূর্বে এই পত্রিকার স্তম্ভে বলিয়াছি যে, ধর্মশাস্ত্রের নামে যাহা কিছু ছাপা হয় তাহাই ভগবদ্‌বাণী বা আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সকলেই বিচার করিতে পারে না কোন্‌টা ভালো এবং অকৃত্রিম, আর

কোন্‌টা মন্দ এবং প্রক্ষিপ্ত। কাজেই এইরূপ একটি ক্ষমতাবান সঙ্ঘ থাকা দরকার, যে সঙ্ঘ ধর্মশাস্ত্র নামে নির্বিবাদে যাহা চালাইয়া দেওয়া হয় তাহা সংশোধন করিবে, এবং যে সকল শাস্ত্রবাক্যের কোন নৈতিক মূল্য নাই সেগুলি, অথবা যেগুলি ধর্ম ও নীতির মূলতত্ত্বের বিরোধী, সেগুলি বর্জন করিয়া শাস্ত্রের একটি সংশোধিত সংস্করণ হিন্দু সমাজের অনুসরণের জন্য প্রকাশিত করিবে। সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং যাঁহারা ধর্মাচার্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা এই সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না ইহা নিশ্চিত। কিন্তু তজ্জন্য সমাজ সংস্কারের এই পবিত্র প্রচেষ্টা যেন কোনরূপে ব্যাহত না হয়। সরল মনে এবং সেবাবুদ্ধির বশে যে কাজ করা যায় তাহা শেষ পর্যন্ত সকলের প্রতিই কার্যকর হয়; এবং ইহা ধ্রুবসত্য যে, এইরূপ নিষ্কাম কর্মে সহায়তা যখন একান্ত প্রয়োজন হইবে তখন তাহা আসিয়া পড়িবে।

[হরিজন, ২৮-১১-'৩৬]

৫
নারী ও বর্ণভেদ

জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন :—"বর্ণ সম্বন্ধে সম্প্রতি হরিজন পত্রিকায় আপনার লিখিত প্রবন্ধ হইতে ইহাই বোধ হয় যে, আপনার আলোচিত বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় নীতি শুধু পুরুষের উপরই প্রযোজ্য। তাহা হইলে নারীদের সম্বন্ধে কী হইবে? স্ত্রীলোকের বর্ণধর্ম কীরূপে নিরূপিত হইবে? আপনি হয়তো উত্তরে বলিবেন যে, বিবাহের পূর্বে সে তাহার বর্ণধর্ম এবং বিবাহের পর স্বামীর বর্ণধর্ম গ্রহণ করিবে। ইহা কি বুঝিতে হইবে যে, আপনি মনুর বিখ্যাত অভিমত সমর্থন করেন যে স্ত্রীলোকের জীবনের কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা থাকিতে পারে না,—বিবাহের পূর্বে সে পিতামাতার আশ্রয়ে থাকিবে, বিবাহের পর স্বামীর অধীনে থাকিবে এবং বিধবা হইলে সে তাঁহার সন্তানগণের আশ্রয় গ্রহণ করিবে?

"ইহা যেরূপই হউক প্রকৃত বিষয় এই যে, বর্তমান যুগ নারীগণের স্বাধীনতার যুগ এবং তাহারা স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রার উপায় অবলম্বনে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতায় সুনিশ্চিতভাবে অবতীর্ণ হইয়াছে। বর্তমানে ইহা প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেছে এবং তাহার স্বামী মহাজনী ব্যবসা করিতেছে। এরূপ অবস্থাতে স্ত্রীলোকটি কোন্ বর্ণধর্ম আশ্রয় করিবে? বর্ণাশ্রমের বিধানমতে পুরুষ সাধারণতঃ তাহার পিতার ব্যবসাই অবলম্বন করে এবং কাজেকাজেই সে তাহার পিতামাতার বর্ণধর্মও গ্রহণ করে; স্ত্রীলোক তাহাদের পিতামাতার বর্ণধর্ম গ্রহণ করিবে এবং বিবাহের পরে নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত থাকিবে ইহা আশা করা সঙ্গত। তাহাদের সন্তানগণ এই বর্ণগুলির কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত হইবে? অথবা আপনি কি সন্তানগণের নিজেদের উপরেই এই প্রশ্ন তাদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে সমাধানের ভার দিবেন? শেষোক্ত অবস্থায় আপনার

প্রচারিত বর্ণধর্মে বর্ণাশ্রমের যে বংশানুগত ভিত্তির কথা বলিয়াছেন তাহার কী হইবে?"

—আমার মতে বর্তমান অবস্থায় উত্থাপিত প্রশ্ন অবান্তর। উল্লিখিত প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে, বর্তমান বর্ণাশ্রমগুলি এলোমেলো হওয়ার দরুণ প্রকৃতপক্ষে কোন বর্ণই বিদ্যমান নাই। বর্ণসম্বন্ধীয় মূল নীতিই এখন আর কার্যকর নহে। হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থাকে অরাজকতার অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা যায়; চতুর্বর্ণ আজ নামে মাত্র বর্তমান। আমরা যদি বর্ণের নাম ধরিয়া কথা বলিতে চাই, তবে স্ত্রী পুরুষ সকলেই আজ একই বর্ণভুক্ত। আমরা সকলেই শূদ্র।

আমার কল্পিত পুনরুজ্জীবিত বর্ণধর্মে বিবাহের পূর্বে মেয়ে ঠিক তাহার ভ্রাতার ন্যায় পিতার বর্ণভুক্ত থাকিবে; বিভিন্ন বর্ণের ভিতর পারস্পরিক বিবাহ অনুষ্ঠান চলিবে। কাজেই মেয়ে তাহার বর্ণ বিবাহের পরও অক্ষুণ্ণই রাখিবে। কিন্তু যদি স্বামী ভিন্নবর্ণযুক্ত হন তবে বিবাহের পর সে পিতামাতার বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই স্বামীর বর্ণ গ্রহণ করিবে। এইরূপ বর্ণ পরিবর্তন দ্বারা কাহারও মানসিক ভাবসম্পদের উপর কোন কটাক্ষ করা হইতেছে এরূপ মনে করিবার হেতু নাই; কারণ পুনরুদ্দীপনার যুগে বর্ণ-প্রতিষ্ঠার অর্থ স্পষ্টতঃই এই হইবে যে, সামাজিক হিসাবে চারিটি বর্ণ সম্পূর্ণ সমস্থানীয়।

স্ত্রী স্বামী হইতে পৃথক্ভাবে কোন কর্মপন্থা সর্বদাই অবলম্বন করিবে, ইহা আমি মনে করি না। সন্তানগণকে লালন পালন করিতে এবং গৃহযাত্রা নির্বাহ করিতেই তাহার সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হইবার কথা। কোন সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে পরিবার প্রতিপালন করিবার অতিরিক্ত ভার বহন তাহার উপর পড়া উচিত নয়। পুরুষ পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিবে এবং স্ত্রী গৃহকর্ম দেখিবে এবং এইভাবে দুইজনের জীবনযাত্রা পরস্পরের অনুপূরক ও পরিপোষক হইয়া পারিবারিক কল্যাণ সাধন করিবে।

ইহাতে স্ত্রীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয় বা তাহাদের স্বাধীনতা বাহিরের চাপে বিনষ্ট করা হয় ইহা আমি মনে করি না। মনুর উক্তি বলিয়া যাহা কথিত হয়—"স্ত্রীলোকের কোন স্বাধীনতা থাকিতে পারে না," তাহা আমার নিকট বেদবাক্যের মতো অলঙ্ঘনীয় নয়। ইহা এইমাত্র প্রমাণ করে, যে সময়ে এই অনুশাসন প্রবর্তিত হয় তখন সম্ভবতঃ নারীদের একপ্রকার অধীন করিয়াই রাখা হইত। আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীকে "অর্ধাঙ্গিণী" (উত্তম অর্ধেক) এবং "সহধর্মিণী" (সহায়কারিণী) এইরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। স্বামী স্ত্রীকে 'দেবী' বলিয়া সম্বোধন করে, তাহাতে স্ত্রীকে কোনরূপ ছোট করিয়া দেখার মনোভাব প্রকাশ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এমন একটি সময় আসিয়াছিল, যখন নারীকে তাহার অনেক অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হয় এবং তাহাকে নিম্নতর সামাজিক মর্যাদা ও স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু তখন তাহার বর্ণগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার কোন প্রশ্ন উঠে নাই। কারণ বর্ণ এই শব্দের দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের পৌর অধিকার বা জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বুঝায় না। ইহা শুধু কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্দেশ করে। যদি আমরা নিজেরা আমাদের কর্তব্য অবহেলা

না করি তবে আমাদিগকে তাহা হইতে কেহ বিচ্যুত করিতে পারে না। যে নারী তাঁহার কর্তব্য বিষয়ে সজাগ এবং তাহা সম্পন্ন করিতে সচেষ্ট, তিনি পরিবারে নিজের উন্নত মর্যাদা অনুভব করেন। সে গৃহের তিনি কর্ত্রী, সেখানে তিনি রাণী, ক্রীতদাসীর ভাব সেখানে জাগিতে পারে না।

অতঃপর ইহা বলা অনাবশ্যক যে, নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে আমি যাহা উল্লেখ করিয়াছি সমাজ যদি তাহা গ্রহণ করে, সন্তানগণের বর্ণ নির্ণয়ে কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি হইবে না; কারণ তখন স্ত্রী ও স্বামীর বর্ণ বিষয়ে বৈষম্য চলিয়া যাইবে।

[হরিজন, ১২-১০-'৩৪]

৬

নারী ও উৎকট সমর-প্রবণতা

অনেক সভায় বিশেষভাবে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে—নারী পুরুষদিগের সমর-প্রবণতা দমনে কীভাবে সহায়তা করিতে পারে। ইটালীতে কোন অপ্রকাশ্য সভায় ভারতের নারীদের নিকট হইতে ইটালীয় নারীগণ শিখিতে পারে এমন কিছু বলিবার জন্য গান্ধীজী অনুরুদ্ধ হন।

প্যারী শহরে তিনি বলিয়াছিলেন, "নারীগণ যদি শুধু ভুলিতে পারে যে তাহারা দুর্বল জাতি তাহা হইলে তাহারা যে যুদ্ধপ্রবণতার বিরুদ্ধে পুরুষের চেয়ে অনেকগুণ বেশী কাজ করিতে পারে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আপনারা নিজেরাই এই প্রশ্নের উত্তর দিন : যদি আপনাদের বড় বড় যোদ্ধা ও সেনাপতিগণের স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মাতাগণ তাঁহাদিগকে কোন প্রকারের যুদ্ধোদ্যমে উৎসাহদান করিতে অস্বীকার করেন তবে তাঁহারা কী করিবেন?

লুসোঁতে তিনি বলিয়াছিলেন, "আপনারা ইউরোপের নারীগণের প্রতি যে বাণীর জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, আমি জানি না আমার সেই বাণী দেওয়ার সাহস আছে কিনা। তাঁহাদের রোষভাজন না হইয়া যদি আমাকে তাহা করিতে হয়, তবে আমি তাঁহাদিগকে যে সকল ভারতের নারী গত বৎসর একযোগে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের নিকট যাইতে বলিব এবং ইহা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি যে, ইউরোপ যদি অহিংসার শিক্ষা গ্রহণ করিতে চায় তবে সেখানকার নারীগণের ভিতর দিয়াই তাহা করিতে হইবে। আমার ধারণা নারী আত্মত্যাগের জীবন্ত প্রতীক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, আজ নারীগণ বুঝিতে পারিতেছে না এই বিষয়ে পুরুষের চেয়ে কত প্রভূত সুযোগ সুবিধা তাহাদের আছে। টলস্টয়ের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাহারা পুরুষের মোহিনী শক্তির কুহকে পড়িয়া কতরূপে বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। অহিংসার শক্তি যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত তবে তাহারা অবলা বলিয়া অভিহিত হইতে স্বীকৃত হইত না।"

ইটালীতে কোন নারীমণ্ডলীর সহিত কথোপকথনস্থলে তিনি বলিয়াছিলেন, "অহিংস যুদ্ধের মজা এই যে, ইহাতে নারী পুরুষের সহিত সমভাবে অংশ গ্রহণ

করিতে পারে। হিংস্র যুদ্ধে নারীর এইরূপ সুযোগ-সুবিধা থাকে না; ভারতের নারীগণ পুরুষের চেয়ে অধিক কার্যকরভাবে গত অহিংস যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ইহার যৌক্তিকতা অতি সহজবোধ্য। অহিংস যুদ্ধে খুব বেশী পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিবার আবশ্যক হয়; এবং নারী অপেক্ষা অধিক পবিত্র ও উদারভাবে কে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে পারে? ভারতবর্ষে নারীগণ পর্দা ছিন্ন করিয়া জাতির জন্য কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের সেবা তাঁহাদের নিকট নিজেদের গৃহাশ্রমের কর্তব্যের চেয়ে বেশী কিছু দাবী করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয় নিষেধের প্রতিকূলে তাঁহারা লবণ তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিদেশী বস্ত্রের দোকানে এবং মদের দোকানে পিকেটিং করিয়াছিলেন এবং উভয় ক্ষেত্র হইতে বিক্রেতা ও খরিদ্দারের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হৃদয়ে সাহস এবং করুণা লইয়া গভীর রাত্রে তাঁহারা মদ্যপায়িগণকে তাহাদের আড্ডা পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা দলে দলে কারাগারে গিয়াছেন এবং তাঁহাদের তুলনায় অতি অল্প সংখ্যক পুরুষই লাঠির আঘাত পাইয়াছে। যদি পশ্চিমের নারীগণ পশুধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চেষ্টা করেন তবে ভারতের নারীর নিকট তাঁহাদের শিখিবার বিষয় কিছুই নাই। তাঁহাদের স্বামিগণকে নরহত্যার উৎসাহে উত্তেজিত করার আনন্দ হইতে এবং তাঁহাদের বীরত্বের জন্য গৌরব অনুভব করার লোভ হইতে তাঁহাদিগকে বিরত হইতে হইবে।"

মহাদেব দেশাই

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১-'৩২]

৭

নারীর বিশেষ অধিকার

'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় বরাবরেষু :—

"মহাশয়, বর্তমান ইউরোপীয় সমস্যার বিষয়ে লিখিত আপনার প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। বর্তমানে আপনি ইউরোপের উদ্দেশে কথা বলিবেন ইহা স্বাভাবিক। মানবতা যখন বিনাশের অতি-সন্নিকটে তখন আপনি কীরূপে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিবেন?

"পৃথিবী তাহাতে কর্ণপাত করিবে কিনা ইহাই প্রশ্ন। বিলাত হইতে প্রাপ্ত বন্ধুগণের চিঠিপত্র হইতে বুঝা যায় যে, সেই বিভীষিকাময় সপ্তাহটি ইংলণ্ড-বাসিগণ নিঃসন্দেহে অতিশয় যন্ত্রণায় কাটাইয়াছে। আমার নিশ্চিত ধারণা, সেই কথা সমগ্র পৃথিবীর প্রতিই প্রযোজ্য। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা ও তাহার দানবীয় উদ্ভাবনীশক্তি এবং তৎপ্রসূত নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও পাশবিকতার কল্পনাই জনগণকে নিশ্চিতরূপে এরূপ চিন্তা করিতে শিখাইয়াছে, যাহা তাহারা পূর্বে কখনও ভাবে নাই। জনৈক ইংরেজ বন্ধু লিখিয়াছেন, "যুদ্ধ হইবে না এই সংবাদে যে

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক হৃদয় হইতে যে কৃতজ্ঞতা ভগবানের চরণে নিবেদিত হইয়াছিল, আমি তাহা আমরণ ভুলিতে পারিব না।" তথাপি লোকে যুদ্ধকে এত ঘৃণা করে কেন? উহা কি অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের আশঙ্কা কিংবা নিকট আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনের অকাল মৃত্যু অথবা নিজের দেশের গৌরব ধূলিসাৎ হওয়ার আশঙ্কা? অপর একটি জাতির লাঞ্ছনা, অবমাননা সত্ত্বেও যুদ্ধ এড়ানো হইয়াছে, ইহাতে কি আমরা সুখী? যদি আমাদিগকে সম্মান বিসর্জন দিতে হইত তাহা হইলে কি আমাদের মনের ভাব অনুরূপ হইত? আমরা যুদ্ধকে কি ঘৃণা করি এই জন্য যে বিবাদ মিটাইবার ইহা ভুল পন্থা অথবা এই ঘৃণা কি আমাদের ভয়ের সহিত জড়িত? যদি পৃথিবী হইতে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ লোপ করিতে হয় তবে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতেই হইবে।

"বিপদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বাস্তবিকপক্ষে আমরা কী দেখিতে পাই? অস্ত্র-সম্ভারের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় প্রতিযোগিতা, যাবতীয় যুদ্ধের উপকরণাদি সংগ্রহে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক ও গভীর সংগঠন, ভাবী যুদ্ধার্থে স্ত্রী, পুরুষ, অর্থ, যুদ্ধ-কৌশল এবং সামরিক প্রতিভার সমাবেশ; উদ্দেশ্য, আবার যদি যুদ্ধ বাধিয়া উঠে! কোথাও স্পষ্টভাবে এই উক্তি কেহ করেই না "যুদ্ধ আর কিছুতেই হইতে দিব না।" এই সব বিষয় দ্বারা ইহা কি মানিয়া লওয়া হইতেছে না যে, আজ যে যুদ্ধ কোন প্রকারে এড়ানো হইল সেই যুদ্ধ ডেমোক্লিসের খড়্গের ন্যায় আমাদের মাথার উপর এখনও ঝুলিয়া রহিয়াছে?

"নারী হইয়া আমি দুঃখের সহিত অনুভব করি যে, নারীজাতি তাহার স্বভাবজাত বুদ্ধি ও প্রেম-ধর্মের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যতটুকু সহায়তা করিতে পারিত, তাহা করে নাই। আমার শুনিতে ও পাঠ করিতে দুঃখ হয় যে, সহকারী নারী-ফৌজ গঠিত হইতেছে; গভর্নমেন্টের তরফ হইতে নারীগণকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে এবং নারীগণও স্বেচ্ছায় রণক্ষেত্র এবং সৈন্যব্যূহের পশ্চাতে যুদ্ধের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে। তথাপি যখন যুদ্ধ বাধে নারীগণের হৃদয়ই প্রথমে যন্ত্রণায় নিষ্পেষিত হয়; তাহাদের আত্মা এমন দগ্ধ হয়—যাহা রক্ষা করার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। এই সকল বিষয় বোধের অতীত। কেন আমরা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যাহা সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর, তাহা নির্বাচন করিয়া লই নাই? বিনা দ্বিধায় কেন আমরা বীভৎস, হৃদয়হীন পশু-শক্তির নিকট নতজানু হইয়াছি? নারীজীবনের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে ইহা অতি শোচনীয় অধ্যায়। আমাদের জীবনের ঠিক আদর্শ আমরা বুঝিতে অক্ষম হইয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, নারীগণ যদি অহিংসার শক্তি ও গৌরব একবার প্রাণে প্রাণে অনুভব করিত তবে পৃথিবীর সব দিকে কল্যাণ হইত।

"আপনি আমাদিগকে, অর্থাৎ ভারতীয় নারী-সমাজকে কেন প্রবুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারেন না? আপনার অহিংস-সংগ্রামের কৃপাণরূপে আমাদের উপর আপনার সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবেন না কেন? কতবার আমার মনে এই আশা হইয়াছে যে, শুধু এই উদ্দেশ্যে আপনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করুন। আপনি আশ্চর্য

সাড়া পাইবেন এই আমার বিশ্বাস, কারণ ভারতীয় নারীর হৃদয় সুস্থ ও সবল, এবং পৃথিবীতে সম্ভবতঃ আর কোনও নারী-সমাজের পশ্চাতে আমাদের মতো ত্যাগ ও আত্মবলিদানের সুন্দর ইতিহাস নাই। যদি আমাদের দ্বারা কিছু করাইতে চান তবে আমরা খুব সামান্যভাবে হইলেও এই দুঃখময় ও ক্ষুব্ধ পৃথিবীকে শান্তির পথ দেখাইতে সক্ষম হইব।"

জনৈকা নারী
২২।১০।৩৮

—দ্বিধাশূন্যভাবে আমি এই পত্র ছাপাইয়া বাহির করিতেছি। নারীচিত্ত অনুপ্রাণিত করিবার বিষয়ে আমার ক্ষমতার উপর লেখিকার বিশ্বাস আমাকে উৎফুল্ল করে বটে; কিন্তু আমার ক্ষমতার সীমারেখা বুঝিবার পক্ষে আমার দীনতা যথেষ্ট অনুভব করি। আমার মনে হয়, আমার পরিভ্রমণের দিনগুলি ফুরাইয়া আসিয়াছে। লেখার দ্বারা যতদূর আমার করা সম্ভব অবশ্য আমি তাহা করিতে থাকিব। কিন্তু নীরব আত্মনিবেদনের কার্যকর শক্তির উপর বিশ্বাস বাড়িয়া যাইতেছে। নীরব প্রার্থনা আত্মিক জীবনের একটি সূক্ষ্ম কলা—সম্ভবতঃ সর্বোচ্চ কৌশল, যাহাতে অতি উচ্চস্তরের যত্ন ও অভ্যাস প্রয়োজন। আমি বিশ্বাস করি অহিংস-নীতির সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাই নারীজীবনের উদ্দেশ্য। সেই নারীহৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করিতে একজন পুরুষের উপর ভার দেওয়া কেন? যদি একজন পুরুষ হিসাবে না করিয়া, জনসাধারণ কর্তৃক আচরণীয় অহিংসব্রতের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র হিসাবে কেবল আমাকেই এই আবেদন করা হইয়া থাকে তবে ভারতের নারীগণের নিকট এই নীতি প্রচার করিবার জন্য যাওয়ার কোন প্রেরণা আমার নাই। আমি লেখিকাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, তাঁহার অনুরোধ মতে কাজ করিতে যে বিরত হইতেছি তাহা আমার অন্তরের ইচ্ছার অভাবহেতু নয়। আমার ধারণা এই, যদি কংগ্রেসের সেবকগণ অহিংস নীতিতে তাহাদের বিশ্বাস অখণ্ড রাখিতে পারে এবং অহিংস কর্মসূচী বিশ্বস্তভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে চালাইয়া যাইতে পারে, তবে নারীগণ আপনা আপনিই সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিত হইয়া পড়িবে। এবং ইহা হইতে পারে যে, তাহাদের মধ্যে এমন একজনের অভ্যুত্থান হইবে যিনি, আমি যতদূর করিতে পারিব আশা করি, তদপেক্ষা অনেকদূর বেশী অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবেন। কারণ অহিংস-ব্রতে নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে এবং অধিকতর সাহস প্রদর্শনে নারী পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিমতী। আমি বিশ্বাস করি, পুরুষ যেমন পশুশক্তিপ্রণোদিত সাহসে নারী হইতে শ্রেষ্ঠ, নারীও সকল সময়ে আত্মত্যাগের শক্তিতে পুরুষের চেয়ে অধিক বলিষ্ঠ।

রামু, ২৫-১০-'৩৮

[হরিজন, ৫-১১-'৩৮]

৮

নারীর কর্মপন্থা

১

সম্প্রতি এব্বটাবাদে নিখিল ভারত নারী সঙ্ঘের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সীমান্ত প্রদেশে ইহা তাঁহাদের প্রথম প্রয়াস। আমি জানিতে পারিলাম সভ্যগণ অত্যন্ত সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। কোনরূপ জাতিবর্ণবৈষম্য বা কোনরূপ ধর্মবিভেদ তথায় ছিল না। মুসলমান, শিখ ও হিন্দু রমণীগণ অবাধে পরস্পরের সহিত মিশিয়াছেন। কার্য্যকরী সমিতি নিম্নের তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন :—

১। নিখিল ভারত নারী সঙ্ঘেব কার্যকরী সমিতিব সভ্যগণ ইউরোপ এবং সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ চলিতে থাকায় তাহাদের গভীব দুঃখ ও নৈরাশ্য প্রকাশ করিতেছেন। যে সকল দেশ তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে এবং নাৎসী ও ফ্যাসিস্ট প্রভুত্বের লৌহপদমূলে পড়িযা রহিয়াছে তাহাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। ভারতের সর্বশ্রেণীর লোক অতি সুস্পষ্ট ভাষায় এই প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। পৃথিবীর সকল নারীর নিকট তাঁহারা পুনরায় আবেদন করিতেছেন, তাঁহারা যেন যুদ্ধদ্বারা বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার, অভিযোগাদি দূর করিবার প্রয়াসের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁহারা যেন শান্তি-প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহাদের সমগ্র ক্ষমতা নিয়োজিত করেন।

২। কার্যকরী সমিতি পুনরায় দৃঢ়ভাবে তাঁহাদের এই বিশ্বাস ব্যক্ত করিতেছেন যে, জাতিসমূহের একটি ভ্রাতৃসঙ্ঘ স্থাপনা দ্বারা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত করার জন্য অহিংসাই একমাত্র কার্যকর উপায়। এই আদর্শে পোঁছানো যে কত কঠিন তাঁহারা উপলব্ধি করেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা ভারতের নারীগণকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে অহিংস-নীতি অবলম্বন করিয়া তাহার বিকাশ-সাধনে চেষ্টা করিতে অনুরোধ জানাইতেছেন; কারণ তাঁহারা অনুভব করেন যে, ভারতের নারীগণ তাঁহাদের সর্বজনবিদিত জন্মজন্মাগত সেবা ও ত্যাগের বলে এই বিষয়ে পৃথিবীর নারীগণকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন।

৩। সভ্যগণ নিখিল ভারত নারী সঙ্ঘের এই মত পুনরায় সমর্থন করিতেছেন যে, ব্রিটেন যে উদ্দেশ্য লাভের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ সকল জাতির স্বাধীনতালাভ এবং নিখিলবিশ্বে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী স্থাপন—তাহার প্রাথমিক এবং ন্যায়সঙ্গত কাজ হওয়া উচিত ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করা।

—এব্বটাবাদে যে সকল ভগিনী মিলিত হইয়াছিলেন, দেখা যাইতেছে আমার মতই তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার পথ বিশ্বের নারীগণই প্রদর্শন করিবেন এবং তাহাই তাঁহাদের কর্তব্য। ইহা তাঁহাদের জীবনের বিশিষ্ট অধিকার ও অপূর্ব সুযোগ। সেইজন্যই সমিতি অহিংস-নীতিতে তাঁহাদের বিশ্বাস পুনরায় দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি আশা করি, যে সকল নারী সঙ্ঘের

কাজ ও ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাঁহারা সমিতির এই মতে বিশ্বাসী এবং তাঁহারা সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মে ব্রতী হইবেন।

সেবাগ্রাম, ২৭-৭-'৪০

[হরিজন, ৪-৮-'৪০]

২

উচ্চশিক্ষিতা কোন ভগিনীর লেখা হইতে কিয়দংশ বাদ দিয়া আমি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অহিংসা ও সত্যাগ্রহের আদর্শের মধ্যে জগতকে আপনি আত্মার গৌরব প্রদর্শন করিয়াছেন। মানবের পাশববৃত্তি কী ভাবে জয় করিতে হয় এই দুইটি শব্দে তাহার সমাধান মিলিবে।

"হস্তশিল্পের আশ্রয়ে শিক্ষাদান" শুধু একটি মহতী কল্পনা নয়, শিক্ষার একমাত্র প্রণালীও—যদি আমাদের সন্তানগণকে আমরা আত্মনির্ভরশীল করিতে চাই। আপনিই এই উপায়ের কথা বলিয়াছিলেন; আপনার পূর্বোক্ত একটি বাক্য-দ্বারা সমগ্র ভারতের বিরাট শিক্ষাসমস্যার সমাধান করিয়াছেন। অভিজ্ঞতা এবং অবস্থানুসারে বিস্তৃত কার্যপ্রণালী স্থির করা যাইতে পারিবে।

"আমরা নারীগণের সমস্যা নিষ্পত্তি করিতে আপনাকে অনুরোধ করি। রাজাজী বলেন, নারীদের সম্বন্ধে কোন সমস্যাই নাই। সম্ভবতঃ রাজনীতিগতভাবে নাই। সমস্যা শব্দ যদি ব্যবসা বা জীবিকা অর্জনের নানা বিষয়ে প্রযুক্ত হয় তবে বলা যায়, আইন পাশ করিয়া সকল ব্যবসা স্ত্রী-পুরুষের জন্য উন্মুক্ত করা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের প্রকৃতিগত যে বিভেদ রহিয়াছে তাহার তো ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

"আমাদের নিচ বৃত্তিগুলি বশে আনিতে হইলে অহিংসা এবং সত্যাগ্রহ ছাড়া অতিরিক্ত কতকগুলি মৌলিক তথ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। যেমন পুরুষের, তেমনি নারীর আত্মাও শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভ করিতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু পুরুষের পক্ষে তাহার উদ্ধত স্বভাব, লালসা, কষ্ট দিবার স্বভাবজাত পাশবিক বৃত্তি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইতে হইলে যেমন অহিংসা এবং সংযমের প্রয়োজন, তেমনি পুরুষ হইতে বিভিন্ন এবং সাধারণতঃ নারীর স্বভাবজাত বলিয়া কথিত এইরূপ কতিপয় নিচবৃত্তি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নারীকে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করিতে পারে এমন কতকগুলি নিয়মের প্রয়োজন। তাহাব স্ত্রীসুলভ স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি লক্ষ্য করিয়া এবং স্ত্রীজাতি বলিয়াই তাহাকে যে ভাবে শিক্ষিত করা হয়, এবং সেই হিসাবেই তাহার জন্য যে পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়—এই সবগুলিই তাহার যথাযোগ্য বিকাশের প্রতিকূল। তাহার প্রতি কাজেই এই বিষয়গুলি অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি, শিক্ষাদীক্ষা এবং পরিবেষ্টনী তাহার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে এবং তজ্জন্য গতানুগতিকভাবে অনেকে বলিবার সুযোগ পায় 'যাহাই বল, সে ত নারী বই কিছু নয়'। এ যেন গলায় 'নারী' নামক একটি চিহ্ন ঝুলাইয়া তাহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা। আমার ধারণা, আমরা সমস্যার ঠিক সমাধান করিতে

পারিলে এবং আমাদিগকে উন্নীত করিবার ঠিক পন্থা বাহির করিতে পারিলে, সহানুভূতি, কোমলতা প্রভৃতি যে সকল সদ্‌গুণ আমাদের আছে সেইগুলি বাধা-স্বরূপ না হইয়া সহায়ক হইবে। শিশু ও পুরুষগণের সমস্যা আপনি যেভাবে সমাধান করিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে আমাদের আত্মোৎকর্ষের প্রয়াস, আমাদের অন্তরাত্মা হইতে উদ্‌গত হইবে।

"আমি স্বভাব, শিক্ষাদীক্ষা এবং পরিবেশের কথা বলিয়াছি। বিষয়টি আরও ভালো করিয়া বুঝাইবার জন্য আমি একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

"সন্তানগণের মাতারূপে নারী স্বভাবতঃই মৃদুস্বভাব, কোমলহৃদয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ। তাহার অজ্ঞাতসারে এইগুলি তাহাকে বহুলপরিমাণে অনুপ্রাণিত করে। সেইজন্য কাজের সময় আসিলে নারী অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়। পুরুষের সঙ্গে চলিবার সময় নারী নানাপ্রকার ভুল করিয়া বসে। যেখানে কোমলহৃদয় হওয়া উচিত নয়, সে সেখানে তাহাই হইয়া পড়ে। নারী সহজেই ভাবপ্রবণ, অভিমানিনী এবং সাধারণতঃ ভুলচুক করিয়া থাকে।

"যদিও আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রবল ইচ্ছা আমার ছিল এবং এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া পূর্বরাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটাইয়াছিলাম—যখন আমি আপনাকে দর্শন করিতে গেলাম এবং আপনার সমক্ষে যখন আমাকে বসিতে বলা হইল তখন আমি শ্রীদেশাই মহাশয়ের বিশাল পৃষ্ঠদেশের আড়ালে গিয়া বসিলাম। আমি আপনার কথাও শুনিতে পাইলাম না এবং আপনাকে দর্শন করিতেও বাধা নিজেই সৃষ্টি করিলাম। ইহা কীরূপ বোকামি হইল! তদুপরি আমি দেখিলাম যে আমার বলার বিষয় বুঝাইতে পারিলাম না—আমার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। আমার প্রকৃতি ভাবপ্রবণ হওয়ায় উহা সহজেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায় এবং এইজন্যই এইরূপ ঘটিয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে নিশ্চয়ই এই বিশেষ দোষটা সংশোধিত হইত, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস অনুরূপ বোকামির জন্য তখন অন্য কোন কাজ করিয়া বসিব।

"নারীগণের কর্তব্য সম্বন্ধে জাতীয় পরিকল্পনা উপসমিতি কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তর আমার জনৈক বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন তাহা তিনি আমাকে দেখাইয়াছেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রশ্নগুলি নম্বর দিয়া সাজানো এবং কতকটা এইরূপ—আপনার গ্রামাঞ্চলে নারীগণ নিজ-স্বত্বে সম্পত্তি-অর্জন, রক্ষণ, উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ, বিক্রী বা অন্যরূপে হস্তান্তর কতদূর করিতে পারেন? নারীগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী যে সকল বিভিন্ন কাজ বা চাকুরীতে ব্রতী হইতে চান, তাহার উপযোগী শিক্ষা এবং অনুশীলনের কী কী ব্যবস্থা করা হইয়াছে অথবা কী কী সুযোগ-সুবিধা আছে? আমার বন্ধু এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, কিন্তু লিখিয়াছেন,—পুরাকলে নারীগণ নারী বলিয়াই কোনরূপ শিক্ষালাভ করিতেন না, সত্যের অপলাপ না করিয়া ইহা আমরা বলিতে পারি না এবং 'বৈদিক যুগে বিবাহের পরই পত্নীকে গৃহে সম্মানিত স্থান দেওয়া হইত এবং স্বামীর গৃহে তিনিই সর্বময়ী কর্ত্রী হইতেন' ইত্যাদি এবং তাহার সমর্থনে মনু হইতে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী ছিল বর্তমান যুগের প্রথাগুলি সম্বন্ধে। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরাকালে আচার-নিয়ম সম্বন্ধে লিখিবার কী প্রয়োজন ছিল? তিনি অস্ফুটভাবে যাহা বলিলেন তাহাতে তাঁহার ধারণা এই ছিল বুঝা যায় যে, একটি রচনা হিসাবে উত্তর দিলেই সুন্দর হইবে এবং উৎসাহের সহিত বলিলেন যে অমুক মহিলার উত্তর তাহার উত্তর অপেক্ষা আরও খারাপ হইয়াছে। আমার ধারণা, উপযুক্ত শিক্ষা-লাভের অভাবই আমার বন্ধুর এই ভুলের কারণ; তিনি নারী বলিয়াই তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। একজন কেরানীও জানে যে কাহাকেও কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে সে অন্য বিষয়ে রচনা লিখিবে না।

"এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া আমার কথা বুঝাইবার আরও চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা আছে আমি মনে করি না। সকল শ্রেণীর নারীদের সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞতা আপনার রহিয়াছে এবং তাহা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন—ঠিক পথে চালিত করিবার মূলনীতি সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞতা কতদূর।

"আপনি আমাকে হরিজন পত্রিকা পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি অতি আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু এ পর্যন্ত ত আমি অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেখিতে পাই নাই। সুতা কাটা এবং জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়াস এই শিক্ষার কয়েকটি দিক। কিন্তু এইগুলি সমগ্র সমস্যার সমাধান করে না। কারণ আমি এরূপ নারী দেখিয়াছি যাঁহারা সুতা কাটেন এবং জাতীয় মহাসমিতিব আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতেও চেষ্টা করেন, অথচ তাঁহারা এমন সব ভুল করিযা বসেন, যেগুলির কারণ নির্দেশ করিতে গেলে 'তাঁহারা অবলা নারী' এই কথাই বলিতে হয়।

"নারী পুরুষের মত হউক আমি ইহা চাই না। কিন্তু আপনি পুরুষকে যেমন তাহার নিচপ্রকৃতি শোধনের জন্য অহিংসার বাণী শিক্ষা দিয়াছেন, সেরূপ আমাদিগকেও শিক্ষা দিন কী ভাবে আমাদের খামখেয়ালী বৃত্তিগুলি দূর করিতে পারি। কৃপা করিয়া বলিয়া দিন, আমাদের সদ্‌বৃত্তিগুলির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার কীরূপে করিতে পারি এবং কী ভাবে আমাদের অন্তরায়গুলিকে আত্মোৎকর্ষের উপায়ে পরিণত করিতে পারি।

"নারীরূপে জীবনের এই গুরুভার আমি সর্বদা অনুভব করিতেছি। যখনই কাহাকেও বিদ্রূপের সুরে বলিতে শুনি, 'সে নারী বই ত নয়' তখন আমার অন্তরাত্মা সংকুচিত হইয়া পড়ে—যদি মানবাত্মার তেমন অবস্থা সম্ভব হয়। একজন পুরুষের সহিত আমি এই সব বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার বন্ধুর বাড়ীতে সেই শিশুটিকে দেখিয়াছেন? সে রেলগাড়ী নিয়া খেলা করিতেছিল এবং যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ীখানি একটি থামে গিয়া না ঠেকিয়াছে ততক্ষণ সে আনন্দে টগ্‌বগ্‌ করিতেছিল। থামটি ঘুরিয়া না যাওয়ায় সে নিজের কাঁধের ঠেলায় থামটিকে সরাইবার চেষ্টা করিল এবং তাহার বালসুলভচিত্তে ভাবিল যে সে উহা সরাইতে পারিবে। আপনার কথা আমাকে তাহার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা মনোবিজ্ঞানের বিষয়। আপনি ইহা বুঝিতে এবং তাহার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমার হাসি পায়।"

এই ভাবিয়া গর্ব বোধ করিতাম যে, "সত্যাগ্রহ" উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে নারীগণের সমস্যা সমাধানে আমার প্রয়াসও সুনির্দিষ্টভাবে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই পত্রলেখিকার মতে পুরুষগণের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা তাহা হইতে পৃথক্ রকম ব্যবস্থা নারীগণের জন্য হওয়া আবশ্যক। যদি তাহাই হয়, তবে আমি মনে করি না যে কোন পুরুষ ইহার উপযুক্ত সমাধান করিতে পারিবে। সে যতই চেষ্টা করুক না কেন নিশ্চয়ই অকৃতকার্য হইবে, কারণ প্রকৃতি তাহাকে নারী হইতে পৃথক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। চাষের মই-এর নিচে পড়া ব্যাঙ্ই জানে কোথায় উহা তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে। কাজেই শেষ পর্যন্ত নারীর কী কী আবশ্যক তাহা নারীই যথাযথভাবে নির্ণয় করিতে পারিবে। আমার নিজের ধারণা এই—যখন পুরুষ ও নারী মূলতঃ এক, তাহাদের সমস্যাগুলিও মূলতঃ একই হইবে। উভয়ের অন্তরাত্মা একই স্বভাবাপন্ন। উভয়ে একই জীবন যাপন করে, এবং তাহাদের চিন্তাভাবনাও একই প্রকারের। একে অন্যের অনুপূরক। একজন আর একজনের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত বাঁচিতে পারে না।

কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক যুগ যুগান্তর হইতে পুরুষ নারীর উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে এবং সেইজন্য নারীর মনে সর্বদাই এই সংস্কার দানা বাঁধিয়াছে যে সে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল, ক্ষীণশক্তি। এই স্বার্থপ্রণোদিত শিক্ষা যাহা পুরুষ নারীকে দিয়া আসিয়াছে, নারী তাহার সত্যতায় বিশ্বাস করিয়া মানিয়া নিয়াছে সে পুরুষ অপেক্ষা সর্বাংশে অপকৃষ্ট। কিন্তু মনীষিগণ পুরুষ এবং নারীর সমান মর্যাদা স্বীকার করিয়াছেন।

মর্যাদা সমান হইলেও কোন সন্দেহ নাই যে, একস্থানে যাইয়া উভয়ের কর্তব্যের ক্ষেত্র দুই দিকে বিভক্ত হইয়াছে। উভয়ে মূলতঃ এক হইলেও ইহাও অনুরূপ সত্য যে, উভয়ের মধ্যে দেহের গঠনে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। সেইজন্য উভয়ের কর্মক্ষেত্রের পরিসরও বিভিন্ন রকমের। অধিকাংশ নারীকেই মাতৃত্বের যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় এবং সেইজন্য তাহাদের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক যাহা পুরুষের না থাকিলেও চলে। পুরুষ কর্মপ্রবণ, নারী সহনশীলা। তিনি গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী। পুরুষ খাদ্যাদি সংগ্রহে উন্মুখ এবং নারী খাদ্যসম্ভার রক্ষা করেন এবং বিতরণ করেন। সেবাপরায়ণা শব্দে যাহা বুঝায় তিনি তাহাই। শিশুগণকে লালনপালন ও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল নারীরই বিশিষ্ট অধিকার; তাহার যত্ন ব্যতীত জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

নারীকে তাহার গৃহকর্ম হইতে সরাইয়া আনা বা তাহা পরিত্যাগ করিতে তাহাকে প্ররোচিত করা এবং সেই গৃহ রক্ষা করিবার জন্য তাহার কাঁধে বন্দুক তুলিয়া দেওয়া, আমার মতে পুরুষ ও নারী উভয়েরই মর্যাদাহানিকর। ইহা বর্বরতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিনাশের সূচনা। পুরুষ যে ঘোড়ায় চড়ে, নারী সেই ঘোড়ায় চড়িতে চেষ্টা করিলে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই অবনতি সুনিশ্চিত। পুরুষ তাহার সঙ্গিনীকে তাহার বিশিষ্ট কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিলে, বা তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলে, নিজের মাথার উপরেই পাপের বোঝা চাপাইবে। বহিঃশত্রু হইতে নিজের গৃহ রক্ষা করা যেমন বীরত্বের নিদর্শন, সেই

গৃহ শৃঙ্খলার সহিত পরিপাটিভাবে রাখাও অনুরূপ সাহসিকতার কাজ।

লক্ষ লক্ষ কৃষককে তাহাদের স্বাভাবিক পরিবেশের ভিতর দেখিতে দেখিতে, এবং ক্ষুদ্র সেবাগ্রামে প্রত্যহ তাহাদিগকে দেখিয়া আমি এই মত পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, কর্মভূমির ভিন্ন ভিন্ন স্বাভাবিক বিভাগ বর্তমান রহিয়াছে। মেয়ে কর্মকার বা সূত্রধর নাই। কিন্তু মাঠে স্ত্রী ও পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে —অবশ্য গুরুতর কাজগুলি পুরুষ করে। নারী গৃহরক্ষা করেন এবং গৃহকর্ম নির্বাহ করেন। মেয়েরা পরিবারে সামান্য আয় বৃদ্ধি করিলেও পুরুষেরাই কিন্তু মূল উপার্জনকারী।

কর্মভূমির বিভাগ স্বীকৃত হওয়ায়, নারী এবং পুরুষ উভয়েরই প্রায় একই রকমের সাধারণ গুণাবলী এবং কৃষ্টি আবশ্যক হয়।

ব্যক্তিগত জীবন বা জাতীয় জীবনের প্রত্যেক বিভাগে সত্য এবং অহিংসার নীতি গ্রহণ করিবার জন্য তাহার আদর্শ জনসাধারণের সম্মুখে স্থাপন করাই এই বিপুল সমস্যা সমাধানে আমার প্রয়াস। আমি এই আশা যত্নের সহিত পোষণ করিয়াছি যে, এই বিষয়ে নারীই অবিসম্বাদী নেত্রী হইবেন এবং মানবজাতির ক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁহার স্থান এইভাবে লাভ করিয়া নারী তাহার হীনমন্যতা বর্জন করিবেন। যদি সাফল্যের সহিত নারী ইহা করিতে পারেন তবে দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি কাজ যে যৌনস্পৃহা দ্বারা চালিত ও নিয়মিত হয়, এই আধুনিক মতবাদে তিনি সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন করিবেন। আমি হয়ত বিষয়টি এলোমেলোভাবে প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমি ভরসা করি যে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট। লক্ষ লক্ষ লোক যাহারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে তাহারা যৌনস্পৃহার ভূতগ্রস্থ, ইহা আমি অবগত নহি। এবং কৃষাণেরাও তাহাদের মাঠে একত্রে কাজ করিবার কালে এই ভাব দ্বারা অভিভূত বা পরিচালিত হয় না। ইহার অর্থ এই নয় বা এইরূপ ইঙ্গিতও করা হইতেছে না যে, তাহারা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে স্বভাবজাত আসঙ্গলিপ্সা নিহিত রহিয়াছে তাহা হইতে মুক্ত। কিন্তু যাহারা আধুনিক যৌন-সাহিত্যে মশগুল তাহাদের জীবনকে এই বৃত্তি যতটা পরিচালিত করে বলিয়া মনে হয়, কৃষাণদের জীবনকে যে তাহা ততটা অভিভূত করে না ইহা অতি সুনিশ্চিত। কঠোর বাস্তবজীবনের বিভীষিকাময় সত্যের সম্মুখীন হইলে স্ত্রী কিংবা পুরষ কাহারও এই সকল বিষয়ে মন দিবার সময় থাকে না।

নারী অহিংসার অবতার। অহিংসার অর্থ অপরিসীম প্রেম এবং সেই প্রেমের অর্থ কষ্ট সহ্য করিবার অপরিসীম ধৈর্য। মানবজননী নারী ছাড়া আর কে সর্বাপেক্ষা বেশী এই শক্তি দেখাইতে পারেন? নয় মাস শিশুকে গর্ভে ধারণ করিয়া এবং পোষণ করিয়া তিনি ইহা প্রতিপন্ন করেন এবং তজ্জনিত কষ্টের ভিতরও আনন্দ অনুভব করেন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ের দুঃসহ যন্ত্রণাজনিত কষ্টের চেয়ে অধিক কষ্ট আর কী হইতে পারে? কিন্তু সৃজনের আনন্দে তিনি সেই সব ভুলিয়া যান। শিশু উত্তরোত্তর বড় হউক, এইজন্য কে পুনরায় দিনের পর দিন কষ্ট ভোগ করে? তিনি সেই প্রেম বিশ্বমানবে অর্পণ করুন এবং তিনি যেন ভুলিয়া যান যে তিনি কখনও পুরুষের লালসার বস্তু ছিলেন বা হইতে

পারেন; এবং তিনি পুরুষের পার্শ্বে থাকিয়া তাহার মাতারূপে, সৃজনকারিণীরূপে এবং নীরব নেত্রীরূপে নিজ গর্বিত সম্মানের স্থান অধিকার করিতে পারিবেন। শান্তিরূপ অমৃতের জন্য তৃষ্ণার্ত যুদ্ধরত জগতে শান্তিলাভের এই অপূর্ব কৌশল শিখাইবার ভার তাঁহার উপর। তিনি সত্যাগ্রহের নেত্রী হইতে পারেন, কারণ সেখানে পুঁথিগত বিদ্যার দরকার হয় না, কিন্তু কষ্টসহিষ্ণুতা এবং স্থিরবিশ্বাস হইতে যে হৃদয়বল উপজাত হয় তাহারই প্রয়োজন অত্যধিক।

কয়েক বৎসর পূর্বে যখন পুণাতে সাসুন হাসপাতালে রুগ্নশয্যায় শায়িত ছিলাম তখন আমার সহৃদয়া সেবিকা একটি স্ত্রীলোকের গল্প আমাকে বলিয়াছিলেন। তিনি ক্লোরোফরম লইতে অস্বীকার করেন পাছে গর্ভস্থ শিশুর জীবন সংকটাপন্ন হয়। তাঁহার উপর যন্ত্রণাদায়ক একটি অস্ত্রোপচার করা হয়। শিশুর প্রতি তাঁহার ভালবাসাই তাঁহাকে অস্ত্রোপচার যন্ত্রণা সহ্য করিবার সামর্থ্য দেয়, কারণ গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করার জন্য কোন প্রকার কষ্ট বা যন্ত্রণাই তাঁহার পক্ষে অসহনীয় ছিল না। এই শ্রেণীর বীররমণী নারীদের মধ্যে অনেক পাওয়া যায়; কাজেই তাঁহারা যেন তাঁহাদের নারীত্বকে ঘৃণা না করেন এবং তাঁহারা পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়া যেন দুঃখ না করেন। এই বীররমণীর বিষয় ভাবিলে অনেক সময় নারীর প্রাপ্য স্থান ও মর্যাদা সম্বন্ধে আমার ঈর্ষা জন্মে; কিন্তু তিনি নিজের গৌরব ও মর্যাদা যদি একবার উপলব্ধি করিতেন! পুরুষের পক্ষে নারীজন্ম লাভের জন্য আগ্রহের যতটা কারণ দেখা যায়, নারীর পক্ষেও পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজসেবায় আত্মনিয়োগে ঔৎসুক্য বোধের যৌক্তিকতাও ততটাই রহিয়াছে, কিন্তু এই ইচ্ছা ফলবতী হইবার নয়। আমরা যে যে অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাতেই যেন সন্তুষ্ট থাকি এবং প্রকৃতি আমাদিগকে যে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিধান দিয়াছেন তাহাই যেন সম্পন্ন করিতে পারি।

সেবাগ্রাম, ১২-২-'৪০

[হরিজন, ২৪-২'-৪০]

৯

নারী ও তাঁহার কাজ

প্রশ্ন : আপনার মতে "নারীকে তাহার গৃহকর্ম হইতে সরাইয়া আনা বা তাহা পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত করা এবং সেই গৃহরক্ষার জন্য তাহার কাঁধে বন্দুক তুলিয়া দেওয়া পুরুষ ও নারী উভয়েরই পক্ষেই অপমানজনক। ইহা বর্বরতার দিকে পুনরাভিযান এবং বিনাশের সূচনা।" কিন্তু মাঠে এবং কারখানা প্রভৃতিতে যে লক্ষ লক্ষ মেয়ে মজুর রহিয়াছে, তাহাদের বিষয় কী বলিতে চান? তাহারা গৃহকর্ম পরিত্যাগ করিয়া "উপার্জনকারী" হইতে বাধ্য হইয়াছে। আপনি কি শিল্পব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়া পাথরের যুগে ফিরিয়া যাইতে চান? উহাও কি বর্বরতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিনাশের সূত্রপাত হইবে না? যে নূতন ব্যবস্থাপনায় নারী-

গণের কাজ করিবার পাপ থাকিবে না, আপনার কল্পিত সেই ব্যবস্থা কী?

উত্তর: যদি লক্ষ লক্ষ নারী গৃহকর্ম পরিত্যাগ করিয়া উপার্জনশীলা হইতে বাধ্য হয়—ইহা গর্হিত বটে, কিন্তু বন্দুক ঘাড়ে করিবার মতো গর্হিত নয়। শ্রমের মধ্যে মূলতঃ কোন বর্বরতা নাই। যে নারীগণ গৃহকর্মের প্রতি নজর রাখিয়াও স্বেচ্ছায় মাঠে কাজ করে, তাহাদের মধ্যে আমি বর্বরতার কোন লক্ষণ দেখি না। আমার কল্পিত নূতন ব্যবস্থায় পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভের জন্য সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিবে। নূতন ব্যবস্থায় নারী কতক সময়ের জন্য মজুরী করিবে, তবে তাহাদের প্রধান কর্তব্য হইবে গৃহকর্ম দেখাশোনা করা। নূতন যুগে বন্দুক চিরস্থায়ীভাবেই থাকিবে, ইহা আমি মনে করি না; পুরুষের ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। যতদিন চলে ইহা অপরিত্যাজ্য অমঙ্গল হিসাবেই চলিবে। কিন্তু আমি নারীকে ইচ্ছা করিয়া এই অকল্যাণের স্পর্শে কলুষিত করিতে চাই না।

সেবাগ্রাম, ১২।৩।৪০

[হরিজন, ১৬-৩-’৪০]

১০

সহবাস-সম্মতির বয়স

মিসেস ডোরথী জিনরাজদাস ব্যবস্থাপক সভায় আনীত একটি আইনের খসড়া সম্বন্ধে একখানা পত্র চারদিকে প্রচার করিয়াছেন। সহবাস-সম্মতির বয়স অন্ততঃ-পক্ষে চৌদ্দ বৎসরে উন্নীত করাই এই আইনের উদ্দেশ্য। প্রচারিত চিঠির একখানা নকল তিনি আমাকে পাঠাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন। নিম্নে তাহা উধৃত করিতেছি :—

“ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে ‘শিশু রক্ষা আইন’ যাহা পেশ হইবে তাহা সমর্থনকল্পে আপনার শক্তি নিয়োজিত করিবার অনুরোধ জানাইয়া এই চিঠি লিখিতেছি। আমার দৃঢ় ধারণা এই, যদি ভারতবর্ষ একটি বড় জাতিতে পরিণত হইতে চায় এবং পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে সম্মানিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন হইতে চায়, তবে শিশুমাতৃত্বের কলঙ্ক ভারত হইতে দূর করিতেই হইবে।

গতবার যখন এই খসড়া আইন উত্থাপিত হয়, দেশে এবং ব্যবস্থাপক সভাতে ইহা যথেষ্ট সমর্থন লাভ করে এবং আমার ধারণা যে, যদি জনসমর্থন ও মতের আনুকূল্য কিয়ৎপরিমাণেও আমরা পাই তবে আগামী অধিবেশনে ইহা আইনে পরিণত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। আমি নিশ্চিতরূপেই জানি যে, এই খসড়া আইনের সমর্থনকল্পে দেশের সর্বই বহুসংখ্যক সভা হইতেছে, বিশে-ষতঃ নারীগণের উদ্যোগে—এবং এই বিষয়ও আমি নিশ্চিত যে, অধিকাংশ নারীগণেরই ইচ্ছা যে অল্পবয়স্কা বালিকাদের পক্ষে স্বামীসঙ্গের বয়স অন্ততঃ চতুর্দশ করিতে হইবে।

আমার নিশ্চিত ধারণা এই যে, আপনি যদি এই খসড়া আইনের স্বপক্ষে দৃঢ়ভাবে আপনার মত প্রকাশ করেন এবং সকল পুরুষ ও নারীকে ইহা সমর্থন করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং উহার মূলনীতি অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন যাপন করিতে বিশেষভাবে বলেন, তবে যথেষ্ট সহায়তা করা হইবে।"

—আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই খসড়া আইন সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না, কিন্তু সহবাস-সম্মতির বয়স চৌদ্দ কেন, এমনকি ষোলতে তুলিবার পক্ষে আমি দৃঢ়মত পোষণ করি। যদিও আমি আইনের ধারাগুলি সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারিতেছি না তথাপি তরুণবয়স্কা নিরপরাধ বালিকাগণকে পুরুষের কামনার লোলুপতা হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে যে কোনও আন্দোলন আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিব। আমার বিনীত মত এই যে, চতুর্দশ বৎসর বয়সেও স্বামী-সংসর্গ নিঃসন্দেহরূপে নীতিবিরুদ্ধ এবং মনুষ্যত্ববর্জিত ব্যাপার এবং তথাকথিত বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান পালন করিলেই স্ত্রীসঙ্গের অধিকার বৈধ ও আইনসঙ্গত বলিয়া গণ্য করা উচিত নয়। যে প্রচলিত আচার আদৌ নীতিবিরুদ্ধ তাহাকে পবিত্র করিবার জন্য সংস্কৃত শাস্ত্রীয় বচনের আশ্রয় নেওয়া যায় না—কারণ সেগুলি প্রামাণ্য কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বহুসংখ্যক শিশুমাতার স্বাস্থ্যও ভাঙিয়া পড়িয়াছে আমি লক্ষ্য করিয়াছি এবং যখন বাল্যবিবাহের বিভীষিকার সহিত বাধ্যতামূলক বাল-বৈধব্য আসিয়া যুক্ত হয়, তখন মানবজীবনের দুঃখান্তক নাটকের যবনিকাপতন হয়। সহবাস-সম্মতির বয়স বাড়াইবার যে কোন যুক্তিযুক্ত আইন নিশ্চয়ই আমার অনুমোদন লাভ করিবে। কিন্তু আমি ইহা জানিয়া অত্যন্ত ব্যথিত যে, বর্তমান আইনও জনমতের সমর্থন না পাওয়াতে ফলপ্রসূ হয় নাই। এই বিষয়ে এবং অন্যান্য দিকেও সংস্কারকের কর্তব্য অত্যন্ত কঠিন। হিন্দু জনসাধারণের উপর কোন মতবাদ প্রকৃতপক্ষে কার্যকর করিতে হইলে ক্রমিক আন্দোলন সর্বদা চালাইয়া যাইতে হইবে। যাঁহারা ভারতের বালিকাগণকে অকাল-বার্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং দুর্বল ও রুগ্ন শিশুদিগের জন্মদানের দায়িত্ব হইতে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিবার মহৎ কর্তব্যে ব্যাপৃত আছেন, আমি তাঁহাদের সর্বপ্রকার সফলতা কামনা করি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৭-৮-'২৫]

১১

বাল্যবিবাহের অভিশাপ

মিসেস মারগারেট ই, কাজিনস্ মাদ্রাজের একটি সদ্যসংঘটিত শোকাবহ ঘটনার খবর আমাকে পাঠাইয়াছেন; একটি বাল্যবিবাহ হইতে উহা উদ্ভূত; বালিকার বয়স ছিল তের এবং স্বামীর ছাব্বিশ। স্বামী-স্ত্রী তের দিনও একত্রে বাস করে নাই, যখন বালিকাটি পুড়িয়া মারা যায়। জুরীগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, তথাকথিত স্বামীর অসহনীয় ও অমানুষিক কামনাপূরণের প্রচেষ্টা মেয়েটির আত্মহত্যার কারণ।

বালিকার মৃত্যুকালীন উক্তিতে দেখা যায় যে, "স্বামী" ই তাহার কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দেয়। রিপুর উত্তেজনায় দয়া-মায়া বা বুদ্ধি-বিচারের স্থান নাই। বালিকাটি কীভাবে মরিল, ইহা অবান্তর। অবিসম্বাদিত ঘটনাগুলি এই :—

১। বালিকাটির যখন মাত্র তের বৎসর বয়স তখন তাহার বিবাহ হয়;

২। তাহার কোন যৌন-স্পৃহা জন্মে নাই; কারণ সে তাহার স্বামীর কামনা-পূরণে বাধা দিয়াছিল;

৩। ঐ "স্বামী" নিষ্ঠুরভাবে কামনা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছিল;

৪। মেয়েটি এখন আর জীবিত নাই।

কোন পাশবিক প্রথা ধর্মের নামে অনুমোদন করা ধর্ম নহে—ইহা অধর্ম। স্মৃতিসমূহ পরস্পর-বিরোধী মতবাদে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পরস্পর-বিরোধী বিষয় হইতে একমাত্র যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত এই করা যায়—যে সকল শাস্ত্রবাক্য সর্বজনবিদিত এবং সর্বজনসম্মত নৈতিক আচারের বিরোধী—বিশেষতঃ শাস্ত্রোক্ত নীতিমূলক উপদেশেরও বিরোধী—সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্জন করিতে হইবে। যে লেখনী হইতে মানুষের পশুবৃত্তিকে প্ররোচিত করিবার কবিতা রচিত হইয়াছে, আত্মসংযমের উদ্দীপনাময়ী কবিতারাশি একই সময়ে সেই একই লেখনীপ্রসূত হইতে পারে না। দুষ্কর্মে নিমজ্জিত এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযমবিহীন মানুষই বলিতে পারে যে রজস্বলা হওয়ার পূর্বে কোন বালিকাকে পাত্রস্থ না করা পাপ। রজস্বলা হওয়ার পরও কয়েক বৎসরের মধ্যে কোন বালিকাকে বিবাহ দেওয়া পাপ-কার্য বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই সময়ের পূর্বে বিবাহ-বিষয়ে কোন চিন্তাও আসিতে পারে না। বালক যেমন তাহার গোঁফ গজাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তান উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত হয় না, তদ্রূপ রজস্বলা হওয়া মাত্রই কোন বালিকাও গর্ভধারণ করিতে সক্ষম হয় না।

বাল্যবিবাহপ্রথা নৈতিক এবং শারীরিক ব্যাধি। কারণ ইহা আমাদের নৈতিক চরিত্রের সর্বনাশ সাধন করে এবং শারীরিক অবনতি ঘটায়। এই শ্রেণীর প্রথা-সমূহ সমর্থন করিয়া আমরা ভগবানের নিকট হইতে এবং স্বরাজ হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। যে ব্যক্তি বালিকাদের অপ্রাপ্ত বয়সের বিষয় ভাবে না, সে ভগবান সম্বন্ধেও চিন্তা করে না। অপরিণতবয়স্ক পুরুষের স্বাধীনতালাভের জন্য যুদ্ধ করিবারও ক্ষমতা থাকে না এবং স্বাধীনতা লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করার শক্তি সে লাভ করে না। স্বরাজের জন্য যুদ্ধ বলিতে শুধু রাজনৈতিক জাগরণ বুঝায় না, বুঝায় সর্বতোমুখী জাগরণ, যথা—সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং শিক্ষাবিষয়ক।

সহবাস-সম্মতির বয়স বাড়াইবার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ করা হইতেছে। অল্পসংখ্যক লোকের শাস্তিবিধানের জন্য ইহা ভালো হইতে পারে। কিন্তু জন-প্রিয় কোন ব্যাধি দূরীভূত করা আইনের দ্বারা সম্ভবপর নয়। শিক্ষিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত জনমতই ইহা করিতে পারে। এই সকল বিষয়ে আমি আইন প্রণয়নের বিরোধী নহি, কিন্তু জনমত গড়িয়া তোলার উপর আমি অধিকতর জোর দিয়া থাকি। যদি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমত বর্তমান থাকিত তবে মাদ্রাজের

ঐ ঘটনা ঘটিত না। যে যুবকের বিষয় আলোচনা হইতেছে সে একজন নিরক্ষর শ্রমজীবী নয়, সে একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত টাইপিস্ট। যদি তরুণবয়স্কা বালিকাগণের বিবাহ কিংবা সহবাসের বিরুদ্ধে জনমত প্রবল থাকিত তবে তাহার পক্ষে বালিকাটিকে বিবাহ করা বা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করা অসম্ভব হইত। সাধারণতঃ আঠার বৎসরের ন্যূনবয়স্কা মেয়েদের বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৮-'২৬]

১২

বাল্যবিবাহ সমর্থনে

'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার জনৈক পাঠক লিখিতেছেন: "১৯২৬ ইং ২৬শে আগস্টের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাল্যবিবাহের অভিশাপ' শীর্ষক আপনার লিখিত প্রবন্ধে নিম্নের বাক্যটি পড়িয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছি: 'দুষ্কর্মে নিমজ্জিত এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযমবিহীন মানুষই বলিতে পারে যে রজস্বলা হওয়ার পূর্বে কোন বালিকাকে পাত্রস্থ না করা পাপ।'

"আমি বুঝিতে পারি না যাঁহাদের মত আপনার মত হইতে ভিন্ন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আপনি উদার ভাব গ্রহণ করিতে পারেন নাই কেন? ইহা নিশ্চয়ই কেহ বলিতে পারে যে, হিন্দু আইনপ্রণেতা বাল্যবিবাহ নির্দেশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ভ্রম করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা বাল্যবিবাহ সর্বদাই সমর্থন করেন তাঁহাদিগকে 'পাপে নিমগ্ন' বলা অত্যন্ত অন্যায়, ইহা আমি মনে করি। বিতর্কমূলক ব্যাপারে এই উক্তি ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি আমি সর্বপ্রথম এই শুনিলাম। আমি যতদূর জানি, হিন্দু সংস্কারকগণ বা খৃষ্টান পাদ্রীগণও এরূপ কখনও বলেন নাই। মহাত্মা গান্ধীকে সম্পূর্ণতার প্রতিমূর্তি বলিয়াই বিশ্বাস করি—অন্ততঃ বিরুদ্ধবাদিগণ সম্বন্ধে তাঁহার সৌজন্য এবং উদারতা সম্বন্ধে; কাজেই কল্পনা করুন, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লিখিত প্রবন্ধে এইরূপ যুক্তির অবতারণা দেখিয়া আমি কীরূপ মর্মাহত হইয়াছি।

"আপনি দুই একজন হিন্দু আইনপ্রণেতাকে নয়, সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রত্যেককে ঘোর অপবাদ দিয়াছেন। কারণ আমি যতদূর জানি, প্রত্যেক স্মৃতিকার বালিকাদের অল্পবয়সে বিবাহের অনুশাসন দিয়াছেন। আপনার কথিতমতে বাল্যবিবাহের অনুশাসন-বাক্যগুলি প্রক্ষিপ্ত, ইহা স্বীকার করা অসম্ভব। বাল্যবিবাহ প্রথা কোন প্রদেশে বা সমাজের শ্রেণীবিশেষে নিবদ্ধ নহে, বস্তুতঃ ইহা ভারতবর্ষে সর্বজনীন প্রথা। ইহা রামায়ণের সময় হইতে প্রচলিত অতি প্রাচীন প্রথাও বটে।

"বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ কেন সর্বদাই জোর দিয়াছেন তাহার কারণসমূহ আমি যাহা মনে করি তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। তাঁহারা ইহাই অত্যন্ত সঙ্গত মনে করিতেন যে, সাধারণ নিয়মে প্রত্যেক বালিকা একটি পতিলাভ করিবে। ইহা সাধারণতঃ সমাজের মঙ্গলের পক্ষে যতটা

প্রয়োজনীয়, বালিকাদের নিজেদের মানসিক শান্তি এবং সুখের জন্যও তদপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় নহে। যদি প্রত্যেক বালিকাকেই পতিলাভ করিতে হয় তাহা হইলে তাহার পিতামাতাই পতি নির্বাচন করিবেন—মেয়েরা স্বয়ং করিবে না। যদি বালিকাদের উপর পতিনির্বাচনের ভার দেওয়া যায়, তাহার ফল হইবে এই যে, অনেক মেয়ের আদৌ বিবাহ হইবে না; ইহার কারণ এই নয় যে তাহারা বিবাহ পছন্দ করে না; কিন্তু কারণ এই যে, উপযুক্ত পতিনির্বাচন মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। পরন্তু ইহা বিপদসঙ্কুল কেন না, ইহা যৌনপ্রগল্‌ভতার প্রশ্রয় দিয়া নীতির বন্ধনও শিথিল করিয়া দিতে পারে। সে সকল যুবক সচ্চরিত্র বলিয়া মনে হয়, অথচ আসলে তাহা নহে তাহারা সরল বালিকাগণের ধর্মনাশ করিতে পারে। অপর পক্ষে, যদি পিতামাতার উপর নির্বাচনভার থাকে তাহা হইলে অল্প বয়সেই মেয়েদিগকে বিবাহ দিতে হইবে। তাহারা বয়স্কা হইলে প্রেমে পড়িতে পারে এবং পিতামাতার নির্বাচিত বরকে বিবাহ করিতে না চাহিতে পারে। অল্প বয়সে বিবাহিতা হইলে বালিকা পতির সহিত এবং তাহার পরিবারের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। এইরূপ বিবাহ অধিকতর স্বাভাবিক এবং দাম্পত্য জীবনে পূর্ণতা দান করে। বয়স্কা মেয়েদের রুচি ও ভাব এবং অভ্যাসাদি বদ্ধমূল হইয়া যায় এবং নূতন পরিবারের সঙ্গে নিজেদের মিশাইয়া লইতে অনেক সময় তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বোধ হয়।

"বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে মেয়ের এবং তাহার সন্তানগণের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। নিম্নলিখিত কারণে, এই আপত্তি খুব সঙ্গত মনে হয় না। বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে বিবাহের বয়স বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু জাতি পূর্বাপেক্ষা দুর্বল হইতেছে। পঞ্চাশ কি একশত বৎসর পূর্বে স্ত্রী এবং পুরুষ এখনকার চেয়ে সাধারণতঃ অধিক সবল, স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘজীবী ছিল। কিন্তু বাল্যবিবাহ তখন আরও বেশী প্রচলিত ছিল। অধিক বয়সে বিবাহিতা শিক্ষিতা মেয়েদের স্বাস্থ্য অল্প বয়সে বিবাহিতা অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিতা মেয়েদের স্বাস্থ্যের চেয়ে সাধারণতঃ ভাল নয়। এই সকল ঘটনা হইতে ইহা সম্ভবপর মনে হয় যে, বাল্যবিবাহে শারীরিক অবনতি যতটা হয় বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, ততটা হয় না।

"আপনি ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সমাজ উভয়ই ভালো জানেন। আপনি বলিতে পারিবেন ইউরোপীয় বিবাহিতা নারীগণ হইতে ভারতের বিবাহিতা নারীগণ স্বামীর প্রতি মোটের উপর বেশী অনুরক্ত কি না; গরীবদের মধ্যে ভারতীয় পতিগণ তাহাদের পত্নীগণের প্রতি ইউরোপীয় পতিগণের অপেক্ষা অধিক সদয় ব্যবহার করে কিনা; ইউরোপীয়দের অপেক্ষা ভারতীয়দের মধ্যে অপ্রীতিকর বিবাহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম কিনা; ইউরোপীয় সমাজ হইতে ভারতীয় সমাজে যৌনবিষয়ক নীতিজ্ঞান উন্নততর কিনা। এই সকল বিষয়ে যদি ভারতীয় বিবাহ ইউরোপীয়দের বিবাহ হইতে অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়া থাকে তবে ভারতীয় বিবাহ-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য যে বাল্যবিবাহ, উহার অপবাদ দেওয়া উচিত নয়।

"আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, বালিকাদের বাল্যবিবাহের অনুশাসন দিতে গিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারগণ সাধারণতঃ সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর প্রকৃত

মঙ্গল চিন্তা ব্যতীত অন্য কোনরূপ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছিলেন। আমি বিশ্বাস করি কন্যার বাল্যবিবাহ হিন্দুসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিকূল পরিবেশের ভিতরও ইহাই সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছে এবং ধ্বংসের পথে সমাজকে যাইতে দেয় নাই। আপনি এই সব বিশ্বাস নাও করিতে পারেন। কিন্তু আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আপনি অন্ততঃ আপনার এই মত পরিত্যাগ করিবেন—যে সকল মনীষী হিন্দুশাস্ত্রকার কন্যার বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে সর্বদা বিশেষ জোর দিয়াছেন তাঁহারা আত্মসংযমের ধার ধারিতেন না এবং 'পাপে নিমজ্জিত' ছিলেন?

"আপনার প্রকাশিত মাদ্রাজের ঘটনাটি অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হয়। জুরীগণ সাব্যস্ত করেন যে বালিকাটি আত্মহত্যা করিয়াছিল। কিন্তু বালিকা বলে, তাহার স্বামী তাহার কাপড়ে আগুন ধরাইয়া দেয়। এই পরস্পর-বিরোধী অবস্থার মধ্যে আপনি যে বিষয়গুলি অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া মনে করেন সেগুলি প্রকৃতই সেইরূপ ইহা ধরিয়া লওয়া অত্যন্ত কঠিন। তের বৎসরের নিম্নবয়স্কা বিবাহিতা বালিকার সংখ্যা লক্ষ লক্ষ হইবে। ইতঃপূর্বে স্বামীর নিষ্ঠুর প্রস্তাবের জন্য আত্মহত্যার একটি ঘটনাও শোনা যায় নাই। মাদ্রাজের ঘটনায় সম্ভবতঃ কোন বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল এবং বাল্যবিবাহ মৃত্যুর মুখ্য কারণ ছিল না।"

—কবি সুন্দরভাবে বলিযাছেন: "যে সকল ঘটনা গোপনে বিবেককে আঘাত করে তাহাদের কঠোরতা প্রশমিত করিবার জন্য উপযুক্ত দার্শনিক যুক্তি তৈয়ার করিতে অতি অল্প আয়াসের প্রয়োজন হয।" 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' এই পাঠক এক পা বেশী অগ্রসর হইযাছেন। তিনি শুধু উপযুক্ত দার্শনিক যুক্তি দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু ঘটনাবলী লক্ষ্য না করিয়া অপ্রমাণিত বিবরণের উপর তাঁহার যুক্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

উদারতার অভাব সম্বন্ধে যে অভিযোগ তাহা আমি উপেক্ষা করিতে পারি; শুধু এই কারণে যে, আমি শাস্ত্রকারগণকে দোষ দিই নাই, কিন্তু যাঁহারা মাতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য সম্পূর্ণ অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদেব বিবাহ দিতে জেদ করেন, আমি তাঁহাদের প্রতিই পাপাচরণ আরোপ করিতে সাহস করিয়াছি। যখন বিনা কারণে কোন জীবিত ব্যক্তিকে, কল্পিত ব্যক্তিকে নয়, তাহার অসাধু উদ্দেশ্যের জন্য দোষ দেওয়া হয়, কেবল তখনই উদারতার অভাব আছে, ইহা বলা যাইতে পারে। স্মৃতিসমূহের প্রবর্তকগণ, যাঁহারা আত্মসংযম শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারাই যে ছোট ছোট বালিকাদের বিবাহের অনুশাসন কবিতায় রচনা করিয়াছেন, উক্ত লেখকের ইহা বলিবার কি কোন যুক্তি বা প্রমাণ আছে? ঋষিগণের প্রতি অপবিত্রতা আরোপ করা যায় না এবং মানবদেহের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি-সম্পর্কিত মূলবিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, এই দোষও দেওয়া যায় না—এইরূপ অনুমান করা কি অধিকতর উদারতার পরিচায়ক নয়?

কিন্তু যদি বা বাল্যবিবাহ-সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের অনুজ্ঞা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে সেই সকল অনুজ্ঞা উপেক্ষা করিতে হইবে। এস্থলে বাল্যবিবাহকে

পরিণত বয়সের পূর্বে বিবাহ হইতে পৃথক্ ধরিতে হইবে— পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্বের বিবাহকেই এরূপ বিবাহ বলা যায়। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ সর্বজনীন, এই উক্তির সত্যতা আমি অস্বীকার করি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব যদি আমি দেখিতে পাই যে, শিশুকালেই "লক্ষ লক্ষ বালিকা" বিবাহিতা অর্থাৎ তাহারা পত্নীরূপে জীবন যাপন করে। যদি "লক্ষ লক্ষ বালিকার" বিবাহ, ধরুন, এগার বৎসরেই সহবাসের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করিত তবে বহু পূর্বেই হিন্দুগণ জাতি হিসাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

এই সিদ্ধান্তেও আসা যায় না যে, যদি পিতামাতাগণ তাঁহাদের কন্যাদের পতি নির্বাচন করিতে থাকেন তাহা হইলেও বিবাহ এবং তাহার আচার অপরিণত বয়সেই করাইতে হইবে। মেয়েদের তাহাদের পতিনির্বাচন করিতে দিলে নিশ্চয়ই রূপজ কিংবা প্রেমজ বিবাহের প্রগলভতা প্রশ্রয় পাইবে, এই সিদ্ধান্তও সত্য হইতে পারে না। ইউরোপেও বিবাহের জন্য পরস্পর ভালবাসার অবাধ সুযোগ দেওয়া সর্বত্র প্রচলিত নয় এবং পনর বৎসর বয়সের পর হাজার হাজার হিন্দুমেয়ের বিবাহ হয় এবং সেই সব ক্ষেত্রে তাহাদের পিতামাতাই তাহাদের বর নির্বাচিত করেন। মুসলমান পিতা-মাতাগণ তাঁহাদের বয়স্থা কন্যাদের বর সর্বদাই নির্বাচিত করিয়া থাকেন। বরনির্বাচন মেয়েরা করিবে অথবা তাহাদের পিতামাতাগণ করিবেন, ইহা একটি পৃথক্ প্রশ্ন এবং তাহা সামাজিক প্রথা দ্বারা নিয়মিত হয়।

লেখক যে উক্তি করিয়াছেন, বয়স্থা পত্নীগণের সন্তানগণ শিশু পত্নীগণের সন্তানগণ অপেক্ষা দুর্বল, তাহার সমর্থনে কোন প্রমাণ দেন নাই। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সমাজ উভয়ের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও আমি তাহাদের নৈতিক আচারব্যবহারাদি সম্বন্ধে তুলনা করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নই। তথাপি যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় যে ইউরোপীয় সমাজের নীতিবন্ধন হিন্দুসমাজের নীতিবন্ধন হইতে নিম্নস্তরের—ইহার স্বাভাবিক অনুমান কি এই হইবে যে, পূর্ণবয়স্কা হওয়ার পর বিবাহই এই অধোগতির কারণ?

সর্বশেষ মাদ্রাজের ঘটনাটির প্রসঙ্গ। তিনি যে ভাবে ইহা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, ইহাই প্রমাণিত হয়। তাঁহার সিদ্ধান্ত সত্য ঘটনা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া করা হইয়াছে। তিনি যদি প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করেন তবে তিনি দেখিতে পাইবেন প্রমাণিত বিষয় হইতে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। মৃত্যুর কারণ কী ছিল না ছিল, তদ্দ্বারা আমার সিদ্ধান্ত কোনরূপ ব্যাহত হয় না। ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল যে, (১) বালিকাটি তরুণবয়স্কা, (২) তাহার কোন যৌনস্পৃহা ছিল না, (৩) "স্বামী" নিষ্ঠুর যৌনসংসর্গের প্রস্তাব করিয়াছিল এবং (৪) সে বাঁচিয়া নাই। যদি মেয়েটি আত্মহত্যা করিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট মন্দ; যদি তাহার স্বামী তাহার পাশবিক লালসা পুরাইতে রাজী না হওয়ার দরুন তাহাকে খুন করিয়া থাকে তবে তাহা ততোধিক মন্দ। বয়স অনুযায়ী বালিকাটি শুধু খেলা ও শিক্ষালাভ করিবার উপযুক্ত ছিল—পত্নীরূপে চলিবার এবং তাহার ক্ষুদ্র কাঁধের উপর গৃহিণীপনার যাবতীয় দায়িত্ব বহন করিবার অথবা জনৈক সর্বেসর্বা প্রভুর হুকুম তামিল করার যোগ্যতা তাহার

ছিল না।

আমার পত্রলেখক সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। জাতি সুশিক্ষিত পুত্র-কন্যাগণের নিকট ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আদর্শ প্রত্যাশা করে এবং তাঁহারা জাতির সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন এবং জাতির মঙ্গলের জন্য কাজ করিবেন—ইহাও তাঁহাদের নিকট আশা করা যায়। নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বহু ব্যভিচার আমাদের মধ্যে বর্তমান। সেইগুলি ধৈর্যের সহিত অনুধাবন করা, তৎ-সম্বন্ধে যত্নের সহিত গবেষণা করা, সেগুলিকে সতর্কতার সহিত অনুশীলন করা, তৎসম্বন্ধে যথাযথ বিবৃতি দেওয়া এবং অনাবিল চিন্তা ও ধীর পক্ষপাতশূন্য সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। তার পরে প্রয়োজনমত আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত মতও পোষণ করিতে পারি। কিন্তু যদি আমরা সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য শ্রম স্বীকার না করি এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হই—তাহা যতই কষ্টসাধ্য হউক না কেন—আমাদের দ্বারা নিশ্চয়ই দেশের, আমাদের নিজ নিজ ধর্মের এবং জাতীয় আন্দোলনের অনিষ্ট বই ইষ্ট সাধিত হইবে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৯-'২৬]

১৩

বালিকা বধূগণের দুর্গতি

বাঙ্গলা হইতে একজন হিন্দু মহিলা লিখিতেছেন : "আমাদের হিন্দুসমাজের নিরুপায় বালিকাবধূগণের সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন তজ্জন্য কী ভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দিব জানি না। মাদ্রাজের ঘটনাটিই একমাত্র বিশিষ্ট ঘটনা নহে। এক বৎসর পূর্বে এইরূপ একটি ঘটনা কলিকাতায় ঘটে। বালিকার বয়স ছিল মাত্র দশ বৎসর। দুই রাত্রি স্বামীর সঙ্গে থাকিয়া সে তাহার নিকট কিছুতেই আর যাইতে চায় না। একদিন তাহার মা মেয়েটিকে একটি পান দিবার ছলে এই লোকটির নিকট পাঠায়। সম্ভবতঃ সেই হতভাগ্য মেয়েটি মনে করিয়াছিল যে, তাহার স্বামীর হাতে পান দিয়াই ফিরিয়া আসিতে পারিবে। কিন্তু লোকটি দরজা বন্ধ করিয়া দেয় এবং মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইতে পারে নাই। কিছুক্ষণ পরে অতি কাতর ঘড়ঘড়ানি আর্তনাদ শুনা যায়। বালিকার মা দৌড়াইয়া ঐ ঘরে যায়। যখন দরজা খোলা হইল তখন দেখা গেল বালিকাটি মরিয়া গিয়াছে—"স্বামী" তাহাকে এমন গুরুতরভাবে মস্তকে আঘাত করিয়াছিল!

"লোকটির আদালতে বিচার হয় এবং তাহার ফাঁসির হুকুম হয়।

"কে জানে আমাদের সমাজে এরূপ কত ঘটনা ঘটে যাহার কোন সংবাদ কেহ রাখে না। আমি নিজে এরূপ ঘটনা অনেক জানি যেখানে বালিকা বধূ বয়স্কা হওয়ার পূর্বে স্বামীর নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিত।

"কিন্তু তাহাদের পক্ষে কথা বলিবে কে? আমাদের মেয়েরা সর্বদাই শান্তভাবে নীরবে তাহাদের দুঃখ ভার বহন করিয়া যায়। তাহাদের এমন কোন শক্তি আর থাকে না যাহা দিয়া কোনপ্রকার কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পারে। এবং আমাদের পুরুষগণ তাহাদের অপরিসীম ক্ষমতার বলে কেবল তাহাদের নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ই ভাবে এবং নিরুপায় নারীগণের বিষয় একটুকুও ভাবে না।

"আমার পরিচিত একটি ব্রাহ্মণ মহিলার দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। তিনি স্বামীর নিকট যাইতে চান না। কাজেই স্বামী আর একটি বয়স্থা মেয়েকে বিবাহ করেন। এই হতভাগ্য মহিলা বর্তমানে তাঁহার পূর্ণযৌবনে পিতৃগৃহে অবস্থান করিতেছেন।

"একজন মহিলার নিকট শুনিলাম যে, গ্রামে নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে স্বামীরা প্রায়ই তাহাদের বালিকাবধূগণকে প্রহার করে, কারণ তাহারা তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে এবং রাত্রিতে তাহাদিগকে সহজে স্বামীর ঘরে ঢুকাইতে পারা যায় না।

"যেখানে ভুক্তভোগিগণের নিজেদের জন্য কোন কথা বলিবার সুযোগ নাই বা বলিলেও সমাজে নির্যাতিত হইতে হয়, সেখানে অমানবোচিত প্রথা সমর্থন করা অতি সহজ।"

—যে চিত্র এখানে অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা বাস্তব জীবনে সত্য হউক বা অতিরঞ্জিত হউক, ইহার সারকথা নিশ্চয়ই সত্য। ইহা সমর্থন করিবার জন্য আমার প্রমাণ সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই। বেশ পসার আছে এমন একজন ডাক্তারকে আমি জানি; তিনি বয়স্ক, বিপত্নীক এবং তাঁহার কন্যাস্থানীয়া হইবার উপযুক্ত বয়সের একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা "স্বামী-স্ত্রী" রূপে একত্রে বাস করিতেছিলেন। অপর একজন ষাট-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ বিপত্নীক শিক্ষা-বিভাগে কাজ করেন, তিনি নয় বৎসর বয়সের একটি বালিকাকে বিবাহ করিয়াছেন। সকলেই এই কেলেঙ্কারির কথা জানিত এবং ইহাকে কেলেঙ্কারি বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু তিনি সরকার এবং জনসাধারণ কর্তৃক বাহ্যতঃ সম্মানিত, কারণ ইনস্‌পেক্‌টরের কাজ করিয়া থাকেন। আমার স্মৃতি হইতে বন্ধুগণের ভিতরও এরূপ আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভবপর।

উক্ত মহিলা লেখিকা যথার্থই বলিয়াছেন যে, কোনপ্রকার কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য বাধা দিবার শক্তি ভারতের নারীর ভিতর আর নাই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইরূপ অবস্থার জন্য পুরুষই প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু মেয়েরা কি সর্বদাই পুরুষের উপর দোষ অর্পণ করিয়া নিজেদের বিবেককে বাঁচাইতে পারেন? তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে নারীজাতির প্রতি এবং যে পুরুষ জাতির তাঁহারা মাতৃস্থানীয়া তাঁহাদের প্রতিও কি কর্তব্য নয় যে, তাঁহারা নিজেরা সমাজ সংস্কারের ভার গ্রহণ করিবেন? তাঁহারা যে শিক্ষালাভ করিতেছেন তাহার সার্থকতা কী থাকে, যদি বিবাহের পর তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণের খেলার পুতুল হইয়া পড়েন এবং অপ্রাপ্ত বয়সেই ভবিষ্যৎ মানবনামধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকে লালনপালন করিবার কাজে

ব্যাপৃত হন? তাঁহারা ইচ্ছা করিলে নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন করিতে পারেন। ইহাতে সময়ও লাগে না এবং কষ্ট স্বীকারও করিতে হয় না। ইহা তাঁহাদিগকে নির্দোষ আমোদ প্রদান করিবে। কিন্তু সেই সকল সৎসাহসী নারীগণ কোথায় যাঁহারা বালবধূ ও বালবিধবাগণের ভিতর কাজ করিবেন? প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পূর্বে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবার অধিকার প্রত্যেক বালিকার রহিয়াছে; যে ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার চূড়ান্ত নির্দেশ তাহাকে দেওয়া হয় সেই ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবার অধিকারও তাহার রহিয়াছে। যতদিন প্রত্যেক বালিকা সেই অধিকার বজায় রাখিয়া চলিবার যথেষ্ট ক্ষমতা নিজের ভিতর অনুভব না করিবে, এবং যতদিন বাল্যবিবাহ অসম্ভব করিয়া তুলিতে না পারা যাইবে, ততদিন নিজেরাও চেষ্টা করা হইতে বিরত হইবে না এবং পুরুষদিগকেও বিশ্রাম দিবে না—এইরূপ বীরাঙ্গনাগণ কোথায়?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-১০-'২৬]

১৪

জনৈক ছাত্রের সমস্যা

একটি ছাত্র লিখিতেছে: "প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে অথবা ডিগ্রী পাইবার যোগ্যতা লাভ করে নাই এরূপ ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে দুই-তিনটি সন্তানের পিতা হইলে সে তাহার জীবিকার্জনের জন্য কী করিতে পারে? এইরূপ ব্যক্তিকে যদি ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বেই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হয় তবেই বা সে কী করিবে?"

আমার মনে হয়, ইহার সহজ উত্তর এই,—যে ছাত্র তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণকে কী ভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে তাহা জানে না, অথবা যে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করে, তাহার শিক্ষালাভ নিরর্থক হইয়াছে। কিন্তু তাহার পক্ষে ইহা অতীত ইতিহাস। এই দিশাহারা ছাত্রকে সহায়তামূলক উত্তর দেওয়া আবশ্যক। তাহার কী কী প্রয়োজন তাহা সে বলে নাই। সে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়াছে এই বিষয়টি যদি বড় করিয়া না দেখে এবং সাধারণ শ্রমজীবীর সঙ্গে নিজেকে সমশ্রেণীতে ফেলিতে পারে তাহা হইলে জীবিকা উপার্জন করিতে তাহাকে বেগ পাইতে হয় না। তাহার বুদ্ধিশক্তি তাহার হাত-পা'কে সাহায্য করিবে; যে শ্রমজীবী তাহার বুদ্ধিশক্তি বিকশিত করিবার সুযোগ পায় নাই তাহা অপেক্ষা উক্ত যুবক অধিকতর নিপুণভাবে কাজ করিতে সক্ষম হইবে— কারণ তাহার ধীশক্তি শিক্ষার ফলে সুমার্জিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে না, যে শ্রমজীবী ইংরেজি শিক্ষা করে নাই সে বুদ্ধিহীন । দুর্ভাগ্যের বিষয়, শ্রমজীবীদের মানসিক শক্তি বিকাশের কোন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এ দেশে নাই; যাহারা স্কুলে পড়াশুনা করে

নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও তাহাদের মানসিক বৃত্তি বিকশিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ প্রতিকূল অবস্থা ভারতের বাহিরে কোথাও দেখা যায় না। স্কুলে শিক্ষার ফলে যতটুকু মানসিক শক্তির বিকাশ হয়, তাহা আবার মিথ্যা আত্মসম্ভ্রমের ধারণার দ্বারা প্রতিহত হইয়া পড়ে। এবং সেইজন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মনে করে যে, টেবিলে বসিয়া লেখাপড়ার কাজ করিয়াই তাহারা জীবিকা উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিটিকে শ্রমের মর্যাদা বুঝিতে হইবে এবং সেই কর্মক্ষেত্রেই তাহার এবং তাহার পরিবারের ভরণপোষণের উপায় খুঁজিতে হইবে।

তাহার স্ত্রীও নিজ অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া কেন পরিবারের আয় বাড়াইবেন না তাহার কোন কারণ নাই। সেইভাবে সন্তানগণ যদি কোন কাজ করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে তাহাদিগকে শ্রমশিল্পাদির কাজে জুড়িয়া দিতে হইবে। শুধু পুঁথি পড়িয়াই বুদ্ধিশক্তি বিকশিত করা যায় এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া এই সত্যে উপনীত হইতে হইবে যে, মানসিক বৃত্তি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিকশিত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্রমশিল্পীদের কাজ শিখিতে হইবে। শিক্ষানবীশকে প্রতি পদে যখন শিক্ষা দেওয়া হয় কী জন্য কী ভাবে হাতের বা একটি যন্ত্রের বিশেষ পরিচালনা আবশ্যক, তখনই তাহার মনের প্রকৃত বিকাশ আরম্ভ হয়। বিদ্যার্থী ছাত্রগণের বেকার সমস্যা অতি সহজেই সমাধান করা যায়, যদি তাহারা নিজদিগকে সাধারণ শ্রমজীবীদের সঙ্গে একই পর্যায়ে রাখে।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, যে, জোর করিয়া যে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় তাহাতে বাধা দিবার উপযোগী যথেষ্ট মানসিক বল ছাত্রদিগকে অর্জন করিতে হইবে। ছাত্রদিগকে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইবার অর্থাৎ স্বাবলম্বনের কৌশল শিক্ষা করিতে হইবে এবং সকল প্রকার ন্যায্য উপায়ে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করাইবার প্রয়াসে—বিশেষতঃ তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ অনুষ্ঠানে বাধা দিবার কৌশল শিখিতে হইবে।

[হরিজন, ৯-১-'৩৭]

১৫

ছাত্রদের প্রতি

বিগত ৯ই জানুয়ারী হরিজন পত্রিকায় "জনৈক ছাত্রের সমস্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে আপনি যাহা বলিয়াছেন সেই বিষয়ে আমি বিনীতভাবে আপনার বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয় জানাইতেছি : "আমার ধারণা ছাত্রটির প্রতি সুবিচার করেন নাই। এই সমস্যার কোন মীমাংসা করা যায় না। তাহার প্রশ্নের আপনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহা অস্পষ্ট এবং অতি সাধারণ। আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা সকল পরিত্যাগ করিয়া ছাত্রদিগকে সাধারণ শ্রমজীবীর পর্যায়ে যাইতে আপনি বলিয়াছেন। এইরূপ

ব্যাপক ভাবের কথা কাহাকেও বিশেষ সহায়তা করে না এবং আপনার ন্যায় অতি প্রবীণ ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের উপযুক্ত নয়।

"আরও বিশদভাবে বিষয়টি চিন্তা করুন এবং নিম্নের ঘটনার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তব জীবনের উপযোগী, সুনির্দিষ্ট সর্বসমন্বিত সমাধান প্রদর্শন করুন।

"আমি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে এম. এ. পড়িতেছি। আমার বয়স ২১। পড়াশোনার দিকে আমার ঝোঁক রহিয়াছে এবং সেদিকে আমার জীবনে যতদূর উন্নতি সম্ভব তাহা লাভ করিতে চাই। আপনার জীবনের আদর্শ দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত। মাসেকের ভিতরই যখন শেষ এম. এ. পরীক্ষা হইবে তখন আমার শিক্ষাও সমাপ্ত হইবে এবং যাহাকে জীবনে প্রবেশ করা বলে আমাকে তাহা করিতে হইবে।

"আমার স্ত্রী ছাড়া আমার কনিষ্ঠ চারটি ভাই আছে— তন্মধ্যে একটি বিবাহিত; দুইটি বোন আছে, তাহারা উভয়েই বার বৎসরের ন্যূনবয়স্কা; পিতামাতা জীবিত। আমার সকলকেই ভরণপোষণ করিতে হয়। এমন কোন মূলধন নাই, যাহার উপর নির্ভর করিতে পারি। ভূসম্পত্তি অতি সামান্য।

"ভাইবোনদের শিক্ষার জন্য আমি কী করিব? বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই ভগ্নী-দিগকে বিবাহ দিতে হইবে। সর্বোপরি অন্নবস্ত্রের সংস্থান কোথা হইতে হইবে?

"জীবনযাত্রার তথাকথিত মান আমি পছন্দ করি না। আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের জন্য আমি শুধু চাই জীবনযাপনের মোটামুটি স্বচ্ছন্দ একটি পথ; এবং তদ্ব্যতীত আপদ-বিপদের জন্য সামান্য সংস্থান। দুই বেলা স্বাস্থ্যের অনুকূল আহার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাধারণ বস্ত্রাদি—এই মোটামুটি আমার বিবেচনার বিষয়।

"অর্থনৈতিক হিসাবে আমি সততার সহিত জীবনযাপন করিতে চাই। আমি টাকা লগ্নী করিয়া বা মাংস বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে চাই না। দেশের কাজ করিবার জন্য আমার উচ্চাকাঙ্খা রহিয়াছে। আপনার উল্লিখিত মন্তব্যে যে সকল সর্ত নির্দিষ্ট করা হইয়াছে আমি যথাসাধ্য সেগুলি পালন করিতে ইচ্ছুক।

"কিন্তু আমি জানি না কী করিব। কোথায় এবং কী ভাবে আরম্ভ করিব? আমার শিক্ষা মারত্মক রকম পুঁথিগত এবং বাস্তবের সহিত সম্বন্ধবর্জিত। কোন কোন সময় সুতা কাটিব মনে করি—ইহাই আপনার প্রিয়, সর্বরোগের মহৌষধি, কিন্তু আমি কী ভাবে সুতা কাটিতে হয় অথবা কাটা সুতা দিয়া কী করিতে হয়, এসব কিছুই জানি না।

"আমি যে অবস্থায় আছি তাহাতে আপনি আমাকে সন্তানের জন্মদান বন্ধ করিবার উপায়াদি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিবেন কি? আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি, আমি আত্মসংযম এবং 'ব্রহ্মচর্যে' আস্থাবান। আমার মনে হয় আমাকে ব্রহ্মচারী হইতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক হইবে। পূর্ণ আত্মসংযমে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জন্মনিরোধের উপায়াদি অবলম্বন না করিলে আমার সন্তানাদি জন্মিতে পারে এবং তদ্দ্বারা আর্থিক সর্বনাশ ডাকিয়া আনা হইবে। এবং আমি

ইহাও ভাবি যে, ঠিক এই সময়ে আমার স্ত্রীর জীবনের স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ ভাবপ্রবণতার অবস্থায় তাহার উপর কঠোর ব্রহ্মচর্যমূলক জীবনযাত্রা চাপাইয়া দেওয়া অসঙ্গত হইবে। পুরুষ ও নারীর স্বাভাবিক জীবনে যৌনস্পৃহার স্থান রহিয়াছে। আমি তাহার বাহিরে নই; আমার স্ত্রী ত নয়ই; সে এমন শিক্ষা লাভ করে নাই, যাহা দ্বারা ব্রহ্মচর্য অথবা অতিরিক্ত সহবাসের বিপদ সম্বন্ধে আপনার অনুপম প্রবন্ধ-সমূহ বুঝিতে সক্ষম হইতে পারে।

"আমি দুঃখিত যে চিঠিখানা একটু বেশী দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলার জন্য আমি সংক্ষেপে বলিতে চাহি নাই। আপনি এই চিঠি-খানার যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন।"

ছাত্রটি যে সকল সমস্যা উত্থাপন করিয়াছে, যদিও সেগুলি তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে তুলনায় গুরুতর বটে, তাহা সমস্তই তাহার স্বকৃত। সেগুলির উল্লেখমাত্রেই তাহার নিজ অস্বস্তিকর অবস্থা এবং আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর অবাস্তবতা প্রকাশ পায়। শিক্ষাকে অর্থার্জনের উপায়বিশেষে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টায় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ একটি ব্যবসাযের বস্তুতে পরিণত হয়। আমার মতে শিক্ষাব আরও উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। সেই ছাত্রটি যদি নিজেকে লক্ষ লক্ষের মধ্যে একজন মনে করে তবে সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার সমবয়স্ক লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীও শিক্ষায় উপাধিলাভ করিয়াছে বলিয়া যে বিষয়গুলির সমাধান করিতে চায়, তাহা পারিয়া উঠিতেছে না। তাহার উল্লিখিত সমস্ত আত্মীয়স্বজনের ভরণপোষণের জন্য সে নিজেকে দায়ী করিবে কেন? যদি প্রাপ্তবয়স্কগণ সুস্থ শরীরে থাকিয়া থাকে তবে তাহারা নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য পরিশ্রম করিবে না কেন? একটি কর্মব্যস্ত পুংমক্ষিকার উপর অধিকসংখ্যক স্ত্রীমক্ষিকার নির্ভর করা অবৈধ।

ইহার প্রতিকার করিতে হইলে তাহাকে অনেকগুলি অধীত বিষয় ভুলিয়া যাইতে হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার ধারণা পরিবর্তন করিতে হইবে। সে যে ব্যয়সাপেক্ষ শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহার ভগ্নীগণের পক্ষে তাহার পুনরাবৃত্তি করা উচিত হইবে না। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোন হস্তশিল্প শিক্ষা করিয়া তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইবে। যে মুহূর্তে তাহারা এইরূপ করিবে, তখনই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনও পরিপূর্ণতা লাভ করিতে থাকিবে। এবং তাহারা যদি মানব-সমাজের উপর প্রভুত্ব চালাইবার চেষ্টা না করিয়া নিজেদের তাহার সেবক বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদের হৃদয়ের অর্থাৎ আত্মারও উন্নতি হইবে। এবং তাহাদের ভ্রাতার মত তাহারাও সমভাবে জীবিকা উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে।

তাহার লিখিত চিঠিতে তাহার ভগ্নীর বিবাহের বিষয় উল্লিখিত আছে। তৎ-সম্বন্ধেও এখানে আমি আলোচনা করিব। বিবাহ বিলম্বে না হইয়া শীঘ্র হওয়ার অর্থ কী তাহা আমি জানি না। কোন ক্ষেত্রেই বিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। এত বৎসর পূর্বে সে বিষয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নাই। জীবনের সমগ্র পরিকল্পনা যদি সে পরিবর্তন করে তাহা হইলে সে তাহার ভগ্নী-গণকে নিজ নিজ স্বামী নির্বাচন করিতে দিবে এবং যদি বিবাহকার্যে কোন খরচ করিতেই হয় তবে প্রত্যেকের জন্য পাঁচ টাকার বেশী খরচ কোন অবস্থাতেই করা

উচিত নয়। এই রকম বহু বিবাহ-বাসরে আমি উপস্থিত হইয়াছি। বরগণ বা তাহাদের পূজনীয়গণ সকলেই সঙ্গতিসম্পন্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কোথায় কী প্রকারে সুতাকাটা সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হইবে তাহা ছাত্রটি জানে না এবং তৎসম্বন্ধে আপনাকে নিরুপায় মনে করে। লক্ষ্ণৌ শহরে একটু যত্নের সহিত খোঁজ করিলে সে দেখিতে পাইবে, তাহাকে শিখাইবার মত যথেষ্টসংখ্যক যুবক সেখানে রহিয়াছে। কিন্তু তাহার সুতাকাটা নিয়া সর্বক্ষণ বিব্রত থাকার কোন প্রয়োজন নাই,—যদিও যে সকল স্ত্রী-পুরুষ গ্রামে বাস করার সংকল্প করিয়াছে তাহাদের পক্ষে দেখিতে দেখিতে সুতাকাটা একটি পূর্ণ জীবিকার্জনের উপায় বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে। আমার বিশ্বাস জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি গুছাইয়া লইবার জন্য তাহাকে উপযুক্ত করিতে আমি এ প্রসঙ্গে যথেষ্ট বলিয়াছি।

এখন সন্তানের জন্মনিরোধ যন্ত্রাদির ব্যবহার বিষয়ে বলিব। এখানেও বিষয়টির দুরূহতা কাল্পনিক। তাহার স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা কম এইরূপ বিবেচনা করিয়া সে ভুল করিয়াছে। যদি তাহার স্ত্রী সাধারণ নারীগণের মত হইয়া থাকেন তবে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, তিনি আত্মসংযম অনুশীলনে সহজেই তাহার সহায়িকা হইবেন। সে নিজে নিজেকে প্রকৃতভাবে বুঝুক এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করুক তাহার নিজেরই যথেষ্ট আত্মসংযম আছে কিনা। আমার নিকট যত প্রমাণ আছে তাহা হইতে এই দেখা যায় যে, নারী অপেক্ষা পুরুষেরই আত্মসংযমের ক্ষমতা কম। সংযম অভ্যাস করিতে তাহার নিজ অক্ষমতাকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই। একটি বৃহৎ পরিবার ভবিষ্যতে হইবে, সাহসিকতার সহিত এই বিষয়ের সম্মুখীন তাহাকে হইতে হইবে এবং তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাহাকে উদ্ভাবিত করিতে হইবে। তাহার জানা উচিত যে, জন্মনিরোধ যন্ত্রাদির ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ লক্ষ লক্ষ লোকের তুলনায় সম্ভবতঃ অল্প কয়েক সহস্র লোকই তাহা ব্যবহার করে। লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের সন্তানগণকে প্রতিপালন করার ব্যাপারে ভীত হয় না—যদিও তাহাদের সকলের জন্মের আবশ্যকতা ছিল না। আমি এই বলিতে চাই যে, নিজের কৃতকর্মের ফলের সম্মুখীন হইতে সংকোচ বোধ করা কাপুরুষতার লক্ষণ। যাহারা জন্মনিরোধ যন্ত্রাদি ব্যবহার করে তাহারা কখনও আত্মসংযম শিক্ষা করিতে পারিবে না। ইহা অভ্যাস করা তাহাদের দরকার হইবে না। জন্মনিরোধ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সহবাস দ্বারা সন্তানের জন্ম বারণ হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের, সম্ভবতঃ পুরুষেরই বেশী, জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। শয়তানের সহিত যুদ্ধ না করা অমানুষের কাজ। আমার পত্রলেখক আত্মসংযম অভ্যাস করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউক এবং তাহাই নিশ্চিতরূপে এবং সাধুভাবে অবাঞ্ছিত সন্তানের আগমন রোধ করিবার একমাত্র উপায়। এই প্রচেষ্টায় শতবার সে অকৃতকার্য হইলেও কিছু আসে যায় না। যুদ্ধেই আনন্দ। ভগবানের কৃপাতেই ফললাভ হয়।

[হরিজন, ১৭-৪-'৩৭]

১৬

জনৈক যুবকের সমস্যা

প্রশ্ন॥ আমি বাইশ বৎসরের যুবক। যদি আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকে তবে সেই বিষয়ে আমার পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করা আমার পক্ষে সমীচীন কিনা।

উত্তর॥ শাস্ত্রমতে এবং যুক্তিমতে সন্তানগণ যখন বিচারবুদ্ধির বয়স প্রাপ্ত হয় (শাস্ত্রমতে সেই বয়স ষোল), তখন তাহারা পিতামাতার মিত্রস্বরূপ হয় অর্থাৎ তাহারা পিতামাতার আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য থাকে না। তথাপি তাহারা পিতা-মাতার সহিত আলোচনা করিতে এবং যেখানে সম্ভবপর সেইখানেই তাহাদের ইচ্ছা-নুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য। তুমি প্রাপ্তবয়স্ক এবং যদি বিবাহ-প্রস্তাব তোমার মনোমত না হয় অথবা অন্য কোন উপযুক্ত কারণ থাকে তবে বিবাহের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তুমি বিনীতভাবে অসম্মতি প্রকাশ করিবে।

[হরিজন, ৯-৩-’৪০]

১৭

ইহা কি বিবাহ ?

আমার বর্তমান পীড়ার প্রথম দিকে যখন কোন পত্রাদি সম্বন্ধে আমার মনো-যোগ দিবার শক্তি ছিল না, তখন একখানা চিঠি পাই; তাহা হইতে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম। যদিও লেখক বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছিলেন, আমি পক্ষগণের নাম উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম।

“বর্তমান বিবাহের মরসুমে কারওয়ার সদাশিবগড়ে একটি হৃদয়বিদারক বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যাটির বয়স ১২ বৎসর এবং গোয়ার একটি দরিদ্র পরিবারে তাহার জন্ম। বরের বয়স ৬০। তাঁহার প্রথমা পত্নী আট নয়টি সন্তানের মধ্যে দুইটি সন্তান রাখিয়া প্রায় তিন বৎসর পূর্বে পরলোকগমন করেন। বর একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। গত বৎসর তিনি একটি অল্পবয়স্কা কন্যার পাণিগ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার সমাজের আন্দোলনে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই বৎসর কন্যার পিতাকে দুইশত টাকা দিয়া তিনি কৃতকার্য হন। এই ব্যাপারে কী করা যায় ?......র মতো ব্যক্তিরা, যাঁহারা সমাজসংস্কারক, তাঁহারাও এই অমানুষিক ব্যাপারে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন নাই।”

—যে চিঠি হইতে উপরোক্ত সারাংশ দিলাম তাহাতে লিখিত বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি বলিতে পারিতাম ইহাই একমাত্র অসাধারণ ঘটনা, মনে স্বস্তি বোধ করিতাম।

এরূপ ঘটনা অনেক সময়ই ঘটিয়া থাকে এবং তাহার সরাসরি দৃঢ় প্রতিকার আবশ্যক। নিঃসন্দেহে একটি উপায় হইতেছে—এরূপ প্রত্যেকটি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া নারীসমাজের বিরুদ্ধে এরূপ পাপাচরণের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তৎসম্বন্ধে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী জনমত গঠন করা। কিন্তু যেখানে এইরূপ অবৈধ নীতিবিরোধী পরিণয় আসন্ন, সেখানে স্থানীয় আন্দোলনই নিঃসংশয়ে অত্যন্ত কার্যকর। লেখকের মতে আটটি সন্তানের এই বৃদ্ধ জন্মদাতার প্রথম উদ্যম উপযুক্ত সময়ে আন্দোলনের ফলেই ব্যর্থ হয়। বর্তমান ক্ষেত্রেও সেইরূপ আন্দোলন কেন হয় নাই তাহা আমি বুঝিতে পারি না। নিশ্চয়ই স্থানীয় বহু লোক জানিতেন যে, এই বৃদ্ধ বিপত্নীকের জন্য অল্পবয়স্কা একটি মেয়ে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমি আশ্চর্যান্বিত হইতেছি যে তখনই কেন মেয়েটিকে অত্যাচার এবং দুর্দশার জীবন হইতে রক্ষা করিবার আন্দোলন আরম্ভ করা হয় নাই। আমার মতে যদি স্থানীয় জনমত সুগঠিত করা যায় তবে এই বালিকা বধূটিকে সাহায্য করিবার সময় এখনও আছে। লেখকের পত্রে বুঝা যায়, উক্ত বিপত্নীক এক কালে একজন জনহিতৈষী রকমের লোক ছিলেন। তাঁহার কবল হইতে মেয়েটিকে সরাইয়া সেবা-সদনে বা এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়া দিবার জন্য কি তাহাকে বুঝান যায় না এবং তার পর মেয়েটি যখন পূর্ণবয়স্কা হইবে তখন তাঁহাকে স্বামীর সঙ্গে থাকিবার বা বিবাহ বন্ধন বাতিল করিবার স্বাধীনতা কি দেওয়া যায় না? কিন্তু সমাজের বর্তমান মৃতপ্রায় অবস্থায় এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হউক বা নাই হউক, নির্মলচরিত্র যুবকগণ সর্বপ্রকার ন্যায়সংগত উপায়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার জন্য এবং বালবিধবাগণকে পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কল্যাণসংঘ কেন গঠন করিবে না তাহার কোন কারণ নাই। এই দুইটি বিষয় পরস্পরসংশ্লিষ্ট। এই সকল কল্যাণসংঘকে যথার্থরূপে কাজ করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ স্থানে হাত লাগাইতে হইবে। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহারা দেখিতে পাইবে যে তাহাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত হইয়াছে। আমাদের অধিকাংশ শহরের প্রত্যেকটিতেই লোকসংখ্যা অতি অল্প এবং শহরে কখন এইরূপ নীতিবিরুদ্ধ কাণ্ড ঘটাইবার উদ্যোগ চলিতেছে তাহা জানা বা বালবিধবাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে, এই সকল কল্যাণসংঘকে যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ এবং আদর্শ আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাদের পক্ষে বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা প্রকাশ বা বলপ্রয়োগ তাহাদের প্রতিকূলে যাইবে, এবং তাহারা যে উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিবে তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৯-'২৭]

১৮

দ্বিগুণ পাপ

কিছুকাল পূর্বে আমার লিখিত "ইহা কি বিবাহ?" এই প্রবন্ধ বিষয়ে জনৈক লেখক একটি বিস্তৃত পত্র লিখিয়াছেন। তাহা আমি নিম্নে সংক্ষেপে দিতেছি। আমার অবগতির জন্য তাঁহার নাম দিয়াছেন বটে, কিন্তু "জনৈক অবিবাহিত" এই গুপ্তনাম তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

"আপনার কাগজে প্রকাশিত 'ইহা কি বিবাহ?' এই প্রবন্ধটি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে, কারওয়ারের গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহা সর্বজনবিদিত। যে সমাজে এই বিবাহ ঘটিয়াছে সেই সমাজের একজন হিসাবে আমি সর্বসাধারণের নিকট, বিশেষতঃ সমগ্র ভারতের গৌড়সারস্বত ব্রাহ্মণগণের নিকট তাঁহাদের সুবিবেচনার জন্য নিম্নের কয়েকটি ছত্র উত্থাপিত করিতেছি।

"কোন পুরুষের পক্ষে পাত্রী ক্রয় করা কলঙ্কের বিষয়। কিন্তু আমাদের ভিতর আর একটি দূষণীয় প্রথা আছে; আমাদের মধ্যে পিতা তাঁহার কন্যার জন্য বর ক্রয় করিতে বাধ্য হন এবং বর যে টাকা পায় তাহাকে পণ বলা হয়। কন্যার পিতামাতার আর্থিক অবস্থানুযায়ী পণ ধার্য হয় না, তাহা ভাবী বরের বংশানুক্রমিক আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী হয়, অথবা সময় সময় বর যে পরিমাণ শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে। যে ব্যক্তি যত বেশী শিক্ষিত হন এবং যিনি যত অধিক উচ্চ শিক্ষাপদবী লাভ করেন বিবাহের বাজারে তাঁহার দাম ততোধিক।

"কয়েক মাস পূর্বে বোম্বাই শহরে সুশিক্ষিত এবং সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত একজন ভদ্রলোকের বিবাহ হয় এবং শোনা যায় প্রায় বিশ হাজার টাকার যৌতুক তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। ইহা প্রকৃতই দুঃখের বিষয় যে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে সকল অনাচার দূর করিবেন বলিয়া আশা করা যায় তাঁহারাই সেই সকল অনাচার অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতেছেন।"

—সেই সমাজের অপর একজন ব্যক্তির এ বিষয়ে লিখিত আর একখানা চিঠি আমার নিকট আছে। দেখা যায়—যাহারা পত্নী ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে তাহারা পাত্রী অনুসন্ধান করিবার জন্য গোয়া নগরীতে যায়। কারণ সেখানেই গরীব সারস্বত ব্রাহ্মণ-গণকে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের কন্যাগণের পিতা বা পিতামহ হইবার উপযুক্ত বয়সের বৃদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট কন্যা বিক্রয় করিয়া ধনবান হইতে তাহারা লজ্জাবোধ করে না। এইভাবে সমাজ দ্বিগুণ পাপাচরণ করিয়া থাকে। শিক্ষিত যুবক সর্বোচ্চ খরিদ্দারের নিকট তাহার হাত বাড়াইয়া রাখে এবং অভাবগ্রস্ত মাতাপিতা সর্বোচ্চ মূল্য দিতে পারে এরূপ অতিবৃদ্ধ (সময় সময় শিক্ষিতও) ব্যক্তিগণের নিকটও তাঁহাদের অল্পবয়স্কা নাবালিকা কন্যাদিগকে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইয়া থাকে। সারস্বত সমাজ ইচ্ছা করিলে এই একমাত্র অজুহাত দিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারে যে, অন্যান্য বর্ণও রহিয়াছে যাহারা এই কুপ্রথা হইতে

মুক্ত নহে; এবং তাহার নজীর দেখাইয়া কোন না কোন উপায়ে এই কুপ্রথার সংস্কার পিছাইয়া দিতে পারে। কিন্তু যদি সারস্বত সমাজ সংস্কার-কার্যে অগ্রণী হয় তবে "তুমিও এই দলে"—এইরূপ নিন্দনীয় ওজরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিবে; এবং এখন এই কুপ্রথার ব্যাপার বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় সমাজ আপনাকে এই দ্বিগুণ পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-'২৭]

১৯

চলতি সামাজিক ক্ষত

শোলাপুর হইতে জনৈক মাহেশ্বরী যুবক বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে অল্পবয়স্কা বালিকাগণের বিবাহপ্রসঙ্গে লিখিতেছে :—"আমাদের মাহেশ্বরী সমাজে গার্হস্থ্য-জীবন বস্তুতঃই দুঃসময়ে পড়িয়াছে। শত শত পঙ্গু বৃদ্ধ লালসা মিটাইবার জন্য অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া প্রতিবৎসর অল্পবয়স্কা বালিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহার ফলে আমাদের সমাজ দ্রুতগতিতে নৈতিক অবনতি ও দুষ্কর্মের পূতিগন্ধময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। বাল্যবিবাহ এবং বিসদৃশ পরিণয় নিত্যদিনের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে সমাজের গার্হস্থ্যজীবন পাপ এবং নৈতিক অধঃপাতের গহ্বরে পতিত হইতেছে; এবং সেই সমাজে দেশের সম্মানরক্ষার উপযুক্ত লোক জন্ম-গ্রহণ করিবে ইহা আশা করা দুরাশা মাত্র। সময় থাকিতে কিছু না করিতে পারিলে এই সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

"বাল্যবিবাহ এবং বিসদৃশ পরিণয় বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে প্রায় দশ বার জন যুবক একটি সমিতি গঠন করিয়াছে—তাহাদের উদ্দেশ্য এই অমঙ্গল দূর করিবার জন্য একটি আন্দোলনের সৃষ্টি করা। আমরা সত্যাগ্রহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি; যখনই এইরূপ অবাঞ্ছনীয় বিবাহব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হইবে তখনই তাহা করিব এবং আমাদের বিশ্বাস এরূপ করিলে তাহা ফলপ্রসূ হইবে। মাহেশ্বরী সমাজের বিবাহের নানাপ্রকার আনুষঙ্গিক নিয়ম, আচার এবং উৎসবাদি আপনার জানা আছে। এই ব্যাপারে সত্যাগ্রহ করিবার শ্রেষ্ঠ শান্তিপূর্ণ উপায় সম্বন্ধে অনুগ্রহ-পূর্বক উপদেশ দিবেন কি?

"আপনার মতে বিবাহের জন্য বর ও কন্যার প্রত্যেকের উপযুক্ত বয়ঃসীমা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়? বয়োধর্মবিরোধী বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য কী কী অবস্থায় সত্যাগ্রহ করা আপনি অনুমোদন করেন?

"মাত্র সেদিন পঞ্চান্ন এবং ষাট বৎসরের দুই জন বৃদ্ধ প্রত্যেকে বারবৎসরবয়স্কা এক একটি মেয়ে বিবাহ করিয়াছে। এই গ্রামেই আরও কয়েকটি এইরূপ বীভৎস বিবাহব্যাপার শীঘ্রই ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা ইতিমধ্যেই এই সকল বিবাহ

বন্ধ করিবার জন্য ছাপানো পুস্তিকা বিতরণ করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু আমরা মনে করি শুধু ফাঁকা প্রচারকার্যে চলিবে না। কর্মক্ষেত্রে নামিয়া প্রবল-ভাবে কাজ সরাসরি আরম্ভ করা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে আপনার মত অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।"

—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহই প্রকৃত উপায়। কিন্তু কীভাবে তাহা করিতে হইবে, তাহা পৃথক্ প্রশ্ন। আমার প্রবন্ধে আমি একাধিকবার সত্যাগ্রহের সীমা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সত্যাগ্রহ করিবার পূর্বে নিজেকে নিয়মানুবর্তী করিতে হইবে, আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হইবে এবং নিজেকে পবিত্র করিতে হইবে এবং যিনি সত্যাগ্রহ করিবেন তাঁহার সর্ববাদিসম্মত সামাজিক মর্যাদা থাকা চাই। সত্যাগ্রহী অসৎ বিষয় এবং যাহারা অসৎ কার্য করে এই উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাহা কখনই ভুলিবেন না। যাহারা মন্দ কাজ করে তাহাদের প্রতি সত্যাগ্রহী কোন বিদ্বেষ বা হিংসা পোষণ করিবেন না। অসৎ ব্যক্তি কৃত কার্য যতই গুরুতর হউক না কেন, সত্যাগ্রহী তাহার প্রতি অকারণে রূঢ় ভাষাও প্রয়োগ করিবেন না। প্রত্যেক সত্যা-গ্রহীর ইহা মূলমন্ত্র হইবে যে, পৃথিবীতে অধঃপতিত এমন কেহ নাই যাহাকে প্রেম দ্বারা সংশোধিত করা যায় না। সত্যাগ্রহীর সর্বদা চেষ্টাই হইবে সৎ দ্বারা অসৎকে, ভালবাসা দ্বারা ক্রোধকে, সত্য দ্বারা অসত্যকে এবং অহিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করা। পৃথিবী হইতে অমঙ্গল দূর করিবার অন্য কোন পথ নাই। কাজেই যিনি সত্যাগ্রহী হইবার দাবী রাখেন তাঁহাকে সূক্ষ্মভাবে প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে আত্মবিচার ও আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা ইহা জানিতে চেষ্টা করিতে হইবে যে, তিনি নিজেই ক্রোধ, হিংসা বা মনুষ্যসুলভ অন্যান্য দুর্বলতার স্পর্শ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত কিনা এবং যে সকল পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই সকল পাপানুষ্ঠানের প্রবণতা হইতে তিনি নিজেও সম্পূর্ণ মুক্ত কিনা। আত্মশুদ্ধি এবং নিজের ভ্রমপ্রমাদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করায় সত্যাগ্রহীর অর্ধেক জয় নিহিত থাকে। সত্যাগ্রহীর এই বিশ্বাস থাকে যে, বক্তৃতা বা বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে যে ফল লাভ হয় তাহা হইতে বহুগুণ স্থায়ী, কার্যকর ও ব্যাপক ফল সত্য এবং প্রেমের নীরব ও অনাড়ম্বর সাধনার দ্বারা লাভ করা যায়।

কিন্তু যদিও সত্যাগ্রহ নীরবে ক্রিয়া করে, তথাপি সত্যাগ্রহীর পক্ষে লোকদৃষ্টির সম্মুখে কতকপরিমাণ কাজ করা আবশ্যক। সত্যাগ্রহী যে অমঙ্গল দূর করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব, সর্বপ্রথম দেশব্যাপী এবং গভীর আন্দোলন দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে তাহাকে জনমত গঠন করিতে হইবে। যখন কোন সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে জনমত যথেষ্টরূপে জাগ্রত হয় তখন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণও তাহা অভ্যাস করিতে বা স্পষ্টভাবে তাহা সমর্থন করিতে সাহসী হইবে না। জাগ্রত এবং বিচারনিষ্ঠ জনমত সত্যাগ্রহীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অস্ত্র। সর্ববাদিসম্মত জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যখন কোন ব্যক্তি কোন সামাজিক ব্যাধিকে সমর্থন করে তখনই তাহাকে সমাজে একঘরে করার স্পষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণ উপস্থিত হয়। কিন্তু যাহার বিরুদ্ধে এই সামাজিক বয়কট স্থিরীকৃত হয় তাহার কোন প্রকার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য সত্যাগ্রহীর

কখনই থাকিবে না। সামাজিক বর্জনের অর্থ এই যে, দোষী ব্যক্তির সহিত সমাজ সম্পূর্ণরূপে অসহযোগিতা করিবে—এর চাইতে কিছু বেশীও নয়, কমও নয়। ইহার ভাব এই—যে সমাজকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে চায়, সমাজের সেবা পাওয়ার তাহার কোন যোগ্যতা বা অধিকার নাই। কার্যতঃ ইহা করিলেই যথেষ্ট। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা যাইতে পারে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ইহার প্রয়োগ-প্রণালীও পরিবর্তন করা আবশ্যক হইতে পারে।

কিন্তু যে ইন্দ্রিয়সেবী বৃদ্ধ পঙ্গু অবস্থায়ও তাহার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দমন করিতে পারে না তাহার সম্বন্ধে কী কর্তব্য? ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অন্ধ, ইহার ভালমন্দ বিচারের শক্তি নাই; যে কোন প্রকারেই হউক এবং যেরূপ ব্যয়সাপেক্ষই হউক, ইহার চরিতার্থতা চাই-ই তার। সমাজ এইরূপ ব্যক্তিকে লইয়া কী ভাবে চলিবে? ইহার উত্তর এই যে, এই সকল কামাতুব বৃদ্ধ যাহাতে অসহায়, দুর্গত কন্যা সংগ্রহ কবিতে না পারে সেই বিষয়ে ব্যাপকভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। বিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা কোন মেয়েকেই বিবাহ না দেওযা এবং তাহাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে বিবাহ না দেওযার প্রথা কঠোরভাবে প্রচলিত করিতে হইবে। স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উঠে—যদি কোন মেয়েই স্বেচ্ছায় সেই বৃদ্ধাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না হয়, তবে সে কী কবিবে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর সমাজ দিতে পারে না এবং ইহার কোন উত্তর দিতেও সমাজ বাধ্য নহে। সমাজেব কাজ শুধু অন্ধ লালসার ইন্ধনে পরিণত হইতে পাবে এমন উপায়হীন বালিকাগণকে রক্ষা করা। লালসা চরিতার্থ করিবার উপায় উদ্ভাবন কবা সমাজেব কর্তব্যের ভিতর নয। কার্যতঃ কিন্তু ইহাই দেখা যাইবে যে, যখন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সর্বত্র পবিত্রতা বিরাজ করে তখন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের লালসা সেই পরিবেশের প্রভাবে বহুল পরিমাণে শান্ত হইয়া পড়িবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-৮-'২৯]

২০

যুবকদের কলঙ্ক

জনৈক সংবাদদাতা আমাকে সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া কিয়দংশ পাঠাইয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, হায়দরাবাদ ও সিন্ধুদেশে বর-পণ শোচনীয়ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে; ইম্পীরিয়্যাল তার বিভাগের একজন ইঞ্জিনিয়র বাগ্‌দানের সময় নগদ পণ বিশ হাজার টাকা আদায় করিয়াছেন; বিবাহের দিনেও তারপর বিশেষ বিশেষ সময় বহু পরিমাণে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও লইয়াছেন। কোন যুবক যখন পণকে বিবাহের সর্ত করে তখন সে তাহার শিক্ষাকে এবং তাহার দেশকে অধঃপাতিত করে এবং স্ত্রীজাতির অবমাননা করে। দেশে অনেক যুব-প্রতিষ্ঠান বর্তমান আছে। আমার

ইচ্ছা, এই শ্রেণীর সমস্যা লইয়া তাহারা আলোচনা করিবে। অনেক সময় দেখা যায় এই শ্রেণীর সঙ্ঘগুলি সমাজের প্রকৃত সংস্কার করিবার সঙ্ঘ না হইয়া—যাহা তাহাদের হওয়া উচিত—তৎপরিবর্তে পরস্পরের প্রশংসাকারী সঙ্ঘে পরিণত হইয়া পড়ে। এই সকল সঙ্ঘের দ্বারা জনসাধারণের আন্দোলনে সহায়তা সময় সময় হইলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের নিকট হইতে দেশের যুবকগণ যে প্রশংসা লাভ করে তাহাই তাহাদের পুরস্কার। এইরূপ কাজ যদি আভ্যন্তরীণ সংস্কার দ্বারা সমর্থিত না হয় তবে উহা যুবকদের ভিতরে অনুচিত আত্মশ্লাঘার ভাব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নৈতিক অবনতি ঘটাইতে পারে। অপমানজনক পণপ্রথা হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রবল জনমত গঠন করিতে হইবে এবং যে সকল যুবক এইরূপ অসদ্‌ভাবে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা তাহাদের জীবন কলুষিত করে, তাহাদিগকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করা উচিত। কন্যার পিতামাতাও বিলাতী উপাধির মোহে তাহাদের চক্ষু ঝলসিত করিতে বিরত হইবেন এবং তাঁহাদের কন্যাদের জন্য সত্যপ্রিয়, সৎসাহসী যুবক সংগ্রহ করিবার জন্য নিজেদের ক্ষুদ্র বংশ ও প্রদেশের গণ্ডী অতিক্রম করিতে দ্বিধা করিবেন না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৬'-২৮]

২১

বিবাহ ও আত্মবিক্রয়

কয়েকমাস পূর্বে স্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকার স্তম্ভে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী অনেক বর্ণের মধ্যে বিদ্যমান পণপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছিল এবং এই বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্যও ছিল। ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় আমি এই নিষ্ঠুর প্রথা সম্বন্ধে প্রায়ই লিখিতাম। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা হইতে গৃহীত অংশগুলি আমার তখনকার পীড়াদায়ক স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। আমার মন্তব্যগুলি "দেতি-লেতি" নামে সিন্ধুদেশে খ্যাত প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছিল। নিজ কন্যাদিগকে ভালো বিবাহ দিবার জন্য উৎসুক পিতামাতাগণের নিকট হইতে অনেক শিক্ষিত সিন্ধুদেশবাসী প্রভূতপরিমাণ টাকা আদায় করিয়াছে এরূপ জানা যায়। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা সাধারণভাবে এই প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছে। প্রথাটি যে হৃদয়হীনতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যতদূর জানি, এই প্রথা লক্ষ লক্ষ লোককে স্পর্শ করে না। ভারতীয় মানবজাতিরূপ সমুদ্রের বিন্দুকল্প মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের ভিতরই এই প্রথা নিবদ্ধ। যখনই আমরা কোন কুপ্রথার সম্বন্ধে বলি তখনই সাধারণতঃ আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের কথাই ভাবি। গ্রামবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যেও নানা রকম প্রথা বিদ্যমান, তাহাদেরও দুঃখকষ্ট আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এখন পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য।

ইহা বুঝাইতেছি না যে, যেহেতু পণের কুপ্রথা এই দেশের অপেক্ষাকৃত অতি অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যেই নিবদ্ধ, সেইজন্য উহাকে উপেক্ষা করা যায়। এই প্রথা ধ্বংস করিতে হইবে। অর্থের জন্য পিতামাতা বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন, এই ধারণার অবসান ঘটাইতে হইবে। এই প্রথা নিগূঢ়ভাবে জাতি বা বর্ণগত সংস্কারের সঙ্গে জড়িত। যতদিন পাত্র-পাত্রী নির্বাচন কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের কয়েক শত যুবক বা যুবতির ভিতর নিবদ্ধ থাকিবে ততদিন ইহার বিরুদ্ধে যাহাই বলা হউক না কেন, ইহা প্রচলিত থাকিবে। যদি এই কুপ্রথা সমূলে দূরীভূত করিতে হয় তবে মেয়েদের, ছেলেদের এবং তাহাদের পিতামাতাদিগকে জাতি বা বর্ণের গণ্ডী ছিন্ন করিতে হইবে। বিবাহের বয়স বাড়াইতে হইবে এবং আবশ্যক হইলে অর্থাৎ যদি উপযুক্ত পাত্র লাভ সম্ভবপর না হয় তবে কন্যাদিগকে আমৃত্যু কুমারী থাকিবার সাহস অর্জন করিতে হইবে। জাতির যুবসম্প্রদায়ের মনোভাব আমূল পরিবর্তন করিতে পারে, এইরূপ শিক্ষা এইজন্য দরকার। দুঃখের বিষয়, আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত শিক্ষাপ্রণালীর কোন যোগ নাই এবং জাতির বালকবালিকাগণের অতি নগণ্য অংশ যে শিক্ষা পায় তদ্দ্বারা সমাজের এই অবস্থা প্রায় অবিকৃত থাকিয়া যায়। কাজেই যদিও এই কুপ্রথা প্রশমিত করিবার জন্য যাহা যাহা করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবে; কিন্তু ইহা আমার নিকট সুস্পষ্ট যে এই কুপ্রথা এবং উল্লেখযোগ্য এইরূপ আরও বহু কুপ্রথা দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইলে একমাত্র উপায় দেশের দ্রুতপরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করা। অথচ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এত অধিকসংখ্যক যুবক-যুবতী এই সুস্পষ্ট সামাজিক অনাচারের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে অক্ষমতা বা অনিচ্ছা প্রদর্শন করে কেন—যদিও বিবাহানুষ্ঠানের ন্যায় ইহার সহিত তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল-অমঙ্গল ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত? বিবাহ যোগ্য হয় নাই এই অপমানে শিক্ষিত মেয়েরা আত্মহত্যা করিতেছে কেন? যে কুপ্রথা সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য এবং যাহা নীতিজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা যদি তাহারা তাহাদের অর্জিত শিক্ষা দ্বারা সাহসের সহিত উপেক্ষা করিতে সমর্থ না হয় তবে সেই শিক্ষার মূল্য কী? উত্তর সুস্পষ্ট। মূলতঃ শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর এমন কোন গলদ আছে যাহার জন্য যুবকযুবতীগণ সামাজিক বা অন্যান্য কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার শক্তিলাভ করিতে পারে না। সেই শিক্ষাব্যবস্থাই মূল্যবান যাহার প্রভাবে শিক্ষিতের সকল মানসিক সদ্বৃত্তির উন্মেষ হয়, যাহার ফলে সে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল সমস্যা নিপুণভাবে সমাধান করার শক্তিলাভ করে।

[হরিজন, ২৩-৫-'৩৬]

২২

পরিহার্য সামাজিক দুর্গতি

একজন লেখকের আর্তিবহুল দীর্ঘ পত্র হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা গেল :—"আমার বয়স ৬৭ বৎসর। আমি বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক। আজীবন অর্থাৎ ৪৬ বৎসর যাবৎ শিক্ষাবিভাগে আছি। একটি উচ্চবংশীয় সম্ভ্রান্ত বাঙগালী কায়স্থ পরিবারে আমার জন্ম। আমাদের পরিবার এক সময় সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্তমানে নিতান্ত দুঃস্থ। ভগবানের আশীর্বাদে (?) আমার সাতটি কন্যা এবং দুইটি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ বৎসর বয়সে তাহার দুঃস্থ এবং নিরাশ্রয় পিতামাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া বিগত অক্টোবর মাসে মারা যায়। সে ছিল উন্নতিশীল যুবক—আমার জীবনের একমাত্র আশাভরসা। সাত কন্যার মধ্যে পাঁচটির বিবাহ ইতিমধ্যে হইয়াছে। আঠার এবং ষোল বৎসর বয়স্কা ষষ্ঠ ও সপ্তম কন্যা এখনও অনূঢ়া। আমার কনিষ্ঠ পুত্র একাদশ বৎসরের নাবালক। আমার বেতন ষাট টাকা। ইহা দ্বারা দুই দিক মেটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সঞ্চয় কিছু তো নাই-ই, বরং দেনা আছে। আমার ষষ্ঠ কন্যার বিবাহ স্থির হইয়াছে। অলঙ্কার এবং তিন শত টাকা পণসহ বিবাহের খরচ নয় শত টাকার কমে হইবে না। কানাডার সন্ লাইফ বীমা কোম্পানীতে আমার দুই হাজার টাকার একটি বীমা আছে। কোম্পানী আমাকে মাত্র চার শত টাকা ধার দিতে রাজি হইয়াছে। আবশ্যকীয় অর্থের ইহা অর্ধেক মাত্র। অপরার্ধের সম্বন্ধে আমি একেবারে নিরুপায়। আপনি কি এই দরিদ্র পিতাকে অপরার্ধ দ্বারা সাহায্য করেতে পারেন না?"

—এই শ্রেণীর বহু পত্রের মধ্যে ইহা একটি। সেগুলির অধিকাংশই হিন্দুস্থানীতে লেখা। কিন্তু আমরা জানি যে, ইংরেজী শিক্ষাও কন্যাদের পিতামাতার আর্থিক অবস্থার মান উন্নত করে নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে—যেহেতু ইংরেজী শিক্ষিত পিতার ইংরেজী শিক্ষিতা কন্যার উপযুক্ত যুবকের বিবাহপণ বাজারে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই বাঙ্গালী পিতার অবস্থায় পতিত ব্যক্তিকে আবশ্যকীয় পরিমাণ ঋণ দান অথবা দাতব্য করা তাহাকে সাহায্য করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় নয়। পিতাকে যদি বুঝাইতে পারা যায় এবং তাঁহার প্রাণে এরূপ শক্তি সঞ্চয় করা যায় যাহার বলে তাঁহার কন্যার বিবাহ পণ দিয়া ক্রয় করিতে তিনি অস্বীকৃত হইবেন এবং পণ না নিয়া শুধু ভালোবাসার জন্য বিবাহ করিবে এরূপ বর নিজে নির্বাচন করিবেন কিংবা কন্যাকে নির্বাচন করিতে অনুমতি দিবেন—তাহাই হইবে সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট সাহায্য। ইহা করিতে হইলে নির্বাচনের ক্ষেত্র স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রসারিত করিতে হইবে। বর্ণ ও প্রদেশ এই দুইটি গণ্ডীই অতিক্রম করিতে হইবে। যদি ভারতবর্ষ এক এবং অবিভাজ্য হয় তবে নিশ্চয়ই সেখানে পরস্পরের সহিত খাওয়া বসা করিবে না অথবা বিবাহাদি ক্রিয়া করিবে না—এরূপ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী সৃষ্টি করিতে পারে এমন কোন অস্বাভাবিক বিভাগ থাকিবে না। এই নিষ্ঠুর

প্রথার মধ্যে কোন ধর্ম নাই। ইহা বলিলে চলিবে না যে, ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এই বিষয়ে সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। কিংবা সমগ্র সমাজ পরিবর্তনের জন্য সম্পূর্ণ তৈয়ারী না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার অপেক্ষা করিতে হইবে। নির্ভীক সাহসী ব্যক্তিগণের সহায়তা ব্যতীত নৃশংস অমানুষিক সামাজিক কুপ্রথা বা কদাচারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সমাজ-সংস্কার কখনও সম্ভবপর হয় নাই। বিবাহ নিঃসন্দেহে সামাজিক প্রথা এবং ধর্মগত একটি অনুষ্ঠান। বিবাহকে পণ্যদ্রব্যের মত একটি ব্যবসায়ের বস্তুরূপে গণ্য করিতে অস্বীকার করিয়া যদি উক্ত শিক্ষক মহাশয় বা তাঁহার কন্যাগণ উহাকে ধর্মানুগ একটি মর্যাদাকর অনুষ্ঠানের মত দেখেন তবে বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে কেন দুঃখভোগ করিতে হইবে? কাজেই লেখককে আমি এই উপদেশ দিব যে, ঋণ করা বা ভিক্ষা করার ভাব সৎসাহসের সহিত পরিত্যাগ করিবেন এবং তিনি নিজ কন্যার সহিত পরামর্শ করিয়া যে কোন বর্ণ বা জাতি বা প্রদেশ হইতে একটি উপযুক্ত বর নির্বাচন করিবার সৎসাহস দেখাইবেন এবং জীবনবীমা হইতে যে চারশত টাকা তিনি ধার করিতে ইচ্ছুক, তাহাও তিনি বাঁচাইতে পারিবেন।

[হরিজন, ২৫-৭-'৩৬]

২৩

বালিকাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা

জনৈকা চারুশীলা লেখিকা পত্রে জানাইতেছেন :—" 'পরিহার্য দুর্গতি' শীর্ষক আপনার লিখিত প্রবন্ধ আমার নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়। পিতামাতা তাঁহাদের মেয়েদের বিবাহ দিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবেন কেন? এবং তজ্জন্য অশেষ কষ্টভোগই বা করিবেন কেন? যদি তাঁহারা ছেলেদের মত মেয়েদিগকেও এইরূপ শিক্ষিত করেন যে তাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের শক্তি লাভ করিতে পারে তবে পিতামাতাকে মেয়েদের পাত্র নির্বাচনের জন্য বেশী চিন্তা করিতে হয় না। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, যদি মেয়েরা সুচারুভাবে তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলিবার সুযোগ পায় এবং আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া নিজেদের ভরণপোষণে সমর্থ হয় তবে তাহারা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহ হইতে কোন অসুবিধা হয় না। কন্যাদের উচ্চ শিক্ষা বলিয়া যাহা বলা হয় আমি তাহাই অনুমোদন করিতেছি এরূপ যেন কেহ না মনে করেন। হাজার হাজার মেয়ের পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয় ইহা আমি জানি। আমি কন্যাদের জন্য এইরূপ কার্যকর জ্ঞানলাভ এবং কোন শিল্প বা ব্যবসামূলক শিক্ষা সমর্থন করি যদ্দ্বারা জীবনসংগ্রামের সম্মুখীন হওয়ার উপযুক্ত আত্মপ্রত্যয় তাহাদের জন্মিবে এবং তাহারা নিজদিগকে ভাবী স্বামিগণের বা পিতামাতার গলগ্রহ বলিয়া মনে করিবে

না। বস্তুতঃ এইরূপ কয়েকটি বালিকাকে আমি জানি, যাহারা স্বামী-পরিত্যক্তা হইয়া আজ তাহাদের স্বামীর সঙ্গে সসম্মানে জীবনযাপন করিতেছে; কারণ এই পরিত্যক্ত অবস্থায় তাহাদের আত্মনির্ভরশীল এবং সাধারণ শিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। আমার এই অনুরোধ যে, বিবাহযোগ্যা মেয়েদের পিতামাতার অসুবিধাগুলি বিবেচনা করিবার সময় সমস্যার এই দিক্‌টাতে আপনি জোর দিবেন।"

—আমার পত্রলেখিকা যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন আমি সর্বান্তঃকরণে তাহা অনুমোদন করি। আমাকে এইরূপ একজন পিতার বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হইয়াছিল যিনি নিজে এবং সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যাও নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পাত্রনির্বাচন নিবদ্ধ রাখিয়া নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়াছিলেন—তাঁহার কন্যা অনুপযুক্ত বলিয়া এরূপ ঘটে নাই। বালিকাটির "সুশিক্ষা"ই এই ক্ষেত্রে বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছিল। যদি বালিকাটি নিরক্ষর হইত সে যে-কোন যুবকের সহিত নিজেকে মানাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু সুশিক্ষিতা হওয়াতে স্বভাবতঃই সে তদ্রূপ "শিক্ষিত" স্বামী লাভ করিতে চাহিবে। বালিকাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য কন্যাপক্ষ হইতে পণ আদায় করিবার নীচ প্রবৃত্তি যে দ্বিধাশূন্যভাবে অযোগ্যতা বলিয়া গণ্য হয় না, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক মূল্য দেওয়া হয়। ইহা নানা প্রকারের পাপ প্রচ্ছন্ন রাখে। যে সকল সমাজের শিক্ষিত যুবকগণ মেয়েদের বিবাহ-প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য পণ আদায় করিয়া থাকে তাহারা "সুশিক্ষা" অর্থে যাহা বুঝে তাহার পরিবর্তে মনুষ্যোচিত সদ্‌গুণের অধিকারী হওয়াই "সুশিক্ষা"। এই অধিকতর সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করিলে বরনির্বাচনের ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রনির্বাচনের দুঃসাধ্যতা সম্পূর্ণ বিদূরিত না হইলেও, অনেকটা কমিয়া যাইবে। কাজেই আমার চারুশীলা লেখিকার প্রস্তাবের প্রতি পিতামাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং তাহা অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত অনিষ্টকারী জাতিবর্ণগত বেড়াগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আবশ্যকতার উপর জোর দিতেছি। সেগুলি ভাঙ্গিতে পারিলে নির্বাচনের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইবে এবং এই ভাবে পণ আদায়ের প্রবণতা অনেকটা প্রশমিত হইবে।

[হরিজন, ৫.৯-'৩৬]

২৪

বিবাহে ব্যয়সংকোচ

জনৈক সংবাদদাতা করাচীতে সম্পন্ন একটি বিবাহের বিবরণ আমাকে পাঠাইয়াছেন। বিবাহের সময় কন্যার বয়স ছিল ষোল; তাহার পিতা, শেঠ লালচাঁদ, ধনী ব্যক্তি এবং তিনি বিবাহের ব্যয় সর্বনিম্ন অঙ্কে সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছিলেন

এবং বিবাহ-অনুষ্ঠান ধর্মানুগতরূপে ও মর্যাদার সহিত নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া জানানো হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, সমগ্র বিবাহব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগে নাই, যদিও সাধারণতঃ এইরূপ ব্যাপারে বহুদিনব্যাপী অনাবশ্যক ব্যয় হইয়া থাকে। বিবাহকার্য একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ দ্বারা করানো হইয়াছিল; বর ও কন্যাকে যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইয়াছিল তিনি তাহার অর্থ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। আমি শেঠ লালচাঁদ এবং তাঁহার পত্নীকে অভিনন্দন জানাইতেছি, কারণ শেঠজীর সহধর্মিণী তাঁহার পতিকে এই বহুকালাগত সংস্কারকার্যে সক্রিয়ভাবে সাহচর্য দিয়াছেন এবং আমি আশা করি, এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য বহুসংখ্যক ধনী ব্যক্তি অনুসরণ করিবেন। যাঁহারা খাদি ভালবাসেন তাঁহারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে, শেঠ লালচাঁদ এবং তাঁহার পত্নী খাদিতে সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান এবং বর ও কন্যা উভয়েই খাদি পরিহিত ছিল এবং তাহারা নিজেরাও খাদিতে স্থিরবিশ্বাসী এবং সর্বদা খাদি পরিধান করে। আগ্রাতে ছাত্রদের সভাতে যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম এই বিবাহব্যাপার আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। একজন বন্ধু আমাকে যে সকল সংবাদ দিয়াছিলেন, উক্ত ছাত্রগণ সেইগুলি সমর্থন করিয়াছিল। সেগুলি এই—যুক্তপ্রদেশের (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ) যুবকগণ যাহারা কলেজে কিংবা স্কুলে পড়ে তাহারা নিজেরাই অল্পবয়সে বিবাহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব এবং তাহারা আশা করে যে, তাহাদের পিতামাতাগণ মূল্যবান উপহারাদির জন্য প্রভূতপরিমাণ ব্যয় করিবেন এবং ভোজ-আমোদ-প্রমোদের জন্য সমপরিমাণ কিংবা সময় সময় ততোধিক ব্যয় করিবেন। আমার সংবাদদাতা আমাকে বলেন যে, খুব উচ্চশিক্ষিত পিতামাতাগণও অর্থের অহঙ্কার হইতে মুক্ত নহেন এবং ব্যয় সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত ধনী ব্যবসায়িগণকে তাঁহারা পরাস্ত করিয়া থাকেন! এই শ্রেণীর সকলের পক্ষেই শেঠ লালচাঁদের সেদিনের দৃষ্টান্ত এবং শেঠ যমুনালাল বাজাজের অপেক্ষাকৃত পুরাতন দৃষ্টান্ত ব্যয় সংক্ষেপ করার বিষয়ে প্রেরণা যোগাইবে। পিতামাতাগণের অপেক্ষা যুবকগণেরই ইহা বেশী কর্তব্য যে, তাহারা অপ্রাপ্তবয়সে, বিশেষতঃ পাঠ্যাবস্থায়, বিবাহ করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃত হইবে; এবং যে ভাবেই হউক, সর্বপ্রকার ব্যয় বন্ধ করিবে। বস্তুতঃ, শাস্ত্রানুমোদিত ক্রিয়াটুকু সম্পন্ন করিতে দশ টাকার অতিরিক্ত খরচ আবশ্যক হইবে না এবং শাস্ত্রানুমোদিত বিষয়টুকু ছাড়া আর কিছুই বিবাহব্যাপারের অত্যাবশ্যকীয় অংগ বলিয়া গণ্য হইবে না। এই গণজাগরণের যুগে—যখন ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ, এই সকল প্রভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে—ইহা ধনী ব্যক্তিগণেরই কর্তব্য যে, তাঁহারা তাঁহাদের আমোদ-প্রমোদে ও বিলাসিতায় আত্মসংযম অভ্যাস করিয়া গরীব লোকদিগকে সন্তোষের সহিত জীবনযাপনের পথে চালিত করিবেন এবং তাঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকটি মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজের নেতৃবর্গ যাহা অনুষ্ঠান করেন অন্যেরা তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে।* এই বাক্যের সত্যতা

* যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥
—গীতা ৩।২১

আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা দৈনিক প্রমাণিত হইতেছে এবং সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ইহা বিবাহ-ব্যাপারে ও মৃত ব্যক্তিদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে প্রমাণিত হইতেছে। সহস্র সহস্র গরীব লোক এই উপলক্ষে জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হইতে নিজদিগকে বঞ্চিত করিতেছে এবং মারাত্মক উচ্চহারের সুদে ঋণভারে জড়িত হইতেছে। জাতীয় সম্পদের এই অপচয় অতি সহজেই বন্ধ করা যায়, যদি দেশের শিক্ষিত যুবকগণ, বিশেষতঃ ধনী পিতামাতার সন্তানগণ, তাহাদের জন্য ব্যয়িত অর্থের সর্বপ্রকার অপচয় নিবারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-৯-'২৯]

২৫

ছাত্রদের লজ্জার কথা

প্রায় দুই মাস যাবৎ পাঞ্জাবের একটি কলেজের ছাত্রীর একখানা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী লিপি আমার দপ্তরে পড়িয়া আছে। ইতিমধ্যে বিশেষ অভিজ্ঞ একটি ভগিনীর নিকট হইতে আমি আর একখানা চিঠি পাইয়াছি এবং আমার মনে হইল যে কলেজের মেয়েটির বিপন্ন অবস্থা নির্মম সত্য; এই বিষয়ের আলোচনা করা কর্তব্য, ইহা আর ফেলিয়া রাখা যায় না। তাহার চিঠিখানা বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে লেখা। ঐ চিঠিতে তাহার গভীর দুঃখের একটি সম্পূর্ণ চিত্র রহিয়াছে এবং আমি তাহার উত্তর যথাসাধ্যরূপে দিতে চেষ্টা করিব। চিঠির একাংশের তর্জমা নিম্নে দিতেছি :—"এমন সময় আসে, যখন বালিকাগণকে এবং বয়স্কা নারীগণকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও একাকী বাহির হইতে হয়;—তা একই শহরে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে হউক, অথবা এক শহর হইতে অন্য শহরেই হউক। এবং এইরূপে তাহাদিগকে একক দেখিতে পাইলে অসৎ প্রকৃতির লোকেরা তাহাদিগকে জ্বালাতন করে। তাহারা নিকট দিয়া পথে চলিয়া যাইতে যাইতে অসঙ্গত, এমনকি অশ্লীল ভাষাও ব্যবহার করে। এবং যদি ভয়ের দরুণ বাধা না পায় তবে আরও অভদ্র ব্যবহার করিতে দ্বিধাবোধ করে না। আমার জানিতে ইচ্ছা করে—এই সকল ঘটনার সময় অহিংসনীতি কতদূর কী করিতে পারে। যদি বালিকার কিংবা মহিলার যথেষ্ট সাহস থাকে তবে সে তাহার যাহা সম্বল তাহা ব্যবহার করিতে পারে এবং দুষ্টদিগকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে। অন্ততঃ তাহারা একটা হৈ চৈ সৃষ্টি করিয়া চতুর্দিকের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এবং ফলে দুষ্ট লোকগুলি চাবুকের মার খাইতে পারে। কিন্তু আমি জানি যে, এই প্রকার ব্যবহারের ফলে বরাবরের জন্য রোগ শোধরাইবে না; যন্ত্রণার কারণটি শুধু স্থগিত থাকিবে। যে সকল লোক অসদ্ব্যবহার করে যদি তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় তবে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, তাহারা যুক্তি শুনিবে এবং সহৃদয় ও

নম্র ব্যবহারের মর্যাদা রক্ষা করিবে। কিন্তু যে লোক পুরুষ-সঙ্গীবিহীন বালিকা কিংবা মহিলাকে দেখিয়া সাইকেলে নিকট দিয়া যাইবার সময় অসভ্য ভাষা ব্যবহার করে, তাহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা? তাহার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করিবার কোন সুযোগ হইবে না। তাহার সহিত পুনরায় দেখা হইবারও সম্ভাবনা নাই এবং তাহাকে হয়ত চিনিতেও পারা যাইবে না। কারণ তাহার ঠিকানা জানা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে নিরুপায় বালিকা বা মহিলা কী করিবে? দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি আপনার নিকট আমার গত রাত্রির (২৬শে অক্টোবর) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছি। সন্ধ্যা প্রায় ৭-৩০ ঘটিকার সময় আমি আমার জনৈকা বালিকা সঙ্গিনীসহ অত্যন্ত জরুরী কাজে যাইতেছিলাম। সেই সময় কোন পুরুষ সঙ্গী পাওয়া অসম্ভব ছিল এবং যে জরুরী কাজে যাইতেছিলাম তাহাও দেরীতে করিবার উপায় ছিল না। পথে একটি শিখ যুবক তাহার সাইকেলে যাইতেছিল এবং কী যেন ক্রমাগত বলিতেছিল। যখন এতটা নিকটে আসিল যে আমরা শুনিতে পাই তখন বুঝিলাম আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই সে তাহা বলিতেছিল। আমরা অপমানিত ও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। রাস্তায় কোন লোকজন ছিল না। আমরা কয়েক পা যাইতে না যাইতেই যুবকটি ফিরিয়া আসিল। আমরা তাহাকে তখনই চিনিতে পারিলাম, যদিও সে যথেষ্ট দূরে ছিল সেই সময়। সে গাড়ীর চাকা ঘুরাইয়া আমাদের দিকে আসিল এবং ভগবানই জানেন সে নামিতে চাহিয়াছিল কিনা কিংবা শুধু আমাদের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। আমাদের মনে হইল, আমরা বিপন্ন। আমাদের শারীরিক সামর্থ্যে আমাদের আস্থা ছিল না। আমি নিজে সাধারণ বালিকাদের চাইতে দুর্বল। আমার হাতে একখানা বড় বই ছিল। হঠাৎ আমার হৃদয়ে সাহস আসিল। আমি ভারী বইখানা সাইকেল লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলাম এবং চীৎকার করিয়া বলিলাম, 'পুনরায় অসভ্যতা দেখাইতে সাহস পাইতেছ?' সে কষ্টের সহিত টাল সামলাইয়া সাইকেল জোরে চালাইয়া আমাদের নিকট হইতে পলায়ন করিল। দেখা যাইতেছে—যদি আমি বইখানা তাহার সাইকেল লক্ষ্য করিয়া না ছুঁড়িতাম তবে আমাদের যাত্রার শেষ পর্যন্ত সে আমাদিগকে অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করিয়া উত্ত্যক্ত করিত। ইহা হয়ত একটি সাধারণ ক্ষুদ্র ঘটনা, কিন্তু আমি ইচ্ছা করি আপনি একবার লাহোরে আসিয়া আমাদের ন্যায় ভাগ্যহীনা বালিকাগণের দুঃখকষ্টের বিষয় শ্রবণ করুন। আপনি নিশ্চয়ই ইহার উপযুক্ত প্রতিকার আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

"প্রথমতঃ বলুন, উল্লিখিত অবস্থাতে বালিকাগণ অহিংসনীতি অবলম্বন করিয়া কীরূপে নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারে?

"দ্বিতীয়তঃ, মেয়েদের অপমানিত করার ঘৃণিত অভ্যাস হইতে যুবকগণকে মুক্ত করার উপায় কী?

"আশা করি আপনি ইহা বলিবেন না যে, ভবিষ্যতে শিশুকাল হইতে নারীগণের প্রতি নম্র ও ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত নূতন বংশধারা সৃষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করিতে হইবে এবং আমরা সহ্য করিয়াই যাইতে থাকিব। সরকার পক্ষও এই সামাজিক ব্যাধি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে অনিচ্ছুক কিংবা অপারগ। বড় বড়

নেতাগণের ত এই সকল সমস্যা আলোচনা করিবার সময় নাই। কেহ কেহ যখন শোনেন যে কোন বালিকা সাহসিকতা দেখাইয়া অভদ্র যুবককে বেশ শিক্ষা দিয়াছে তখন বলেন, 'বেশ করিয়াছে। এইভাবেই বালিকাদিগকে চলিতে হইবে।' কোন কোন সময় কোন নেতাকে ছাত্রদের এইরূপ অসদাচরণের বিরুদ্ধে জোরের সহিত বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। কিন্তু কেহই এই গুরুতর সমস্যার সমাধান করিবার জন্য নিজেকে সর্বসময়ের জন্য নিয়োজিত করেন না। আপনি শুনিয়া দুঃখিত ও আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, দেওয়ালী এবং অন্যান্য পর্বদিনে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া নারীদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হয় যেন তাহারা আলোকসজ্জা পর্যন্ত দেখিতে ঘরের বাহির না হয়। পৃথিবীর এই অংশে আমরা কীরূপ সংকটের মধ্যে অবস্থান করিতেছি এই একটি ঘটনাই তাহা আপনাকে জানাইয়া দিবে। এই সকল সতর্কবাণী যে কাগজে আদৌ বাহির করা হয় তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, এই সকলের লেখক বা পাঠকগণের লজ্জার কোন বালাই নাই।"

—অপর একটি পাঞ্জাবী বালিকাকে আমি এই চিঠিখানা পড়িতে দিই। সেও তাহার কলেজে পড়ার সময়ের নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই বিবরণ সমর্থন করে এবং আমাকে বলে যে, আমার পত্রলেখিকা যাহা বর্ণনা করিয়াছে তাহাই অধিকাংশ বালিকাদের নিত্যনৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা।

অপর চিঠিতে একজন অভিজ্ঞা মহিলা লক্ষ্ণৌ শহরে তাঁহার বলিকা বন্ধুদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। সিনেমা বা চলচ্চিত্রগৃহে বালিকাদের পিছনে সারি সারি উপবিষ্ট বালকগণ দ্বারা তাহারা উপদ্রুত হয়; তাহারা এমন সব ভাষা ব্যবহার করে যাহাকে আমি অশ্লীল ছাড়া কিছু বলিতে পারি না। এমনকি, তাহারা যে সব বাস্তব রসিকতা করিয়া নানা অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করে আমার পত্রলেখিকা সেইগুলির বর্ণনা দিয়াছেন, কিন্তু তাহার পুনরুল্লেখ আমি এখানে কিছুতেই করিব না।

যদি উপস্থিত শারীরিক আপদ হইতে মুক্তিই বিষয় হয় তবে যে মেয়েটি নিজেকে দুর্বল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে সে যে প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিয়াছিল অর্থাৎ সাইকেল-চালকের প্রতি তাহার পুস্তক নিক্ষেপ, তাহা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ প্রতিকার যুগযুগান্ত হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এবং এই পত্রিকার স্তম্ভে আমি বলিয়াছি যে, যখন কোন ব্যক্তি হিংসার আশ্রয় লইতে চায় শারীরিক দুর্বলতা সেই হিংসাবৃত্তি কার্যকররূপে ব্যবহারের পক্ষে বাধা জন্মায় না; এমনকি, প্রবল প্রতিপক্ষকের বিরুদ্ধেও না। এবং আমরা অবগত আছি যে, বর্তমান যুগে শারীরিক শক্তি প্রয়োগের এত সব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে যে একটি ক্ষুদ্র বালিকাও উপযুক্ত বুদ্ধি থাকিলে প্রবল প্রতিপক্ষের মৃত্যু ও বিনাশ ঘটাইতে পারে। আমার পত্রলেখিকা যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছে সেইরূপ অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য বালিকাগণকে শিক্ষা দিবার রীতি বর্তমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। যদিও সে সেই সময়ে তাহার হাতের পুস্তকখানিকে আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপে কার্যকররূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তথাপি তাহার এই জ্ঞান যথেষ্ট আছে যে, ইহা এই ক্রমবর্ধনশীল উক্ত কদভ্যাসের কোন প্রতিকার নয়। রূঢ় এবং

অশিষ্ট মন্তব্যাদির বেলায় কোন মানসিক চঞ্চলতা উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা উপেক্ষা করাও চলে না। এরূপ সব ঘটনা কাগজে ছাপাইয়া দিতে হইবে। যেখানে অপরাধীকে বাহির করা যায়, তাহাদের নাম প্রচারিত করিতে হইবে। এই কুঅভ্যাসের বিষয় প্রকাশিত করিতে কোন প্রকার মিথ্যা লজ্জার স্থান থাকিবে না। বাহিরের দুর্ব্যবহারের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে জনমতের ন্যায় শক্তিশালী আর কিছু নাই। লেখিকা বলিয়াছে, এই সকল বিষয়ে জনসাধারণের যথেষ্ট উদাসীনতা রহিয়াছে; ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা কেবল জনসাধারণেরই দোষ নহে। অশিষ্ট ব্যবহারের দৃষ্টান্ত তাহাদের সম্মুখে আসিবেই। যেমন চুরির বিষয়ে তাহা বাহিরে প্রকাশ না করিলে এবং তারপর অনুসন্ধান করিতে না থাকিলে তৎসম্বন্ধে কিছু করা যায় না, সেইরূপ যদি অশিষ্ট ব্যবহারের ঘটনাগুলি চাপিয়া যাওয়া যায় তবে সেইগুলি সম্বন্ধে কোন প্রতিকার করা অসম্ভব। অপরাধ এবং পাপ সাধারণতঃ গোপনে অন্ধকারে বিচরণ করে এবং আলোকপাত হওয়া মাত্র তাহারা অদৃশ্য হয়।

কিন্তু আশঙ্কা হয় যে, বর্তমান যুগের প্রগতিশীলা বালিকা জুলিয়েটের মত অর্ধ-ডজন রোমিওর সঙ্গে প্রণয়ের খেলা খেলিতে ভালবাসে। আমার পত্রলেখিকা কিন্তু সেই শ্রেণীর প্রতীক নয় বলিয়া মনে হয়। আধুনিকা বা প্রগতিশীলা বালিকা নিজেকে বায়ু, জল ও উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পোশাক পরিধান করে না, তাহা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই করিয়া থাকে। নিজেকে রঙে রঞ্জিত করিয়া অসাধারণ রূপ দেখাইয়া সে প্রকৃতির উপরও কারুকার্য সাধনে চেষ্টিত থাকে। অহিংসনীতি এই শ্রেণীর বালিকাদের জন্য নয়। আমি এই পত্রিকার স্তম্ভে অনেকবার মন্তব্য করিয়াছি যে, আমাদের ভিতরে অহিংসনীতির মূলপ্রেরণা জাগাইয়া তোলা ও তাহা বর্ধিত করা কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সংযমের অধীন। এই প্রচেষ্টা বিশেষ কষ্টসাধ্য। চিন্তাধারা এবং জীবনযাত্রায় অহিংসনীতি আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়া দেয়। যদি আমার পত্রলেখিকা এবং তাহার সঙ্গে সমভাবাপন্ন মেয়েরা নির্দিষ্ট উপায়ে তাহাদের জীবনের আমূল পরিবর্তন করিতে পারে তবে তাহারা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে, যে সকল যুবক আদৌ তাহাদের সংস্পর্শে আসে তাহারা তাহাদিগকে সম্মান করিতে এবং তাহাদের সহিত যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে শিখিবে। যদি দৈবাৎ তাহারা দেখিতে পায় (ইহা সম্ভবপর বটে,) যে, তাহাদের সতীত্ব পর্যন্ত নষ্ট হইবার উপক্রম তখন মানুষের পশুবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করিবার উপযুক্ত সাহস তাহাদের অর্জন করিতে হইবে। ইহা আমাকে বলা হইয়াছে যে, বালিকার মুখ বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা এরূপভাবে তাহাকে বাঁধা হইয়াছে যে, সে কোন শারীরিক চেষ্টা করিতেও অসমর্থ, সে ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করা আমি যতটা সহজ মনে করি ততটা সহজ নয়। আমার ধারণা এই, যে বালিকার বাধা দিবার ইচ্ছাশক্তি আছে তাহাকে অক্ষম করিবার জন্য যতপ্রকার বন্ধন ব্যবহার করা হইয়াছে সেইগুলি সে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি তাহাকে মৃত্যুবরণ করিবার শক্তি যোগাইবে।

কিন্তু এইরূপ বীরত্ব শুধু তাহাদের পক্ষেই সম্ভব যাহারা তজ্জন্য নিজেদের

শিক্ষিত করিয়াছে। যাহাদের অহিংসনীতিতে জ্বলন্ত বিশ্বাস নাই তাহাদিগকে আত্মরক্ষার সাধারণ উপায় শিক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাই তাহাদিগকে শ্রদ্ধাহীন যুবকগণের অশ্লীল আচরণ হইতে রক্ষা করিবে।

কিন্তু বড় প্রশ্ন এই--যুবকগণ এরূপভাবে সাধারণ সদাচারবিহীন কেন হইবে যে সুশীলা মেয়েরা সর্বদা তাহাদের উপদ্রবের ভয়ে ভীত থাকিবে? যদি ইহা আবিষ্কার হয় যে, যুবকদের অধিকাংশই স্ত্রীলোকের প্রতি সদাচার ও শ্রদ্ধার সর্বপ্রকার জ্ঞান হারাইয়াছে তবে আমি দুঃখিত হইব। কিন্তু তাহারা যুবকশ্রেণী হিসাবে সতর্কতার সহিত নিজেদের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিবে আশা করা যায় এবং তাহাদের সহযোগীদের মধ্যে যে কোন অসঙ্গত আচরণ দেখিতে পাইবে সেইগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে। তাহারা প্রত্যেক রমণীর মান সম্ভ্রম তাহাদের নিজ নিজ ভগিনী এবং মাতাগণের মান সম্ভ্রমের ন্যায় আদরণীয় বলিয়া মনে করিতে শিক্ষা করিবে। যদি তাহরা সদাচরণ না শিখে তবে তাহারা যত শিক্ষাই পাইয়া থাকুক তাহা ব্যর্থ হইবে।

বিদ্যালযের শ্রেণীতে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়গুলির জন্য ছাত্রদিগকে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া যেমন অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের কর্তব্য, সেইরূপ তাঁহাদের ছাত্রগণ যাহাতে সর্বদা ভদ্র এবং সদাচারপরায়ণ হইতে পাবে তৎপ্রতিও দৃষ্টি রাখা কি কর্তব্য নয়?

[হরিজন, ৩১-১২-'৩৮] সেবাগ্রাম, ২৮-১২-'৩৮

২৬

আধুনিকা নারী

নাম ও ঠিকানাযুক্ত এগারটি বালিকার একখানা চিঠি আমি পাইয়াছি। অর্থের ব্যত্যয় না করিয়া চিঠিখানা আরও পাঠযোগ্য করিবার মত পরিবর্তন করিয়া নিম্নে দিতেছি:—"৩১শে ডিসেম্বরের হরিজন পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছাত্রীর চিঠির উপর 'ছাত্রদের কলঙ্ক' শীর্ষক মন্তব্যগুলি বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করার উপযোগী। ইহাতে মনে হয় যে আধুনিকা বালিকা আপনাকে এতটা ক্ষুব্ধ করিয়াছে যে শেষ পর্যন্ত আপনি তাহার মধ্যে অর্ধ ডজন রোমিওর সহিত জুলিয়েটের খেলা খেলিবার যোগ্যতা দেখিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি দিযাছেন। এই মন্তব্য দ্বারা সমগ্র নারীজাতি সম্বন্ধে আপনার যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নারীসমাজকে অনুপ্রাণিত করে না।

"বর্তমান যুগে যখন নারী পুরুষের সাহায্যার্থ এবং তাহার সহিত সমান-ভাবে জীবনভার বহন করিবার জন্য গৃহকোণ হইতে বাহিরে আসিতেছে, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যজনক যে পুরুষের নিকট দুর্ব্যবহার পাইলেও নারীকেই দোষ

দেওয়া হয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন ঘটনা ঘটে যেখানে দোষ উভয় পক্ষে সমভাবে বিদ্যমান। অল্পসংখ্যক বালিকা থাকিতে পারে যাহারা অর্ধ ডজন রোমিওর সহিত জুলিয়েটের খেলা খেলে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে ধরিয়া লইতে হইবে যে, জুলিয়েটের খোঁজে অর্ধ ডজন রোমিও রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত ইহা কখনও বলা যাইতে পারে না এবং বলা উচিতও নয় যে, আধুনিকা বালিকাগণ সকলেই জুলিয়েট অথবা আধুনিক যুবকগণ সকলেই রোমিও। আপনি নিজে বহু সংখ্যক আধুনিকা বালিকার সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, ত্যাগ ও নারীসুলভ অন্যান্য নিখুঁত গুণাবলী দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

"আপনার পত্রলেখিকা যে সকল অসদাচরণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ইহা করা বালিকাদের কর্তব্য নয়। মিথ্যা লজ্জাসম্ভ্রমের ভাব হইতে ততটা না হইলেও, ইহার নিষ্ফলতাই তাহার কারণ।

"কিন্তু জগৎপূজ্য একজনের নিকট হইতে এইরূপ বর্ণনা সেই বহুকালের পুরাতন এবং অসঙ্গত উক্তিকেই যেন আবার সমর্থন করে—নারী নরকের দ্বার।'

"পূর্বোক্ত মন্তব্য হইতে আপনি এই সিদ্ধান্ত করিবেন না যে, আধুনিকা মেয়েরা আপনাকে শ্রদ্ধা করে না। প্রত্যেক যুবক আপনাকে যতদূর শ্রদ্ধাভক্তি করে, মেয়েরাও ততটা করে। তাহারা ইহা সহ্য করিতে পারে না যে, তাহাদিগকে ঘৃণা করা হইবে বা তাহাদিগকে কৃপার পাত্র বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। তাহারা তাহাদের চালচলন সংশোধন করিতে প্রস্তুত—যদি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের দোষত্রুটি থাকে। তাহাদের প্রতি দোষারোপ করার পূর্বে তাহাদের কোন দোষ থাকিলে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে তাহারা 'আহা, ইহারা দুর্বল নারীজাতি'—এইরূপ অজুহাতের আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে চায় না; আবার নিজ ইচ্ছানুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে বিচার করার ভার বিচারকের উপর দিয়া তাহারা নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতেও চাহে না। সত্যের সম্মুখীন হইতেই হইবে: আধুনিকা বালিকা বা আপনি যাহাকে 'জুলিয়েট' বলিয়াছেন, সত্যের সম্মুখীন হইতে তাহার যথেষ্ট সাহস আছে।"

—আমার পত্রলেখিকাগণ বোধ হয় জানেন না যে, চল্লিশ বৎসরেরও পূর্বে, যখন সম্ভবতঃ তাহাদের কাহারও জন্ম হয় নাই, আমি দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতের নারীদের সেবাকার্যে ব্রতী হই। নারীজাতির অসম্মানজনক কিছু লিখিতে আমি নিজেকে অক্ষম বলিয়াই মনে করি। আমি নারীজাতিকে এতদূর শ্রদ্ধা করি যে, আমার পক্ষে তাহাদের সম্বন্ধে মন্দ কিছু চিন্তা করাও সম্ভবপর নয়। ইংরেজীতে যে বলা হয়, নারী মানবজাতির শ্রেষ্ঠ অর্ধাংশ, বাস্তবিক নারী তা-ই। আমার প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রসমাজের কলঙ্ক প্রকাশ করিয়া দেওয়া—মেয়েদের দুর্বলতা প্রচার করা লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু রোগের নিদান নির্ণয় করিতে গিয়া যে যে কারণে রোগের সৃষ্টি হয়, সেই সব বিষয়ই আমি উল্লেখ করিতে বাধ্য, নতুবা আমি উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে পারিব না।

"আধুনিকা বালিকা" শব্দগুলির একটা বিশেষ অর্থ আছে। সেইজন্য আমার অভিমত মাত্র কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে নাই। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতেছে এইরূপ সকল বালিকাই প্রগতিশীলা নহে। আমি অনেককে জানি, যাহারা "প্রগতিশীলা মেয়ে"দের হাবভাব দ্বারা সংক্রামিত নয়। কিন্তু কতিপয় বালিকা আছে যাহারা প্রগতিশীলা হইয়া পড়িয়াছে। আমার মন্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বালিকা ছাত্রীদিগকে প্রগতিশীলা মেয়েদের অনুকরণ না করিতে সাবধান করিয়া দেওয়া এবং যে সমস্যা অত্যন্ত ভীতিজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাকে আরও জটিল করিতে না দেওয়া। কারণ আমি যখন উল্লিখিত পত্র পাই, তখন একটি অন্ধ্রদেশীয়া মেয়ের নিকট হইতেও একখানা পত্র পাই। তাহাতে অন্ধ্রদেশীয় ছাত্রগণের আচরণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা লাহোরের মেয়েটির বর্ণনা হইতেও নিকৃষ্ট। অন্ধ্রের এই কন্যা আমাকে বলিতেছে যে, তাহার বালিকা বন্ধুগণের সাদাসিধা পোশাক তাহাদিগকে কোনরূপে রক্ষা করিতে পারে না। বালকদের বর্বরোচিত আচরণ তাহারা যে বিদ্যালয়ে পড়ে সেই বিদ্যালয়ের কলঙ্ক-স্বরূপ; কিন্তু বালিকাদের সেই সকল বিষয় প্রকাশ করিবার সাহস নাই। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আমি এই অভিযোগের প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

আমি এই এগারটি বালিকাকে ছাত্রদের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি। যাহারা নিজেদের সাহায্য করে ভগবান তাহাদেরই সহায় হন। পুরুষের গুণ্ডামি হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিবার কৌশল তাহাদিগকে অবশ্যই শিখিতে হইবে।

[হরিজন, ৪-২-'৩৯] বার্দোলী, ৩০-১-'৩৯

২৭

নৈতিক উভয়সংকট

জনৈক বন্ধু লিখিতেছেন :—"প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে কোন সামাজিক দুর্ঘটনায় এই শহর আলোড়িত হইয়াছিল। একজন বৈশ্য ভদ্রলোকের একটি ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যা ছিল। মেয়েটির একুশবৎসরবয়স্ক এক মাতুল সেই শহরেই কলেজে পড়িত। দুইজনই গোপন প্রেমে পড়ে। বালিকাটির গর্ভসঞ্চার হয়। অবশেষে যখন প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হইয়া পড়ে প্রণয়ীযুগল বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করে। বালিকাটি তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায় কিন্তু বালকটি দুই দিন পরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বাদানুবাদের ঝড় উঠে এবং সকলের মুখেই এই কথা বলাবলি হওয়ায় অবস্থা এতটা গড়ায় যে, বালিকাটির শোকাতুর পিতা-মাতার পক্ষে সেই শহরে বাস করাই কঠিন হইয়া পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়

থামিয়া যায়। কিন্তু লোকের মনে ঘটনাটির স্মৃতি এখনও বর্তমান রহিয়াছে এবং যখনই এই রকমের কোন কথাবার্তা উঠে তখনই প্রায় এই ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়। যখন ঝড় অত্যন্ত প্রবল এবং হতভাগ্য মৃত প্রণয়ীযুগল সম্বন্ধে সহৃদয়তাপূর্ণ একটি কথাও কেহ বলে নাই, তখন আমার মত ব্যক্ত করিয়া সকলকে বিস্মিত ও ব্যথিত করি। আমি বলি, ঐ অবস্থায় উপরোক্ত অবস্থাধীনে এই অল্পবয়স্ক প্রণয়ীযুগলকে তাঁহাদের নিজ মতানুযায়ী চলিতে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার অরণ্যে রোদন হইল। এ বিষয়ে আপনার মত কী?"

—আমি ইচ্ছা করিয়াই লেখকের অনুরোধে তাঁহার নাম ও বাসস্থান গোপন করিয়াছি; কারণ একটি পুরাতন তর্ক জাগাইয়া তুলিয়া পুরাতন ক্ষতগুলি আবার খুলিয়া দেখাইতে তিনি ইচ্ছা করেন না। তাহা সত্ত্বেও আমি মনে করি এই গুরুতর বিষয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে আলোচনা হওয়া উচিত। আমার মনে হয়, কোন বিশেষ সমাজে যে সকল বিবাহ নিষিদ্ধ সেগুলিকে প্রথমেই একেবারে চালু করা চলে না, কিংবা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাতেই তাহা করা যায় না। পক্ষান্তরে, যে সকল যুবক-যুবতী এই প্রকারের বিবাহ করিতে চায় তাহাদের উপর প্রতিকূল ইচ্ছা চালাইবার অথবা জোর করিয়া তাহাদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা খর্ব করিবার কোন অধিকার সমাজের কিংবা সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের আত্মীয়স্বজনেরও নাই। লেখকের উল্লিখিত ঘটনায় উভয়পক্ষই সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্তবয়স্ক ছিল। তাহারা নিজেদের বিষয় নিজেরা বিবেচনা করিতে সক্ষম ছিল। তাহারা পরস্পরকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাহা হইতে তাহাদিগকে বিরত করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। খুব বেশী কিছু করিতে চাহিলে সমাজ এরূপ বিবাহ স্বীকার না করিতে পারিত; কিন্তু তাহাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইল—ইহা সামাজিক অত্যাচারের চরম বলিতে হইবে।

বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ সর্বজনীন নহে এবং সেগুলি অনেক পরিমাণে সামাজিক প্রথার উপর নির্ভর করে; প্রথাও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নানারকম, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরও অনেক প্রভেদ দেখা যায়। ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় না যে, যুবক-যুবতীগণ সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রথা ও বিধিনিষেধসকল সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলিবে। এরূপ করিবার পূর্বে তাহাদিগকে জনমত তাহাদের অনুকূলে গঠন করিতে হইবে। তাহা না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ধীরভাবে তাহাদের সময়ের অপেক্ষা করিবে। আর যদি তাহারা তাহা না করিতে পারে তবে স্থিরচিত্তে ও শান্তভাবে সমাজে একঘরে হইয়া থাকার বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

পক্ষান্তরে, যাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথানিয়মাদি উপেক্ষা করে বা ভঙ্গ করে তাহাদের প্রতি হৃদয়হীন এবং বিমাতার ন্যায় মনোভাব পোষণ না করাও সমাজের পক্ষে অনুরূপ কর্তব্য। লেখকের কথিত ঘটনার যে বিবরণ আমাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি সত্য হইয়া থাকে তবে এই যুবক-যুবতীকে আত্মহত্যার পথে চালাইবার অপরাধ নিশ্চয়ই সমাজের স্কন্ধে সম্পূর্ণ পড়িবে।

[হরিজন, ১৯-৫-'৩৭]

২৮

বিবাহের আদর্শ

জনৈক বন্ধু লিখিতেছেন :—"হরিজন সেবকের বর্তমান সংখ্যায় 'নৈতিক উভয়সংকট' নামীয় আপনার প্রবন্ধে আপনি এইরূপে মন্তব্য করিয়াছেন 'সামাজিক প্রথা হইতেই বিবাহ সম্বন্ধে বিধিনিষেধের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন ক্ষেত্রেই সেগুলি কোন মূল নৈতিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা দেখা যায় না।' আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, সুপ্রজনন সম্বন্ধীয় বিষয়ের বিবেচনা হইতে সম্ভবতঃ এই সকল বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছে। প্রজননবিজ্ঞানের এই একটি সর্বজনবিদিত নিয়ম যে, অসবর্ণ প্রাণীদের সংযোগে উৎপন্ন সন্তানসন্ততি সগোত্রে বিবাহজাত সন্তানাদি হইতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের দিক দিয়া যোগ্যতর হয়। হিন্দুশাস্ত্রে সেইজন্যই সগোত্র এবং সপিন্ডগণের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে, যদি স্বীকার করিয়া লই যে চিরপরিবর্তনশীল ও প্রতিমুহূর্তে বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক প্রথাই এই সকল বিধিনিষেধের একমাত্র কারণ তাহা হইলে পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রী অথবা এমনকি ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়ার কোন প্রবল কারণ পাওয়া যায় না। আপনার কথামত যদি সন্তানোৎপাদনই বিবাহের একমাত্র সঙ্গত উদ্দেশ্য হয়, তবে স্বামীস্ত্রী নির্বাচন ব্যাপারটি কেবল প্রজননার্থে মিলনের প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। অপেক্ষাকৃত কম জরুরী বলিয়া অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়গুলি কি উপেক্ষা করিতে হইবে? যদি তাহা না হয়, তবে তাহাদের কোন্‌টি বড়, কোন্‌টি ছোট বিবেচিত হইবে? আমি নিম্নলিখিতরূপে এই ক্রম উল্লেখ করিব :—(১) পরস্পরের আকর্ষণ বা ভালোবাসা, (২) প্রজনন সম্বন্ধীয় যোগ্যতা, (৩) সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলির অনুমোদন এবং সম্মতি এবং দম্পতীপক্ষ যে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত সেই সমাজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি, (৪) আধ্যাত্মিক উন্নতি। এই বিষয়ে আপনার মত কী?

"হিন্দুশাস্ত্রসমূহে সন্তান-উৎপাদনকেই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। বিবাহের সময় বয়োবৃদ্ধগণের ভাবী গৃহকর্ত্রীকে 'তোমার আটটি সন্তান হউক' এই বলিয়া যে আশীর্বাদ করা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা এই বিষয় প্রমাণ করে। বিবাহের পর সহবাস যে শুধু সন্তানউৎপাদনের জন্য এবং কখনই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য নয় আপনার এই যুক্তি এতদ্বারা সমর্থিত হয়। কিন্তু তাহা হইলে আপনি কি আশা করিতে পারেন যে, পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, একটি মাত্র সন্তান লাভ করিয়াই দম্পতী পরিতৃপ্ত হইবে? বংশরক্ষা করার ইচ্ছা আপনি যথার্থই স্বীকার করিয়াছেন; তাহা ছাড়াও আমাদের মধ্যে একটি দৃঢ় ধারণা বর্তমান আছে যে, একমাত্র পুত্রসন্তান দ্বারাই বংশরক্ষা হয়। এবং সেইজন্যই পুত্রের জন্ম হইতে কন্যার জন্ম কম আনন্দদায়ক। পুত্রসন্তানলাভের জন্য ব্যাপক বাসনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনি

কি শুধু একটি পুত্রসন্তান লাভ করিবার আদর্শ এরূপভাবে পরিবর্তিত করা সংগত মনে করেন না যে, পুত্রসন্তান লাভ না করা পর্যন্ত কন্যাসন্তানও কয়েকটি জন্মগ্রহণ করিতে পারে?

"আমি আপনার সহিত এই বিষয়ে একমত—যে ব্যক্তি শুধু সন্তান উৎপাদনের জন্য সহবাস করে তাহাকে ব্রহ্মচারী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। আপনার মতের সহিত আমারও এই মত—যে দম্পতী বিবাহের পূর্বে এবং পরে পবিত্রতা এবং আত্মসংযমের নীতি পালন করিয়াছে তাহারা একবার সহবাস করিলেই গর্ভসঞ্চার হইবে। আপনার প্রথম তর্কের সমর্থনে আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বামিত্র ও অরুন্ধতীর প্রসিদ্ধ গল্প রহিয়াছে; অরুন্ধতী ছিলেন বশিষ্ঠের পত্নী এবং তাহার শতপুত্র হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বামিত্র তাঁহাকে সাধ্বী ব্রহ্মচারিণী বলিয়া সংবর্ধনা করিয়াছিলেন; তাঁহার আদেশ পঞ্চভূতও পালন করিতে বাধ্য ছিল, কারণ স্বামীর সহিত তাঁহার যৌনসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে মাতৃত্বের কর্তব্যজ্ঞানলাভ ও সেই কর্তব্যপালনের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় যে, এমনকি হিন্দুশাস্ত্রগুলিও একটিমাত্র সন্তানলাভের আপনার কথিত আদর্শ সমর্থন করিবে না—সে পুত্রই হউক না কন্যাই হউক। সেইজন্য আমার মনে হয় যে, বিবাহিত জীবন সম্পর্কে আপনার আদর্শ যদি এরূপভাবে আরও প্রসারিত করেন যে একটি পুত্রসন্তান লাভ না হওয়া পর্যন্ত কতিপয় কন্যাসন্তানও সম্ভবতঃ লাভ করা যাইতে পারে, তবে ইহা বহু দম্পতীকে অনেকটা প্রসন্ন করিবে। অন্যথা আমার আশংকা হয় যে, অনেকেই একেবারে বিবাহ না করার চাইতে প্রথম সন্তান লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে যৌন-সম্বন্ধ ত্যাগ করা অধিকতর কঠিন মনে করিবে, কারণ সেই সন্তান পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, তারপর সারাজীবন তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে যৌনসম্পর্ক হইতে বিরত থাকিতে হইবে। স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমস্পৃহা মানবের আদিম প্রবৃত্তি—ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। আত্মসংযম একটি অর্জিত ভাব, ইহা যত্ন-পূর্বক অভ্যাস করিতে হয়। ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে ক্রমোন্নতিই মানবের পূর্ণ বিকাশের স্বাভাবিক নিয়ম; আত্মসংযম তাহা লাভ করার একটি সোপানবিশেষ। এইজন্যই আত্মসংযমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়। যে ব্যক্তি যৌনসম্বন্ধ শুধু সন্তান উৎপাদনের উপায়—এই আদর্শ লইয়া জীবন যাপন করে তাহাকে আমি সম্মান করি। ইহাও আমার মত যে, অন্য যে কোন অবস্থায় সহবাস শুধু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিমাত্র। কিন্তু ইহাকে আমি ঘোর পাপের কাজ বলিয়া নিন্দা করিতে প্রস্তুত নই, কিংবা যে দম্পতী স্বভাবের তাড়না সহ্য করিতে পারে না তাহাদিগকে অধঃপতিত জীব বলিয়া সহজলভ্য করুণা অথবা ভ্রূকুটিপূর্ণ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে প্রস্তুত নই।"

—বিবাহ-বিষয়ে নানাবিধ বিধিনিষেধের বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি কী তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু ইহা আমার নিকট সুস্পষ্ট বোধ হয়, যে সামাজিক প্রথা বা নিয়ম সদ্‌গুণ ও আত্মসংযম লাভে সহায়তা করে তাহাকে নৈতিক ব্যবস্থার পবিত্র মর্যাদা দেওয়া যাইতে পারে। যদি ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ যৌনসম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ হইয়া থাকে, তবে সেগুলি সমভাবে খুল্লতাত,

জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি ভ্রাতাভগ্নীস্থানীয়দের বিবাহ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কাজেই কোন বিশেষ সমাজে যদি এই সকল বিধিনিষেধ বর্তমান থাকে তবে সেইগুলি সর্বদাই মানিয়া চলার অভ্যাস করা নিরাপদ হইবে। আমার পত্রলেখক আদর্শ বিবাহের যে সকল সর্তাদি উল্লেখ করিয়াছেন মোটামুটি আমি সেগুলি গ্রহণ করিতেছি। কিন্তু তাহাদের গুরুত্বের ক্রম আমি পরিবর্তন করিতে চাই এবং "ভালোবাসা"কে তালিকার সর্বনিম্ন স্থান দিতে চাই। ইহাকে প্রথম স্থান দিলে অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়া যাইতে পারে এবং কমবেশী ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। কাজেই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকে বিবাহনির্বাচন ব্যাপারে প্রথম স্থান দেওয়া উচিত। তারপর আসিবে সেবা এবং তৃতীয় স্থানে আসিবে পারিবারিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ এবং সমাজের শ্রেণীগত স্বার্থ; এবং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বা ভালোবাসা চতুর্থ এবং সর্বশেষ স্থান অধিকার করিবে। ইহার অর্থ এই—যেখানে অপর চারটি বিষয় পূর্ণ হইতেছে না সেখানে শুধু "ভালোবাসা"ই বিবাহের যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যেখানে ভালোবাসা নাই অথচ অন্য সবগুলি উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইতেছে সেখানেও সমভাবে বিবাহ বর্জন করিতে হইবে। যৌনসম্পর্কীয় যোগ্যতার সর্তটি আমি কাটিয়া দিব, কারণ সন্তান উৎপাদনই যখন বিবাহের মূল উদ্দেশ্য, যৌনসম্পর্কীয় যোগ্যতাকে শুধু একটি "সর্ত" বলিয়া গণ্য করা চলে না—ইহা না থাকিলে বিবাহ হইতেই পারে না (*sine qua non*)।

হিন্দুশাস্ত্রে নিশ্চয়ই পুত্রসন্তানের দিকে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। কিন্তু এই বিষয়ের প্রবর্তন হইয়াছিল সেই সময় যখন বাহুবলে যুদ্ধ করা প্রচলিত ছিল এবং জীবনসংগ্রামে কৃতকার্যতা লাভের জন্য উপযুক্তসংখ্যক লোকজনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক ছিল। সেইজন্য তখন কোন ব্যক্তির পুত্রসংখ্যার দ্বারাই তাহার জীবনীশক্তি ও দৈহিক সামর্থ্যের পরিচয় বিবেচিত হইত এবং বহুসংখ্যাক সন্তান উৎপাদনে সহায়তার জন্য এমনকি বহুবিবাহপ্রথাও প্রচলিত হয় এবং তাহা সমাজে সংবর্ধিত হয়। কিন্তু যদি বিবাহকে ধর্মমূলক পবিত্র ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা যায় তবে একটিমাত্র সন্তান উৎপাদনের স্থানই ইহাতে আছে এবং সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রে প্রথম সন্তানকে "ধর্মজ" এবং পরবর্তী সকল সন্তানকে "কামজ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন প্রভেদ করি না। এইরূপ ভেদজ্ঞান আমার মতে অন্যায় এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পুত্রই জন্মগ্রহণ করুক বা কন্যাই জন্মগ্রহণ করুক, উভয়ই সমভাবে আদরণীয়।

বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের গল্প অতি সুন্দররূপে দৃষ্টান্তদ্বারা এই নীতি প্রমাণিত করিতেছে যে, কেবল সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যৌনক্রিয়া সম্পাদিত হইলে ব্রহ্মচর্যের সর্বোচ্চ আদর্শের সহিত তাহার অসামঞ্জস্য হয় না। কিন্তু সেই গল্পের সবটাই অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য যৌনক্রিয়া পশুত্বেই ফিরিয়া যাওয়া; এবং সেইজন্য মানুষ উহার ঊর্ধ্বে উঠিতে চেষ্টা করিবে। স্বামী স্ত্রী যদি তাহা করিতে অক্ষম হয়, উহাকে পাপ বা লোকনিন্দার বিষয় বলিয়া গণ্য করা যায় না। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক তাহাদের রসনার

পরিতৃপ্তির জন্য আহার করিয়া থাকে; সেইরূপ লক্ষ লক্ষ স্বামী স্ত্রীও তাহাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্যই যৌনক্রিয়ায় আসক্ত হয় এবং হয়ত সেইরূপ করিতে থাকিবেও; এবং তজ্জন্য প্রকৃতি স্বভাবগত নিয়মভঙ্গের জন্য অশেষ অমঙ্গল ও ব্যাধির আকারে যে সকল দুর্নিবার শাস্তি প্রদান করিয়া থাকে তাহারা তাহাই ভোগ করে। যাহারা আধ্যাত্মিক বা উচ্চস্তরের জীবন লাভ করিতে অভিলাষী তাহাদের জন্যই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য অথবা বিবাহিত জীবনের ব্রহ্মচর্যের আদর্শ; আত্মসংযম ব্যতীত এরূপ আধ্যাত্মিক জীবন কিছুতেই লাভ করা যায় না।

[হরিজন, ৫-৬-'৩৭]

২৯

বিবাহিত জীবনের সূচনায়

[গান্ধী সেবা সঙ্ঘ একটি নৈতিক সমিতি—ইহা জনসাধারণের সেবাব্রতী সভ্যগণ দ্বারা গঠিত; তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবকেই প্রাধান্য দিয়া কর্মসমস্যা সমাধান করিতে অগ্রসর হন এবং তাঁহাদের আলোচনা সর্বদাই আত্মপরীক্ষামূলক। এই সঙ্ঘের সহায়তায় গান্ধীজী তাঁহার দৌহিত্রী এবং আমার ভগ্নীর বিবাহ এবং আমার ভ্রাতা ও পুত্রের উপনয়ন কার্য সম্পন্ন করিতে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছিল। এই বিবাহ ও উপনয়ন অনুষ্ঠান যে কেবল আনন্দোৎসব নয়, উহা যে মানবজীবনে পবিত্র আত্মনিবেদনের ব্যাপার, এই প্রতীতির গভীরতা তরুণ বালকবালিকাদের মনে তাহাদের নবজীবনের উন্মেষকালে মুদ্রিত করিয়া দিতে এর চাইতে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা কিছুই হইতে পারিত না। সর্বপ্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর ও আমোদপ্রমোদ বর্জন করা হইয়াছিল; আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করা হয় নাই; এই বিশ্বাস লইয়া সকলেই আসিয়াছিল যে, আত্মীয়স্বজনের আশীর্বাদ ত তাহারা সর্বদাই পাইবে; এবং চিন্তাশীল, স্বার্থত্যাগী, জনসেবারত একদল ব্যক্তির আশীর্বাদ তাহা হইতে তাহাদের বেশী আদরণীয় হইবে। বেলগাঁওর রামভট্টজী শাস্ত্রী এবং ওয়াইস্থিত বিখ্যাত প্রজ্ঞাপাঠশালার লক্ষ্মণযোশী শাস্ত্রী এই দুজন উক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করেন; তাঁহারা কোন পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা না করিয়াই কাজ করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানসমূহের প্রত্যেক অংশের অর্থবোধ তাঁহাদের ছিল এবং শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী প্রত্যেকটি মন্ত্র প্রাঞ্জল হিন্দীতে তরজমা করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহাদের উচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ যাহাতে বুঝিতে পারে সেই বিষয়ে জোর দেন।

গান্ধীজী তাঁহার অভ্যস্ত নিয়মের বিরুদ্ধে শ্রোতাগণের সমক্ষে বিবাহিত দম্পতীকে কোন উপদেশ না দিয়া নিভৃতে তাঁহার বক্তব্য বলেন। কিন্তু সেগুলি সকল বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের পক্ষেই প্রযোজ্য এবং এখানে আমি আমার সাধ্যমত

তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি—মহাদেব মশাই।]

"তোমরা ইহা জানিও যে, ক্রিয়াকলাপ আমাদের অন্তরে কর্তব্যজ্ঞান যতটুকু উদ্বুদ্ধ করে ততটুকু ব্যতীত আমি এই সকলে বিশ্বাস করি না। যখন হইতে নিজে নিজে চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়াছি তখন হইতেই আমার মানসিক চিন্তার ধারা এইরূপ। তোমরা যে সকল মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছ এবং যে সংকল্প করিয়াছ তাহা সবই সংস্কৃত ভাষায়। কিন্তু সেগুলি তোমাদের জন্য তরজমা করা হইয়াছে। মূল সংস্কৃত বলা হইয়াছে এই জন্য যে, আমি জানি সংস্কৃত শব্দগুলির এমন একটি শক্তি আছে যাহার কার্যকর প্রভাবের অধীনে আসিতে সকলেই ভালোবাসিবে।

"বিবাহক্রিয়ার সময় স্বামী একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে যে স্ত্রী সৎ এবং স্বাস্থ্যবান পুত্রের জননী হইবে। এই ইচ্ছাতে আমি আশ্চর্যান্বিত হই নাই। ইহার অর্থ এই নয় যে, সন্তান উৎপাদন করিতেই হইবে, কিন্তু ইহার অর্থ এই যে যদি সন্তানসন্ততির প্রয়োজন বোধ হয় তবে সম্পূর্ণ ধর্মমূলক পদ্ধতিতে সম্পাদিত বিবাহ অত্যাবশ্যক। যে সন্তান কামনা করে না তাহার বিবাহ করিবার কোন প্রয়োজনই নাই। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ বিবাহই নয়। ইহা ব্যভিচারের নামান্তর। কাজেই আজিকার বিবাহ-ব্যাপারের অর্থ এই যে, যখন উভয়েই সন্তান উৎপাদনের স্পষ্ট ইচ্ছা উপলব্ধি করে কেবলমাত্র তখনই সহবাস শাস্ত্রানুমোদিত। এই বিষয়ের সম্পূর্ণ ধারণাটিই পবিত্রতামূলক। কাজেই প্রার্থনাসহকারে সহবাসক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহার পূর্বে যৌনসম্বন্ধীয় উত্তেজনা ও আনন্দ উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ যে মেলামেশা করা হয়, তাহার প্রয়োজন হয় না। যদি একাধিক সন্তান কামনা না করা হয় তবে এইরূপ সহবাস সারাজীবনে মাত্র একবার হইতে পারে। যাহারা নৈতিক দিক হইতে কিংবা শারীরিক স্বাস্থ্যের দিক হইতে সুস্থ নয় তাহাদের সহবাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং যদি তাহারা তাহা করে তবে তাহা ব্যভিচার মাত্র। যদি তোমরা এই শিক্ষা পূর্বে পাইয়া থাক যে বিবাহ পাশবিক ক্ষুধা পরিতৃপ্তির জন্য তবে সেই শিক্ষা তোমাদিগকে ভুলিতেই হইবে। ইহা কুসংস্কার মাত্র। সমগ্র ক্রিয়াকান্ড পবিত্র অগ্নির সম্মুখে সম্পন্ন হয়। সেই অগ্নি তোমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা ভস্মীভূত করুক।

"বর্তমান সময়ে বহুপ্রচলিত আর একটি কুসংস্কার হইতে তোমাদিগকে মুক্ত হইতে বলিব। ইহা বলা হইয়া থাকে যে, সংযম এবং বীর্যক্ষয় নিবারণ অবৈধ এবং যৌনক্ষুধার অবাধ পরিতৃপ্তি এবং অবাধ ভালোবাসাই মানবের অত্যন্ত স্বাভাবিক বৃত্তি। এর চাইতে সর্বনাশকর কুসংস্কার আর নাই। তুমি আদর্শে পৌঁছাইতে অসমর্থ হইতে পার, ইন্দ্রিয়দমনে তোমার শক্তি কম থাকিতে পারে—কিন্তু সেইজন্য আদর্শ খর্ব করিও না। যখনই তোমাদের দুর্বলতা আসিবে, আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি তাহা স্মরণ করিও। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের স্মৃতি তোমাদের জীবনীশক্তিকে সংহত এবং সংযত করিতে পারিবে। বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্যই সংযম এবং সংযম-যোগাগ্নিতে যৌনপ্রবৃত্তির আহুতি। যদি বিবাহের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে বিবাহ পবিত্র আত্মোৎসর্গ বলিয়া গণ্য হইবে না—তাহা হইবে সন্তান-উৎপত্তি ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্য বিবাহ।

"তোমরা বন্ধুভাবে এবং সমান মর্যাদায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছ। যদি পতিকে বল 'স্বামী' তবে স্ত্রী হইবেন 'স্বামিনী'—একে অন্যের উপর প্রভুত্ব করিবে, একে অন্যের আশ্রয় হইবে; জীবনের কাজকর্ম ও কর্তব্য সম্পাদনে একে অন্যের সহিত সহযোগিতা করিবে। বালকদিগকে আমি এই বলিব যে,' যদি তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর বিকশিত হইয়া থাকে এবং তোমাদের ভাবরাশি অধিকতর পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে তবে বালিকাদিগকে সেই সকল ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত কর। তাহাদের প্রকৃত শিক্ষক এবং পরিচালক হও; তাহাদিগকে সাহায্য কর, তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া দাও, কিন্তু কখনও তাহাদিগকে বাধা দিও না কিংবা ভুল পথ দেখাইও না। চিন্তা, বাক্য এবং কাজ তোমাদের ভিতর সম্পূর্ণ সমন্বিত হউক; একে অন্যের নিকট হইতে কিছুই গোপন করিও না; তোমরা আত্মায় আত্মায় এক হও।

"মিথ্যাচার পরিত্যাগ করিবে, যাহা তোমাদেব পক্ষে করা অসম্ভব তাহা করিবার বৃথা চেষ্টায় নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিও না। সংযম কখনও স্বাস্থ্য নষ্ট করে না। বাহিরের বলপ্রয়োগে, বৃত্তিনিরোধে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়—সংযমে নয়। যে প্রকৃতপক্ষে আত্মসংযম শিক্ষা করিয়াছে তাহার শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং মনের শান্তিও ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আত্মসংযমের প্রথম ধাপই ভাবের সংযম। তোমার শক্তির সীমা আগে বুঝিতে চেষ্টা কর এবং যতটুকু পার ততটুকু কর। আমি তোমাদের নিকট আদর্শ স্থাপন করিলাম—ইহাই প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টি-ভঙ্গী লাভ করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা কর। যদি অকৃতকার্য হও তবে দুঃখ বা লজ্জার কোন কারণ নাই। আমি শুধু তোমাদিগকে বুঝাইয়াছি—বিবাহ একটি আত্মোৎসর্গের ব্যাপার, নবজীবনলাভের সোপান; পবিত্র উপনয়ন-সংস্কারও তেমনি একটি আত্মত্যাগ ও নবজীবনলাভের জন্য অনুষ্ঠান। আমি যাহা বলিলাম তাহাতে তোমরা ভীত হইও না বা দুর্বলতা বোধ করিও না। সর্বদাই চিন্তা, বাক্য ও কার্যে সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটাইবার জন্য উন্মুখ থাকো। সর্বদাই তোমাদের ভাবগুলি পবিত্র করিতে চেষ্টা করিবে এবং দেখিবে সবই কল্যাণের দিকে যাইবে। ভাব হইতে অধিক শক্তিশালী কিছুই নাই। কাজ বাক্যের অনুসরণ করে এবং বাক্য ভাবের অনুগামী হয়। এই জগৎ একটি বিরাট ভাবনার পরিণতি এবং যেখানে ভাব পবিত্র এবং মহৎ, ফলও সর্বদাই মহৎ এবং পবিত্র হইবেই। আমি ইচ্ছা করি, তোমরা একটি উচ্চ আদর্শের বর্মে আবৃত হইয়া এখান হইতে যাও এবং আমি তোমাদিগকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, কোন প্রলোভনই তোমাদিগের অনিষ্ট করিতে পারিবে না, কোনরূপ অপবিত্রতাও তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

"যে সকল বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড তোমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে সেগুলি মনে রাখিও। দেখিতে সামান্য 'মধুপর্ক' ক্রিয়াটির বিষয়ই ধর। সমগ্র বিশ্ব 'মধুময়'—সুস্বাদু অমৃত বা মধুতে পরিপূর্ণ—যদি শুধু জগতের অন্যান্য জীব তাহাদের ভোগাংশ গ্রহণ করিবার পর তোমরা প্রসাদরূপে ইহা আস্বাদ করিতে চাও। ইহার অর্থ ত্যাগের সাহায্যে ভোগ।"

একটি কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "যদি সন্তান প্রজননের ইচ্ছা না থাকে তবে কি

বিবাহ হইবেই না?”

“নিশ্চয়ই না। আমি ভাবরাজ্যের (Platonic) বিবাহে বিশ্বাস করি না। অতি অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, পুরুষ নারীকে আদৌ কোনরূপে শারীরিক সাহচর্যের জন্য বিবাহ না করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ সেই সকল দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। আমি পবিত্র বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা সমস্তই তোমরা পড়িবে। মহাভারতে যাহা পড়িয়াছি তাহা দিন দিন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহাতে লিখিত আছে, ব্যাসদেব ‘নিয়োগ’ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই, বরং তিনি ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার আকৃতি ছিল ভয়ঙ্কর; তিনি প্রেমের কোন ভঙ্গী প্রদর্শন করেন নাই কিন্তু সহবাস ক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে তিনি ঘৃতদ্বারা তাঁহার সর্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়াছিলেন। কামের বশীভূত হইয়া তিনি এই কাজ করেন নাই, প্রজননের জন্যই করিয়াছিলেন। সন্তান কামনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং সেই ইচ্ছা একবার পূর্ণ হইলেই আর সহবাস হইবে না।

“মনু প্রথম সন্তানকে ‘ধর্মজ’ বলিয়াছেন—অর্থাৎ কর্তব্য জ্ঞান হইতে জাত এবং তৎপরবর্তী সন্তানগণকে ‘কামজ’ বলিয়াছেন—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে জাত। এক কথায় সংক্ষেপে ইহাই যৌনসম্বন্ধীয় বিধি ব্যক্ত করিতেছে। ভগবান কি তাঁহার বিধানের অতিরিক্ত অন্য কিছু? ভগবানকে মানিয়া চলার অর্থ তাঁহার বিধান ও নিয়ম অনুষ্ঠান করা। স্মরণ রাখিও, তোমাদিগকে তিন বার উচ্চারণ করিতে হইয়াছে, ‘আমি কোনপ্রকারেই বিধি লঙ্ঘন করিব না।’ বিধি-নিয়ম মানিয়া চলিতে প্রস্তুত এরূপ মুষ্টিমেয় সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক যদি আমরা পাই তবে আমরা বলবান এবং প্রকৃত স্ত্রী পুরুষের দ্বারা গঠিত একটি জাতিই পাইব।

“ইহা স্মরণ রাখিও যে, আমার স্ত্রী ‘বা’র প্রতি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দিক হইতে দৃষ্টি থামাইবার পর আমি প্রকৃতপক্ষে আমার বিবাহিত জীবন উপভোগ করিতে আরম্ভ করি। আমি পূর্ণযৌবনে এবং স্বাস্থ্যের পূর্ণাবস্থায় ব্রহ্মচর্যের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি; সাধারণতঃ বিবাহিত জীবন বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহা উপভোগ করিবার পক্ষে আমার বয়স তখন উপযুক্ত ছিল। বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় আমি দেখিতে পাইলাম যে, কোন পবিত্র কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই আমার জন্ম হইয়াছে—আমাদের সকলের জন্মই তদ্রূপ। যখন আমার বিবাহ হয় তখন আমার এই জ্ঞান হয় নাই। কিন্তু যখন আমার জ্ঞানের উন্মেষ হইল তখন অনুভব করিলাম, যে কাজের জন্য আমি জন্মলাভ করিয়াছি বিবাহ সেই কাজের সহায়তা করিতেছে কিনা ইহা অবশ্যই আমাকে দেখিতে হইবে। সেই সময়েই প্রকৃত ধর্ম কী তাহা আমি বুঝিতে পারি। এই প্রতিজ্ঞাগ্রহণের পরই আমাদের জীবনে প্রকৃত সুখ আসিয়াছিল। ‘বা’ যদিও দেখিতে কৃশ, তাঁহার শরীরের বাঁধ চমৎকার এবং তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত পরিশ্রম করেন। যদি তিনি আমার কামনার সামগ্রীই থাকিয়া যাইতেন তবে তিনি কখনই এরূপ করিতে পারিতেন না।

“অবশেষে, বিলম্বে হইলেও আমি সচেতন হইয়াছিলাম; এই অর্থে আমি

কয়েক বৎসর মাত্র প্রকৃত বিবাহিত জীবন যাপন করিতে পারিয়াছি। উপযুক্ত সময়ে সচেতন হইবার সৌভাগ্য তোমাদের হইয়াছে। আমার বিবাহের সময় ঘটনাবলী যতদূর সম্ভব প্রতিকূল ছিল। তোমাদের পক্ষে সেগুলি যতদূর সম্ভব অনুকূল। তথাপি আমার একটি জিনিস ছিল এবং তাহাই আমাকে চালাইয়া নিয়াছে। ইহা সত্যের বর্মাচ্ছাদন। উহাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে এবং বাঁচাইয়াছে। আমার জীবনের মূল ভিত্তিই সত্য। সত্য হইতে ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা পরে উৎপন্ন হইয়াছে। কাজেই তোমরা যাহা কর, নিজেরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হও, জগৎকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। তোমাদের মনের ভাব কখনও গোপন করিও না। যদি সেগুলি প্রকাশ করা লজ্জাজনক মনে হয়, তবে সেগুলি চিন্তা করা আরো লজ্জাজনক।"

[হরিজন, ১৪-৪-'৪৬]

৩০

পতি ও পত্নী

প্রশ্ন॥ স্বামী বন্ধুস্থানীয়ই হউন বা প্রেমের প্রতিমূর্তিই হউন, হিন্দুধর্মমতে স্বামীর প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ এবং তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিলয় স্ত্রীজাতির সর্বোচ্চ আদর্শ। পত্নীর জীবনযাপনের প্রকৃত নীতি যদি এই হয় তবে স্বামীর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন কিনা?

উত্তর॥ আমার আদর্শ পত্নী—সীতা, এবং আদর্শ পতি—রাম; কিন্তু সীতা রামের ক্রীতদাসী ছিলেন না। অথবা একে অন্যের ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী ছিলেন। রাম সর্বদাই সীতার সব বিষয় মনোযোগ দিয়া বিবেচনা করিতেন। প্রকৃত ভালবাসা যেখানে আছে সেখানে উক্ত প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আজকালকার হিন্দুপরিবার একটি অদ্ভুত সমস্যাবিশেষে পরিণত হইয়াছে। যখন বিবাহ হয় তখন স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। লোকাচারের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত ধর্মের অনুশাসন এবং বিবাহিত ব্যক্তিগণের শান্ত জীবনপ্রবাহ বিপুল হিন্দুপরিবারের শান্তি রক্ষা করিতেছে। কিন্তু স্বামী কিংবা স্ত্রী যখনই কোন সাধারণ মত হইতে ভিন্ন মতাবলী পোষণ করেন তখনই বিরোধের আশঙ্কা হয়। স্বামীর বেলায় তাঁহার বিচারবুদ্ধি লোপ যায়। তিনি মনে করেন তাঁহার জীবনসঙ্গিনীর ইচ্ছা ও অভিমত কী তাহা আলোচনা করিতে তিনি বাধ্য নহেন। পত্নীকে তিনি তাঁহার সম্পত্তির সামিল মনে করেন এবং নিরুপায় পত্নীও স্বামীর দাবী আছে এই বিশ্বাস করিয়া নিজেকে চাপিয়া যান। আমার মনে হয়, ইহার একটা সমাধান আছে। মীরাবাঈ সেই পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন পত্নী নিজে জানেন যে তিনি যাহা করিতেছেন তাহাই ঠিক, এবং যখন কোন মহত্তর উদ্দেশ্যে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেন, তখন তাঁহার নিজ মতানুযায়ী চলিবার এবং বিনয় ও সাহসের সহিত নিজ কার্যের

পরিণামের সম্মুখীন হইবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে।

প্রশ্ন॥ ধরুন, স্বামী যদি মাংসাশী হন এবং স্ত্রী মাংসভোজন অনিষ্টকর মনে করেন, স্ত্রী কি তাঁহার মানসিক বৃত্তি অনুযায়ী চলিতে পারেন? তিনি কি সর্বপ্রকার অনুনয় বিনয়ে স্বামীকে মাংসভোজন বা অনুরূপ কার্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টাও করিতে পারেন না? অথবা তিনি কি স্বামীর জন্য মাংস রন্ধন করিতে বাধ্য, অথবা ততোধিক মন্দ বিষয়—স্বামী যদি তাঁহাকে মাংস খাওয়াইতে চান তবে কি তিনি তাহা খাইতে বাধ্য? যদি বলেন স্ত্রী তাঁহার নিজপথে চলিতে পারেন, তবে যেখানে একজন বাধ্য করিতে চায় এবং অপরজন তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে উদ্যত হয়, সেখানে যুক্তপরিবারের কাজকর্ম কী করিয়া চলিতে পারে?

উত্তর॥ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই প্রশ্নের কতকটা জবাব দেওয়া হইয়াছে। স্বামীর দুষ্কর্মের সহযোগী হইতে স্ত্রী বাধ্য নন। এবং যখন তিনি মনে করেন যে কোন বিষয় মন্দ, তখন ভাল কাজটি করিবার সাহস তাঁহার থাকা চাই। যদি এমন হয় যে পূর্বে স্বামী স্ত্রী উভয়েই মাংসাশী ছিলেন তবে তিনি পরিবারের লোকদেব জন্য মাংস রন্ধন করিতে বাধ্য। কারণ আমরা দেখিতে পাই, স্ত্রীব কর্তব্য গৃহকর্ম সুচারুভাবে পরিচালনা করা—রন্ধনও তাঁহার অন্যতম কাজ; আর স্বামীর কর্তব্য পরিবারেব জন্য উপার্জন করা। পক্ষান্তরে, যদি কোন নিরামিষভোজী পরিবারের স্বামী মাংসাশী হন এবং স্ত্রীকে মাংস রন্ধন করিতে বাধ্য করিতে চান, স্ত্রী তাঁহার সদ্‌বিবেচনার বিরুদ্ধজনক কিছুই রন্ধন করিতে বাধ্য নহেন। পারিবারিক শান্তি সর্বাপেক্ষা অধিক কাম্য। কিন্তু ইহাই কেবল মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আমার মতে বিবাহিত অবস্থা অন্য যে কোন অবস্থার ন্যায় নিয়মানুবর্তিতার অবস্থা। কর্তব্যের সমষ্টি লইয়াই মানবজীবন; উহা আবার শিক্ষাব ক্ষেত্র। এই জীবনে এবং তৎপবেও পরস্পরের মঙ্গলবিধান করাই বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্য। মানবজাতির সেবাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। যখন একজন সঙ্গী নিয়মের শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে তখন বন্ধন ছিন্ন করিবাব অধিকার অপরের উপর বর্তিয়া থাকে। নৈতিক বন্ধনই ছিন্ন হয়—শারীরিক বন্ধন নয়। ইহাতে দাম্পত্য-বন্ধনের ছেদ বুঝায় না। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা মিলিত হইয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই স্বামী কিংবা স্ত্রী পৃথক্ হইয়া পড়েন। হিন্দুধর্ম প্রত্যেককে প্রত্যেকের সম্পূর্ণরূপে সমান বলিয়া গণ্য করেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে অন্যরূপ প্রথা গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোন্ সময় হইতে তাহা কেহ জানে না। সেইরূপ অন্যান্য বহু মন্দ বিষয়ও হিন্দুধর্মে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু আমি ইহা জানি যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, তিনি স্ত্রীই হউন বা পুরুষই হউন, নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য তিনি যাহা করা ভাল মনে করেন তাহা করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এই আত্মোপলব্ধির জন্যই স্ত্রী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১০-'২৬]

৩১

হিন্দু পরিবারের স্ত্রী

জনৈক ভ্রাতা তাঁহার বিবাহিতা ভগ্নীর দুর্দশা বর্ণনা করিয়া যে দীর্ঘ পত্র দিয়াছেন নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া হইল—"কিছুকাল পূর্বে এক ব্যক্তির সহিত আমার ভগ্নীর বিবাহ হয়; স্বামীর চরিত্র আমাদের নিকট হইতে গোপন করা হইয়াছিল। এখন প্রকাশ পাইয়াছে যে, লোকটি লম্পট এবং অতিমাত্র ব্যভিচার এবং লাম্পট্যও তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। আমার দুর্ভাগ্যশীলা ভগ্নী বিবাহের অল্প পরেই দেখিতে পাইল যে তাহার 'প্রভু' দিন দিন ক্রমশঃ গভীরভাবে অধঃপতনের দিকে যাইতেছে। সে বাদানুবাদ করিল। লোকটি তাহা সহ্য করিতে পারিল না এবং 'তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য' তাহার সম্মুখেই তাহার লাম্পট্যের প্রশ্রয় দিতে লাগিল। সে তাহাকে চাবুকও মারিত, দাঁড় করাইয়া রাখিত এবং অনাহারেও রাখিত, ইত্যাদি। তাহার লাম্পট্য দেখিবার জন্য তাহাকে একটি থামে বাঁধিয়া রাখিত। আমার ভগ্নীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার বিলাপে আমরাও নিজেদের নিতান্ত দুর্দশাগ্রস্ত বোধ করিতেছি। আমরা নিতান্ত অসহায় বোধ করিতেছি। আমাদিগকে এবং তাহাকে কী করিতে উপদেশ দেন? হিন্দুধর্মের অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়ের মধ্যে ইহা একটি যে, নারীকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের কৃপার উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তাহার বিশেষ কোন স্বত্ব বা স্বাধিকার নাই। যদি কোন পুরুষ নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন হইতে চায় তবে উপায়হীনা নারীর প্রতিকারের কোন উপায় থাকে না। পুরুষ যার তার সঙ্গে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং তাহার বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র আঙ্গুলও কেহ উঠাইতে পারে না। কিন্তু নারীর বিবাহ হওয়া মাত্র তাহাকে কেবল 'প্রভুর' কৃপার উপরেই নির্ভর করিতে হয়। এইরূপ হাজার হাজার নারী ক্রন্দন করিতেছে এবং যাতনায় আর্তনাদ করিতেছে। যতদিন হিন্দুধর্ম হইতে এই সকল অত্যাচার এবং তদনুরূপ ব্যভিচারগুলি দূরীভূত না হইবে ততদিন সমাজের কোন উন্নতির আশা আছে কি?"

—লেখক একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁহার ভগ্নীর দুর্দশার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল তাঁহার নিজের বর্ণনা তাহা হইতে অধিক মর্মস্পর্শী। লেখক আমাকে তাঁহার নাম ও ঠিকানা পূর্ণভাবেই দিয়াছেন। একটি বিচ্ছিন্ন দৃষ্টান্ত হইতে তিনি হিন্দুধর্মের যে তীব্র নিন্দা করিয়াছেন তাহা আহত মনস্তাপপ্রসূত বলিয়া যদিও ক্ষমার যোগ্য, উৎকট ভাবপ্রবণ সাধারণ সিদ্ধান্তের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। কারণ লক্ষ লক্ষ হিন্দু স্ত্রী অবিরাম শান্তিতে বাস করেন, এবং তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁহারা তাঁহাদের পতিগণের উপর যে প্রভুত্ব করেন তাহা যে কোন নারীর পক্ষে স্পৃহণীয়। ভালবাসা হইতে এই ক্ষমতার উদ্ভব হয়। লেখক নির্মম অত্যাচারের যে কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হিন্দুধর্মের মন্দ বিষয়গুলির দৃষ্টান্ত নহে; পরন্তু তাহা সকল দেশে এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের ভিতর মানবপ্রকৃতির যে কুৎসিত চিত্র, তাহাই প্রকটিত করিয়াছে। উক্ত

ঘটনা তাহারই একটি উদাহরণ। নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে অসমর্থ বা সময় সময় তাহা করিতেও অনিচ্ছুক, নমনীয়স্বভাবা স্ত্রীর পক্ষে পশুপ্রকৃতির স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের সুযোগ-সুবিধা কোন সুফল প্রদান করে নাই। কাজেই সংস্কারের অনুকূলে এবং সংস্কারকদের পক্ষে উৎকট ভাবপ্রবণতা এবং অত্যুক্তি পরিহার করা কর্তব্য।

তথাপি এই প্রবন্ধে যে ঘটনাটির বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে তাহা হিন্দুসমাজে মোটেই অসাধারণ ঘটনা নহে। হিন্দুদের কৃষ্টি স্ত্রীকে স্বামীর অত্যধিক অধীন করিয়া ভ্রম করিয়াছে এবং স্ত্রীকে স্বামীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিলোপ করিতে বিশেষ জোর দিয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, স্বামী সময় সময় এত অধিক ক্ষমতা জোর করিয়া প্রয়োগ করেন এবং প্রভুত্ব খাটান যে তিনি পশুর শ্রেণীতে গিয়া পড়েন। এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার আইন দ্বারা হয় না। কিন্তু কুমারীদিগের শিক্ষার কথা না ধরিয়া, বিবাহিতা নারীদের প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা এবং স্বামিগণের অমানুষিক আচরণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের দ্বারা ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। যে ঘটনার আলোচনা এখানে হইতেছে তাহার প্রতিকার অতিমাত্রায় সরল। ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন নিজদিগকে অসহায় মনে না করিয়া এবং দুঃখপ্রপীড়িতা মেয়েটির সহিত ক্রন্দন না করিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিবেন এবং তাহাকে এইরূপ শিক্ষা দিবেন যেন সে বিশ্বাস করিতে পারে যে পাপমগ্ন স্বামীকে তুষ্ট করা বা তাহার সাহচর্য কামনা করা তাহার কর্তব্যমধ্যে গণ্য নয়। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তাহার প্রতি কোন মনোযোগ দেওয়া হয় না। কাজেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন না করিয়াও সে স্বামীর গৃহ হইতে দূরে বাস করিতে পারে এবং মনে করিতে পারে যেন আদৌ তাহার বিবাহ হয় নাই। অবশ্য যদিও হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভবপর নয়, আইনের দিক হইতে তাহার সম্মুখে দুইটি উপায় উন্মুক্ত আছে—তাহার স্বামীকে সাধারণ মারামারির জন্য শাস্তি দেওয়ান এবং তাহাকে খোরপো দেওয়ার জন্য বাধ্য করা। অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা যায় যে, সর্বক্ষেত্রে না হইলেও অধিকাংশ স্থলেই এই শ্রেণীর প্রতিকার দ্বারা ফল ভাল না হইয়া আরও মন্দ হয় এবং তদ্দ্বারা কোন সাধ্বী স্ত্রীর মনে শান্তি আসিতে পারে না এবং স্বামীকে সংশোধন করার প্রশ্ন আরও জটিল, এমনকি, অসম্ভব হইয়া পড়ে; অথচ এই সংশোধনের কাজই সমাজের, বিশেষতঃ প্রত্যেক স্ত্রীর অধিকতর ভাবে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। বর্তমান ক্ষেত্রে বালিকার পিতামাতা তাহাকে ভরণপোষণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; কিন্তু যেখানে তাহা সম্ভবপর নয়, এইরূপ নির্যাতিতা রমণীগণকে আশ্রয় দিবার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান দেশে গড়িয়া উঠিতেছে তাহাকে সেখানে পাঠাইতে হইবে।

কিন্তু তাহা হইলেও একটি প্রশ্নের উত্তর বাকী থাকে;—যে সকল তরুণী এইভাবে অনাদৃত হইয়া স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করে অথবা প্রকৃতপক্ষে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা হয় এবং যেখানে বিবাহবিচ্ছেদ দ্বারাও প্রতিকার সম্ভবপর নয়, তাহাদের আসঙ্গলিপ্সা মিটাইবার প্রশ্ন। কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা প্রকৃতপক্ষে গুরুতর অভিযোগ নয়, কারণ যে সমাজে লোকাচারমূলে যুগ-যুগান্তর

হইতে বিবাহবিচ্ছেদ অপ্রচলিত, সেখানে যে নারীর বিবাহ দুঃখময় হইয়া উঠে সে পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে না। যখন কোন সামাজিক পরিবেশে জনমত এইরূপ বিশেষ প্রতিকার আবশ্যক মনে করে তখন আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে এইরূপ প্রতিকার অনুমোদিত হইবে। আমি লেখকের চিঠি যতদূর বুঝিয়াছি, উক্ত স্ত্রীলোকটি তাহার আসঙ্গলিপ্সা মিটাইতে পারে না এই অভিযোগ নাই। স্বামীর অতি কদর্য এবং উদ্ধত অসচ্চরিত্রতা সম্বন্ধেই অভিযোগ। ইহার জন্য পূর্বেই বলিয়াছি যে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনেই প্রতিকার নিহিত। আমাদের অধিকাংশ দুঃখকষ্টের ন্যায় এই অসহায় ভাব কাল্পনিক। অসম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত দুঃখ দূর করিতে হইলে একটু নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, একটু নূতন রকমের চিন্তাধারা যথেষ্ট। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে এইরূপ ক্ষেত্রে অত্যাচারের বেষ্টনী হইতে নির্যাতিতাকে সরাইয়া লওয়ার পরোক্ষ প্রভাব প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না। তাহাকে জনসাধারণের সেবার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করিবার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা দিতে পারিলে স্বামীর শয্যালাভরূপ সংশয়াত্মক সুখের পরিবর্তে বহুগুণ অধিক সৌভাগ্য তাহার দুঃখের ক্ষতিপূরণ করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১০-'২৯]

৩২

তরুণ-তরুণীর দুর্গতি

একটি যুবক লিখিতেছে—"আমার বয়স পনর। আমার স্ত্রীর বয়স সতর। আমি বিষম সংকটে পড়িয়াছি। আমি সর্বদাই এই বিসদৃশ সম্বন্ধের বিরোধী ছিলাম; কিন্তু আমার পিতা এবং খুড়া আমার প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া রুষ্ট হইলেন এবং আমাকে ভর্ৎসনা ও নানা গালিগালাজ করিলেন এবং বালিকার পিতা শুধু ধনী সন্তানের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইবার লোভে পড়িয়া তাহারা কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিলেন, যদিও আমি ছিলাম অপরিণতবয়স্ক এবং কন্যা হইতে বয়সে ছোট। ইহা কীরূপ বোকামির কাজ! আমার পিতা এই অসমঞ্জস বিবাহ আমাকে জোর করিয়া না করাইয়া এবং আমাকে এরূপ একটি সংকটে না ফেলিয়া কি আমাকে আমার নিজের মতানুযায়ী চলিতে দিতে পারিতেন না? আমি যদি সেই সময় বিষয়টির সব দিক্ বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে আমি কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হইতাম না। কিন্তু সেই অধ্যায় ত শেষ হইয়া গিয়াছে। আমাকে আপনি কী করিতে উপদেশ দেন?"

—লেখক তাহার পুরা নাম ও ঠিকানা আমাকে দিয়াছে কিন্তু পাছে উত্তর তাহার নিকট পৌঁছিতে না দেওয়া হয় এই ভয়ে 'নবজীবন' পত্রিকা যোগে যেন

আমি উত্তর দিই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ অবস্থা শোচনীয়। এই যুবকের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, যদি তাহার সাহস থাকে তবে এই বিবাহ প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত। কারণ তাহাদের বিবাহকালে "সপ্তপদী" অনুষ্ঠানের সময় তাহাদিগকে যে সকল প্রতিজ্ঞা করানো হইয়াছিল এই যুবক বা এই বালিকার তৎসম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। বিবাহের পর তাহারা কখনও একত্রে বাস করে নাই। কাজেই এই যুবককে অত্যন্ত সাহসের সহিত চলিতে হইবে এবং তথাকথিত বিবাহ প্রত্যাখ্যান করিবার পরিণামস্বরূপ তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনারও সম্মুখীন হইতে হইবে। এবং যদি আমার এই মত তাহাদের নিজ নিজ পিতামাতার কানে পৌঁছায় তবে তাঁহাদিগকে এই সনির্বন্ধ অনুরোধ করিব যেন তাঁহারা তাঁহাদের নির্দোষ সন্তানগণের প্রতি দয়াপরবশ হন এবং জোর করিয়া তাহাদের উপর একটি নির্মম ভয়াবহ ভার চাপাইয়া না দেন। পনের বৎসরের একটি বালক কিশোর মাত্র। সে হয় বিদ্যালয়ে গিয়া পড়াশুনা করিবে, নয় কারখানায় কাজ শিখিবে; কিন্তু গৃহস্থের কর্তব্যসমূহ তাহার উপর চাপান চলে না। আমি আশাকরি এই দম্পতীর পিতামাতা তাঁহাদের কর্তব্যজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইবেন। যদি তাঁহারা সেরূপ না হন, তাহা হইলে বিনম্রভাবে তাহাদের অভিভাবকগণের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করা এবং যুক্তি ও বিবেকের আলোতে চলা এই বালক এবং এই বালিকার সুস্পষ্ট কর্তব্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১-'২৯]

৩৩

পারিবারিক গোলমাল

১

প্রশ্ন॥ আমি তেইশ বৎসরের যুবক। গত দুই বৎসর যাবৎ আমি বিশুদ্ধ খদ্দর ব্যবহার করিতেছি। গত ২৮ দিন যাবৎ আমার অবসর সময়ে আমি নিয়মিত-রূপে সুতা কাটিতেছি। কিন্তু আমার স্ত্রী খদ্দর পরিধান করিতে চায় না। সে বলে খদ্দর অত্যন্ত মোটা। আমি কি তাহাকে খদ্দর পরিতে বাধ্য করিব? আমি ইহাও বলিতে পারি যে আমাদের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; কোন মতে মিলে না।

উত্তর॥ ভারতের লোকের ইহাই সাধারণ নিয়তি। আমি অনেকবার বলিয়াছি যে স্বামী অধিকতর শক্তিশালী এবং অধিকতর শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার স্ত্রীর শিক্ষকরূপে কাজ করিবে এবং তাহার কোন অসম্পূর্ণতা থাকিলে সহ্য করিয়া যাইবে। তোমাকে এই অসামঞ্জস্য সহিয়া যাইতে হইবে এবং ভালোবাসা দ্বারা তাহাকে জয় করিতে হইবে—জোর করিয়া কখনই নয়। ইহা হইতে বুঝিবে যে তোমার স্ত্রীকে খদ্দর পরিধান করিতে তুমি বাধ্য করিতে পার না। কিন্তু তুমি তোমার ভালোবাসা এবং দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিবে যেন তোমার স্ত্রী তদ্দৃষ্টে ঠিক পথে চলিতে পারে। মনে রাখিও, তুমিও যেমন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি নও, তোমার

স্ত্রীও তোমার সম্পত্তি নয়। সে তোমার শ্রেষ্ঠ অর্ধাঙ্গিনী এবং তাহার সহিত সেইরূপ আচরণ করিবে। এইভাবে পরীক্ষা করিয়া চলিলে তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে না।

২

প্রশ্ন॥ আমি বিবাহিত। আমার স্ত্রী ভালমানুষ। আমাদের সন্তান-সন্ততি আছে। এযাবৎ আমরা শান্তিতে বাস করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, তিনি এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট হইতে গুরুমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার জীবন এখন আমার নিকট অজ্ঞাত। ইহা আমাদের ভিতর ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। আমি কী করিব বুঝিতে পারিতেছি না। তুলসীদাসের বর্ণিত রাম আমার আদর্শ পুরুষ। রাম যাহা করিয়াছিলেন আমি তাহা করিব? না, আমার স্ত্রীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিব?

উত্তর॥ তুলসীদাস আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমরা বিচার না করিয়া যেন মহাত্মাদের অনুসরণ না করি। মহাপুরুষগণ যাহা নিঃশঙ্কচিত্তে করিতে পারেন আমরা তাহা পারি না। সীতার জন্য রামের ভালোবাসার কথা ভাব। তুলসীদাস আমাদিগকে বলেন যে, স্বর্ণমৃগের আগমনের পূর্বেই রামের আদেশে প্রকৃত সীতা মেঘের ভিতর লুক্কায়িত হন এবং শুধু ছায়াটি থাকিয়া যায়। এই ঘটনা এমনকি, লক্ষ্মণের নিকটও গূঢ়ভাবে গোপন ছিল। কবি আমাদিগকে আরো বলিয়াছেন যে, রামের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা দেবগণের উপযুক্ত। এই ছায়া সীতার সহিত রাম স্বর্ণমৃগের ঐ স্থানে আগমনের পর হইতে বাস করিতেন। এই অবস্থাতেও সীতা রামের কৃত একটি কার্যের জন্যও রুষ্ট হন নাই। তোমার ক্ষেত্রেও যেমন এই সকল উপাদানের অভাব বিদ্যমান, পার্থিব যে কোন বিষয়ে এই সকল উপাদানের অভাব লক্ষিত হইবে। কাজেই তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, স্ত্রীর এই বিষয় তুমি সহ্য করিয়া যাও এবং যে পর্যন্ত তাঁহার আচরণের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগের কোন কারণ উপস্থিত না হয় সে পর্যন্ত তাঁহার কাজে হস্তক্ষেপ করিও না। যদি তুমি কাহাকেও গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গুরুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই গুহ্য বিষয় তোমার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ না করিতে এবং উহা প্রকাশ না করাতে যদি তিনি রাগ করিতেন তবে তুমি তাহা পছন্দ করিতে না—ইহা নিশ্চয়ই বলিতে পারি। আমি স্বীকার করি স্বামী স্ত্রীর ভিতর কোন বিষয়ই গোপন থাকা উচিত নয়। বিবাহবন্ধন বিষয়ে আমার ধারণা খুব উচ্চ। আমার ধারণা স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। তাহারা দুই হইয়াও এক অথবা একের ভিতরে দুই। কিন্তু এই সকল বিষয় ধরাবাঁধা নিয়মে পরিচালিত করা যায় না। কাজেই সব দিক বিবেচনা করিয়া এবং যেহেতু তুমি উদারচেতা স্বামী, তোমার স্ত্রীর তাঁহার গুহ্য বিষয় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করার মর্যাদা রক্ষা করিতে তোমার কোন অসুবিধা হইবার কারণ নাই।

[হরিজন, ৯-৩-'৪০]

৩

প্রশ্ন॥ আপনি ঠিকই বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সকল রকমে ও উপায়ে অস্পৃশ্যতা বর্জন করেন নাই তিনি সত্যাগ্রহে যোগদান করিতে পারেন না। মনে করুন, কোন কংগ্রেসকর্মীর স্ত্রী তাঁহার মত অনুমোদন করেন না এবং তাঁহার বাড়ীতে হরিজনদিগকে আনিতে দেন না—তখন তিনি কী করিবেন? তাঁহার নিজমতে স্ত্রীকে জোর করিয়া আনিবেন অথবা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন অথবা সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিত্যাগ করিবেন?

উত্তর॥ তোমার স্ত্রীকে বাধ্য করিয়া মতে আনার বিষয় ইহা নয়। তুমি তাঁহাকে তাঁহার মতানুযায়ী চলিতে দাও এবং তুমি তোমার পথে চলিতে থাক। এর অর্থ এই হইবে যে, তিনি পৃথক্ রান্নাঘর পাইবেন এবং যদি তিনি ইচ্ছা করেন একটি পৃথক্ ঘরও পাইতে পারেন। কাজেই আন্দোলন পরিত্যাগ করার কোন প্রশ্নই উঠে না।

[হরিজন, ১৩-৪-'৪০]

৩৪

অদ্ভুত প্রকৃতির পিতা

একটি যুবক আমাকে একটি চিঠি দিয়াছে, তাহার সারাংশ মাত্র এখানে দেওয়া গেল—"আমি বিবাহিত। আমি বিদেশে গিয়াছিলাম। আমার একটি বন্ধু ছিল। সে আমার ও আমার পিতামাতার সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসভাজন ছিল। আমার অনুপস্থিতিতে সে আমার স্ত্রীকে ভুলাইয়া নেয় এবং তৎকর্তৃক তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। আমার পিতা জোর করিয়া বলিতেছেন যে মেয়েটির গর্ভপাত করাইতে হইবে; অন্যথায়, তিনি বলেন, তাঁহার পরিবার নিন্দনীয় হইবে। আমার মনে হয় সেরূপ করা অন্যায় হইবে। উপায়হীন স্ত্রীলোকটি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে। আপনি কি অনুগ্রহপূর্বক এই ক্ষেত্রে আমার কী করা কর্তব্য বলিয়া দিবেন?"

—অত্যন্ত দ্বিধার সহিত আমি এই পত্র প্রকাশিত করিলাম; যেহেতু প্রত্যেকেই জানে যে সমাজে এইরূপ ঘটনা মোটেই বিরল নহে। সেইজন্য এই প্রশ্নের প্রকাশ্য সংযত আলোচনা আমার নিকট অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না।

দিবালোকের ন্যায় ইহা আমার নিকট স্পষ্ট যে গর্ভপাত করা অপরাধ। এই নিরুপায় স্ত্রীলোকটির ন্যায় অসংখ্য পতি অনুরূপ অপরাধে অপরাধী, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না। সমাজ যে শুধু তাহাদিগকে ক্ষমা করে তাহা নয়, তাহাদিগকে নিন্দা পর্যন্তও করে না। আরো লক্ষ্য করার বিষয়, স্ত্রীলোক তাহাদিগের পাপ গোপন করিতে পারে না, কিন্তু পুরুষ সাফল্যের সহিত তাহার পাপ গোপন করিতে পারে।

আলোচিতা স্ত্রীলোকটি কৃপার পাত্রী। স্বামীর কর্তব্য হইবে সাধ্যমত স্নেহ

ও কোমলতা দ্বারা এই শিশুটিকে লালনপালন করা এবং তাহার পিতার উপদেশ মানিয়া চলিতে অস্বীকার করা। তাহার স্ত্রীর সঙ্গে সে বাস করিতে থাকিবে কিনা ইহা একটি জটিল প্রশ্ন। ঘটনাবলী দ্বারা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। সেক্ষেত্রে তাহার ভরণপোষণ যোগাইতে এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে এবং পবিত্র জীবনযাপনে সহায়তা করিতে সে বাধ্য হইবে। তাহার অনুতাপ আন্তরিক এবং প্রকৃত হইলে স্বামীর পক্ষে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে আমি কিছুই অন্যায় দেখি না। এমনকি, আমি ইহার উপর আরো একটি অবস্থা কল্পনা করিতে পারি, যখন স্বামীর পক্ষে বিপথগামিনী পত্নীকে পুনরায় গ্রহণ করা তাহার পবিত্র কর্তব্যমধ্যে গণ্য হইবে, যদি স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে পাপমুক্ত রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-১-'২৯]

৩৫

ঘৃণিত এবং অসঙ্গত বৈষম্য

জনৈক লেখক লিখিতেছেন—"বর্তমান কচ্ছ দেশে আমাদের মধ্যে অন্য বিষয়ে সম্ভ্রান্ত কতিপয় ভদ্রলোক আছেন যাঁহারা সৎ, দানশীল, উদারচেতা এবং অত্যন্ত ধর্মভাবাপন্ন। কিন্তু শুধু পুত্রসন্তান লাভের জন্য তাঁহাদের পুনরায় বিবাহ করিতে কোন দ্বিধাবোধ নাই। হিন্দুদের মধ্যে কন্যার জন্ম হইলে তজ্জন্য খেদ করার যে অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে তাহা আপনি অনুমোদন করেন কিনা তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত প্রকাশ করিতে আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি। গোঁড়াদের সঙ্গে আপনিও কি এই মত পোষণ করেন যে পুত্র না হইলে কেহ স্বর্গে যাইতে পারে না?

"এক ব্যক্তি তাঁহার দানশীলতার জন্য বিখ্যাত। তাহার তিনটি পত্নী। কিন্তু তাঁহার কোন পুত্রসন্তান নাই। বর্তমানে তিনি চতুর্থ বার বিবাহ করিয়াছেন। কয়েকমাস পূর্বে তিনি একটি যজ্ঞ করিয়াছেন এবং তখন প্রতিদিন পাঁচশত ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছে। এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়।"

—দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুসমাজে পুত্রসন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রায় সর্বত্র বিদ্যমান। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বর্তমানে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের যুগ। এই সময়ে স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারে এই অন্যায় বৈষম্য যুগোপযোগী নহে। পুত্র জন্মিলে আহ্লাদ এবং কন্যা জন্মিলে খেদ করার কোন কারণ আমি দেখি না। উভয়েই ভগবানের দান। তাহাদের বাঁচিবার সমান অধিকার রহিয়াছে এবং পৃথিবীকে চালু রাখিতে হইলে উভয়েরই সমানভাবে প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ পুরাতন এবং

সমাজে গভীরভাবে অন্তর্নিবিষ্ট প্রথার মূলোচ্ছেদও সহজে করা যায় না। সামাজিক বিষয়ে জনগণের বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিয়া এবং নারীগণের প্রকৃত পদবী ও মর্যাদা যথাযথরূপে স্বীকার করিয়াই এইগুলিকে দূর করা সম্ভব। বর্তমান কালে পুত্রসন্তান না হইলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই সমানভাবে স্বামীর পুনরায় বিবাহে রাজী হইতে দেখা যায়। আমার লেখকের মত সমাজসংস্কারকগণকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিতে হইবে এবং এই সকল দুর্দশাপূর্ণ ঘটনাতে তাঁহাদের রুষ্ট কিংবা ভগ্নহৃদয় হইলে চলিবে না। যে বিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে চান তাহার সত্যতা এবং যৌক্তিকতায় বিশ্বাস রাখিতে হইবে এবং তাঁহারা এই আশায় কাজ করিয়া যাইতে থাকিবেন যে, সমাজ একদিন না একদিন পুত্র ও কন্যা সন্তানগণের ভিতর অর্থহীন ও অন্যায় প্রভেদ করার কুফল উপলব্ধি করিতে পারিবে।

[হরিজন, ১৮-৫-'৩৮]

৩৬

বর্বরতার শেষ চিহ্ন

বেদনাবহুল ব [illegible] ত্রতা হইতে আমরা প্রতিদিন ভারতবর্ষে যাহা [illegible] তাহা জানি; দেখা যায়, এরূপ বহু স্বামী আছেন যাঁহারা তাঁহাদের পত্নীগণকে তাঁহাদের গৃহপালিত পশু বা গৃহসজ্জার সম্পত্তিরূপে গণ্য করেন এবং সেইজন্য মনে করেন যে তাঁহাদের গরুভেড়ার ন্যায় তাঁহাদের পত্নীগণকেও মারপিট করিবার অধিকার তাঁহাদের রহিয়াছে। কিন্তু এই পাশবিক অভ্যাসও যে আদালতের বিচারে সমর্থিত হইতে পারে তাহার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না; কিন্তু আমার একটি বন্ধু একটি সংবাদপত্রের কিয়দংশ কাটিয়া আমার হাতে দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে, মাদুরার জনৈক দায়রা জজ এইরূপ বিচার করিয়াছেন যে স্ত্রীকে মারপিট করিবার আইনগত অধিকার স্বামীর আছে। সৌভাগ্যের বিষয়, একজন ইংরেজ বিচারক ফৌজদারী মোকদ্দমার তালিকাদৃষ্টে মাদুরার দায়রা জজের এই অদ্ভুত রায় ধরিয়া ফেলেন এবং কারণ দর্শাইবার জন্য স্বামীর উপর নোটিশ জারী করেন। যথাসময়ে মামলাটির হাইকোর্টের বিচারপতি পাণ্ডুরাং রাও এবং কে. এস. মেনন এই দুইজনের সম্মুখে শুনানী হয়। তাঁহাদের রায় নিম্নে উদ্ধৃত করিতে আমার কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই—

"দায়রার জজ আসামীকে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করার জন্য প্রথম দফা অভিযোগ হইতে খালাস দিয়াছিলেন এবং স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এই খালাসের হুকুমের বিরুদ্ধে কোন আপীল করেন নাই। এই দফার অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে এইজন্য যে, দায়রার জজ একাধিক স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন যে ঔদ্ধত্য বা বেয়াদবির জন্য স্ত্রীকে মারিবার অধিকার স্বামীর আছে,—তাঁহার এই

মতের উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। স্ত্রীকে মারিবার অধিকার স্বামীর আছে এই অভিমতের দ্বারা দায়রার জজ এতটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে চার্জসীটে স্ত্রীকে মারিবার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করাতে তিনি পুলিশের সমালোচনাও করিয়াছেন, এমনকি, দায়রার বিচারের জন্য প্রেরিত অভিযোগের মধ্যে ইহা দফাভুক্ত করার জন্য সাব-ম্যাজিস্ট্রেটেরও সমালোচনা করিয়াছেন।

"ইহা বলিলেই সম্ভবতঃ যথেষ্ট হইবে যে, যদিও ব্যক্তিগত হিসাবে দায়রার জজের এ বিষয়ে তাঁহার নিজ মত পোষণ করিবার অধিকার থাকিতে পারে, তথাপি বিচারাসনে বসিয়া এইভাবে আইন জাহির করিবার তাঁহার পক্ষে কোন যুক্তি নাই যে, ঔদ্ধত্য বা বেয়াদবির জন্য স্ত্রীকে প্রহার করিয়া শাস্তি দিবার অধিকার স্বামীর আছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে এরূপ কোন অধিকারের কথা স্বীকৃত হয় নাই। এবং 'সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বিষয়ক' অধ্যায়েও 'স্ত্রীকে প্রহার করা'র অধিকার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

"এই আদালত (হাইকোর্ট) যদি দায়রার জজের এই বিচারকে ভ্রমাত্মক এবং ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা না করেন তবে বিচারাসন হইতে তাঁহার এই প্রকার সিদ্ধান্তের যে কী ভীষণ ফল হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এইজন্যই আমরা কোন ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ না রাখিয়া পরিষ্কারভাবে ইহা বলা আবশ্যক বোধ করিয়াছি যে, এই বিষয়ে দায়রার জজ স্বামিগণের অধিকার সম্বন্ধে যে বিচার করিয়াছেন তাহার কোন ভিত্তি নাই এবং ভবিষ্যতে যেন কেহ স্ত্রীকে প্রহার করিবার অজুহাত বা যৌক্তিকতার জন্য উহার উপর নির্ভর না করে।"

লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হয় যে, শিক্ষিত স্বামীরাও স্ত্রীদিগকে অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিবার এবং যখন খুশী তাহাদিগকে প্রহার করিবার অধিকার তাহাদের আছে এই বিশ্বাস হইতে মুক্ত নন। আমরা আশা করি যে, এই রায় তাহাদিগকে দেখাইয়া দিবে যে স্ত্রীদের প্রতি এরূপ ব্যবহার বর্বরতার চিহ্নাবশেষ।

[হরিজন, ৩-১০-'৩৬]

৩৭

পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলো

যখনই আমি বাঙলা, বিহার বা যুক্তপ্রদেশে গিয়াছি, অন্যান্য প্রদেশ হইতে সেখানে পর্দাপ্রথা অধিকতর কড়াকড়িভাবে প্রচলিত দেখিতে পাইয়াছি। দ্বারভাঙ্গাতে বেশী রাত্রিতে যখন একটি সভায় বক্তৃতা দিই—এবং সভাটি উচ্ছৃঙ্খল জনতা, গোলমাল ও ব্যস্ত কোলাহল হইতে মুক্ত শান্ত পরিবেশের ভিতর হইয়াছিল—আমার সম্মুখে পুরুষগণকে দেখিতে পাই কিন্তু আমার পশ্চাতে এবং পর্দার পিছনে মেয়েরা ছিলেন; আমার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ না করিলে তাঁহাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে আমি

জানিতে পারিতাম না। একটি অনাথাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে এই আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু আমাকে পর্দার পিছনের মহিলাগণকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা দিতে বলা হয়। আমার শ্রোত্রীবর্গের সংখ্যা আমি জানিতাম না। তাঁহারা যে পর্দার পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই দৃশ্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও অপমানিত বোধ করি। একটি বর্বরোচিত প্রথাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ভারতের নারীগণের প্রতি পুরুষ যে অবিচার করিয়াছে তাহার বিষয় আমি ভাবি; যে সময়ে সেই প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হয় তখন তাহার উপকারিতা যাহাই থাকুক না কেন, বর্তমানে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং দেশের অশেষ অকল্যাণ সাধন করিতেছে। গত একশত বৎসর যাবৎ আমরা যে শিক্ষালাভ করিতেছি মনে হয় তাহা আমাদের উপর অতি সামান্য প্রভাবই বিস্তার করিয়াছে; কারণ আমি দেখিতে পাই যে শিক্ষিত পরিবারের মধ্যেও পর্দাপ্রথা বজায় রাখা হইয়াছে। ইহার কারণ এই নয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহার উপকারিতায় নিজেরা বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাহার কারণ এই যে তাঁহারা এক ধাক্কায় এই বর্বরোচিত প্রথাকে দূরীভূত করিবার উপযুক্ত সাহস সঞ্চয় করিতে পারেন না। হাজার হাজার নারীর উপস্থিতিতে শত শত সভায় বক্তৃতা করিবার সুযোগ-সুবিধা আমার হয়। যে সকল স্ত্রীলোক এই সকল সভায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগকে কার্যকরভাবে কিছু বলা এই সকল সভায় নানা কোলাহলের মধ্যে অসম্ভব হইয়া পড়ে। যতদিন পর্যন্ত তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণ এবং গৃহের খাঁচায় আবদ্ধ রাখা হইবে, ততদিন এর চেয়ে অধিক কিছু আশা করা যায় না। কাজেই তাঁহারা যখন কোন বড় ঘরে সম্মিলিত হন এবং হঠাৎ যদি কাহারও বক্তৃতা শুনিতে হয় তাঁহারা নিজেরা কী করিবেন এবং বক্তার সমক্ষেই বা কী করিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। এবং যখন সভায় গোলমাল থামান হয়, অনেক দৈনন্দিন বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করা কঠিন হইয়া পড়ে, কারণ এই সকল বিষয়ের তাঁহারা কিছুই জানেন না, যেহেতু স্বাধীনতার মুক্তবায়ু সেবন করিতে তাঁহাদিগকে কখনও প্রবুদ্ধ করা হয় নাই। আমি জানি এই চিত্র কতকটা অতিরঞ্জিত। যে সকল হাজার হাজার ভগিনীর সম্মুখে আমার বক্তৃতা দিবার সুযোগ হয় তাঁহাদের অতি সুমার্জিত রুচি ও কৃষ্টি সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অবহিত আছি। আমি জানি পুরুষ যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, তাঁহারাও তদ্রূপ উচ্চস্তরে উঠিতে সমর্থ এবং ইহাও জানি যে, তাঁহাদেরও সময় সময় বাহিরে যাইতে হয়। এর জন্য শিক্ষিত শ্রেণীসমূহের বাহাদুরী লওয়ার কিছু নাই। প্রশ্ন এই—তাঁহারা আরও অগ্রসর হন নাই কেন? পুরুষরা যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে আমাদের মেয়েরা সেই স্বাধীনতা ভোগ করেন না কেন? তাঁহারা বাহিরে ভ্রমণ করিতে এবং মুক্তবায়ু সেবন করিতে পারিবেন না কেন?

সতীত্ব রৌদ্রবৃষ্টিবর্জিত উষ্ণ গৃহে জন্মে না। বাহির হইতেও ইহা চাপাইয়া দেওয়া যায় না। চারিদিকে পর্দার আড়াল দিয়া ইহা রক্ষা করা যায় না। ইহা ভিতর হইতেই বিকশিত হয় এবং ইহার কোন মূল্য দিতে হইলে প্রত্যেকটি অবাঞ্ছিত প্রলোভন এড়াইবার ক্ষমতা ইহার থাকিবে। সীতার সতীত্বের ন্যায় ইহা দুর্ধর্ষ

হইবে। পুরুষের দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারা অত্যন্ত দুর্বলতার পরিচায়ক। মেয়েরা যেমন পুরুষদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন, পুরুষদিগকেও পুরুষপদবাচ্য হইতে গেলে তাহাদের স্ত্রীজাতিকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে হইবে। একটা অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া যেন আমরা বাঁচিয়া না থাকি। রামের মত সীতা যদি স্বাধীন এবং স্বচ্ছন্দগতি না হইতেন, শ্রীরামের কোন প্রভাব থাকিত না। ইহা অপেক্ষাও তেজপূর্ণ স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতর দৃষ্টান্ত সম্ভবতঃ দ্রৌপদী। সীতা ছিলেন নম্রতার প্রতিমূর্তি—একটি কোমল পুষ্পের ন্যায়। দ্রৌপদী ছিলেন বিশাল বনস্পতির মত। তাঁহার অদম্য ইচ্ছাশক্তির নিকট পরাক্রান্ত ভীমকেও নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অন্য সকলের নিকট ভীম ছিলেন ভয়ংকর কিন্তু দ্রৌপদীর নিকট তিনি ছিলেন মেষের ন্যায়। পাণ্ডবগণের কাহারও নিকট হইতে আশ্রয় প্রার্থনার আবশ্যকতা তাঁহার ছিল না। ভারতের নারীজাতির স্বচ্ছন্দ বিকাশ আজ ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিয়া আমরা স্বাধীনচেতা এবং সরল প্রকৃতির পুরুষের বিকাশও ব্যাহত করিতেছি। আমাদের নারীজাতিব প্রতি এবং "অস্পৃশ্যগণের" প্রতি আমরা যে অবিচার করিতেছি তাহা শতসহস্রগুণে বর্ধিত শক্তিতে আমাদের মাথার উপর পাল্টা ফিরিয়া আসিতেছে। আমাদের দুর্বলতা. অব্যবস্থিতচিত্ততা, সংকীর্ণতা এবং উপায়হীনতার জন্য ইহা কতক পরিমাণে দায়ী। বিপুল উদ্যমে আসুন আমরা পর্দা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দিই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩-২-'২৭]

৩৮

পর্দা

আমার মত এই যে, পর্দা ভারতবর্ষে একটি নূতন আমদানী এবং হিন্দুদের অবনতির সময় ইহা গৃহীত হইয়াছিল। তেজস্বিনী দ্রৌপদী এবং নিষ্কলঙ্ক সীতার যুগে পর্দার কোন স্থান ছিল না। গার্গী পর্দার আড়াল হইতে তাঁহার বাদানুবাদ চালান নাই। পর্দাপ্রথা সমগ্র ভারতে প্রচলিত নহে। দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে এবং পাঞ্জাবে ইহা অজ্ঞাত। কৃষকদের মধ্যে ইহা অজ্ঞাত এবং এই সকল প্রদেশে এবং কৃষকদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা যে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করে তাহার ফলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে এরূপ কেহ শুনে নাই। পরন্তু ইহা বলাও যুক্তিযুক্ত হইবে না যে, পৃথিবীর যে সকল স্থানে পর্দাপ্রথা প্রচলিত নাই সেখানে পুরুষগণ বা স্ত্রীলোকগণ নৈতিক দিক দিয়া অপেক্ষাকৃত হেয়। পত্রলেখক যাহা কিছু পুরাতন তাহাই ভাল ইহা সমর্থন করিতে চান। যদিও আমার মত এই যে, প্রাচীন মনীষিগণ আমাদিগকে এরূপ নীতিশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা দিয়াছেন যাহা হইতে ভাল আর কিছু করা যায় না, তথাপি প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহারা অভ্রান্ত এই মত আমি

সমর্থন করি না। এবং প্রকৃতপক্ষে কী প্রাচীন তাহা কে বলিবে? ১০৮টি উপনিষদের সবগুলি কি সমানভাবে প্রামাণ্য? আমার মনে হয় যুক্তির কষ্টিপাথরে যাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া যায় তাহা নিশ্চয়ই আমরা পরীক্ষা করিয়া লইব এবং সেই পরীক্ষা দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠিত নয় তাহা প্রাচীনতার পরিচ্ছদে থাকিলেও বর্জনীয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-৩-'২৭]

৩৯

পর্দার অবসান

সম্প্রতি বিহারে প্রভূত ক্ষমতাশালী বহু লোকের এবং ঐ প্রদেশের প্রায় সমসংখ্যক মহিলাগণের স্বাক্ষরিত একটি যুক্তিপূর্ণ আবেদন বাহির হইয়াছে, পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া দিবার জন্য। উক্ত আবেদনে পঞ্চাশের অধিক মহিলা স্বাক্ষর করিয়াছেন; এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে উদ্যমের সহিত এই কাজ চালাইতে পারিলে বিহারে পর্দাপ্রথা অতীতের বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা উল্লেখযোগ্য, যে সকল মহিলা উক্ত আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারা বিলাতী ভাবাপন্ন শ্রেণীর নন; তাঁহারা গোঁড়া হিন্দু। উহাতে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে—

"আমরা চাই যে আমাদের প্রদেশের নারীগণ কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং মাদ্রাজ প্রদেশের তাহাদের ভগিনীগণের ন্যায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবে এবং সামাজিক জীবনে সকল বিষয়ে তাহাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবে এবং পাশ্চাত্যভাব অনুকরণের সকল চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া তাহা মূলতঃ ভারতীয় ভাবেই করিতে হইবে। যদি আমাদের দেশের নারীদিগকে ভারতীয় আদর্শমূলে নিজেদের গড়িয়া তুলিতে হয় তবে আমাদের মতে পর্দা উঠাইয়া দিতে হইবে; কারণ ইহা আমাদের ধারণা যে, বলপূর্বক প্রবর্তিত নির্জনবাস হইতে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য জগতের অবস্থায় উপনীত হওয়া জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘের মত হইবে। যদি আমাদের সামাজিক জীবনে শ্রী ও মাধুরী বাড়াইতে চাই এবং নৈতিক মান উন্নত করিতে চাই, যদি নারীদিগকে বাড়ীতে সুনিপুণা গৃহকর্ত্রীরূপে, তাহাদের স্বামিগণের সহায়কারী সঙ্গিনীরূপে এবং সমাজের উপকারী অঙ্গরূপে দেখিতে চাই, তবে বর্তমানে পর্দাপ্রথা যেভাবে প্রচলিত আছে তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। বস্তুতঃ যদি পর্দা সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দেওয়া না হয় তবে নারীগণের মঙ্গলের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া যায় না। ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি একবার আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকের কৃত্রিম উপায়ে নিরুদ্ধ শক্তি বন্ধনমুক্ত হয় তবে ইহা এমন একটি বীর্যের সৃষ্টি করিবে যাহা উপযুক্তভাবে চালিত হইলে এই প্রদেশের অসীম উপকার সাধন করিবে।"

বিহারে পর্দা যে সব কুফল প্রসব করিয়াছে তাহা আমি জানি। এই আন্দোলন উপযুক্ত সময়েই আরম্ভ হইয়াছে।

এই আন্দোলনের আরম্ভ অদ্ভুত রকমের। বাবু রামানন্দন মিশ্র নামক জনৈক খাদিকর্মী পর্দার অত্যাচার হইতে তাঁহার স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার স্ত্রীকে আশ্রমে আনিতে না দেওয়ায় তিনি আশ্রম হইতে দুইটি মেয়েকে তাঁহার স্ত্রীর সহচরীরূপে নেন। তাহাদের একজন মগনলাল গান্ধীর কন্যা রাধাবেন, তাঁহার শিক্ষকতার কাজ করিবেন, এবং তাঁহার সঙ্গে গেলেন স্বগীর্য় লালবাহাদুর গিরির কন্যা দুর্গাদেবী। বালিকাবধূর পিতামাতা তরুণী শ্রীযুক্তা মিশ্রকে পর্দামুক্ত করার জন্য আশ্রমবালিকাদের এই উদ্যমে রুষ্ট হইলেন। বালিকাগণ সকলপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে মগনলাল গান্ধী তাঁহার কন্যাকে দেখিতে গেলেন এবং সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার চেষ্টা কিছুতেই না ছাড়িবার জন্য সাহস দিয়া গেলেন। রাধাবেন যে গ্রামে তাঁহার কাজ করিতেছিলেন সেখানে মগনলাল অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পাটনাতে তিনি দেহত্যাগ করেন। সেইজন্য বিহারের বন্ধুগণ পর্দার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা একটি সম্মানজনক কাজ বলিয়া গণ্য করিলেন। রাধাবেন তাঁহার ছাত্রীকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। তাঁহার আশ্রমে আসার ফলে আরো জোরে আন্দোলন জাগিয়া উঠে এবং তাঁহার স্বামী পূর্ব হইতেই তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত আন্দোলনে যোগদান করিতে বাধ্য হন। এইভাবে এই আন্দোলন ব্যক্তিগত ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিশেষ শক্তিসহকারে পরিচালিত হইবে আশা করা যায়। এই আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছেন বিহারের পাকা সৈনিক এবং বহুযুদ্ধে জয়ী বীর বাবু ব্রিজকিশোর প্রসাদ। তিনি নেতারূপে যে সকল আন্দোলন চালাইয়াছেন তাহার কোনটি বিফল হইয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হয় না।

এই প্রথার বিরুদ্ধে গভীরভাবে আন্দোলন আরম্ভ করিবার জন্য উক্ত আবেদনে পরবর্তী ৮ই জুলাই দিন ধার্য করা হইয়াছে। এই পর্দাপ্রথার ফলে বিহারের জনসংখ্যার অর্ধেক লোককল্যাণের জন্য সমাজসেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। উহা দ্বারা এই নারীদিগের স্বাধীনতা, এমনকি বিশুদ্ধ আলোক ও বায়ুতে বিচরণ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যত শীঘ্র আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে আমাদের সমাজের অনেকগুলি কুসংস্কার স্বরাজের দিকে আমাদের গতি ব্যাহত করিতেছে, বাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে আমাদের অগ্রগতি তত বেশী ত্বরান্বিত হইবে। স্বরাজলাভ না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক সংস্কার যেমন আছে, তেমনি ফেলিয়া রাখার অর্থ স্বরাজ দ্বারা কী বুঝায় তাহা না জানা। যদি আমাদের নারীগণকে পঙ্গু করিয়া রাখার অবসর দিই তবে ইহা নিশ্চিত যে, আমরা নিজেদের রক্ষা করিতে পারিব না কিংবা অন্যান্য জাতির সহিত সদুপায়ে প্রতিযোগিতা করিতেও সমর্থ হইব না।

কাজেই বিহারের নেতাগণকে পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য মনে প্রাণে ধন্যবাদ দিতেছি। সাধারণতঃ সকল সংস্কারের, বিশেষতঃ এই শ্রেণীর সংস্কারের জয়লাভ কর্মিগণের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে। যে সকল

মহিলা আবেদনপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদের উপরও অনেকটা নির্ভর করিবে। পর্দা উঠাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা যদি ভারতের নারীসমাজের সনাতন লজ্জাশীলতা রক্ষা করেন এবং গুরুতর বাধাবিপদের সম্মুখেও সাহস এবং দৃঢ় সংকল্প দেখাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের প্রচেষ্টা শীঘ্রই জয়যুক্ত হইবে। পর্দার বিরুদ্ধে আন্দোলন যথাবিহিতরূপে পরিচালিত হওয়ার অর্থ হইবে বিহারের স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষে প্রকৃত রকমে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৬-'২৮]

৪০

নারীগণের আর্থিক স্বাধীনতা

প্রশ্ন॥ কোন কোন লোক বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগের সম্পত্তিতে মালিক হইবার অধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্তনের এই কারণে বিরোধিতা করেন যে, স্ত্রীলোকরা আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিলে তাহাদের মধ্যে নৈতিক অবনতি বৃদ্ধি পাইবে এবং গার্হস্থ্যজীবন চুরমার হইয়া যাইবে। এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আপনার মনোভাব কী?

উত্তর॥ এই প্রশ্নের উত্তর আমি একটি পাল্টা প্রশ্ন করিয়া দিব। পুরুষের স্বাধীনতা এবং তাহার সম্পত্তির অধিকার কি পুরুষের ভিতর নৈতিক অধঃপতন বাড়ায় নাই? যদি উত্তরে 'হাঁ' বল তবে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সেইরূপ হউক। এবং যখন নারীগণ পুরুষের ন্যায় মালিকী স্বত্বাধিকার প্রভৃতি লাভ করিবে তখন ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই সকল স্বত্ব ও অধিকার ভোগ তাহাদের সৎ বা অসৎ কাজের কারণ নহে। যে নীতি-ধর্ম স্ত্রী কিংবা পুরুষের উপায়হীনতার উপর নির্ভর করে তাহার সপক্ষে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। নৈতিক চরিত্রের মূল আমাদের হৃদয়ের পবিত্রতার মধ্যে নিহিত।

[হরিজন, ৮-৬-'৪০]

৪১

জনৈকা ভগিনীর সমস্যা

প্রশ্ন॥ স্ত্রীলোকের মানসম্ভ্রম কীরূপে রক্ষা করা যায়?

উত্তর॥ আমার বিশ্বাস আপনি নিয়মিতভাবে হরিজন পত্রিকা পড়েন না। বহু বৎসর পূর্বে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি এবং তৎপরও অনেকবার

করিয়াছি। বিষয়টি দুই দিক হইতে আলোচনা করা যায় : (১) কোন নারী নিজের সম্মান নিজে কীভাবে রক্ষা করিবে এবং (২) তাহার পুরুষ আত্মীয়গণই বা কীভাবে তাহা রক্ষা করিবে?

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে বলিব, যেখানে অহিংস পরিবেশ বিদ্যমান, যেখানে অহিংস-নীতি সর্বদা শিক্ষা দেওয়া হয়, সেখানে নারী নিজেকে পরাধীন, দুর্বল বা উপায়হীন মনে করিবেন না। যতক্ষণ তিনি প্রকৃত নির্মল চরিত্রবতী, ততক্ষণ বাস্তবিক পক্ষে তিনি উপায়হীন নন। তাঁহার পবিত্রতাই তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে তাঁহাকে সজাগ করিয়া দেয়। আমি সর্বদাই এই মত পোষণ করিয়াছি যে, কোন নারীকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করা বাহ্যতঃ অসম্ভব। তখনই ধর্ষণ ঘটিয়া থাকে যখন তিনি ভয়ে অভিভূত হন অথবা তাঁহার নৈতিক বল সম্বন্ধে ধারণা না থাকে। আক্রমণকারীর শারীরিক শক্তি যদি তিনি প্রতিহত করিতে না পারেন তাহা হইলে ধর্ষিত হইবার পূর্বেই তাঁহার পবিত্রতা তাঁহাকে মৃত্যুবরণ করিবার শক্তি প্রদান করিবে। সীতার কথা ধরুন। রাবণের সম্মুখে তিনি ছিলেন অতিশয় দুর্বল কিন্তু তাঁহার নির্মল চরিত্র রাবণের দানবীয় শক্তিসামর্থ্যকে পারভূত করিয়াছিল। সর্বপ্রকার প্রলোভন দ্বারা তিনি তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সম্মতি না থাকায় তাঁহাকে কুভাবে স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। পক্ষান্তরে, যদি কোন নারী তাঁহার নিজের শারীরিক বলের উপর বা তাঁহার আয়ত্ত কোন মন্ত্রের উপর নির্ভর করেন তবে তাঁহার শক্তি ফুরাইয়া গেলে তিনি নিশ্চয়ই বিফলপ্রয়াস হইবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। ভাই, পিতা বা বন্ধু তাহার রক্ষণীয় ব্যক্তি তাহার এবং আক্রমণকারীর মাঝে আসিয়া দাঁড়াইবে। তারপর হয় সে আক্রমণকারীকে তাহার অসৎ উদ্দেশ্য পূরণে নিবারিত করিবে অথবা তাহাকে বাধা দিতে গিয়া তাহার হাতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবে। এইভাবে মৃত্যু বরণ করিয়া সে শুধু নিজ কর্তব্য পালন করিল তাহা নয়, তাহার আশ্রিতা নারীর হৃদয়ে নূতন বল সঞ্চারিত করিতে পারিবে এবং তিনি নিজের সম্মান কীভাবে রক্ষা করিতে হইবে তদ্বিষয়েও উদ্বুদ্ধ হইবেন।

পুণা হইতে জনৈকা ভগিনী বলিয়াছেন, "কিন্তু সেখানেই গোল। নারী তাহার জীবন কীভাবে বিসর্জন দিবে? তাহার পক্ষে ইহা করা কি সম্ভবপর?"

গান্ধীজী উত্তরে বলিলেন, "পুরুষের পক্ষে না হইলেও নারীর পক্ষে ইহা সর্বদাই অধিক সম্ভবপর। আমি জানি যে নারী এর চাইতে অনেক ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও প্রাণ দিতে পারে। অল্প কয়েক দিন পূর্বে কুড়ি বৎসরের একটি তরুণী সামান্য লেখাপড়া শিখিতে অস্বীকৃত হওয়ায় যখন মনে করিল যে তাহার উপর জোরজুলুম করা হইতেছে তখন সে আগুনে পুড়িয়া মরিয়া গেল। এবং সে ধীরভাবে অত্যন্ত সাহসের সহিত দৃঢ়সংকল্প হইয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সাধারণ তেলের বাতি দ্বারা তাহার শাড়ীতে আগুন ধরাইয়াছিল, কোনরূপ চীৎকারও করে নাই এবং পার্শ্ববর্তী ঘরের লোকেরা সব শেষ হইয়া যাইবার পূর্বে পর্যন্ত কী ঘটিতেছিল তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই। তাহার দৃষ্টান্ত

অনুমোদন করিবার জন্য আমি এইরূপ বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি না, কিন্তু নারী কীরূপ সহজে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে তাহার দৃষ্টান্তই দিতেছি। অন্ততঃ আমি এরূপ সাহস দেখাইতে অসমর্থ। কিন্তু আমার মত এই যে, ভিতরের আলোরই দরকার, বাহিরের আলোর নয়।"

উক্ত ভগিনী ইহা ভাবিয়া আশ্চর্য মনে করেন যে ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহারে ক্রোধ এবং পীড়ন সম্পূর্ণরূপে কী করিয়া পরিত্যাগ করা যায়। গান্ধীজী প্রাণখোলা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি আমাদের পুরাতন নীতিবাক্যটি জানো কি? পাঁচ বৎসর পর্যন্ত তাহার সঙ্গে খেলা করিবে, দশ বৎসর পর্যন্ত বার বার শাসন করিবে এবং যখন সে ষোড়শ বৎসরের হইবে তখন তাহার সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবে।" তিনি আরও বলিলেন, "কিন্তু চিন্তা করিও না। সময় সময় যদি তোমার সন্তানের উপর রাগ করিতে হয় সেই রাগকে আমি অহিংস রাগ বা ফোঁস করা বলিব। আমি বুদ্ধিমতী জননীদের কথাই বলিতেছি; যাহারা অজ্ঞ এবং মাতৃনামে অভিহিত হইবার অযোগ্য তাহাদের কথা বলিতেছি না।"

[হরিজন, ১-৯-'৪০]

৪২

বিধবার আর্তি

বিধবাদের পুনর্বিবাহ কোন কোন ক্ষেত্রে দরকার। আমাদের যুবকগণ নিজেরা নির্মল চরিত্রের হইলেই এই সংস্কার সম্ভব হইতে পারে। তাহারা কি নির্মল? শিক্ষা দ্বারা তাহারা কি কোন উপকার পায়? আর তাহাদের শিক্ষারই বা দোষ দাও কেন? শিশুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের ভিতর একটি দাসত্বের মনোভাব যত্নের সহিত অনুশীলন করা হয় এবং যদি আমরা স্বাধীন-ভাবে চিন্তা করিতে না শিখি তবে স্বাধীনভাবে কাজ করিব কী করিয়া? আমরা সমভাবে জাতিভেদের, বিদেশী শিক্ষার এবং বিদেশী সরকারের দাস। আমাদের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয় তাহার প্রত্যেকটি আমাদের নিগড়স্বরূপ। আমাদের ভিতর কত শিক্ষিত যুবক রহিয়াছে, তাহাদের ভিতর কয়জন তাহাদের নিজেদের ঘরের বিধবাগণের অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করে? তাহাদের ভিতর কয়জন অর্থের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিয়াছে? তাহাদের ভিতর কয়জন নারীদিগকে আপনার ভগ্নী বা মাতার ন্যায় জ্ঞান করে এবং তাহাদের সম্মান রক্ষা করে? তাহাদের কয়জনের নিজের মতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং কয়জন বা জাতিগত অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাহস রাখে? নিরুপায় বিধবাগণ কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতে যাইবে? আমি তাহাদিগকে কী সান্ত্বনা দিতে পারি? তাহাদের কয়জন 'নবজীবন' পত্রিকা পড়ে? যাহারা পড়ে, তাহাদের

কয়জনই বা নিজেদের মত অনুযায়ী কাজ করিতে পারে? তথাপি আমি সময় সময় নবজীবন পত্রিকার স্তম্ভে বিধবাগণের আর্তির কথা লিখিয়া থাকি এবং সুযোগ হইলে আরও বেশী কিছু করিবার ইচ্ছা রাখি। ইতিমধ্যে যাঁহাদের তত্ত্বাবধানে বালবিধবা আছে তাঁহাদের প্রত্যেককে বলিব যে, তাহার বিবাহ দেওয়া তাঁহাদের কর্তব্য।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-২-'২৬]

৪৩

বাধ্যতামূলক বৈধব্য

স্যার গঙ্গারাম সমগ্র ভারতের বিধবাগণের সংখ্যার একটি মূল্যবান তালিকা প্রত্যেক প্রদেশের অতিরিক্ত তালিকাসহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক সমাজসংস্কারকের নিকট এই তালিকাগুলি থাকা উচিত।

স্যার গঙ্গারাম যে পর্যায়ক্রমে সংস্কারকাজে অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করেন অনেকে সে বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইবেন না। এইরূপ পর্যায় তিনি দিয়াছেন—

প্রথম—সামাজিক সংস্কার,
দ্বিতীয়—অর্থনৈতিক সংস্কার,
তৃতীয়—স্বরাজ বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

স্যার গঙ্গারামের পূর্ববর্তিগণ, যাঁহারা সর্বাংশে তাঁহার ন্যায় উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, এরূপ ভাবে চিন্তা করেন নাই। রাণাডে, গোখ্‌লে এবং চন্দ্রভারকর স্বরাজকে সামাজিক সংস্কারের ন্যায় গুরুত্ববিশিষ্ট মনে করিয়াছেন। লোকমান্য তিলক সামাজিক সংস্কারের বিষয়ে এতদপেক্ষা কম চিন্তা করেন নাই। কিন্তু তিনি ও তাঁহার পূর্ববর্তিগণ সকল প্রকারের সংস্কার একসঙ্গেই পরিচালিত করিবার আবশ্যকতা স্বীকার ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ লোকমান্য এবং গোখ্‌লে রাজনৈতিক সংস্কারকে অন্যান্যগুলি হইতে অধিকতর জরুরী মনে করিতেন। তাঁহাদের মত ছিল এই যে, রাজনৈতিক দাসত্ব আমাদিগকে অন্য সব কাজের ক্ষেত্রে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে।

প্রকৃত কথা এই যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ জনসাধারণের চেতনা উদ্বুদ্ধ করা। জাতীয় কর্মধারার সবগুলি দিক প্রভাবিত না করিয়া সেই স্বাধীনতা আসিতে পারে না। সংস্কারমাত্রেরই অর্থ একরূপ জাগরণ। একবার প্রকৃতপক্ষে জাগরিত হইলে জাতি জীবনের শুধু একটি বিভাগের সংস্কার দ্বারা সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। সবগুলির জন্য আন্দোলন চলিতে থাকিবে এবং প্রত্যেকটিই একসঙ্গে চলিবে।

কিন্তু স্যর গঙ্গারাম নির্দেশিত প্রয়োজনীয় সংস্কারাদির ক্রমধারা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। যদিও তাঁহার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষেধকগুলি সম্বন্ধে একমত হওয়া যায় না, তথাপি সামাজিক সংস্কার বিষয়ে তাঁহার প্রবল উৎসাহ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। তিনি যে সংখ্যাগুলি দিয়াছেন তাহা ভয়াবহ। তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, "বাল্যবিবাহ এবং বাধ্যতামূলক বৈধব্যজনিত দুঃখদুর্দশার যে চিত্র এই সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় তজ্জন্য এমন কে আছে যে অশ্রুবিসর্জন করিবে না?" ১৯২১ সালের আদামসুমারি মতে হিন্দু-বিধবাদের সংখ্যা এই—

পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত বিধবা—	১১৮৯২
পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের বিধবা—	৮৫০৩৭
দশ হইতে পনের বৎসর বয়সের বিধবা—	২৩২১৪৭
	৩২৯০৭৬

পূর্ববর্তী দুইটি লোকগণনার সংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। পূর্ববর্তী বিশ বৎসরের সংখ্যা হইতে ১৯২১ সালের মোট সংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক। অন্যান্য শ্রেণীর বিধবাগণের সংখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। সেগুলি আরও বিশেষভাবে হিন্দু বালবিধবাগণের প্রতি সামাজিক অবিচারের আতিশয্য সপ্রমাণ করে। আমরা ধর্মের দোহাই দিয়া গাভী-রক্ষার জন্য চীৎকার করি, কিন্তু বালবিধবারূপী নরগাভীদিগকে রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হই। ধর্মের নামে আমরা বলপ্রয়োগ করিতে পারি, কিন্তু ধর্মের নামে আমাদের তিন লক্ষ বালবিধবাকে আমরা জোর করিয়া বৈধব্যদশায় রাখি,—যাহারা বিবাহ-ক্রিয়ার প্রকৃত অর্থ কখনও বুঝিতে পারে নাই। ছোট ছোট বালিকাদিগকে বৈধব্য অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করা নৃশংস অপরাধ এবং তাহার জন্য আমরা হিন্দুগণ প্রত্যহ প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। যদি আমাদের বিবেকবুদ্ধি প্রকৃত জাগ্রত হইত তাহা হইলে পনের বৎসরের পূর্বে কোন বিবাহই হইতে পারিত না এবং বৈধব্যের কথাই উঠিত না এবং এই তিন লক্ষ বালিকা কখনও ধর্মতঃ বিবাহিতা হয় নাই, ইহা আমরা দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতাম। কোন শাস্ত্র দ্বারাই এই প্রকার বৈধব্য সমর্থিত হয় না। যে নারী জীবনসঙ্গীর ভালোবাসা উপলব্ধি করিয়াছে সে যদি জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছাক্রমে বৈধব্য অবস্থাই বরণ করে তাহা হইলে জীবন সুন্দর এবং মর্যাদাসম্পন্ন হয়, গৃহ পবিত্র হয় এবং ধর্ম পর্যন্ত উন্নীত হয়। ধর্ম বা প্রথা দ্বারা যে বৈধব্য কায়েম করা হয় তাহা অসহনীয় জোয়ালস্বরূপ এবং উহার ফলে গোপন পাপ দ্বারা গৃহ কলুষিত হয় এবং ধর্মের অবনতি ঘটে।

পঞ্চাশ বৎসরের ঊর্ধবয়স্ক বৃদ্ধ এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ বালিকাবধূ গ্রহণ করিতেছে অথবা ক্রয় করিতেছে—সময় সময় এক স্ত্রী থাকিতেই আর একজনকে বিবাহ করিতেছে—এই সব বিষয় যখন চিন্তা করা যায় তখন হিন্দুবিধবাগণের অবস্থা মনে করিয়া তাহার পূতিগন্ধে কি নাসিকা জ্বালা করে না? হাজার হাজার বিধবা আমাদের মধ্যে যতদিন থাকিবে, আমরা বারুদপূর্ণ গহ্বরের উপরই বসিয়া থাকিব; উহার বিস্ফোরণে প্রতিমুহূর্তেই সমাজ ধ্বসিয়া পড়িতে পারে। যদি আমরা

পবিত্র হইতে চাই, যদি হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিতে চাই, তবে বাধ্যতামূলক বৈধব্য-দশার বিষ হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে। যাঁহাদের আশ্রয়ে বালবিধবারা রহিয়াছে তাঁহারাই এই সংস্কার প্রভূত সাহসের সহিত আরম্ভ করিবেন এবং যাহাতে তাহারা বিধি-অনুযায়ী যথাযোগ্য স্থলে বিবাহিত হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন—ইহা পুনর্বিবাহ নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহারা কখনই বিবাহিত হয় নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৫-৮-'২৬]

৪৪

স্বাধিকার-বঞ্চিত মানবসম্প্রদায়

অস্পৃশ্যগণই স্বাধিকার-বঞ্চিত মানবজসমাজের একমাত্র অংশ নহে। হিন্দুসমাজে বালবিধবাগণ তদপেক্ষা কম নহে। বাঙ্গলা হইতে একজন লিখিয়াছেন—"মুসলমানদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধানিষেধ নাই; পরন্তু ক্রমান্বয়ে চারিটি পত্নী গ্রহণ করিবার বিধান রহিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে অনেক মুসলমানেরই একাধিক পত্নী রহিয়াছে। এইজন্য মুসলমান পুরুষদিগের মধ্যে কেহই অবিবাহিত থাকে না। কাজেই ইহা কি সত্য নয় যে যেখানে বিধবাগণের পুনর্বিবাহে বাধা নাই সেখানে পুরুষদের সংখ্যা হইতে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশী? অর্থাৎ ইহা কি সত্য নয় যে, যে-সকল সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে সেখানে বহুবিবাহও প্রচলিত থাকা উচিত?

"যদি বিধবাদের পুনর্বিবাহ হিন্দুদের ভিতর প্রচলন করা যায় তাহা হইলে তরুণী বিধবাগণ কি যুবকগণকে তাহাদিগকে বিবাহ করিতে প্ররোচিত করিবে না এবং তদ্দ্বারা অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য বর পাওয়া কঠিন, এমনকি অসম্ভব, করিয়া তুলিবে না?

"যদি হিন্দুদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা না করা হয় তাহা হইলে বিধবাগণ যে সকল পাপে লিপ্ত হয় বা লিপ্ত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়, সেই সকল পাপকার্য তখন অবিবাহিতা মেয়েরা করিবে না?

"বিধবাবিবাহ অনুমোদন করিবার সময় দাম্পত্যপ্রেম, গার্হস্থ্যজীবনের শুচিতা, পাতিব্রত্যধর্ম এবং এরূপ অন্যান্য বিষয় যাহা বিবেচনা করা উচিত সেই সম্বন্ধে আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে ক্ষান্ত রহিলাম।"

—বিধবাগণের বিবাহ বন্ধ করিবার আগ্রহাতিশয্যে লেখক অনেকগুলি বিষয় বাদ দিয়া গিয়াছেন। মুসলমান সমাজে যদিও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবার অধিকার থাকিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশেরই এক স্ত্রী থাকে। লেখকের বোধ হয় জানা নাই যে, হিন্দুধর্মে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে কোন বাধানিষেধ নাই। সমাজের অতি

উচ্চ স্তরের হিন্দুগণও একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিয়াছেন জানা যায়। অনেক রাজা অসংখ্য স্ত্রী বিবাহ করেন। লেখক ইহাও ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কেবল তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। অবনমিত শ্রেণীর লোকের অধিকাংশের ভিতর বিধবাগণ বিনাবাধায় পুনরায় বিবাহ করে এবং তজ্জন্য কোন অশুভ ঘটনা ঘটে নাই। যদিও তাহাদের একাধিক স্ত্রী পাণিগ্রহণেও বাধা নাই, ইহা প্রায় সর্বদাই দেখা যায় যে তাহারা সব সময় একজন সঙ্গিনী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে।

তরুণী বিধবাগণ সমস্ত যুবককে বিবাহ করিয়া ফেলিবে এবং অবিবাহিতা মেয়েদের জন্য কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না, এইরূপ মন্তব্য দ্বারা সংখ্যানুপাতিক জ্ঞানের শোচনীয় অভাব প্রকাশ পায়। তরুণবয়স্কা মেয়েদের সতীত্ব সম্বন্ধে অত্যধিক আশঙ্কা মানসিক বিকারের পরিচয় দেয়। অল্পসংখ্যক বিধবাগণের পুনর্বিবাহ হইলে বহুসংখ্যক তরুণী মেয়েদের অবিবাহিত থাকিতে হইবে ইহা কখনই হইতে পারে না। এবং যদি এইরপ কোন প্রশ্ন কখনও উঠে তবে ইহা অন্ততঃ দেখা যাইবে যে, বর্তমানে যে সকল বাল্যবিবাহ ঘটে তাহাই তাহার কারণ। ভবিষ্যতের প্রতিকারের উপায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করা।

অতিঅল্পবয়স্কা বিধবাদের সম্বন্ধে প্রেম, গার্হস্থ্যজীবনের পবিত্রতা ইত্যাদি বিষয়ে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

কিন্তু লেখক আমার বক্তব্য বিষয়টি মোটেই ধরিতে পারেন নাই। আমি সর্বব্যাপকভাবে বিধবাবিবাহ কখনও অনুমোদন করি নাই। স্যর গঙ্গারামের সংকলিত পরিসংখ্যান বিবরণ এবং এই পত্রিকায় যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল পনের বৎসরের অনূর্ধ্ব বিধবাদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই উপায়হীন হতভাগ্য বিধবাগণ পাতিব্রত্যধর্মের কিছু জানিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত। প্রেম সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ইহা বলাই বরং সত্য হইবে যে, এই সকল মেয়েরা কখনও আদৌ বিবাহিত হয় নাই। যদি বিবাহ ধর্মমূলক সংস্কার হয় (তাহাই হওয়া বিধেয়) এবং তাহা নূতন জীবনের প্রবেশদ্বার হয়, তাহা হইলে মেয়েদের বিবাহের পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতালাভ করিতে হইবে, জীবনসঙ্গী নির্বাচন বিষয়ে তাহাদের কতকটা স্বাধীনতা থাকাও দরকার এবং কৃত কার্যের পরিণাম সম্বন্ধে তাহাদের অবহিত হওয়াও আবশ্যক। শিশুদের মিলনকে বিবাহিত অবস্থা বলা এবং তৎপর তথাকথিত স্বামীর মৃত্যু হইলে বালিকাটিকে চিরতরে বৈধব্য অবস্থায় থাকিতে বাধ্য করা ভগবানের নিকট, মানবতার নিকট অপরাধ।

আমি ঠিক বিশ্বাস করি যে, একটি প্রকৃত হিন্দু বিধবা রত্নস্বরূপা। মানবজাতিকে হিন্দুধর্ম যাহা দান করিয়াছে তিনি তাহার মধ্যে একটি। রমাবাই রাণাডে এইরূপ একটি রত্ন ছিলেন। কিন্তু বালবিধবাগণের অস্তিত্ব হিন্দুধর্মের কলঙ্কস্বরূপ। রমাবাই তুল্য একজনের অস্তিত্ব দ্বারা সেই কলঙ্কমোচন হয় না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৯-৪-'২৬]

৪৫

বিধবার পুনর্বিবাহ

যুক্তি দিয়া একজন লেখক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন স্যর গঙ্গারামের দেওয়া হিন্দু বিধবাগণের বিবরণ সকল হিন্দু বিধবাদিগের সম্বন্ধে, না শুধু প্রথানুযায়ী যাহাদের বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ তাহাদের সম্বন্ধে? স্যর গঙ্গারামের নিকট উক্ত প্রশ্ন পাঠাইয়া আমি জানিতে পারি "তাঁহার সংখ্যাসম্বন্ধীয় বিবরণী যে সকল শ্রেণীতে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ তাহাতেই সীমাবদ্ধ নয়, সর্বশ্রেণীর হিন্দু বিধবাই উহার অন্তর্ভুক্ত।" স্যর গঙ্গারাম আরও বলেন, "পরন্তু শুধু এই সকল শ্রেণীর সংখ্যা দিয়া কোন লাভ নাই। আমরা সকলেই জানি যে, মুসলমানেরা এবং খৃষ্টানরা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। তথাপি তাহাদের মধ্যে এমন বিধবা সব রহিয়াছে যাহারা আগেই হউক বা পরেই হউক, পুনরায় বিবাহ করিবে। হিন্দু বিধবাগণের উপর বিবাহের যে নিষেধ আছে আমি তাহাই দূর করিতে চাই। আমি প্রত্যেক বিধবাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে চাই না।"

ইহা ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দুসমাজের অনুশাসন সেই সকল শ্রেণীর মধ্যেই নিবদ্ধ যাহারা বিধবাবিবাহমূলক নিষেধের আওতায় পড়ে। এই আওতার বাহিরে হিন্দু বিধবাগণ মুসলমান ও খৃষ্টান বিধবাদের ন্যায় প্রায় একই রকম স্বাধীনতার সহিত বিবাহ করে, যদিও শেষোক্তগণের পক্ষে ন্যায়ের খাতিরে বলিতে হয় যে মুসলমান ও খৃষ্টান বিধবাগণের সকলেই "আগে কিংবা পরে" বিবাহ করে না। অনেকে আছেন যাঁহারা নিজ ইচ্ছানুসারেই বিবাহ করেন না। ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, উক্ত নিষিদ্ধ আওতার বাহিরে যে সকল সমাজ আছে তাহারা তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকদিগকে অনুকরণ করিবার দাসোচিত একটি প্রবৃত্তির বশে তরুণী বিধবাদিগকে অবিবাহিত রাখিবার মনোবৃত্তি পোষণ করে। কিন্তু আরও বিস্তৃত পরিসংখ্যান না পাওয়া পর্যন্ত বিধবাগণকে পুনরায় বিবাহ করিতে নিষেধজ্ঞাপক প্রথা দ্বারা যে কী পরিমাণ অনিষ্ট করা হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভবপর নহে। আশা করা যায়, স্যর গঙ্গারাম এবং অন্যান্য যে সকল সঙ্ঘ এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তাঁহারা আবশ্যকীয় বিবরণী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিবেন। তখন নিষিদ্ধ শ্রেণীর ভিতর, ধরুন বিশ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা হিন্দু বিধবাদের সংখ্যা কত তাহা জানাও সম্ভবপর হইবে।

আমার পত্রলেখক সম্ভবতঃ এই নিষেধ সমর্থন করিবার ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সহিত যাঁহারা একমত তাঁহারা যেন তরুণী বিধবাগণের বিবাহনিষেধরূপ অমঙ্গলকে উপেক্ষা না করেন। একটিও বালবিধবা যতদিন পর্যন্ত থাকিবে ততদিন হিন্দুসমাজ সেই অন্যায় প্রতিকারের দাবী পোষণ করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৯-'২৬]

৪৬

বিধবাগণ

আমি সর্বদাই বলিয়া আসিতেছি, যে সকল পিতামাতা অল্পবয়সে তাঁহাদের কন্যাগণের বিবাহ দানের পাপ করেন, যদি এই কন্যাগণ বিংশতিবর্ষের ন্যূন বয়সে বৈধব্যপ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহ দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যদি প্রাপ্তবয়সে এই সকল বালিকা বৈধব্যপ্রাপ্ত হয় তবে তাহারা চিরবৈধব্য অবলম্বন করিবে কিংবা পুনরায় বিবাহ করিবে তাহা তাহাদের নিজেদের বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে। আমাকে যদি কোন নিয়ম নির্ধারণ করিতে বলা হয় তবে আমি এই বলিব যে, পুরুষ এবং নারী একই নিয়মানুযায়ী চলিবে। যদি পঞ্চাশৎবর্ষবয়স্ক বিপত্নীক নির্বিবাদে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে তবে সমবয়স্কা বিধবাও পুনারায় পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে। উভয়েই পুনরায় বিবাহ করিয়া পাপ-অর্জন করিবে ইহা আমার ব্যক্তিগত মত—কিন্তু সে অন্য কথা। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ কিংবা নারী স্বেচ্ছায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যদি বিপত্নীক বা বিধবা হয় এবং পুনরায় বিবাহ করে তবে আইনমতে তাহা পাপজনক বিবেচিত হওয়া উচিত। হিন্দু আইনের এইরূপ কোন সংস্কার আমি সর্বদাই সমর্থন করিব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৪-১০-’২৬]

৪৭

বিপত্নীক ও বিধবাগণ

জনৈক লেখক জানাইতেছেন—“গত ১৪ই অক্টোবর ইয়ং ইণ্ডিয়াতে প্রকাশিত প্রশ্নাবলী এবং আপনার উত্তর এবং পত্রাবলী আমি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, ‘পরিণত বয়সে স্বেচ্ছায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যাঁহারা বিপত্নীক বা বিধবা হইয়াছেন তাঁহারা পুনরায় বিবাহ করিলে ঐ কাজ পাপজনক হইবে এই মর্মে যদি হিন্দু আইনের সংস্কার হয়, তাহা আমি সর্বদাই সমর্থন করিব।’

“আমার মতে হিন্দু আইনে এই প্রকারের সংস্কার অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে এবং সমগ্র সমাজের নৈতিক মান যথেষ্ট প্রভাবিত করিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরুন, কোন পুরুষ বা নারী পরিণত বয়সে বিবাহ করিবার কতিপয় দিবসের মধ্যেই দুর্ভাগ্যক্রমে যদি পত্নী বা পতিহারা হন তাহা হইলে আপনি কি বলিতে চান যে বিবাহিত জীবন উপভোগ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সেই পুরুষ বা নারীকে পুনরায় বিবাহ করিতে দেওয়া হইবে না? যেহেতু তাহারা পরিণত বয়সে বিবাহ করিয়াছে ইহাই কি এই নিষেধের একমাত্র কারণ? হিন্দু আইনের যদি এই প্রকারের

সংস্কার হয়, আমার ধারণা সেই পুরুষ বা নারী তাহার অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করিবার জন্য কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করিবে এবং সমাজের সম্পূর্ণ নৈতিক অবনতি ঘটিবে। সেইজন্য আমার মতে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট পুরুষ বা নারীর নিজ বিবেচনার উপর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।"

—প্রশ্নকর্তাকে যে উত্তর আমি দিয়াছিলাম তাহা আইনপ্রণয়নকারী পুরুষের বিরুদ্ধেই ঘোষণা। পুরুষ তাহার স্বাধীনতা খর্ব হইতে দিবে না। সেইহেতু আমার উত্তরে ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পুরুষের পক্ষে যাহা সঙ্গত মনে করা হয়, নারীর পক্ষেও তাহা সঙ্গত হইবে এবং পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে বিপত্নীকের ন্যায় নিজ বিবেচনামতে কাজ করিবার স্বাধীনতা বিধবারও থাকিবে। পরন্তু ইংরেজের নিয়মতন্ত্রের অধীনে প্রচলিত আইনের ন্যায় হিন্দু আইন অপরিবর্তনশীল নয়। ইহা লক্ষ্যের বিষয় যে আমি ইচ্ছা করিয়াই "অপরাধ" শব্দ ব্যবহার না করিয়া "পাপজনক" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। মানব পরিচালিত রাজ্যে অপরাধের শাস্তি বিহিত রহিয়াছে। পাপের শাস্তি দিতে পারেন একমাত্র ভগবান বা বিবেক-বুদ্ধি। ইহা আমার বিশ্বাস, যদি হিন্দু সমাজ আমার উত্তরের লক্ষ্যের স্তরে উন্নীত হইতে পারে তবে তাহা শুধু উক্ত সমাজের নয়, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে প্রভূত মঙ্গলজনক হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-১১-'২৬]

৪৮

আদর্শের ব্যভিচার

বালবিধবাগণের পুনর্বিবাহসম্বন্ধীয় একখানা চিঠি হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"ইয়ং ইণ্ডিয়ার ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় 'বি. আগ্রা'র প্রশ্নের উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে বালবিধবাগণের পিতামাতা তাহাদিগকে পুনরায় বিবাহ দিবে। যে সকল পিতামাতা শাস্ত্রীয় বিধানমতে তাঁহাদের কন্যাদিগকে দান করেন তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ করা কীরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ধর্মের অনুশাসনমতে বিধিবিধানানুযায়ী তাঁহারা তাঁহাদের জামাতাগণের হস্তে কন্যাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছেন; জামাতার মৃত্যুর পর অপর কাহারও সঙ্গে তাহাদিগকে বিবাহ দেওয়া পিতামাতার পক্ষে অসম্ভব। যদি সে নিজে ইচ্ছা করে তবে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু পিতামাতা দানস্বরূপ তাহাকে তাহার স্বামীর নিকট অর্পণ করে; স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাকে পুনরায় বিবাহ দিবার অধিকার পৃথিবীতে কাহারও নাই; এবং সেই একই কারণে পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার বিধবার নিজেরও নাই। কাজেই যদি তাহার স্বামীর মৃত্যু সময়ে দেওয়া বিশেষ অনুমতি ব্যতীত সে পুনরায় বিবাহ করে তবে তাহাকে ব্যভিচারিণী এবং মৃত স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী বলিতে হইবে। ন্যায় ও যুক্তির দিক হইতে

দেখিতে গেলে, বিধবা শিশুই হউক তরুণীই হউক বা বৃদ্ধাই হউক—তাহার পক্ষে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত পুনরায় বিবাহ করা অসম্ভব। সনাতনীদের মধ্যে প্রচলিত কন্যাদানপ্রথা অনুযায়ী তাহার বিবাহ হইয়াছে। যথার্থ স্বামী এরূপ অনুমতি দিবার কথা ভাবিতেই পারেন না। তিনি বরং তাঁহার পত্নী সমর্থ হইলে চিতারোহণ করিয়া "সতী" হইবেন ইহাতে আনন্দের সহিত মত দিবেন কিংবা অন্ততঃ তাঁহার স্মৃতিপূজা করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিবেন, ইহাই তিনি চাহিবেন; ভগবানের সেবা ও স্মৃতিপূজা একই জিনিস। হিন্দুবিবাহ এবং বৈধব্য পরস্পর ভিন্ন নয়—একে অন্যের পরিপূরক। কেবল হিন্দুধর্মের উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিতে সহায়তা করিবার কর্তব্যজ্ঞান বা ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া স্বামী উপরোক্ত ব্যবস্থায় সম্মতি দিবেন।"

—এই প্রকার যুক্তিকে আমি উচ্চ আদর্শের ব্যভিচার বলিয়া মনে করি। লেখকের উদ্দেশ্য ভাল সন্দেহ নাই; কিন্তু নারীগণের পবিত্রতা সম্বন্ধে অত্যধিক চিন্তা তাঁহার সাধারণ ন্যায়বুদ্ধি ঘোলাটে করিয়া ফেলিয়াছে। ছোট ছোট শিশুদের সম্বন্ধে "কন্যাদানে"র অর্থ কী? সন্তান কি পিতার কোন অস্থাবর সম্পত্তি যে দানের অধিকার পিতার থাকিবে? তিনি সন্তানের রক্ষক;—মালিক নহেন। যখন তিনি তাঁহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত ব্যক্তির স্বাধীনতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন, তখন ন্যস্ত ধনের অপব্যবহারের জন্য তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার হারাইতে হয়। অন্য দিকে, যে শিশু দান গ্রহণ করিতে অক্ষম তাহাকে কিছু দান করা যায় কীরূপে? গ্রহণ করিবার ক্ষমতা যেখানে নাই সেখানে কোন দান করা যায় না। "কন্যাদান" নিশ্চয়ই আধ্যাত্মিক অর্থযুক্ত ধর্মানুমোদিত রহস্যাবৃত একটি অনুষ্ঠান। এই সকল শব্দ আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা ধর্ম ও ভাষার অপব্যবহার। তাহা হইলে পুরাণের রহস্যাবৃত ভাষাকেও মূলশব্দানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বিশ্বাস করিতে হয় যে, সহস্রশীর্ষ বাসুকীর ফণার উপর পৃথিবী একটি সমতল থালার ন্যায় ধৃত রহিয়াছে এবং ভগবান ক্ষীরসমুদ্রকে শয্যারূপে আশ্রয় করিয়া অশেষ আরামে শয়ান রহিয়াছেন।

যে পিতা শিশুকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধের সহিত অথবা বিংশতিবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের সহিত বিবাহ দিয়া তাহার ন্যায়ের অপব্যবহার করিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে ন্যূনকল্পে তাঁহার কন্যাকে বিধবা হওয়ার পর পুনরায় বিবাহ দিতে হইবে। পূর্বেও আমি একবার লিখিয়াছি যে, ঐ বিবাহ (প্রথমোক্ত) প্রথম হইতেই সম্পূর্ণ বাতিল গণ্য হওয়া উচিত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-১১-'২৬]

৪৯

বিধবার পুনর্বিবাহ

[৩০-৭-১৯২৭ তারিখে মহীশূরে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে]

আমি শত শত বালিকা দেখিয়াছি, কিন্তু আমার ভ্রমণকালে কদাচিৎ দুই তিনটি তের বৎসরের ঊর্ধ্ববয়স্কা অনূঢ়া বালিকা আমার চোখে পড়িয়াছে। কোলে বসাইবার যোগ্য বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা ধর্মসঙ্গত ত নয়ই, পরন্তু অধর্মের পরাকাষ্ঠা। ভারতের সব যুবকই ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বালিকাকে বিবাহ না করিতে কৃতসংকল্প হইবে, ইহা আমি আশা করি। হিন্দুধর্মের বিধবা পবিত্রস্থান অধিকার করেন; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু বিধবা বর্তমান সময়ের হিন্দু বিধবার ন্যায় দুর্দশা-পূর্ণ অবস্থায় কখনও ছিলেন না। পনের-বৎসর-বয়স্কা বালিকা বিধবা—ইহা আমি কল্পনাই করিতে পারি না। যে বালিকার পিতামাতা তাহার সম্মতি না লইয়া, কিংবা আর্থিক বা অন্য কোনরূপ সুবিধার জন্য তাহাকে পাত্রস্থ করে, তাহার প্রকৃত বিবাহ হইয়াছে ইহা আমি মনে করি না। এইরূপ কোন বালিকা বিধবা হইলে আমার মতে তাহার পিতামাতার কর্তব্য তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া। অন্য বিধবাদের সম্বন্ধে এই বলা যায়— যদি তাঁহারা মনে করেন যে বিধবার পবিত্র জীবন তাঁহারা যাপন করিতে পারিবেন না তবে সমাবস্থাপ্রাপ্ত বিপত্নীকদিগের ন্যায় তাঁহাদেরও পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার রহিয়াছে। তোমাদের সমাজ এই তিনটি বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দিক এবং তাহার সমাধান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুক।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৮-'২৭]

৫০

ছাত্রদের কর্তব্য

[মাদ্রাজে পচাইয়াপ্পা কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে]

আপনারা বাল্যবিবাহ এবং বালবিধবাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। একজন বিদ্বান্ তামিলদেশবাসী ছাত্রদিগকে বালবিধবাগণের বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে এই প্রদেশে বালবিধবাগণের দুর্দশা ও কষ্ট অনেক বেশী। এই উক্তির সত্যতা আমি পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। আমার চাইতে আপনারা ইহা ভালরূপে জানেন। কিন্তু আমার চতুষ্পার্শ্বে যে সকল যুবককে দেখিতে পাইতেছি তাহাদের মধ্যে নারীগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের ভাব দেখিতে চাই। যদি তোমাদের তাহা থাকিয়া থাকে তবে একটি গুরুতর বিষয় তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিব। আমার ধারণা তোমাদের অধিকাংশই অবিবাহিত

এবং তোমাদের মধ্যে "ব্রহ্মচারী"র সংখ্যা নেহাত কম নয়। আমার "নেহাত কম নয়" বলার তাৎপর্য এই যে, আমি ছাত্রদিগকে বিশেষভাবে জানি; যে ছাত্র তাহার ভগিনীর প্রতি লালসার দৃষ্টিতে চাহিতে পারে তাহাকে আমি "ব্রহ্মচারী" বলিব না। আমি তোমাদিগকে এই পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিতে বলি—"বিধবা বালিকা ভিন্ন কাহাকেও বিবাহ করিব না, বিধবা বালিকা খুঁজিয়া লইব এবং না পাইলে আদৌ বিবাহ করিব না।" এই বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও এবং সকলকে এই বিষয় জানাইয়া দাও; পিতামাতা বর্তমান থাকিলে তাঁহাদিগকে কিংবা নিজেদের ভগিনী-গণকে ইহা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দাও। সত্যের দিক হইতে আমি তাহাদিগকে বিধবাবালিকা বলিয়া অভিহিত করিয়াছি; কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, দশ পনের বৎসর বয়সের শিশু, যে তথাকথিত বিবাহে কখনও সম্মতি দেয় নাই কিংবা বিবাহের পর যে তথাকথিত স্বামীর সঙ্গে বাস করে নাই, এবং যাহাকে হঠাৎ বিধবা বলিয়া ঘোষণা করা হয়, সে কখনও বিধবাপদবাচ্য হইতে পারে না। ইহা বিধবা শব্দের অপব্যবহার, ভাষার কদর্থ করা এবং ধর্মের নামে কলঙ্ক। হিন্দুধর্মে "বিধবা" শব্দের সঙ্গে পবিত্র ভাব জড়িত রহিয়াছে। স্বর্গীয়া শ্রীযুক্তা রমাবাই রাণাডের তুল্য প্রকৃত বিধবাকে আমি পূজা করিয়া থাকি। বৈধব্যজীবন কীভাবে পালন করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু স্বামী কীরূপ, নয় বৎসরের বালিকা তাহার কিছুই জানে না। এই প্রদেশে যদি এই শ্রেণীর বালবিধবা না থাকিয়া থাকে তবে আমার বক্তব্যের কোন ভিত্তি নাই। কিন্তু যদি এই শ্রেণীর বালবিধবা থাকিয়া থাকে এবং যদি আমাদিগকে এই অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে চাও তবে বালবিধবাকে বিবাহ করিবার সংকল্প গ্রহণ করা তোমাদের পবিত্র কর্তব্য। কোন জাতি যখন এই শ্রেণীর পাপের প্রশয় দেয়, সেগুলি জাতির উপর দৈহিক প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। ইহা আমার কুসংস্কার হইতে পারে, কিন্তু ইহা আমি বিশ্বাস করি। আমার ধারণা, আমাদের এই সকল পাপরাশি একত্রীভূত হইয়া আমাদিগকে দাসত্বের অবস্থায় লইয়া গিয়াছে। যতদূর উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা কল্পনা করা যায় তাহা হাউস অব কমন্স উপর হইতে তোমাদিগকে দিতে পারে; কিন্তু সেই রাজ্যভার বহন করিবার যোগ্য পুরুষ বা নারী যদি না থাকে তবে উহার কোন মূল্যই থাকে না। প্রকৃতিগত মূল অভাব দূর করিবার জন্য লালায়িত অথচ জোর করিয়া তাহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে, এইরূপ একটিমাত্র বিধবাও সমাজে যতদিন থাকিবে ততদিন কি মনে কর আমরা নিজেকে শাসন করিতে কিংবা ত্রিশ কোটী ভারতবাসীর শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে যোগ্যতা লাভ করিয়াছি এই কথা বলিতে পারি? উহা ধর্ম নয়—নিছক অধর্ম। হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট ভাবরাশি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিপ্লুত হইয়া আমি এই কথা বলিতেছি। পাশ্চাত্ত্য-ভাবে প্রণোদিত হইয়া আমি এইরূপ বলিতেছি বুঝিলে ভুল হইবে। ভারতের অনাবিল বিশিষ্ট ভাবরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবার দাবী আমি রাখি। পাশ্চাত্ত্যের অনেক বিষয় আমি নিজস্ব করিয়া লইয়াছি—কিন্তু ইহা পারি নাই। হিন্দুধর্মে এই প্রকার বৈধব্যের কোন অনুশাসন নাই।

আমি বালবিধবাদের সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি বালবধূগণের প্রতিও তাহা

যুক্তিযুক্তভাবে প্রযোজ্য। তোমাদের কামনা অন্ততঃ এই পরিমাণে দমন করিতে হইবে যে, ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্কা কোন বালিকার পাণিগ্রহণ করিবে না। আমার ক্ষমতা থাকিলে বিবাহের জন্য বিংশতি বৎসরই বালিকাদের ন্যূনতম বয়ঃক্রম নির্ধারিত করিতাম। এমনকি. ভারতবর্ষেও কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রম কম বলিয়াই গণ্য হওয়া উচিত। বালিকাদের অকালপরিপক্কতার জন্য আমরাই দায়ী,—ভারতবর্ষের জলবায়ু দায়ী নহে। কারণ বিংশতিবর্ষবয়স্কা বহু নির্মল ও পূতশীলা বালিকাকে আমি জানি যাহারা চতুর্দিকে প্রবহমান ঝঞ্ঝাবাত হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে সক্ষম।

কোন কোন ব্রাহ্মণ ছাত্র আমাকে বলিয়াছে যে তাহারা এই নিয়ম মানিয়া চলিতে অক্ষম; কারণ তাহারা ষোড়শবর্ষবয়স্কা ব্রাহ্মণ বালিকা পাইবে না; অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণই ঐ বয়স পর্যন্ত কন্যাগণকে অনূঢ়া রাখেন এবং সাধারণতঃ দশ, বার এবং তের বৎসরেই ব্রাহ্মণ কুমারীগণের বিবাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি আমার উত্তর এই—"যদি নিজেকে সংযত করিতে না পার তবে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিও না; শৈশবে বিধবা হইয়াছে এইরূপ ষোল বৎসরের কোন বয়স্থা বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর; যদি এই বয়সের কোন ব্রাহ্মণ বিধবা না পাও তবে তোমার পছন্দমত যে কোন বালিকার পাণিগ্রহণ কর। আমি জোরের সহিত বলিতে পারি. যে যুবক দ্বাদশ বৎসরের বালিকাকে ধর্ষিত না করিয়া বরং নিজ জাতির বাহিরে বিবাহ করা উপযুক্ত মনে করে, হিন্দুর দেবতা তাহাকে মার্জনা করিবেন। যখন তোমার হৃদয় পবিত্র নয় এবং তোমার রিপুসকল তুমি দমন করিতে পার না তখন আর তোমাকে শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত করা যায় না। তোমাদের শিক্ষায়তনকে প্রাচীনতম বলিয়া আখ্যা দিয়াছ। আমি এই ইচ্ছা করি যে তোমাদের জীবনের ধারা সেই বিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে: এবং সেখান হইতে যে সকল ছাত্র বাহির হইবে তাহারা চরিত্রবলে পুরোভাগে স্থানলাভ করিবে। চরিত্রবল ছাড়া শিক্ষার মূল্য কী? এবং সাধারণ ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতা না থাকিলে চরিত্রেরই বা মূল্য কী? আমি ব্রাহ্মণ্যধর্মকে শ্রদ্ধা করি। আমি বর্ণাশ্রমধর্ম সমর্থন করি। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অস্পৃশ্যতা, বালবৈধব্য এবং কুমারী-ধর্ষণ অনুমোদন করে, তাহার পূতিগন্ধে আমার নাসিকা কুঞ্চিত হয়—আমি প্রাণে জ্বালা অনুভব করি। ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম নয়—তাহার উপহাসমাত্র। যেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের লেশমাত্র নাই. সেখানে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থবোধও নাই। ইহা নিছক পশুর ধর্ম। ব্রাহ্মণ্যধর্ম উচ্চতর উপাদানে গঠিত। আমার এই কয়েকটি উক্তি তোমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গভীরভাবে প্রবেশ করুক, ইহাই আমি চাই। আমি বক্তৃতা দিবার সময় বালকদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছি; আমার হৃদয় উন্মুক্ত করিবার সময় একটি হাসিও যদি আমার কানে আসে আমি ব্যথা পাই। আমি তোমাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে আসিয়াছি—বুদ্ধিবিকাশের জন্য কিছু বলিতে আসি নাই। তোমরাই দেশের আশার স্থল এবং আমি যাহা বলিয়াছি তাহা তোমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা জরুরী বিষয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৯'২৭]

৫১

রুদ্ধ প্রতিবাদ

বাঙ্গলার কোন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক লিখিয়াছেন—"মাদ্রাজের ছাত্রদিগকে শুধু বিধবা বালিকাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে আমরা ভয়ে স্তম্ভিত হইয়াছি। আমার বিনীত প্রবল প্রতিবাদ পাঠাইতেছি। আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে বলিয়া ভারতের নারী পৃথিবীতে অতি উচ্চ অথবা সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই প্রকারের উপদেশ বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য পালনের মানসিক গতি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিবে। এবং সাংসারিক সুখের পঙ্কিল পথে তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া এক জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা মুক্তি-লাভের আশাও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিবে। বিধবাদের প্রতি এই প্রকারের প্রবল সহানুভূতি তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিবে এবং কুমারীদের প্রতিও অবিচার করা হইবে; কারণ বর্তমানে কুমারীদের বিবাহ-সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মত, হিন্দুদের দেহান্তরপ্রাপ্তি, পুনর্জন্ম, এমনকি মুক্তিসম্বন্ধীয় মতবাদ উল্টাইয়া দিবে এবং আমরা যে সকল সমাজকে পছন্দ করি না হিন্দু সমাজকে সেই সকল সমাজের সমপর্যায়ে টানিয়া আনিবে। আমাদের সমাজে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু হিন্দু আদর্শের দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং অন্যান্য সমাজ এবং আদর্শের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইয়া যতদূর সম্ভব উন্নতির দিকে যাইতে পারি তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, বেহুলা, সাবিত্রী, সীতা এবং দময়ন্তীর আদর্শ হিন্দুসমাজকে পরিচালিত করিবে এবং সেই আদর্শ অনুযায়ী সমাজকে আমাদের চালাইতেই হইবে। সেইজন্য আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এই সকল জটিল সমস্যাপূর্ণ বিষয়ে আপনি মত প্রকাশ করিতে বিরত থাকিবেন এবং সমাজ যাহা করা ভাল মনে করে তাহা সমাজকে করিতে দিবেন।"

—এই রুদ্ধ প্রতিবাদে আমার মতের পরিবর্তন ঘটে নাই বা আমার কোন অনুশোচনাও হয় নাই। ব্রহ্মচর্য কী তাহা জানেন এবং তাহা পালন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্না একজন বিধবাও আমার উপদেশে তাহার সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইবেন না। পক্ষান্তরে, যে সকল অল্পবয়স্কা বালিকা তাহাদের তথাকথিত বিবাহ-উৎসবের সময় বিবাহ কী তাহা পর্যন্ত জানিত না, আমার উপদেশমত চলিলে নিশ্চয়ই তাহাদের দুঃখভার অনেকটা লাঘব হইবে। পবিত্র ভাবরাশির সহিত জড়িত "বিধবা" শব্দটি এই সকল বালবিধবা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা শব্দার্থের অত্যন্ত গুরুতর অপব্যবহার। লেখক যে উদ্দেশ্য লইয়া পত্র দিয়াছেন ঠিক সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি দেশের যুবকগণকে এই শ্রেণীর তথাকথিত বিধবাগণকে বিবাহ করিতে কিংবা আদৌ বিবাহ না করিতে উপদেশ দিতেছি। বিবাহ-অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় উহাকে বালবৈধব্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত করা।

ব্রহ্মচর্য পালন করিলে বিধবাগণ মোক্ষলাভ করে, বাস্তবক্ষেত্রে এই উক্তির কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। পরম আনন্দ লাভ করিতে হইলে শুধু ব্রহ্মচর্য পালন ছাড়া আরও অনেক জিনিসের দরকার। যে ব্রহ্মচর্য জোর করিয়া উপরে চাপাইয়া দেওয়া হয় তাহার কোনও মূল্য নাই; তাহা প্রায়শঃ গোপন পাপেরই সৃষ্টি করে এবং যে সমাজে এই পাপ প্রবেশ করে তাহার নৈতিক দিক সম্পূর্ণরূপে ধসিয়া পড়ে, লেখক যেন মনে রাখেন আমি নিজ পর্যবেক্ষণ হইতে এই বিষয় লিখিতেছি।

যদি আমার উপদেশের ফলে কুমারী বিধবাগণের প্রতি সাধারণ সুবিচার করা হয় এবং তজ্জন্য অপরাপর কুমারীগণ পরিণত বয়সে উপনীত হইবার এবং জ্ঞানের পরিপক্বতা লাভ করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হয় তবে আমি বাস্তবিক সুখী হইব, এবং তাহা হইলে শেষোক্ত কুমারীগণকে অকালে পুরুষের লালসার নিকট বিক্রীত হইতে হইবে না।

জন্মান্তর-পরিগ্রহ, পুনর্জন্ম বা মুক্তি এই সকল মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য-বিহীন বিবাহ সম্বন্ধে কোন মত আমি পোষণ করি না। পাঠক জানিয়া রাখিবেন, যে সকল লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে আমরা ঔদ্ধত্যের সহিত সমাজে নিম্নশ্রেণীভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করি তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহে কোন বাধা নাই। যদি বৃদ্ধ বিপত্নীক-গণের পুনরায় বিবাহ এই মতের বিরুদ্ধে না যায় তবে অন্যায়ভাবে বিধবারূপে আখ্যাত বালিকাবিধবাগণের প্রকৃত বিবাহ কীরূপে উক্ত মতবাদের বিরুদ্ধে যায় তাহা আমি বুঝিতে পারি না। লেখকের অবগতির জন্য আমি বলিতে পারি জন্মান্তর-পরিগ্রহবাদ এবং পুনর্জন্মবাদ আমার নিকট দৈনিক সূর্যোদয়ের ন্যায় প্রকৃত সত্য বলিয়া প্রতিভাত, শুধু মতবাদরূপে নহে। মুক্তিও সত্য, এবং তাহা লাভ করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি এবং এই সকল কুমারী বিধবাদের প্রতি যে অবিচার হইতেছে তাহা আমি মুক্তি সম্বন্ধে গভীর চিন্তা হইতেই সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছি। আমাদের বর্তমান ক্লীবত্বের যুগে লেখকের উল্লিখিত সীতা এবং অন্যান্য অমর নামাবলীর সহিত এই সকল আধুনিক ব্যথিত কুমারী বিধবাগণের নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সর্বশেষে, হিন্দুধর্মে প্রকৃত বৈধব্যের উচ্চপ্রশংসা রহিয়াছে এবং তাহা সম্পূর্ণ ন্যায্য। তৎসত্ত্বেও আমি যতদূর জানি, বৈদিক যুগে বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল এইরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। প্রকৃত বৈধব্যের বিরুদ্ধে আমি এই যুদ্ধ ঘোষণা করি নাই। ইহার নৃশংস বিকৃত চিত্রের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ। আমি যে সকল বালিকার কথা বলিতেছি তাহাদিগকে বিধবা বলিয়া গণ্য না করাই ভাল। নারীদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানজ্ঞান কণিকাংশেও আছে এইরূপ প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য এই সকল বিধবাকে তাহাদের অসহনীয় দুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত করা। আমি বিনীতভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সহিত প্রত্যেক হিন্দু যুবককে পুনরায় উপদেশ দিতেছি যে, এই সকল কুমারীকে অন্যায়ভাবে বিধবা বলা হয় এবং তাহারা যেন এই সকল কুমারী ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ না করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৬-১০-'২৭]

৫২

বিংশ শতাব্দীর 'সতী'

[বোম্বাইয়ের একটি গুজরাটী কাগজে সস্ত্রীক একজন "সতী" হইয়াছে, এরূপ ঘটনা প্রকাশিত হয়। জনৈক মহিলা ঘাটকোপর হইতে গান্ধীজীকে এই বিষয়ে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী এই বিষয়ে গুজরাটী ভাষায় যে প্রবন্ধ লেখেন তাহার তরজমা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।]

আমি আশা করি সংবাদপত্রে ঘটনাটি যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে। উল্লিখিত মহিলা অসুখে বা কোন আকস্মিক কারণে মারা গিয়া থাকিবেন—আত্মহত্যা করিয়া নয়। প্রাচীনেরা "সতী"র যে বিবরণ্ দিয়াছেন তাহা অদ্যাপি প্রচলিত। স্বামীর প্রতি যাঁহার অচলা ভক্তি এবং ভালোবাসা, স্বামীর জীবদ্দশায় এবং তাঁহার অভাবেও নিঃস্বার্থ সেবাদ্বারা যিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ, চিন্তায়, বাক্যে এবং কর্মে যিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র—তিনিই "সতী" পদবাচ্য। স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণ উন্নত শিক্ষার পরিচায়ক নহে, বরং আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই ইহা সূচিত করে। আত্মা অমর, অবিকারী এবং সর্বগত। নশ্বর দেহের সহিত আত্মার বিনাশ হয় না। পার্থিব বন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে ভ্রমণ করে। অগণিত সাধু, সন্ত ও ঋষিগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং ইচ্ছা করিলে যে কেহ অদ্যাপি ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। এই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে আত্মহত্যার স্বপক্ষে কী যুক্তি থাকিতে পারে?

পুনশ্চ, প্রকৃত বিবাহ দ্বারা দৈহিক মিলনই শুধু বুঝা যায় না। আত্মার মিলনও ইহা দ্বারা সূচিত হয়। যদি বিবাহ দ্বারা শারীরিক সম্বন্ধের অতিরিক্ত কিছু বুঝা না যায় তবে শোকার্তা বিধবা তাহার স্বামীর চিত্রপট বা মোমের প্রতিমূর্তি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। কিন্তু আত্মবিনাশ দ্বারা কোন ফললাভ করা যায় না। ইহা দ্বারা মৃতের জীবন ফিরিয়া পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে, প্রাণিজগৎ হইতে আরও একটি প্রাণীকে বিনষ্ট করা হয়।

দৈহিক মিলনের ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক মিলনই বিবাহের লক্ষ্য এবং আদর্শ। বিবাহ দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম সঞ্জাত হয় তাহা স্বর্গীয় বা বিশ্বপ্রেম অর্জনের প্রথম স্তর। সেইজন্যই মীরা গাহিয়াছিলেন—

"একমাত্র ঈশ্বরই আমার পতি—আর কেহ নয়।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, "সতী" রমণী বিবাহকে পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় বলিয়া বিবেচনা করিবেন না; পরন্তু নিজের ব্যক্তিত্বকে স্বামীর প্রাণের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিবেন যে বিবাহ নিঃস্বার্থ এবং আত্মত্যাগমূলক সেবার আদর্শে পৌঁছিবার উপায়। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার চিতারোহণ করিলেই তাঁহার "সতীত্ব" প্রমাণিত হইবে না। বিবাহকালে সপ্তপদী ক্রিয়ার সময় তিনি স্বামীর নিকট যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন জীবনের

প্রতি মুহূর্তে স্বামীর, স্বামীর পরিজনের এবং দেশের সেবাতে আত্মত্যাগ এবং আত্মোৎসর্গ দ্বারা তিনি তাঁহার "সতীত্ব" প্রমাণ করিবেন। শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বিষয় তিনি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবেন। ক্ষুদ্র পারিবারিক স্বার্থ ও বিষয়াদি চিন্তা করিয়া তিনি নিজেকে জড়িত করিবেন না। জ্ঞানলাভের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা তিনি গ্রহণ করিবেন; আত্মত্যাগ এবং আত্মসংযম অনুশীলন করিয়া সেবা করিবার শক্তি বৃদ্ধি করিবেন এবং স্বামীর সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে এক করিয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত নিজেকে মিশাইয়া দিতে শিখিবেন।

এই শ্রেণীর "সতী" স্বামীর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন না। তাঁহার কার্য দ্বারা তাঁহার স্বামীর আদর্শ ও গুণাবলী জীবন্ত রাখিতে তিনি সর্বদাই চেষ্টা করিবেন এবং এইরূপ করিলে তাঁহার স্বামী অমরত্বের গৌরবলাভ করিবেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, তাঁহার স্বামীর আত্মার বিনাশ হয় নাই, তাহা এখনও জীবিত এবং ইহার পর তিনি আর পুনরায় বিবাহ করিবার বিষয় চিন্তাও করিবেন না।

পাঠক কৌতূহলী হইয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—"আপনার অঙ্কিত 'সতী' বিষয়বাসনা বা যৌনক্ষুধা দ্বারা স্পৃষ্ট নহে। সন্তানলাভের ইচ্ছা তাঁহার থাকিতে পারে না। তিনি আর বিবাহ করিবেন কেন?" ইহার উত্তর এই—বর্তমান হিন্দু সমাজে অধিকাংশ স্থলেই বিবাহ পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক নির্বাচনের উপর নির্ভর করে না। আবার কেহ কেহ মনে করেন, বর্তমান যুগবিপর্যয়ের মধ্যে ধর্ম ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য এবং আত্মসংযমের সহায়তার জন্য বিধবার বিবাহ হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ আমি নিজে কয়েকজন নারীর বিষয় জানি—তাঁহারা বিবাহের সময় পাশবিক প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ছিলেন না; পরে তাঁহারা পুরামাত্রায় সতীত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে উক্ত আদর্শ অনুযায়ী চলিবার পক্ষে বিবাহিত জীবনই প্রকৃষ্ট পন্থা। এই সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, আমি "সতী"র যে আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছি তাহা শুধু নিখুঁত আদর্শমাত্র নয়, ভাবরাজ্যের বাহিরেও তাহার স্থান আছে; এই বাস্তব জগতে সেই আদর্শ অনুযায়ীই আমাদিগকে চলিতে হইবে এবং জীবনে তাহা দেখাইতে হইবে।

আমি ইহা অবশ্য স্বীকার করি যে, সাধারণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে সকল নারী "সতীর" আদর্শে পৌঁছাইবার চেষ্টা করিবেন তাঁহাদিগকে, সন্তানের জননীও হইতে হইবে। সেইজন্য উপরিউক্ত গুণাবলীর সঙ্গে সন্তান লালনপালনের জ্ঞানও তাঁহাদিগকে অর্জন করিতে হইবে। এবং এইরূপে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের প্রকৃত সেবিকারূপে জীবন যাপন করিতে পারিবেন।

স্ত্রী সম্বন্ধে উপরে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সমভাবে স্বামীর প্রতিও প্রযোজ্য। যদি স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত ও তাঁহার প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তিসম্পন্ন হইতে হয়, স্বামীকেও তদ্রূপ স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন হইতে হইবে। একই রকম মাপকাঠি দিয়া উভয়কে মাপিতে হইবে—একই আদর্শে উভয়কে বিচার করিতে হইবে। তথাপি কোন স্বামী মৃতা স্ত্রীর চিতারোহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা কখনও শুনি নাই। সেইজন্য ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, স্বামীর মৃত্যুতে বিধবার

সহমরণের প্রথা অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং পুরুষের অন্ধ একগুঁয়েমি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কোন সময়ে এই প্রথার সার্থকতা ছিল ইহা প্রমাণিত হইলেও বর্তমান যুগে ইহা বর্বরতার পরিচায়ক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। স্ত্রী স্বামীর সঙ্গিনী—তাঁহার দাসী নন; তাঁহাকে স্বামীর সহযোগিনী, বন্ধু এবং অর্ধাঙ্গিনী বলা হইয়া থাকে। স্বামীর অধিকার এবং কর্তব্যাদির তিনি সমান অংশীদার। পরস্পরের প্রতি এবং জগতের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্যসমূহও সেইজন্য এক এবং পারস্পরিক হইতে বাধ্য।

কাজেই আমি এই ভগিনীর কথিত সহমরণ নিষ্ফল মনে করি। নিশ্চয়ই ইহা অনুকরণের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত নয়। আমাকে সম্ভবতঃ কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, আমি কি তাহার মৃত্যুবরণের সাহসকেও অন্ততঃ প্রশংসা করি না? সত্য কথা বলিতে গেলে, আমি উত্তরে "না" বলিব। এমনকি দুষ্কৃতকারীদের মধ্যেও আমরা কি সাহসের পরিচয় পাই না? তথাপি কেহ কখনও তাহাদিগকে সেজন্য প্রশংসা করে নাই। আত্মহত্যা সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিহীন প্রশংসা দ্বারা একটিও অজ্ঞ ভগিনীকে অজ্ঞাতসারে পথভ্রষ্ট করিবার পাপ আমি অর্জন করিতে যাইব কেন? "সতীত্ব" পবিত্রতার চরমোৎকর্ষ। মৃত্যুবরণ করিয়া এই পবিত্রতা লাভ করা যায় না। সর্বদা অনুশীলন ও অবিচল আত্মাহুতি দ্বারাই কেবল ইহা অর্জন করা যায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৫-'৩১]

৫৩

সমাজে নারীর স্থান

কটক হইতে শ্রীমতী সরলাদেবী লিখিতেছেন—"আপনি কি স্বীকার করেন না যে অস্পৃশ্যতার ন্যায় নারীদের প্রতি আচরণও নিন্দনীয় ব্যাধিস্বরূপ? আমি যে সকল যুবক 'স্বদেশসেবী'র সঙ্গে মিশিয়াছি তাহাদের শতকরা নব্বই জনের মনোভাব পশুর তুল্য। ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনকারিগণের কয়জন নারীগণকে ভোগের সামগ্রী বলিয়া মনে করে না? আন্দোলনে জয়লাভ করিতে হইলে আত্মশুদ্ধি সর্বাগ্রে প্রয়োজন; নারীদিগের প্রতি মনোভাব পরিবর্তিত না হইলে আত্মশুদ্ধি কি সম্ভবপর?"

—অস্পৃশ্যতার ন্যায় নারীদিগের প্রতি আচরণ একই প্রকার "নিন্দনীয় ব্যাধি", এই মত আমি সমর্থন করিতে পারি না। শ্রীমতী সরলাদেবী এই দুর্নীতি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাও সমর্থন করা যায় না। কোন বিষয় অতিরঞ্জিত করিয়া সুফল পাওয়া যায় না। তবে আমি অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি যে প্রকৃত স্বরাজলাভের জন্য আমাদিগকে উপযুক্ত হইতে হইলে নারীগণের প্রতি, তাঁহাদের পবিত্রতার প্রতি পুরুষেরা যেরূপ সম্মান দেখাইয়াছেন তাহা হইতে বেশী শ্রদ্ধা

ও সম্ভ্রমের ভাব অনুশীলন করিতে হইবে।

কতিপয় পথভ্রষ্টা ভগিনী অসহযোগী কর্মীদের ভোগ্যরূপে নির্দিষ্টা, এই কথা বাহবার সহিত বলিতে পারে এমন কোন অসহযোগী মিলিতে পারে ইহা ভাবিতেও যে হীনতায় মাথা নত হয়। আমাদের নৈতিক উৎকর্ষের জন্য এই গুরুতর বিষয়ে সহযোগী ও অসহযোগীদের ভিতর কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। যতদিন পর্যন্ত একটিমাত্র নারীও আমাদের ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য রক্ষিত থাকিবে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তক লজ্জায় হেঁট হওয়া উচিত। নারী ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাহাকে পুরুষের ইন্দ্রিয়লালসার ইন্ধনে পরিণত করিয়া পশুরও অধম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র পুরুষজাতি সমূলে বিনাশ হউক ইহাই বরং আমি দেখিতে চাই। শুধু ভারতবর্ষের নয়, সমগ্র জগতের এই সমস্যা। পশুত্বেরও হীন অবস্থা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সুবুদ্ধিপরিচালিত সহজ জীবন-যাত্রায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। সেইজন্যই আমি বর্তমান ইন্দ্রিয়ভোগসর্বস্ব অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইতেছি এবং পুরুষ ও নারীগণকে সহজ ও সরল জীবন যাপন করিতে উপদেশ দিতেছি। চরকার ভিতর ইহার সারমর্ম নিহিত রহিয়াছে। আমি নারীগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অন্তরের সহিত কামনা করি। আমি বাল্যবিবাহ ঘৃণার চক্ষে দেখি। বালবিধবাকে দেখিলে আমি শিহরিয়া উঠি। সদ্য বিপত্নীক স্বামীকে নিষ্ঠুর নির্মমতার সহিত পুনরায় বিবাহ করিতে দেখিলে আমি রাগে কাঁপিতে থাকি। যে সকল পিতামাতা তাঁহাদের কন্যাদিগকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিরক্ষর রাখিয়া কোন অবস্থাপন্ন যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিয়া নিষ্কৃতিলাভের জন্যই শুধু তাহাদিগকে লালনপালন করেন, আমি তাহাদের এই অমার্জনীয় উদাসীনতার জন্য আক্ষেপ করি। এই রাগ ও দুঃখ সত্ত্বেও আমি সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করি। নারীদের ভোটাধিকার দিতেই হইবে এবং পুরুষের সমপর্যায়ে তাহাদের আইনগত অধিকারাদি থাকিবে। সমস্যার মীমাংসা কিন্তু এখানেই হয় না। জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন যখন নারীগণের দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকিবে তখনই এই সমস্যা সমাধানের সূত্রপাত হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি চমৎকার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। জনৈক বিশিষ্ট মুসলমান বন্ধুর লন্ডন শহরে একজন খ্যাতনামা নারী-আন্দোলনকারীর সহিত কথোপকথন হয়। তিনি তাঁহাদের একটি সভায় উপস্থিত ছিলেন। একজন মুসলমানকে সেখানে দেখিয়া একজন মহিলা বন্ধু আশ্চর্যান্বিত হন। তিনি কী সূত্রে সেখানে গেলেন মহিলাটি এই প্রশ্ন করিলেন। বন্ধু উত্তর করিলেন যে দুইটি বড় ও দুইটি ক্ষুদ্র কারণে তিনি সেখানে আসিয়াছেন। শৈশবে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। জীবনে তিনি যাহা কিছু হইয়াছেন তজ্জন্য তিনি তাঁহার মাতার নিকট ঋণী। তৎপর যাঁহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় তিনিও ছিলেন প্রকৃত সহযোগিনী। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না, চারটি কন্যা ছিল—সকলেই নাবালিকা এবং পিতা হিসাবে তাহাদের মঙ্গলের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি নারী-আন্দোলনের পক্ষপাতী, ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। নারীগণের প্রতি উদাসীন বলিয়া মুসলমানদিগকে দোষ দেওয়া হয়। এর চাইতে গুরুতর কুৎসা আর হইতে পারে

না। ইসলামীয় আইন নারীদিগকে সমান অধিকার দিয়াছে। তিনি মনে করেন, পুরুষ কামের বশীভূত হইয়া নারীকে অবনমিত করিয়াছে। তাহার ভিতরের আত্মার শোভা বিকশিত হইতে না দিয়া পুরুষ তাহার দেহকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সেই গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনে পুরুষ কৃতকার্য হইয়াছে—তাই আজ নারী দাসত্বের চিহ্নস্বরূপ শারীরিক বেশভূষাকেই আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাষ্পাকুল কণ্ঠে তিনি আরও বলিলেন—যদি তাহা না হইত তবে পতিতা ভগিনীগণ শারীরিক সাজসজ্জা করিতে এত ভালবাসে কেন? আমরা, পুরুষগণ, কি তাহাদের ভিতর হইতে আত্মাকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলি নাই? আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—"না, তিনি শুধু নারীগণের বাহিরের দিকের স্বাধীনতা চান না, যে সকল শৃঙ্খল নারীর স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে তিনি সেগুলিও ভাঙিগয়া ফেলিতে চান।" সেইজন্য তাঁহার ইচ্ছা যে তাঁহার কন্যাদিগকে তিনি স্বাধীন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিবেন।

এই উদার ও উন্নতস্তরের কথোপকথন আর বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। আমার মহিলা লেখিকাকে এই মুসলমান বন্ধুর আলোচনার মূলগত ভাবটির বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। নারী পুরুষের লালসার বস্তু এই ভাব নারীকে ত্যাগ করিতে হইবে। পুরুষের চাইতে নারীর নিজের কাছে প্রতিকারের উপায় বিদ্যমান। পুরুষের সহিত সমান পর্যায়ে অংশীদার হইতে হইলে পুরুষের, এমনকি স্বামীরও, মনোরঞ্জনের জন্য নারীকে সাজসজ্জা হইতে বিরত হইতে হইবে। বাহিরের সাজসজ্জা দ্বারা রামের প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য সীতা কখনও একটি মুহূর্ত নষ্ট করিবেন ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-৭-'২১]

৫৪

আমাদের পতিতা ভগিনীগণ

যে সকল নারী আত্মবিক্রয় দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে অন্ধ্র প্রদেশে কোকনদে সর্বপ্রথম তাহাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কয়েক মিনিটের জন্য তাহাদের জন ছয়ের সঙ্গে দেখা হয়। দ্বিতীয় বার—বরিশালে। পূর্বে সময় নির্ধারণ করিয়া এই শ্রেণীর শতাধিক নারী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়া তাহারা পূর্বে চিঠি দেয়। তাহাতে জানায় যে তাহারা কংগ্রেসের সভ্য হইয়াছে এবং তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে চাঁদা দিয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিতে কর্মীর পদগ্রহণের প্রতিকূলে আমার উপদেশ তাহারা বুঝিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে কিসে তাহাদের মঙ্গল হইবে সেই সম্বন্ধে আমার উপদেশ পাইবার আশা করিয়া চিঠি শেষ করে। একটি ভদ্রলোক এই চিঠি আমার নিকট অত্যন্ত

সঙ্কোচের সহিত দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না এই চিঠি পাইয়া আমি বিরক্ত হইব না খুশী হইব। এই সকল ভগিনীকে কোন উপায়ে সহায়তা করা সম্ভবপর হইলে তাহা আমার কর্তব্য, এই আশ্বাস দেওয়ার পর তাঁহার সেই আশঙ্কা দূরীভূত হয়।

যে দুই ঘণ্টা আমি এই ভগিনীদের সঙ্গে কাটাইয়াছি তাহার বহুমূল্য স্মৃতি অনেককাল জাগরূক থাকিবে। স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা মিলিয়া শহরের জনসংখ্যা বিশ হাজার। তন্মধ্যে পতিতাদের সংখ্যা ৩৫০। তাহারা বরিশালের পুরুষদের কলঙ্কস্বরূপ। বরিশালের প্রভূত সুনামরক্ষাকল্পে এই পাপ যত শীঘ্র বিদূরিত হয় ততই মঙ্গল। আমার আশঙ্কা হয় যে বরিশালের পক্ষে যাহা সত্য প্রত্যেক শহর সম্বন্ধেই তাহা খাটে। সেইজন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বরিশালের নাম করিলাম। এই ভগিনীদিগকে কীরূপে সহায়তা করা যায় সেই বিষয়ে চিন্তা করিয়া বরিশালের কয়েকজন যুবক প্রশংসার পাত্র হইয়াছে। আমি আশা করি, এই পাপ সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করিয়া বরিশাল শীঘ্রই প্রশংসা অর্জন করিতে সক্ষম হইবে।

নারীগণ মানবসমাজের বিশিষ্ট অর্ধাংশ। আমার মতে তাহারা সমাজের দুর্বলতর অংশ নহে। সমাজের যত পাপের জন্য পুরুষরা দায়ী তন্মধ্যে নারীর প্রতি অবিচার, অপমান ও দুর্ব্যবহারের মত এত ঘৃণিত, বীভৎস ও নির্মম অত্যাচার কল্পনা করা যায় না। পুরুষের তুলনায় নারীপ্রকৃতি অধিকতর উদার। কারণ তাহারা আজও আত্মত্যাগ, নীরব সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, বিনয়, বিশ্বাস ও জ্ঞানের প্রতীক। পুরুষ অহঙ্কার করিয়া মনে করে সে নারী হইতে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু নারীর স্বভাবজাত বুদ্ধিবিবেচনা পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রাম নামের পূর্বে সীতার এবং কৃষ্ণ নামের পূর্বে রাধার নাম প্রয়োগের বিশেষ কারণ আছে। নারী লইয়া পাপের খেলা প্রবলভাবে চলিতেছে; সভ্য ইউরোপে কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা সরকারী আইন অনুযায়ী পরিচালিত; কিন্তু তাই বলিয়া ভ্রমেও যেন আমরা এই বিশ্বাসে উপনীত না হই যে সমাজের ক্রমোন্নতির পথে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতেও এই পাপ পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল, সেইকারণেও যেন আমরা এই পাপকে চিরস্থায়ী না করি। অতীতের সব বিষয় আমরা সম্পূর্ণরূপে অবগত নই; যদি আমরা অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করি কিংবা আমরা পাপপুণ্য বা ধর্ম-অধর্মের বিচার করিতে বিরত হই তবে আমরা কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। অতীত যুগে যাহা সর্বাপেক্ষা উদার এবং উৎকৃষ্ট ছিল উত্তর কালে তাহাই আমরা লাভ করিয়াছি এবং সেইজন্য গৌরব বোধ করি। অতীতের ভুলভ্রান্তি বহুলপরিমাণে বাড়াইয়া তুলিয়া আমরা যেন যাহা পাইয়াছি তাহার অবমাননা না করি। আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ভারতে প্রত্যেক নারীকে নিজের ভগিনীর ন্যায় দেখা এবং সেই দৃষ্টিতে তাহার ধর্মরক্ষা করার দায়িত্ব কি প্রত্যেক পুরুষের নয়? প্রত্যেক ভারতবাসীকে নিজ ভাই কিংবা ভগিনীর মত দেখিবার শক্তি লাভ করাই স্বরাজ।

সেইজন্য পুরুষ হিসাবে এই তিনশত ভগিনীর সম্মুখে আমি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলাম। কয়েকজন ছিল বয়স্কা, অধিকাংশের বয়স ছিল কুড়ি হইতে ত্রিশের মধ্যে;

দুই তিনটির বয়স বার বৎসরের কম ছিল। তাহারা বলিল, তাহাদের ছয়টি কন্যা ও চারিটি পুত্রসন্তান আছে। ছেলেদের বড়টি তাহাদের শ্রেণীরই একজনকে বিবাহ করিয়াছে। যদি অন্য কোন পথ বাহির করা সম্ভবপর না হয় তবে মেয়েগুলিকেও তাহাদের ধারায়ই জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সকল নারীকে যদি ভাবিতে হয় যে তাহাদের উদ্ধারের কোন উপায় আর নাই—তাহা জীবিতের মাংসপেশীর উপর ছুরিকাঘাতের ন্যায় আমাকে বিদ্ধ করিবে। কিন্তু তাহারা বুদ্ধিমতী এবং লজ্জাশীলা। তাহাদের কথাবার্তা মর্যাদাব্যঞ্জক, তাহাদের উত্তর সরল এবং পরিষ্কার। যে কোন সত্যাগ্রহীর ন্যায় তাহাদিগকে তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বোধ হইতেছিল। তাহাদের মধ্যে এগার জন প্রতিজ্ঞা করিল যে, কাহারও নিকট হইতে সহায়তা পাইলে তাহারা পরের দিন হইতেই তাহাদের বর্তমান পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া সুতা কাটিবে এবং বয়ন করিবে। অন্য সকলে বলিল, এই বিষয়ে চিন্তা করিবার জন্য সময় আবশ্যক; কারণ তাহারা আমাকে কোন কপটবাক্য বলিতে ইচ্ছুক ছিল না।

এই সকল পতিতার মধ্যে বরিশালের নাগরিকদের এক কর্মক্ষেত্র মুক্ত রহিয়াছে। যে সকল নরনারী ভারতের প্রকৃত সেবাব্রতী, তাহাদের জন্য কাজ এখানে রহিয়াছে। যদি বিশ হাজার লোকের মধ্যে ৩৫০ জন হতভাগিনী ভগিনী থাকিয়া থাকে তবে সারা ভারতবর্ষে তাহাদের সংখ্যা ৫২,৫০,০০০ হইতে পারে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার ৪/৫ ভাগ কৃষিজীবী, গ্রামেই তাহাদের বসবাস; তাহাদের মধ্যে এই ব্যাভিচার প্রবেশ করে নাই, এই ধারণায় আমি আনন্দলাভ করি। কাজেই আত্মবিক্রয় দ্বারা যাহারা জীবিকা উপার্জন করে এরূপ নারীর সংখ্যা সমগ্র ভারতে ন্যূনকল্পে ১০,৫০,০০০ হইবে। এই হতভাগিনী ভগিনীদিগকে তাহাদের পাপজীবন হইতে ছাড়াইয়া আনিতে হইলে দুইটি ব্যবস্থা পালন করিতে হইবে। আমাদের পুরুষদের কামপ্রবৃত্তি দমন করিয়া সংযম শিক্ষা করিতে হইবে এবং এই সকল নারীকে সদুপায়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য কোন কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে। অসহযোগ আন্দোলনের কোন অর্থই থাকিবে না যদি ইহা আমাদের চরিত্র নির্মল না করে এবং আমাদের অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত না করে। কর্মীদের ভিড় বাড়িবে না, এমন কোন কাজে নিয়োগ করিতে হইলে সুতাকাটা এবং বস্ত্রবয়ন ব্যতিত আর কিছুই দেখা যায় না। ইহা গৃহকর্মের মত সকলেই করিতে পারে। এই ভগিনীদের অধিকাংশেরই বিবাহের জন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা বিবাহ করিতে পারিবে না। কাজেই তাহাদিগকে ভারতবর্ষের প্রকৃত সন্ন্যাসিনী হইতে হইবে। সেবা ছাড়া জীবনে তাহাদের আর কোন বিষয়ের চিন্তা থাকিবে না এবং তাহারা পরমানন্দে যত খুশী ইচ্ছা সুতা কাটিতে এবং বস্ত্র বয়ন করিতে পারিবে। দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নারী যদি প্রত্যহ আট ঘণ্টা করিয়া যত্নের সহিত সুতা কাটে এবং কাপড় বুনে তবে শোষিত ভারতের দৈনিক সেই পরিমাণ টাকা আয় হইবে। এই ভগিনীরা আমাকে বলিয়াছে যে তাহারা দৈনিক দুই টাকা পর্যন্ত রোজগার করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ইহাও স্বীকার করিয়াছে যে, পুরুষের লালসার ইন্ধন যোগাইতে তাহাদের অনেক জিনিসের দরকার হয়; যদি

তাহারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়া গিয়া সূতাকাটা এবং বস্ত্রবয়ন আরম্ভ করে তবে ঐ সকল জিনিসের দিকে তাহাদের দৃষ্টি দিতে হইবে না। আমার সঙ্গে তাহাদের কথাবার্তা শেষ হইতে হইতেই, আমার কিছু না বলা সত্ত্বেও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের পাপজীবন পরিত্যাগ না করিলে তাহারা কোন কংগ্রেস কমিটির কর্মীশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। বিশুদ্ধ চিত্ত এবং পবিত্র মন না লইয়া স্বরাজের বেদীতে পূজারীরূপে কেহ অর্ঘ্য অর্পণ করার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-৯-'২১]

৫৫

পতিতা ভগিনীদের সূতাকাটা

নোয়াখালীতে আমি জানিলাম যে, দুইটি পতিতা ভগিনী শুধু সূতা কাটে না, সূতা কাটিয়া তাহারা নিজেদের সমগ্র ব্যয়ভার নির্বাহ করে। তাহারা যুবতী নয়,—তাহাদের বয়স চল্লিশ অতিক্রম করিয়াছে; কাজেই পাপপথে জীবিকানির্বাহের উপায় ছিল না। সূতা না কাটিলে তাহাদিগকে পথের ভিখারী হইতে হইত। কাজেই প্রকৃতপক্ষে বলিতে হইবে তাহারা শুধু পূর্বের পেশা পরিত্যাগ করিয়াছে এমন নয়, ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিজেদের রক্ষা করিয়াছে। এই ভগিনীদের সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া এবং তাহাদের ভালমন্দ সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নোয়াখালী একটি মহৎ কাজ করিয়াছে। আমি ইহাও জানি যে তাহাদের কেহ কেহ পাপবৃত্তি পরিত্যাগ না করিয়াও সূতাকাটা আরম্ভ করিয়াছে। যদি তাহারা পেশা ত্যাগ না করে তবে সূতা কাটিয়া এই ভগিনীদের কোন লাভ হইবে কিনা আমি বলিতে পারি না। ইহা তাহাদের পাপ ঢাকিবার উপায়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে সূতাকাটাকে জীবিকা অর্জনের উপায়স্বরূপ অবলম্বন করিতে তাহাদের নিকট অনুরোধ করা যায় না। তাহারা দৈনিক অন্ততঃ এক টাকা, দুই টাকা বা ততোধিক রোজগার করিত। তাহাদের বস্ত্রবয়ন অথবা বুটিতোলা, চিকণের কাজ অথবা অন্য কোন চারুশিল্পের কাজ শিক্ষা করিতে হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহাদের আয় মোটামুটি ভাল হইবে। পরন্তু পুরুষদের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর নয়। নারীদেরই এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হইতে হইবে। যত দিন পর্যন্ত অসাধারণ চরিত্রবলসম্পন্না পূতশীলা কোন রমণী কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পতিত মানবসমাজের এই অংশের উদ্ধারকার্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গিত না করেন ততদিন সমাজে গণিকাবৃত্তিসমস্যার সমাধান সম্ভবপর হইবে না। অবশ্য পুরুষরাও যথেষ্ট কাজ করিতে পারে; তবে তাহাদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকিবে সেই সকল পুরুষের মধ্যে

যাহারা কামের বশীভূত হইয়া যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে আত্মবিক্রয়ের পথে প্রলুব্ধ করিয়া নিজদিগকে অধঃপাতিত করে। গণিকাবৃত্তি পৃথিবীর সৃষ্টি হইতেই বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান যুগের ন্যায় নাগরিকজীবনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যরূপে ইহা কখনও ছিল কিনা আমি জানি না। অন্ততঃ একটা সময় আসিবে যখন মানবসমাজ এই অভিসম্পাতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে এবং যেভাবে সমাজ বহু পুরাতন অনেক কুপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়াছে সেইভাবে গণিকাবৃত্তিকেও অতীতের গহ্বরে প্রোথিত করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৮-৫-'২৫]

৫৬

পতিতা ভগিনীগণ

মাদারীপুরে অভ্যর্থনা-সমিতি পতিতা ভগিনীদের দ্বারা সুতাকাটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিল, এই দৃশ্য দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছিলাম, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের আনুষঙ্গিক বিপদ্ সম্বন্ধে উদ্যোক্তাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পতিতা উদ্ধারের জন্য আন্দোলন বরিশালে সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। কিন্তু তাহা সুপথে পরিচালিত হয় নাই এবং নিঃসন্দেহে কুৎসিত আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। এই হতভাগিনী ভগিনীদিগকে সেখানে সংঘবদ্ধ করা হইয়াছে। সংঘের যে নামকরণ করা হইয়াছে তাহাতে ভ্রম উৎপাদন করে। ইহার "বর্তমান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"(১) দরিদ্রকে সাহায্য করা এবং পীড়িত ভ্রাতাভগিনীদের শুশ্রূষা করা;
(২) (ক) নিজেদের ভিতর শিক্ষা বিস্তার করা;
(খ) একটি নারীশিল্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুতাকাটা, বস্ত্রবয়ন, সেলাই, সূচীশিল্প এবং অন্যান্য হস্তশিল্পের উন্নতি করা;
(গ) উচ্চতর সঙ্গীত শিক্ষা;
(৩) অন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা তাহাদের সহিত যুক্ত হওয়া।"

এই সম্বন্ধে এই বলা যথেষ্ট হইবে যে, সমগ্র বিষয়টি ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী স্থাপনের ন্যায় ওলটপালট করা হইয়াছে। নিজেদের সংস্কার না করিয়া এই ভগিনীদিগকে জনহিতকর কার্যে ব্রতী হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতশিক্ষার কল্পনা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক মনে করা যায় যদি না উহার ফলে শোচনীয় সামাজিক অনর্থের সৃষ্টি হয়। কারণ ইহা সকলে জানে যে, এই সকল নারী নাচিতে এবং গাইতে জানে। যে সকল প্রতিষ্ঠানের মূলনীতি সত্যাগ্রহ ও

অহিংসা তাহাদের সঙ্গে উক্ত পতিতাসংঘ যুক্ত হইলে তাহারা তাহাদের পাপবৃত্তি চালাইতে থাকিবে এবং সত্য ও অহিসাংর মূলেই কুঠারাঘাত করিবে।

আমার হাতে উক্ত পতিতাসংঘের যে বিবরণী আছে তাহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, তাহারা কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে "তাহাদের নিম্ন অবস্থার উপযোগী অন্যান্য দেশহিতৈষণার কাজ" করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এমনকি, তাহারা প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত হইয়াছে। তাহাদের নামে প্রচারিত একটি ঘোষণাপত্রও আমি দেখিয়াছি। ইহাকে আমি শ্লীলতাবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি।

উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক, আমি এই সমগ্র আন্দোলনকে লজ্জাকর মনে না করিয়া পারি না। সুতাকাটা আমি প্রশংসা করি, কিন্তু পাপপথে চলিবার ছাড়পত্ররূপে ইহার ব্যবহার হইতে পারে না। আমি ইচ্ছা করি, সকলেই সত্যাগ্রহী হউক, কিন্তু নরহত্যা করা যাহার ব্যবসা এরূপ কোন ব্যক্তি অনুতপ্ত না হইয়া যদি সত্যাগ্রহ-নীতি স্বাক্ষর করিতে চায় তবে আমার সকল শক্তি দ্বারা তাহাকে বাধা দিব। এই সকল ভগিনীর দুঃখ আমি সম্পূর্ণরূপে অনুভব করি কিন্তু বরিশালে যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে তাহাতে আমি সায় দিতে পারিতেছি না। এই ভগিনীরা সমাজের যে স্তরে নামিয়া গিয়াছে সমাজের নৈতিক কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে সকল উদ্দেশ্য লইয়া এই সকল পতিতা সংঘবদ্ধ হইয়াছে, অনুরূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা কখনই একদল জানা চোরকে সংঘবদ্ধ করিব না। বর্তমান আকারের সংঘের প্রয়োজন আরো কম, কারণ ইহারা চোর হইতেও অধিক বিপজ্জনক। চোর পার্থিব জিনিস চুরি করে, কিন্তু ইহারা ধর্ম নষ্ট করে, মানবাত্মার অধোগতি আনে। সমাজে এই সকল হতভাগিনীর অস্তিত্বের জন্য পুরুষই প্রধানতঃ দায়ী: কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না যে সমাজের অনিষ্টসাধনের অতি ভয়ঙ্কর ক্ষমতা তাহারা অর্জন করিয়াছে। বরিশালে আমি শুনিয়াছি যে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিয়া এই সকল স্ত্রীলোক অস্বাভাবিকরূপে প্রগতি-শীলা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই বরিশালের যুবকদিগকে তাহারা কলুষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সংঘ ভাঙিয়া দেওয়া হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা। আমার দৃঢ় মত এই—যতদিন তাহারা এই পাপজীবন পরিত্যাগ না করে ততদিন তাহাদের নিকট হইতে চাঁদা বা সেবা গ্রহণ করা অথবা তাহাদিগকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা অথবা তাহাদিগকে কংগ্রেসের সভ্য হইতে উৎসাহিত করা সম্পূর্ণরূপে অন্যায়। তাহাদের কংগ্রেসে প্রবেশ করিতে আইনতঃ কোন বাধা নাই, কিন্তু আমার আশা ছিল যে জনমত তাহাদের কংগ্রেসের বাহিরেই রাখিবে এবং তাহারাও নিজেদের হীনতাবোধে কংগ্রেসের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে বিরত থাকিবে।

আমার ইচ্ছা, আমার বাণী তাহাদের নিকট পৌঁছায়। কংগ্রেস হইতে তাহাদের নাম তুলিয়া লইবার জন্য তাহাদিগের বিশেষভাবে বলিতেছি; তাহাদের যে কোন সংঘ ছিল তাহা তাহারা ভুলিয়া যাউক। কিন্তু যত শীঘ্র সম্ভব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাহারা তাহাদের পাপব্যবসা পরিত্যাগ করুক। তখনই তাহারা আত্মশুদ্ধির তপস্যারূপে সুতাকাটা আরম্ভ করিতে পারিবে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য বস্ত্র-

বয়ন বা অন্য যে কোন প্রকার অর্থকরী এবং নির্দোষ কাজে নিজদিগকে নিয়োজিত করিতে পারিবে—কিন্তু তৎপূর্বে কিছুতেই নয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৫-৬-'২৫]

৫৭

বেদনাজনক আলোকপাত

"আপনি বাঙ্গলার বহু শহরে এবং গ্রাম্য অঞ্চলে সফর করিতেছেন। বাঙ্গলার সামাজিক জীবনের একটি অতীব মলিন চিত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সুযোগ লইতেছি। আমার ঐকান্তিক আশা যে, আপনার উপদেশ ও বাণী এই ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়, জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি দোষারোপ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও নাই। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য বাঙ্গালাদেশের বর্তমান প্রকৃত অবস্থার প্রতি আপনার সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

"আমার বিশ্বাস, বাঙ্গলাদেশে অহরহঃ যে সকল নারীহরণের ঘটনা আশ্চর্য-রকমে বাড়িয়া চলিয়াছে, সেই দিকে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সামাজিক জীবনের ভিতরে কোথাও যে গলদ রহিয়াছে এই সকল নৈতিক বিভ্রাট তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ।

"বাঙ্গলার কোন কোন জেলাতে গণিকাবৃত্তি ও অন্যান্য দুর্নীতির প্রাবল্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পশ্চিম বাঙ্গলার প্রায় সব জেলাতে এবং উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গলার পাট এলাকায়, এমনকি গ্রাম্য বাজারেও বেশ্যালয় অপরিহার্য অংশরূপে গণ্য হইয়া থাকে। বড় বড় বাজারের বা বন্দরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কাজ-কারবারের মরশুমে প্রধান প্রধান পাটের বাজারে ভাসমান গণিকা-লয় দ্বারা পতিতাদের সংখ্যাবৃদ্ধি পায়। বাজারের সন্নিহিত স্থানে নিবদ্ধ নৌকাতে অসংখ্য গণিকা বাস করিয়া তাহাদের নারকীয় ব্যবসা চালাইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্থলে প্রায় সকল মেলাতেই এই সকল হতভাগিনী নারীর প্রাদুর্ভাব হয়। মেলাস্থলে তাহারা সাময়িকভাবে বাসা তৈয়ারী করে এবং মেলাতে যাহারা যায় তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করে। কোন কোন জেলাতে জমিদারের বাড়ীর বা কাছারীর চতুর্দিকে বহুসংখ্যক গণিকাকে আবাসস্থান দেওয়া হয়; কারণ, সাধারণতঃ জমিদারগণ বা তাহাদের কর্মচারিগণ ইহাদের পৃষ্ঠপোষক। এই বিষয়ে ময়মনসিংহ, পাবনা এবং রাজসাহী জেলা বিশেষভাবে কুখ্যাত। এই সকল জেলাতে নারীহরণ ও নারীধর্ষণের ঘটনা যে সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যায় ঘটে, তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা প্রায় চার লক্ষ। ইহাদের অধিকাংশ ভিক্ষা করিয়া এবং গান গাহিয়া জীবিকা উপার্জন করে।

সংক্ষেপে এই বলা যায়, বাঙ্গালীরা এই সকল পরগাছাকে পোষণ করিতে বাৎসরিক প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় করে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই, হিন্দুসমাজে এই শ্রেণীর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের স্থান নাই,—তাহাদিগকে আবর্জনা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। বৈষ্ণব সমাজের মেয়েদের মধ্যেই অধিকাংশ নারীহরণের ঘটনা ঘটে। ধর্মের ছদ্মবেশে এই সকল উপায়হীন নারীগণ অত্যন্ত কদর্য ও কলুষিত জীবন যাপন করে। আমার বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে আপনাকে গোপনে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি। পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া দান করা বন্ধ করিলে এবং চরকার প্রবর্তন করিলে এই চার লক্ষ লোককে বাঁচান যাইতে পারে এবং তাহাদের দ্বারা সমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইতে পারে। কলিকাতা এবং শহরতলীর অবস্থাও কল্পনায় যতদূর আসে ততটা খারাপ। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা হইতে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তাড়িত হইয়া শত শত স্ত্রীলোক তাহাদের গ্রামাঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা ও শহরতলীতে দলে দলে আসিয়া থাকে। এখানে তাহারা ঝি বা পরিচারিকা বা পানওয়ালী ইত্যাদির কাজ করিয়া পাপজীবন যাপন করে। এই সকল জেলাতে জনসাধারণের নৈতিক মান অত্যন্ত হীন এবং এই কারণে সেখানে যৌনব্যাধি ও কুষ্ঠরোগাদির প্রাবল্য। বাঙ্গলার ১৫,৪৫১ জন কুষ্ঠরোগীর প্রায় অর্ধেক ৭,২৪০ জন শুধু বর্ধমান বিভাগ হইতে আসে (১৯২১ সনের লোকগণনা বা আদমসুমারী বিবরণ, ২য় খণ্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা)। পরন্তু বাঙ্গলার সবচেয়ে অপচয়শীল জেলা এইগুলি; এবং তাহাদের লোকসংখ্যা বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের তুলনায় এই সকল জেলাতে মদ্যপানের প্রাবল্যও বহুব্যাপক।

"কলিকাতার নাট্যশালাগুলি প্রধানতঃ পতিতা নারীদের দ্বারা চালিত হয়। বহুসংখ্যক ছাত্র এবং বিখ্যাত জননেতাগণও থিয়েটারে গিয়া থাকেন। এই সকল নাট্যগৃহে জনসাধারণের বড় বড় সভার অধিবেশন হয়। আমাদের দৈনিক কাগজ-গুলির স্তম্ভে অভিনেত্রী ও নর্তকীদের বিস্তৃত প্রশংসা বাহির হয়। এইগুলির মধ্যে প্রভূত শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী কাগজও রহিয়াছে, ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয়। এতদ্ব্যতীত চিত্রসম্বলিত বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা আছে; সেগুলিতে নাটক ও নৃত্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা হয়। দশ বৎসর পূর্বে যেরূপ ছিল তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষায় বর্তমানে প্রকাশিত হইতেছে।

"এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে নৈরাশ্যে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে।

"মহোদয়, এই অবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিনীতভাবে আপনার মত সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি—

(১) কংগ্রেসের সভ্য অথবা স্বেচ্ছাসেবক অথবা যাহারা জাতীয়দলে কর্মী হইবার অভিলাষ করে তাহাদের পক্ষে স্ত্রীলোক দ্বারা পরিচালিত থিয়েটারে যাওয়া উচিত কিনা? অথবা যে সকল ছায়াচিত্রে কামোদ্দীপক চিত্রাবলী নানাপ্রকার লোভনীয় আকারে প্রদর্শিত হয় সেখানে যাওয়া সঙ্গত কিনা?

(২) জনসাধারণের কোন সভা নাট্যশালাতে অনুষ্ঠিত হইবে কিনা?

(৩) কোন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কাগজ নারী-পরিচালিত যাত্রা, নৃত্যশালা-বিষয়ক এবং অভিনেত্রীগণের প্রশংসা ইত্যাদি এবং মদ্য ও মাদকদ্রব্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিবে কিনা?

(৪) ছাত্রগণের এবং কংগ্রেসসেবিগণের ধূমপান এবং মদ্যপান সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয় কিনা? ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে সংগৃহীত সঠিক সংবাদ—এই চট্টগ্রাম শহরে প্রতিমাসে ৫০,০০০ টাকা মূল্যের সিগারেট ও বিড়ি বিক্রী হয়। শহরের লোকসংখ্যা ৩৬,০৩০ এবং জেলার লোকসংখ্যা ১৬,১১,৪২২ !!

(৫) মদ্যপান এবং গণিকালয় বন্ধ করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি এবং লোকাল বোর্ডের যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত কিনা? এবং এই সকল সামাজিক ব্যাধি দূরীভূত করিতে তাহাদের যথাসাধ্য প্রচারকার্য চালানো উচিত কিনা?"

—এই চিঠি আমাকে চট্টগ্রামে দেওয়া হইয়াছিল এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই বিষয় বিবেচনার জন্য উহা আমার জ্যাকেটের ভিতরই ছিল। লেখক হয়ত জানেন, পতিতা ভগিনীদের তাহাদের পাপ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টার ফল আপাততঃ তাহাদের পাপজীবন যাপন করিবার সুবিধায় পরিণত হইয়াছে। আমি জানি, গণিকাবৃত্তি সমাজের মহা অনিষ্টকর প্রথা এবং ইহা ক্রমশঃই বর্ধনশীল। লক্ষ্য করিলেই অনায়াসে দেখা যায় সমাজ নৈতিক কুষ্ঠে আক্রান্ত; পাপের ভিতর সদ্‌গুণ আবিষ্কার করিবার মনোবৃত্তি এবং শিল্পকলার পবিত্র নামে বা অন্য কোন ভ্রান্ত ভাবধারার বশীভূত হইয়া কুপ্রথা সমর্থন করার মনোভাব—এই হেয় পাপাচরণকে অতি নিপুণভাবে কল্পিত সম্মানের আসন দিয়াছে; ইহাই সামাজিক ব্যাধির কারণ। কিন্তু লেখক যে ভয়াবহ অবস্থার অস্তিত্ব বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস তিনি এই সকল কুপ্রথা অতিরঞ্জিত করেন নাই। কারণ আমার সফরের সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে সমর্থন পাইয়াছি। বর্তমান যুগ ঈশ্বরে অবিশ্বাস বা মৌখিক অর্ধবিশ্বাসের যুগ; ভোগবিলাস বহুল ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে রোমক সাম্রাজ্য যখন উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল তখন উহার চরম নৈতিক অধঃপতনের কথা এই সকল যুগচিহ্ন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্তমান যুগেও এই সামাজিক ব্যাধি অত্যন্ত গুরুতর—তাহার প্রতিকার উদ্ভাবন সহজ নয়। আইন দ্বারা ইহার সংশোধন করা যায় না। লণ্ডন এই পাপে ভরপুর। প্যারীনগরী পাপের লীলায় কুখ্যাত এবং উক্ত পাপাচরণ প্রায় শৌখিন ব্যসনে পর্যবসিত। যদি আইন দ্বারা প্রতিকার সম্ভব হইত তবে এই সকল সুনিয়ন্ত্রিত জাতি তাহাদের রাজধানী হইতে এই পাপ বিদূরিত করিত। আমার ন্যায় সংস্কারকগণ যতই লিখুক না কেন, এই পাপের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। এদেশে প্রত্যক্ষ-ভাবে ইংরেজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব যথেষ্ট অবনতি ঘটাইয়াছে; ভারতীয় কৃষ্টির উপর তাহাদের আধিপত্য ততোধিক শোচনীয়। আমরা একদিকে রাজনৈতিক আধিপত্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতেছি, অপর দিকে তাহাদের কৃষ্টিকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। এই মোহে পড়িয়া আমরা ভুলিয়া যাই যে, কৃষ্টিগত আধিপত্য যখন সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন রাজনৈতিক আধিপত্যও চূড়ান্ত হইয়া পড়িবে। আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি

এই আভাস দিতেছি না যে, ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে এদেশে গণিকাবৃত্তি প্রচলিত ছিল না। কিন্তু দৃঢ়তার সহিত আমি বলিতে পারি, বর্তমানের ন্যায় ইহা এতটা উগ্রভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল না। সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকদের ভিতরই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। ইহা বর্তমানে মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকদের দ্রুতগতিতে সর্বনাশসাধন করিতেছে। দেশের যুবকগণ আমার আশাভরসার স্থল। ইহাদের মধ্যে যাহারা এই পাপে নিমগ্ন হইতেছে তাহারা স্বভাবতঃ কলুষিত নয়। বিবেচনার অভাবে এবং নিরুপায়ভাবে তাহারা ইহাতে আকৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহাদের এবং সমাজের কী ক্ষতি হইয়াছে তাহা তাহাদের বুঝা উচিত। তাহাদের ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, দেশকে অধঃপতনের অতল গহ্বর হইতে রক্ষা করিতে হইলে এবং নিজেদের বাঁচাইতে হইলে কঠোরভাবে সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতে হইবে। অন্যথায় তাহা সম্ভবপর হইবে না। যদি ভগবানের দিকে তাহাদের দৃষ্টি না যায়, এবং প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা ভগবানের কৃপা প্রার্থনা না করে, প্রাণহীন নিয়মানুবর্তিতার বহুল অনুশীলনেও তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে না। গীতায় ঋষি সত্যই বলিয়াছেন, "নিরাহার দ্বারা দেহকে সংযত করিলেও কামনা থাকিয়া যায়। ভগবানকে সাক্ষাৎ করিতে পারিলে বিষয়বাসনা দূর হয়।"* ভগবানের সাক্ষাৎ অর্থ তাঁহাকে উপলব্ধি করা। তিনি আমাদের হৃৎসিংহাসনে সর্বদা বিরাজমান। কোন প্রমাণ ব্যতিরেকেই যেমন শিশু মাতৃস্নেহ অনুভব করে, আমরাও ভগবানকে তেমন অনুভব করিতে পারি। মাতার স্নেহের অস্তিত্ব কি শিশু যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়া স্বীকার করে? অন্যের নিকট কি সে তাহা প্রমাণিত করিতে পারে? উল্লাসের সহিত সে ঘোষণা করে "ইহা আছে"। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ঠিক তাই। তিনি যুক্তিদ্বারা অধিগম্য নন। কিন্তু তাঁহাকে অনুভব করা যায়। আমরা পৃথিবীতে যেমন শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা অস্বীকার করি না তেমনি আমরা যেন তুলসীদাস, চৈতন্য, রামদাস ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক শিক্ষকগণের অভিজ্ঞতাও অস্বীকার না করি।

লেখক তাঁহার চিঠিতে উল্লিখিত বহু বিষয়ে কংগ্রেসসেবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন; যথা, থিয়েটারে যাওয়া ইত্যাদি। আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে আইন দ্বারা মানুষকে সৎপথে আনা যায় না। আমার যদি যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া কাহারও মত পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা থাকিত, আমি নিশ্চয়ই গণিকাদিগকে অভিনেত্রী হিসাবে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতে দিতাম না। সকলকে মদ্যপান এবং ধূমপান হইতে বিরত করিতাম। বিখ্যাত সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাগুলিকেও যে সকল হেয় বিজ্ঞাপন কলঙ্কিত করে, সেইগুলি সবই নিশ্চয় বন্ধ করিয়া দিতাম। কিন্তু হায়! সেইরূপ বুঝাইবার ক্ষমতা আমার নাই। থাকিলে সুখী হইতাম। এই সকল বিষয় সরকারী আইন বা কংগ্রেসের নিয়মাবলী দ্বারা পরিচালিত করিতে গেলে রোগের চেয়ে ঔষধের জ্বালা সম্ভবতঃ আরও শোচনীয় হইবে। এই সবের জন্য প্রয়োজন সুবুদ্ধিপরিচালিত, ধীর বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী জনমত। রন্ধনশালাকে পায়খানারূপে কিংবা বৈঠকখানাকে অশ্বশালারূপে ব্যবহার করিবার বিরুদ্ধে কোন আইন নাই।

* বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে॥—গীতা ২।৫৯

কিন্তু জনমত অর্থাৎ সর্বসাধারণের রুচি এই প্রকার ব্যবস্থা সমর্থন করিবে না। জনমতের অভ্যুদয় কোন কোন ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাই একমাত্র কার্যকর উপায়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৭-'২৫]

৫৮

আমাদের দুর্গতা ভগিনীগণ

দাক্ষিণাত্যে যতগুলি অভিনন্দনপত্র আমি পাইয়াছি তন্মধ্যে দেবদাসীদের দেওয়া অভিনন্দন অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী। মিষ্ট ও সাধু ভাষায় বেশ্যাদিগকে দেবদাসী বলা হয়। যে গোষ্ঠী হইতে এই সকল ভগিনীস্থানীয়া অভাগিনীদিগকে আনা হয়, সেই গোষ্ঠীর লোকেরাই এই অভিনন্দনপত্র রচনা করিয়া আমাকে দেন। যাঁহারা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট জানিতে পারি যে, ভিতর হইতে সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। সাক্ষাৎকারী ভদ্রমহোদয়রা বলিলেন যে, এই সংস্কারের প্রতি জনসাধারণ উদাসীন। কোকনদে এই বিষয়ে সর্বপ্রথম আঘাতে আমি শিহরিয়া উঠি। এবং সেখানকার লোকদিগের সহিত কথাবার্তায় বিষয়টির গুরুত্ব লাঘব করিবার চেষ্টা করি নাই। দ্বিতীয়বার ধাক্কা খাই বরিশালে: সেখানেও ভগিনী-স্থানীয়া বহু অভাগিনীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তাহাদিগকে "দেবদাসী"ই বল বা অন্য কোন নামে অভিহিত কর, সমস্যা একই। বহু নারী পুরুষের ইন্দ্রিয়লালসার ইন্ধনস্বরূপ সতীত্ব বিকাইয়া দিতেছে, ইহা ঘোর লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয় এবং গভীর হীনতার পরিচায়ক। আইনরচয়িতা পুরুষরা তথাকথিত দুর্বলতর নারীসমাজের উপর যে হীনতা বা অমর্যাদার ভাব চাপাইয়াছে তাহার জন্য ভীষণ শাস্তি তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। পুরুষের মোহজাল ছিন্ন করিয়া নারী যখন আত্মগৌরবের ভিতের উপর দাঁড়াইবে এবং পুরুষের রচিত আইন এবং পুরুষের কল্পিত অনুষ্ঠানসকলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে, সেই বিদ্রোহ যদি অহিংসপথে চালিত হয়, অমোঘ ফল প্রসব করিবে। ভারতের প্রত্যেক পুরুষের কর্তব্য এই সকল হাজার হাজার ভগিনীর অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করা; তাহাদেরই অবৈধ নীতিবিগর্হিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ইহারা পাপজীবন বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা আরও পরিতাপের বিষয়, যে সকল লোক এই সব কদর্য পাপের আগারে গমনাগমন করে তাহাদের অধিকাংশই বিবাহিত এবং সেইজন্য তাহারা দ্বিগুণ পাপ করে; পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে পাপাচরণ করে এবং সহোদরা ভগিনীর ন্যায় যাহাদের পবিত্রতা অত্যন্ত গৌরবের সহিত তাহাদের রক্ষা করা উচিত সেই সকল ভগিনীর উপরে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আমরা

গণ যদি আমাদের আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ হই তবে এই পাপ একদিনের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না।

ক্ষুধার্ত মানুষ যদি একটি কলা চুরি করে তবে অপরাধ হয়; অভাবে পড়িয়া যুবক পকেট মারিলে অপরাধ হয়। আমাদের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত বলিয়া যাহারা পরিচিত সেই সকল লোক যদি এই পাপে নিমগ্ন না থাকিত তবে এই প্রকারের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পূর্বোক্ত অপরাধ হইতে গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। চুরি করা এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট করা, এই উভয়ের মধ্যে সমাজের পক্ষে কোন্‌টি অধিক অকল্যাণকর বা গর্হিত? আমায় যেন কেহ না বলে, আত্মবিক্রয়ে পতিতার সম্মতি ও সাহচর্য থাকে, কিন্তু ঘোড়দৌড়ে লক্ষপতি এবং গাঁটকাটার তেমন যোগ থাকে না; তাহা হইলে বলিব, যে দুষ্ট বালক পকেট কাটে এবং যে দুষ্টলোক তাহার শিকারকে ঔষধপ্রয়োগে অচেতন করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তির দলিল লিখাইয়া লয়—এই উভয়ের মধ্যে কে অধিক অপরাধী? পুরুষ কি নানা সূক্ষ্ম কৌশলে এবং অসদুপায়ে প্রথমে নারীকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্বভাবজাত সতীধর্মকে অপহরণ করে না? এবং তৎপর তাহার উপর পাপাচরণ করিয়া তাহাকেই পাপপথে সহকারিণী করিয়া তোলে না? অথবা "পঞ্চমাঙ্গের" ন্যায় কোন কোন শ্রেণীর নারী কি লাঞ্ছিত জীবনযাপন করিবার জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে? বিবাহিত, অবিবাহিত প্রত্যেক যুবককে আমি যাহা লিখিলাম তাহার গূঢ় অর্থ অনুধাবন করিতে বলি। এই সামাজিক ব্যাধি, এই নৈতিক কুষ্ঠ সম্বন্ধে আমি যে সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছি তাহা সব লিখিয়া উঠা যায় না। কল্পনার সাহায্যে বাকীটুকু পূরণ করিয়া লইতে হইবে এবং যদি সে নিজে এই দোষে দোষী হইয়া থাকে তবে যেন লজ্জায় নতশিরে এবং ভয়ে কম্পিত হইয়া সেই পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়। প্রত্যেক পূতচরিত্র ব্যক্তি যেখানেই থাকুন, তাঁহার চতুর্দিকে পবিত্রতার হাওয়া সৃষ্টি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। আমি জানি শেষের কথাটি বলা সহজ কিন্তু কাজে পরিণত করা কঠিন। বিষয়টি গুরুতর এবং গুরুতর বলিয়াই প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। অভাগিনীদের ভিতর কাজ করিতে হইলে সেই কাজ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। যাহারা গণিকালয়ে গমন করে তাহাদের মধ্যেও কাজ করিবার কথা আমি বলিব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৪-'২৫]

৫৯

দ্বিগুণ অপরাধ

এই নৈতিক কলুষ আরও গভীরভাবে আঘাত করিয়াছিল গান্ধীজীকে। এই নারীগণ তাহাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একত্রে উপবিষ্ট ছিল; লোকচক্ষে ইহা মর্মান্তিক ব্যাপার। সামাজিক প্রথার নামে এই শয়তানের খেলা তাহাদিগকে যে বিপন্ন অবস্থায় ফেলিয়াছে তাহা হইতে কী উপায়ে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে উভয় পক্ষের কেহই তাহা জানিত না। সকলেই অসহায়ভাবে বলিয়া উঠিল, "আমাদের কেহই এই পাপজীবন পছন্দ করি না, কিন্তু কী উপায়ে আমরা বাঁচিব"? "আচ্ছা, যদি আমি পবিত্র পরিবেশের মধ্যে তোমাদিগকে লইয়া গিয়া উপযুক্ত খাওয়া-পরা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে তোমরা কি পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যাইবে না?"—গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল "হাঁ"। কিন্তু এ বিষয়ে গান্ধীজীর নিকট ভ্রান্তির স্থান ছিল না। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বিষয়টির উল্লেখ করেন এবং অগ্নিময়ী বাণীর তেজে পতিতাগণের অর্ধসুপ্ত বিবেককে প্রদীপ্ত করিয়া তুলেন।

"তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে যখন এই ঘৃণিত প্রথার মর্ম অনুভব করিতেছিলাম তখন অসদুদ্দেশ্যে নাবালিকাদের দেবতার নামে উৎসর্গ করার বিরুদ্ধে আমার সমগ্র আত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাদিগকে 'দেবদাসী' আখ্যা দিয়া ধর্মের নামে আমরা স্বয়ং ভগবানের নামে কলঙ্ক ঘোষণা করি; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুইটি অপরাধ করি—আমাদের ইন্দ্রিয়লিপ্সা তৃপ্তির জন্য এই সকল ভগিনীকে নিয়োজিত করি এবং একই বিশ্বাসে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া থাকি। যখন ভাবি একদল লোক এই পাপকাজে নিরত রহিয়াছে এবং অপর একদল লোক তাহাদের এই বীভৎস পাপকে প্রশ্রয় দিয়া যাইতেছে তখন জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া পড়ি। আমি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি, যখন আমি তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলাম, তাহাদের চোখে কুৎসিত কিছু দেখিতে পাই নাই; এবং অপর যে কোন নারীর ন্যায় রুচি মার্জিত এবং চরিত্র বিশুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। আমাদের আপন ভগিনী এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? আমাদের নিজ ভগিনীগণকে আমরা পাপকাজে লিপ্ত হইতে দিই না—কোন্ সাহসে ইহাদিগকে তাহা করিতে দিই? যে সকল হিন্দু কোন না কোন ভাবে এই সকল বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তাঁহারা সমাজের এই কণ্টক দূরীভূত করুন। আমি তাহাদিগকে যে আশা দিয়াছি তাহা কাজে পরিণত করিতে পারিলে তাহাদের অধিকাংশই এই পাপপথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু যদি তাহারা তাহা না পারে তবে যে সমাজে তাহারা এরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছে সেই সমাজকে আমি দোষী করিব—তাহাদিগকে নয়। এই সকল ভগিনীকে সহায়তা করা এবং যাহাতে এই পাপপঙ্কিল জীবন হইতে তাহারা উদ্ধার পায় সেজন্য চেষ্টা করা আপনাদের কর্তব্য। আমি জানি, পুনরায় যখন প্রলোভন তাহাদের সম্মুখে আসিবে, তাহা প্রতিরোধ

করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে। যদি পুরুষ তাহার লিপ্সা সংযত করে এবং সমাজ এই পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে অতি সহজেই সমাজ হইতে এই পাপ দূরীভূত করা সম্ভবপর হইবে।"*

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-২-'২৭]

৬০

দেবদাসী

অক্লান্তকর্মী ডাঃ এস্. মথুলক্ষ্মী রেড্ডী লিখিতেছেন—"আপনি হিন্দু দেবালয়ে দেবদাসীপ্রথার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নিন্দা করিতেছেন দেখিয়া আমি এই অমঙ্গল দূর করিবার মহৎ কাজে আপনার সহায়তা প্রার্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি। এই প্রদেশে (মাদ্রাজ) ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ বলিয়া মনে হইতেছে। তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা এবং এমনকি খ্যাতনামা কংগ্রেসসেবিগণের অনেকেই আমার সংস্কারমূলক কাজগুলির বিরোধিতা করিতেছেন এবং এই কুখ্যাত প্রথা সমর্থন করিতেছেন।

"মৎকর্তৃক আনীত দেবদাসী বিল আইনে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ইনামভোগী দেবদাসীগণের প্রতিই প্রযোজ্য। দেবদাসীদের অপর একটি অংশ আছে—যাহারা দেবতার নামে নিজদিগকে উৎসর্গ করে, শুধু ব্যভিচার দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিবার জন্য। ইহা শিশুদিগকে লইয়া পেশাদারী ব্যবসা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ শিশুদিগকে ক্রয় করা হয়; তাহারা হিন্দু আইনমতে পোষ্যসন্তানরূপে গৃহীতও হইয়া থাকে। যে বয়সে তাহাদিগকে এই জঘন্য জীবনযাত্রায় প্রবৃত্ত করানো হয় তখন তাহারা নিষ্পাপ এবং নিজের বিবেচনামতে কোন বিষয় বিচার করিতে বা কোন কাজ করিতে অসমর্থ। এই পাপজীবনের শৃঙ্খল হইতে তাহারা মুক্ত হইতে প্রায়ই সমর্থ হয় না। এই সমাজের সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোকের নিকট হইতে আমি বহু আবেদন ও স্মারকলিপি পাইয়াছি—যেসকল পাপিষ্ঠ শিশুদিগের শরীর ও আত্মা নিয়া এই ব্যবসা চালায় তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদানের জন্য আইন পাশ করাইতে আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

"দণ্ডবিধি আইনের ৩৭২ এবং ৩৭৩ ধারাগুলি এই ক্ষেত্রে কার্যকর হয় নাই। সেইজন্য আর একটি বিলের আমি নোটিশ দিয়াছি এবং উহার সফলতার জন্য আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। কেহ কেহ এই তর্ক তুলিবেন যে, যতদিন জনসমাজ এই প্রথার মন্দ দিকটা হৃদয়ঙ্গম না করিবে ততদিন আইনদ্বারা কোন

* তামিলনাদে মায়াভরমে গান্ধীজীর সফর বিবরণী হইতে উদ্ধৃত।

উপকার হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে—জনসমাজের বিশিষ্ট অংশ এই অবিচার উপলব্ধি করিতেছে। এখন আমারও এই প্রতীতি হইতেছে যে, যদি আইনসিদ্ধ কোন ক্ষমতা থাকিত তবে আমিও অপরাধী পিতামাতার হস্ত হইতে এই সকল বালিকাদের অনেককে রক্ষা করিতে পারিতাম।

"দেবদাসীদের নিজ সমাজের ভিতরও বিশেষ জাগরণ আসিয়াছে এবং তাহারা ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য চালাইতেছে। কিন্তু উচ্চবংশজাত লোকেরা এই সমাজের সংস্কার-প্রচেষ্টাতে কোনরূপ সহায়তা করিতেছে না দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি। তদুপরি অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায়, এমনকি বোম্বাই, বাঙ্গলা প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও এই প্রদেশে শিশু-সংরক্ষণী আইন নাই বলিলেই হয়।

"আমরা জানি, স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় ও নৈতিক সংস্কারগুলির অনুকূলে জনমত গঠিত হওয়ার পূর্বেই সভ্যতায় অগ্রগামী দেশগুলিতে সর্বদা এই সকল সংস্কার সাধিত হইয়াছে। এই প্রদেশে গভর্নমেণ্টকে ততটা দোষ দেওয়া যায় না; এই প্রদেশের অভিজাতবর্গ উপযুক্তরূপে এই বিষয়টি গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না যে, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল শিশুই আমাদের যত্ন ও সহানুভূতির পাত্র; এই নির্দোষ শিশুদিগকে এই ভয়াবহ জীবন যাপনের গ্লানি ও কালিমা হইতে মুক্ত করার জন্য তাঁহাদিগকে জাতি ও বর্ণগত সকল প্রকার কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে দাঁড়াইতে হইবে।"

—আমি আন্তরিকতার সহিত লেখিকার প্রস্তাব সমর্থন করি। বস্তুত আমার বিবেচনায় প্রস্তাবিত আইন সময়োপযোগীই হইবে; জনমত প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। সমগ্র প্রকাশ্য শিক্ষিত জনমত কোনও আকারে বা প্রকারে এই প্রথা প্রচলিত রাখিবার বিপক্ষে রহিয়াছে। জনমত বিরুদ্ধে থাকিলে, আফিমের আড্ডাগুলি বজায় রাখিবার পক্ষে সেগুলির মালিকদের মতের যেমন কোন মূল্যই থাকে না; সেইরূপই এই পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত লোকদের মতেরও কোন মূল্য নাই। দেবদাসীপ্রথা সমর্থনকারীদেরই কলঙ্কস্বরূপ। জনসাধারণ জড়ভাবাপন্ন না হইলে ইহা বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হইত। যে কারণেই হউক, এই দেশে জনসাধারণের হিতাহিত জ্ঞান সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনেক অন্যায় বিষয়ের ভয়াবহ গুরুত্ব প্রায়শঃ অনুভব করিয়াও ঔদাসীন্য এবং মানসিক জড়তাবশতঃ ইহারা প্রতিকারে অগ্রসর হইতে চায় না। ডাক্তার রেড্ডির ন্যায় কোন উদ্যোগী কর্মী ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে এই উদাসীনতার মধ্যেও জনগণের শুভবুদ্ধি যতটুকু সম্ভব সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবে। আমার মতে ডাঃ রেড্ডির প্রস্তাব খুব সময়োপযোগী। পূর্বেই এই প্রকার আইন বিধিবন্ধ করা উচিত ছিল। অন্ততঃ আমি আশা করি যাঁহারা ধর্মজীবনে এবং সাধারণ সামাজিক জীবনে পবিত্রতার অনুরাগী, তাঁহাদের সকলের আন্তরিক সহানুভূতি তিনি পাইবেন।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৮-'২৯]

৬১

ভারতের নারীগণের প্রতি

প্রিয় ভগিনীগণ, লোকমান্য তিলকের স্মৃতিতর্পণে বোম্বাই নগরীতে বিগত ৩১শে জুলাই যাজ্ঞিক অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বিলাতী কাপড় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিবার শেষ তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর নির্ধারিত করিয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি অত্যন্ত গুরুতর সিদ্ধান্ত করিয়াছে। বহুমূল্য শাড়ী এবং অন্যান্য পোশাকের বিশাল স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিবার সুযোগ আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল শাড়ী এবং পোশাক এযাবৎ আপনারা সৌখিন এবং সুন্দর বলিয়া বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন। আমি মনে করি, মূল্যবান কাপড়গুলি সমর্পণ করা ভগিনীদের পক্ষে উপযুক্ত এবং বুদ্ধিমত্তার কাজ হইয়াছে। প্লেগ-বিষ-সংক্রামিত দ্রব্যাদির ন্যায় ইহার ধ্বংসই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং মিতব্যয়িতার পরিচায়ক। রাষ্ট্রীয় সমাজের আরো গুরুতর ব্যাধিসমূহ নিবারণের উদ্দেশ্যে এই অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল।

বিগত এক বৎসর যাবৎ ভারতের নারীগণ মাতৃভূমির যে সেবা করিয়াছেন তাহা আশ্চর্যরূপে ফলপ্রসূ হইয়াছে। দয়ার মূর্তিমতী দেবদূতরূপে আপনারা নীরবে কাজ করিয়া গিয়াছেন। আপনাদের সুন্দর বহুমূল্য অলঙ্কার ও নগদ টাকা আপনারা অকাতরে দান করিয়াছেন। অর্থসংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়াছেন। কেহ কেহ প্রহরীর কার্যও (পিকেটিং) করিয়াছেন, যেন নিষিদ্ধ দ্রব্য কেহ ব্যবহার না করিতে পারে। কেহ কেহ বিচিত্রবর্ণের নানারকম মনোহর পোশাক ব্যবহার করিতেন এবং তাহাও দিনে কয়েকবার বদল হইত; তাঁহারা এখন নির্মল শুভ্র খাদির মোটা শাড়ি পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নারীর স্বভাবজাত পবিত্রতার বিষয়ই খাদি স্মরণ করাইয়া দেয়। ভারতের জন্য, খিলাফতের জন্য এবং পাঞ্জাবের জন্য আপনারা এইসব করিয়াছেন। আপনাদের কথা বা কাজে কপটতার কোন চিহ্ন নাই। রাগ ও দ্বেষ বিবর্জিত সর্বাপেক্ষা পবিত্র ত্যাগ আপনাদেরই। আপনাদের নিকট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, সারা ভারতবর্ষব্যাপী আপনাদের স্বপ্রণোদিত প্রেমের আহবান আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করিয়াছে যে ভগবান আমাদিগের সহায়। আমাদের সংগ্রাম যে আত্মশুদ্ধির সংগ্রাম তাহার আর কোন প্রমাণ দরকার করে না—কারণ লক্ষ লক্ষ ভারতের নারী তাহাতে যোগদান করিয়া সহায়তা করিতেছেন।

আপনারা যথেষ্ট দান করিয়াছেন, কিন্তু এখন আরো কাজ আপনাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডের যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পুরুষেরা দান করিয়াছে। আপনারা যদি সবার চেয়ে বেশী অংশ দান করেন তবেই স্বদেশী কর্মতালিকানুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হইবে। আপনারা যদি আপনাদের যাবতীয় বিদেশী বস্ত্রসম্ভার পরিত্যাগ না করেন তবে বিলাতী বস্ত্র বর্জন (বয়কট) সাফল্যমণ্ডিত করা অসম্ভব হইবে। রুচি যতদিন থাকিবে ততদিন সম্পূর্ণ ত্যাগ অসম্ভব। বয়কটের অর্থই সম্পূর্ণ ত্যাগ। ভগবান কৃপা করিয়া আমাদিগকে যে সন্তানসন্ততি দেন কৃতজ্ঞতাভরে আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি;

তদ্রূপ ভারতমাতা আমাদিগকে যে বস্ত্র উৎপন্ন করিয়া দিবেন আমাদের তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অপরের নিকট কুৎসিত হইলেও কোন মাতা তাহার সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছে এমন কেহ শোনে নাই। ভারতের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যাদি সম্বন্ধেও ভারতবর্ষের দেশপ্রেমিকা নারীদের সেইরূপ করিতে হইবে। এবং আপনাদের জন্য হাতে-কাটা এবং হাতে-বোনা জিনিসই ভারতের উৎপন্ন শিল্প বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যুগ পরিবর্তনের সময় আপনারা মোটা সুতার খাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাইবেন। আপনাদের রুচি অনুযায়ী সর্বপ্রকার শিল্পচাতুর্য তাহাতে যোগ করিতে পারেন। এক সময়ে এদেশের সূক্ষ্ম মূল্যবান এবং বঙ্গীন বস্ত্রসম্ভার সমগ্র পৃথিবীর ঈর্ষা এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; আপনারা কয়েকটি মাস মোটা খদ্দরে সন্তুষ্ট থাকিলে সেই পুরাতন লুপ্ত শিল্পকলার পুনরভ্যুদয় দেখিতে পাইবেন আশা করা যায়। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ছয়মাস কাল আত্ম-ত্যাগের অনুশীলনের পর দেখিতে পাইবেন যাহা আজ শিল্পকলার উৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে তাহা ভ্রান্ত ধারণাজাত এবং প্রকৃত কারুকলার সৌন্দর্য শুধু বাহ্যিক বর্ণ ও গঠনের উপর নির্ভর করে না,—তাহার অন্তর্নিহিত ভাবই সেই সৌন্দর্যের প্রকৃত উপাদান। একপ্রকার কলা মানুষকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া লয় এবং আর একপ্রকার কলা মানুষকে জীবন দান করে। পাশ্চাত্য বা সদূর প্রাচ্য হইতে আমরা যে সূক্ষ্ম এবং সৌখিন বস্ত্রাদি আমদানি করিয়াছি তাহা আমাদের লক্ষ লক্ষ ভ্রাতাভগিনীকে বস্তুতঃ মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়াছে এবং হাজার হাজার প্রিয় ভগিনীকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিয়াছে। প্রকৃত কারুকলার মধ্যে রচয়িতার আনন্দ, শান্তি, সন্তোষ, তৃপ্তি এবং পবিত্রতা আত্মপ্রকাশ করে। যদি আমাদের মধ্যে এইরূপ কলা পুনরুজ্জীবিত করিতে চান তবে বর্তমানে আপনাদের মধ্যে যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ-স্থানীয়া তাঁহাদিগকে অবশ্যই খদ্দর ব্যবহার করিতে হইবে।

স্বদেশী আন্দোলন সফল করিয়া তুলিতে হইলে শুধু খাদি ব্যবহারই যে আবশ্যক তাহা মনে করিবেন না, অবসর সময়ে আপনাদের প্রত্যেকের সুতাকাটা অবশ্য করণীয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদিগকে এবং বালকদিগকে আমি সুতা কাটিতে উপদেশ দিয়াছি। আমি জানি, তাহারা হাজারে হাজারে প্রত্যহ সুতা কাটিতেছে। কিন্তু প্রাচীন কালের ন্যায় সুতাকাটার ভার প্রধানতঃ আপনাদের উপরই পড়িবে। দুইশত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের নারীদের কাটা সুতা স্বদেশের চাহিদা মিটাইয়া বিদেশেও প্রেরিত হইত। তাহারা শুধু মোটা সুতাই কাটিত না, তাহাদের সুতা পৃথিবীর মধ্যে ছিল সূক্ষ্মতম। আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ সূক্ষ্ম সুতা কাটিতেন কোন যন্ত্রদ্বারা আজ পর্যন্ত সেরূপ করিতে পারা যায় নাই। যদি আমরা খাদির চাহিদা মিটাইতে চাই তবে এই দুই মাসের মধ্যে এবং তৎপর আপনাদিগকে সুতা কাটিবার সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে; সুতাকাটার প্রদর্শনী করিতে হইবে এবং হাতে-কাটা সুতা দ্বারা ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতে হইবে। এই কাজের জন্য আপনাদের মধ্যে কয়েকজনকে সুতা কাটায়, সুতা পেঁজায় এবং চরকার অংশগুলি যথাযথরূপে সন্নিবেশ করার বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইবে। ইহার অর্থ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম। চরকাকে জীবিকানির্বাহের উপায়স্বরূপ আপনারা মনে করিবেন না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইহা পরিবারের আয়বৃদ্ধি করিবে এবং অত্যন্ত দরিদ্র স্ত্রীলোকদের পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা জীবিকার্জনের উপায় হইবে। পূর্বে যেমন ছিল,— চরকা বিধবাদের প্রিয় সহচর হইবে। যাঁহারা এই আবেদন পাঠ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা একান্ত কর্তব্য এবং ধর্মানুষ্ঠানরূপে উপস্থিত করা হইতেছে। যদি ভারতবর্ষের সঙ্গতিসম্পন্না সকল নারী দৈনিক কিয়ৎ পরিমাণে সূতা কাটেন তাহা হইলে সূতার মূল্য সস্তা হইবে। এবং অতি শীঘ্র যেরূপ সূক্ষ্ম সূতার প্রয়োজন তাহা প্রস্তুত করিতে পারিবেন; নতুবা বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী।

এইরূপে ভারতবর্ষের নৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তি প্রধানতঃ আপনাদের উপর নির্ভর করে। ভারতের ভবিষ্যৎ আপনাদের অঙ্কে ন্যস্ত রহিয়াছে। কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে আপনারাই লালন পালন করিবেন। ভারতের শিশুবৃন্দকে আপনারা সরল, ধর্মভীরু এবং সৎসাহসী স্ত্রীপুরুষ হইবার জন্য শিক্ষা দিতে পারেন অথবা অতিমাত্রায় আদর-আবদারে তাহাদিগকে জীবনসংগ্রামের অনুপযুক্ত দুর্বল মানবে পরিণত করিতে পারেন। তাহারা বিদেশী সৌখীন জিনিসের প্রতি এরূপ আসক্ত হইয়া পড়িবে যে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহা পরিত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে। আগামী কয়েক সপ্তাহের ভিতরই দেখা যাইবে ভারতের নারী কী ধাতুতে নির্মিত। আপনারা কোন্ পথ নির্বাচন করিবেন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়তি আপনাদের হাতে যেরূপ নিরাপদে ন্যস্ত করা যায়, গভর্ণমেন্টের আশ্রয়ে তেমন নিরাপদ নহে; কারণ এই শাসনতন্ত্র ভারতের সকল সম্পদ এমনভাবে শোষণ করিয়া লইয়াছে যে আজ ভারত আত্ম-শক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। নারীদের প্রত্যেক সভাতে জাতীয় উন্নয়নপ্রচেষ্টায় আপনাদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়াছি এবং এই বিশ্বাসে ইহা করিয়াছি যে আপনারা পবিত্র, সরল এবং ধর্মভীরু এবং সেইজন্য আপনাদের আশীর্বাদ অমোঘ হইবে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন করিয়া এবং জাতির কল্যাণে অবিশ্রান্তভাবে আপনাদের অবসর সময়ে সূতা কাটিয়া আপনাদের সেই আশীর্বাদ সফল করুন।

আপনাদের অনুগত ভ্রাতা,
এম. কে. গান্ধী

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-'২১]

৬২

নারীর কর্তব্য

খাদি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে গিয়া কলিকাতার নারীগণ সেখানে পুরুষদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। এই মর্মে সংবাদপত্রের তারের খবরে প্রকাশ যে, সেইজন্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির নির্বাচিত সভাপতি

মহাশয়ের পতিপরায়ণা পত্নী, তাঁহার বিধবা ভগিনী এবং তাঁহার ভাগিনেয়ী এই দলের ভিতর আছেন। আমার ভরসা ছিল যে আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় অন্ততঃ নারীদিগকে কারাগারে যাইবার সম্ভ্রম হইতে দূরে রাখা হইবে। আইন অমান্য আন্দোলন বলপ্রয়োগে চালাইতে তাহারা প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার স্ত্রীপুরুষের প্রতি কোন ভেদ না দেখাইয়া নিরপেক্ষ উৎসাহের সহিত কলিকাতার এই তিনটি মহিলাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করিয়াছেন। সমগ্র দেশ, আশা করি, এই নূতন পদ্ধতি সাদরে অভ্যর্থনা করিবে। স্বরাজলাভের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের নারী পুরুষের সহিত সমান অংশ গ্রহণ করিবে। সম্ভবতঃ এই শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে নারী পুরুষকে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া যাইতে পারিবে। নারী সর্বদাই পুরুষ হইতে অধিক ধর্মপরায়ণা, ইহা আমরা জানি। নীরবে এবং মর্যাদার সহিত দুঃখ-বরণ নারীজাতির বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গলা সরকার নারীদের যুদ্ধের পুরোভাগে টানিয়া লইয়াছে; আমি আশা করি, সমগ্র ভারতের নারীগণ যুদ্ধের এই আহ্বানে সাড়া দিয়া নিজদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে। যথেষ্টসংখ্যক পুরুষকর্মিগণকে সরাইয়া লইবার পর যে কোন অবস্থাতেই নারীজাতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদের শূন্যস্থান পূরণ করা নারীদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে কারাজীবনের দুঃখকষ্ট তাহারা পুরুষদের সঙ্গে পাশাপাশি সহ্য করিবে। ভগবান তাহাদের মর্যাদা রক্ষা করিবেন। পুরুষজাতিকে উপহাস করিবার ছলে যখন দ্রৌপদীর স্বাভাবিক ভর্তা ও রক্ষকগণ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হওয়ার অপমান হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন তিনি আপন ধর্মবলে নিজ সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। চিরকাল এইরূপ হইবে। শারীরিক বলে সর্বাপেক্ষা দুর্বল ব্যক্তিগণকে নিজ সম্মান রক্ষা করিবার ক্ষমতা ভগবান দিয়াছেন। নারীকে রক্ষা করা পুরুষের গৌরবের বিষয় হউক; কিন্তু পুরুষেরা না থাকিলে বা পুরুষ নারীকে রক্ষা করিবার পবিত্র কর্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইলে ভারতবর্ষের কোন নারীই যেন নিজেকে অসহায় মনে না করে। যে নারী বা পরুষ কীরূপে প্রাণ দিতে হয় জানে তাহার কোন ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষের নারীদিগেক এই উপদেশ দিতেছি—তাঁহারা কালক্ষেপ না করিয়া শান্তভাবে যে সকল নারী সংগ্রামের পুরোভাগে যাইতে প্রস্তুত তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করুন। বাঙ্গলার মহিলাদের নিকট তাঁহাদের প্রস্তাব পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে বুঝিতে দেওয়া হউক তাঁহাদের মহৎ দৃষ্টান্ত অন্য প্রদেশের ভগিনীরাও অনুসরণ করিতে প্রস্তুত। কারাজীবনের দুঃখকষ্ট এবং আনুষঙ্গিক যাহা কিছু নারীদিগের বিবেচ্য তাহার সম্মুখীন হইবার সাহস হয়ত অনেকেরই হইবে না। যদি অল্প কয়েকজনও সর্বপ্রথম ত্যাগের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করে, জাতির পক্ষে লজ্জিত হইবার কারণ নাই।

পুরুষদিগের কর্তব্য সুস্পষ্ট। বিচলিত হইয়া বিচারবুদ্ধি হারাইলে চলিবে না। শুধু উত্তেজনা সৃষ্টি দ্বারা নারীদিগকে বা দেশকে রক্ষা করা যায় না। নারীদিগকে বা শিশুদিগকে রেহাই দিতে আমরা গভর্ণমেণ্টকে বলি নাই। পাঞ্জাবে সামরিক আইন প্রচলনের সময় গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই তাহা করে নাই। অখ্যাতনামা বসওয়ার্থ স্মিথ পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালার নারীদের প্রতি থুথু ফেলিয়া, গালি-

গালাজ করিয়া এবং অন্যান্য প্রকারে অপমানিত করিয়াছিল; কলিকাতার ভগিনীগণ তথাকার রাজপুরুষদের মতে অপরাধ করিয়াছেন এই আইনের ধুয়া দিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহারা গ্রেপ্তার করিয়াছেন; অবশ্য ইহা আগের ঘটনার চেয়ে নিশ্চয়ই অধিকতর সভ্যতার পরিচায়ক। জনসাধারণের সেবা করিতে গেলে যদি তাঁহারা নারীগণকে গ্রেপ্তার করেন তবে কারাগারবরণের জন্য মহিলাদের আমরা আহ্বান জানাই। আমাদের নারীগণ স্বদেশীর মন্ত্র প্রচার করিবে এবং গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের মূল পর্যন্ত ধ্বংস করিবে, আর গভর্ণমেণ্ট উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবে ইহা আমরা আশা করিতে পারি না। বিলাতী বস্ত্রের ব্যবসায় এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের সম্পদ লুটিয়া লইবার ক্ষমতাই বিদেশী গভর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের মূলে। সেইজন্য যদি আমরা পুরুষেরা আমাদের ভগিনীদিগকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিতে দিই তবে পুরুষদের সংগে নারীদিগকেও কারাগারে প্রেরণ করিবার অধিকার গভর্ণমেণ্টের আছে, ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১২-'২১]

২

নারী ত্যাগের প্রতীক। সৎ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি যখন কোন কাজে প্রবৃত্ত হন তখন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। আমাদের নারীদিগকে আমরা ভ্রমপথে চালিত করিয়াছি; আমরা সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে অবহেলা করিয়াছি। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে চরকা তাঁহাদিগকে ঠিকপথে পরিবর্তিত করিয়া আনিতেছে। যে সকল নেতা এবং অন্যান্য ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের সুনজরে আছেন তাঁহারা সকলেই যখন কারাগারে যাইবার সম্মান লাভ করিবেন তখন ভারতের নারীগণ তাঁহাদের অসমাপ্ত কাজ অধিকতর সুষমার সহিত সমাপ্ত করিবেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-১২-'২১]

৬৩

ভারতের নারীদের প্রতি

এই সত্যের সংগ্রামে কতিপয় ভগিনীর যোগদান করিবার একান্ত আগ্রহ আমি শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। লবণকরের বিরুদ্ধে এই অভিযান যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, আমরা ইহা দেখিতে পাইতেছি, যদি নারীদিগকে ইহাতে আবদ্ধ রাখা যায় তবে অশেষ ক্ষতির কারণ হইবে। তাহারা জনসমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে এবং

যে দুঃখবরণের তৃষ্ণা তাহাদের মনে জাগিয়াছে তাহা তৃপ্ত করিবার উপাদান সেখানে নাই।

এই অহিংস সংগ্রামে পুরুষ অপেক্ষা তাহাদের দান অনেক বেশী হইবে। নারীকে পুরুষ হইতে দুর্বল বলিয়া অভিহিত করা মিথ্যা অপবাদ; ইহা নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার। যদি শক্তি দ্বারা পশুবল বুঝিতে হয় তবে নারী পুরুষ হইতে বাস্তবিক কম শক্তিশালিনী; যদি শক্তি দ্বারা নৈতিক বল বুঝিতে হয় তবে পুরুষ হইতে নারী অধিক শক্তিশালিনী। তাহাদের স্বভাবজাত বুদ্ধি, আত্মত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য এবং সাহস কি পুরুষের চেয়ে অধিক নয়? নারী ব্যতিরেকে পুরুষের অস্তিত্ব থাকিত না। যদি অহিংসা আমাদের জীবনের মূল নীতি হয় তবে দেশের ভবিষ্যৎ নারীর হাতে।

বহু বৎসর হইতেই এই ধারণা আমি পোষণ করিয়া আসিতেছি। যখন আশ্রমের মহিলাগণ পুরুষদের সহিত তাঁহাদিগকেও সঙ্গে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, আমার অন্তর হইতে এই নির্দেশ পাই যে শুধু লবণ আইন ভঙ্গ করার চাইতে মহত্তর কাজ করিবার সৌভাগ্য তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আমার মনে হয় সেই কাজের সন্ধান এখন আমি পাইয়াছি। ১৯২১ সালে পুরুষগণ মাদকদ্রব্য এবং বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিয়া সাময়িকভাবে আশাতীতরূপে সেই আন্দোলনে কিয়দ্দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু হিংসার ভাব ক্রমশঃ প্রবেশ করায় তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। যদি প্রকৃত জাগরণ সৃষ্টি করিতে হয় তবে পুনরায় প্রহরীর কার্যে অবতীর্ণ হইতেই হইবে। যদি শেষ পর্যন্ত ইহা শান্তিপূর্ণ থাকে তবে এই উপায়ে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিতে পারা যাইবে। জোর করিয়া ইহা কখনও করা যাইতে পারে না; নৈতিক যুক্তিদ্বারা মনের পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে। নারী ব্যতীত অন্তর স্পর্শ করে এমন সনির্বন্ধ অনুনয় আর কেহ সফলতার সহিত করিতে পারে কি?

শেষ পর্যন্ত মদ্য ও মাদকদ্রব্যাদি নিবারণ এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন আইনের সাহায্যে করিতে হইবে; কিন্তু সুস্পষ্টভাবে সমাজের নিম্নস্তর হইতে জনমতের চাপ না দিতে পারিলে আইন কখনই বিধিবদ্ধ হইবে না।

এই দুইটি বিষয়ই যে জাতির মঙ্গলের জন্য অত্যাবশ্যক, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। মদ্য এবং মাদকদ্রব্য সেবন করা যাহাদের অভ্যাস তাহাদের নৈতিক জীবন সমূলে ধ্বংস হয়। বিদেশী বস্ত্র জাতির অর্থনৈতিক ভিত্তির মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে বেকার করিয়া দেয়। উভয়-ক্ষেত্রেই গৃহে গৃহে নারীগণ এই দুরবস্থা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেন। যে সকল গৃহে পূর্বে একসময় শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করিত, সেখানে মদ এবং মাদকদ্রব্যের সহিত পাপ প্রবেশ করিয়া পরিবারের কী সর্বনাশ সাধন করে তাহা মদ্যপায়িগণের পত্নীগণই জানেন। বেকার থাকার কী অর্থ তাহা আমাদের গ্রামের লক্ষ লক্ষ নারীর অবিদিত নহে। আজ চরকাসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে এক লক্ষেরও উপর স্ত্রীলোক সুতা কাটিতেছে; সেই স্থলে পুরুষ সুতাকাটনীর সংখ্যা দশ হাজারের নিম্নে।

ভারতবর্ষের নারীগণ এই দুইটি কাজে হাত দিন এবং সেই কাজে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করুন; তাহা হইলে জাতীয় স্বাধীনতালাভের জন্য তাঁহাদের অবদান পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী হইবে এবং তাঁহারা অননুভূতপূর্ব আত্মপ্রত্যয় ও শক্তি অর্জন করিবেন। নারীগণের সর্নির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় বিলাতী বণিক্ ও তাহাদের ক্রেতাগণের অন্তরে পরিবর্তন আনিবে এবং মদ্যবিক্রেতা ও মদ্যপায়িগণের অন্তর বিগলিত না হইয়া পারিবে না। অন্ততঃ এই চার শ্রেণীর লোকের উপর মেয়েরা কোনরূপ জোরজুলুম করিবে বা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিবে এরূপ আশঙ্কার কোন কারণ নাই। পক্ষান্তরে এরূপ শান্তিপূর্ণ এবং নির্বিরোধ আন্দোলনের প্রতি গভর্ণমেণ্টও দীর্ঘকাল উদাসীন থাকিতে পারে না।

এই আন্দোলন কেবল মহিলাদের দ্বারাই আরম্ভ করা হইবে এবং তাহারাই ইহা নিয়মিত করিবে; ইহার বৈশিষ্ট্য এইখানে। তাহারা পুরুষদিগের নিকট আবশ্যকমতে সাহায্য চাহিতে পারিবে এবং তাহা পাইবে। কিন্তু পুরুষেরা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া কাজ করিবে।

এই আন্দোলনে শিক্ষিতা এবং অশিক্ষিতা হাজার হাজার স্ত্রীলোক যোগদান করিতে পারে।

আমার এই আবেদনের ফলে উচ্চশিক্ষিতা মহিলাগণ সর্বসাধারণের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে মিলিত হইবার সুযোগ পাইবেন। এবং তাহাদের নৈতিক এবং আর্থিক সহায়তা করিতে পারিবেন।

তাঁহারা বিদেশী বস্ত্র বর্জনের বিষয় অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে খাদি ছাড়া এই আন্দোলন অসম্ভব। কাপড়ের কলের মালিকগণ নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষের চাহিদা মিটাইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় নিকট-ভবিষ্যতে তাঁহাদের কলগুলি প্রস্তুত করিতে পারিবে না। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারিলে আমাদের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য বাড়ীতে খাদি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের নারীগণ প্রত্যেকটি অবসর-মুহূর্তে সুতাকাটায় নিয়োজিত থাকিয়া সে পরিবেশ সৃষ্টি করুন এবং নিজেরা ধন্য হউন।

খাদি প্রস্তুত করিবার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে নিশ্চয়ই উপযুক্ত সুতা কাটিতে হইবে। এই অভিযানের গত দশ দিনে অবস্থার চাপে আমি তকলীর শক্তি কী পরিমাণ তাহা বুঝিতে পারিয়াছি—তৎপূর্বে আমি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ তকলী আশ্চর্যজনকভাবে কাজ করে। অন্য কোনকাজের ব্যাঘাত না জন্মাইয়া আমার সঙ্গিগণ হাসিয়া খেলিয়া ১২-নম্বরী সুতা এই পরিমাণ কাটিয়াছে যে তাহা দিয়া দৈনিক চারবর্গগজ খাদি বোনা যাইতে পারে। সংগ্রামের কার্যপ্রণালী হিসাবে ধরিলে খাদি কখনও পরাভূত হইবে না। এই দুইটি সংস্কারকার্যের নৈতিক ফল স্পষ্টতঃই অসামান্য। রাজনৈতিক ফলও কম হইবে না। মদ্য ও মাদকদ্রব্যাদি সেবন বন্ধ করিতে পারিলে পঁচিশ কোটী টাকা আয় গভর্ণমেণ্টের কমিয়া যাইবে। বিদেশী বস্ত্রাদি বর্জন করিতে পারিলে ভারতবর্ষের বিপুল জনসাধারণের অন্ততঃ ষাট কোটী টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এই দুইটিতে কৃতকার্য হইতে পারিলে আর্থিক হিসাবে আমরা লবণ-কর প্রত্যাহার করিলে

যে লাভ হইবে তাহার চেয়ে অধিকতর লাভবান হইতে পারিব। উভয় সংস্কারের নৈতিক ফল যাহা হইবে তাহা অমূল্য, অপরিমেয়।

কোন কোন ভগিনীরা উত্তরে বলিবেন—"মাদক দ্রব্য এবং বিদেশী বস্ত্রের পিকেটিং ব্যাপারে কোন উত্তেজনা বা সাহসিকতার স্থান নাই।" এই আন্দোলনে যদি তাঁহারা মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন তবে দেখিতে পাইবেন যে ইহাতে প্রভূতপরিমাণ উত্তেজনা এবং উদ্যমের অভিনবত্ব রহিয়াছে। আন্দোলন শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁহারা নিজদিগকে কারাগারে পর্যন্ত আবদ্ধ দেখিতে পারেন। ইহা অসম্ভব নয় যে তাঁহারা অপমানিত হইবেন এবং এমনকি শরীরেও আঘাত পাইবেন। এইরূপ অপমান এবং আঘাত তাঁহাদের সংগ্রাম-জয়ে গৌরবের টিকা হইবে। যদি এইরূপ বিপদে এবং কষ্টে তাঁহারা পতিত হন তাহা হইলে উদ্দেশ্য শীঘ্রই সফল হইবে।

ভারতের নারীগণ যদি আমার আবেদনে কর্ণপাত করেন এবং তদনুযায়ী কিছু করিতে চান তবে অতি শীঘ্র তাহা করিতে হইবে। যদি এখনই সমগ্রভারত-ব্যাপী কাজ আরম্ভ করিতে না পারা যায় তবে যে সকল প্রদেশ নিজেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে তাহারা কাজ আরম্ভ করুক। অন্যান্য প্রদেশও অতি শীঘ্রই তাহাদের অনুসরণ করিবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-৪-'৩০]

৬৪

জনৈকা ভগিনীর সমস্যা

জনৈকা ভগিনী লিখিতেছেন—"খাদি ব্যবহার করা অতীব প্রয়োজনীয়—আপনার মুখনিঃসৃত এই বাণী শ্রবণ করিয়া আমি তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। আমরা গরীব। আমার স্বামী বলেন, খাদি দুর্মূল্য। মহারাষ্ট্রবাসী বলিয়া আমাদের আট গজ লম্বা শাড়ী পরিতে হয়। যদি লম্বায় ছয় গজ করা যায় তাহা হইলে অনেকটা বাঁচিয়া যায়। কিন্তু আমার অভিভাবকগণ তাহা কমাইতে দিবেন না। আমি তাঁহাদের সঙ্গে বৃথা তর্ক করিয়াছি যে খাদি পরিধান করাই অধিকতর জরুরী বিষয়—শাড়ী কী রকম হইবে, ইহা কত লম্বা হইবে. এই সকল বিষয় সম্পূর্ণ অবান্তর। তাঁহারা বলেন, আমি অল্পবয়স্কা বলিয়াই এই সকল অভিনব ধারণা আমার মাথায় ঢুকিয়াছে। আমি মনে করি যদি আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে লেখেন যে বস্ত্রপরিধানের রীতি ভঙ্গ করিয়াও খাদি ব্যবহার করা উচিত, তাহা হইলে তাঁহারা শাড়ীর দৈর্ঘ্য ঐরূপ কমাইতে সম্মত হইবেন।"—ভগিনীকে তাঁহার অভীপ্সিত উত্তর দিয়াছি। কিন্তু তাঁহার ন্যায় অন্যান্য ভগিনীরাও এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতেছেন বলিয়া বিষয়টি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

এই চিঠিতে লেখিকার প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইতেছে; স্বেচ্ছায় পুরাতন

চালচলন এবং প্রথা পরিত্যাগ করিতে অনেক ভগিনীই প্রস্তুত নন। কোনরূপে অসুবিধা ভোগ না করিয়া, বিনাব্যয়ে, পুরাতন প্রথাগুলির সংগতি বা অসংগতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া, সেইগুলিরই অনুসরণ করিয়া যে সকল ভ্রাতাভগিনী আহ্লাদের সহিত স্বরাজ লাভ করিতে চান, তাঁহাদের সংখ্যা অগণিত। কিন্তু স্বরাজ এত সস্তা জিনিস নয়। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আত্মত্যাগের প্রেরণা জোগাইতে হইবে এবং প্রাদেশিকতাও পরিত্যাগ করিতে হইবে।

প্রাদেশিকতা শুধু জাতীয় স্বরাজলাভ ব্যাহত করে এমন নয়—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনেরও পক্ষে ইহা বিঘ্ন জন্মায়। এই সংকীর্ণতার ভাব পোষণ করার জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীগণই অধিকতর দায়ী। রুচিবৈচিত্র্য বজায় রাখার সীমা আছে; সেই সীমা অতিক্রম করিলে সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং নানা লোকাচার বৈচিত্র্যের ছদ্মবেশে আসিয়া জাতিস্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করে। দাক্ষিণাত্যের শাড়ী অতি সুন্দর; কিন্তু সৌন্দর্যের খাতিরে যদি জাতিকে বলি দিতে হয় তবে সেই সৌন্দর্যের উপকরণ সর্বাংশে বর্জনীয়। যদি কচ্ছদেশীয় ছোটমাপের "শাড়ী" কিংবা পাঞ্জাবের "ওধানী" দ্বারা খাদি পরিধান সুলভ এবং সুগম করা যায় তবে সেগুলিকেই প্রকৃতপক্ষে সুন্দর বলিয়া আমরা বিবেচনা করিব। দাক্ষিণাত্যের, গুজরাটের কচ্ছ এবং বঙ্গদেশের শাড়ী পরিবার রীতি সবগুলিকেই নানাপ্রকারের জাতীয় রীতি বলিয়া ধরা যায় এবং ইহাদের প্রত্যেকটির অন্যটির ন্যায় জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেইহেতু শালীনতার ব্যাঘাত না ঘটাইয়া যে রীতি অনুযায়ী সবচেয়ে কম পরিমাণ কাপড়ে চলে, তাহাই সর্বাগ্রে গ্রহণীয়। এই বিষয়ে কচ্ছদেশীয় রীতি পুরোবর্তী স্থান অধিকার করে; লম্বায় গুজরাটী শাড়ীর অর্ধেকপরিমাণ—মাত্র তিনগজ কাপড় দরকার হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম ওজন বহন করিতে হয় বলিয়া কষ্টেরও লাঘব হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। "পাচ্চেদো" এবং পেটিকোট যদি একই রংয়ের হয় তবে তাহা শুধু "পাচ্চেদো." না পুরা মাপের শাড়ী তাহা সহজে বুঝা যায় না। এই সকল জাতীয় রীতিনীতির পারস্পরিক বিনিময় এবং অনুকরণ সর্বথা বাঞ্ছনীয়।

যাঁহারা সঙ্গতিপন্ন তাঁহারা তাঁহাদের পরিচ্ছদাগারে প্রাদেশিক রীতি অনুযায়ী যতরকম পরিধেয় আছে তাহা রাখিতে পারেন। বাঙ্গালী অতিথিগণের অভ্যর্থনাতে গুজরাটী গৃহস্বামী এবং তাঁহার পত্নী যদি বাঙ্গালীর পোশাক পরিধান করেন এবং বাঙ্গালীও গুজরাটী অতিথিকে অনুরূপভাবে সম্বর্ধনা জানান, তবে ইহা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত সৌজন্য ও দেশপ্রেমের পরিচায়ক হইবে। কিন্তু ইহা স্বদেশপ্রিয় ধনীদের পক্ষেই সম্ভবপর হইতে পারে। যে প্রাদেশিক রীতিবিশেষ খদ্দরপরিধান সুলভ এবং সুগম করিয়া তুলে, মধ্যবিত্ত ও গরীবশ্রেণীর লোকেরা সেই রীতি গ্রহণ করিয়া গৌরববোধ করিবেন এবং সেখানেও তাঁহারা সর্বাপেক্ষা গরীবদের পোশাক-পরিচ্ছদের রীতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবেন।

স্বদেশীর অর্থ এই নয় যে, লোকেরা নিজ নিজ পঙ্কিল কূপে ডুবিয়া থাকিবে; স্বদেশীর অর্থ প্রত্যেকে বিশিষ্ট জীবনধারায় সমৃদ্ধ হইয়া জাতিরূপ মহাসাগরের দিকে অভিযান করিবে। যদি প্রতিটি ধারা বিশুদ্ধ হয় তবেই না ইহা সমুদ্রকে কিছু দিবার দাবী করিতে পারে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, যে সকল স্থানীয়.

বা প্রাদেশিক রীতিনীতি অবিশুদ্ধ বা কুরুচিপূর্ণ নয় শুধু সেইগুলিই সমগ্র জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিতে পারে। এই সত্য একবার উপলব্ধি করিতে পারিলে স্বদেশপ্রেম বিশ্বজনীন প্রেমে রূপান্তরিত হইবে।

পরিধেয় বস্ত্রাদি সম্বন্ধে যাহা খাটে ভাষা সম্বন্ধেও তাহা সমভাবে প্রযোজ্য। অপর প্রদেশের পোশাক সময়বিশেষে আমরা যদি অনুকরণ করিতে পারি তবে সেরূপ ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ও আমরা ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু বর্তমানে ইংরেজী ভাষাকে গৌরবের স্থান দিতে গিয়া আমাদের সকল শক্তির অপচয় হইতেছে; এই অসম্ভব এবং মারাত্মক চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এর ফলে আমাদের মাতৃভাষাকে এবং ততোধিক অন্যান্য প্রদেশের ভাষাকে আমরা অনাদর করিতেছি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-২-’২৮]

৬৫

ইহা কি পুরুষের কাজ নয়?

জনৈক অধ্যাপক লিখিতেছেন—“চরকা এবং খদ্দরে আমার নিজের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ভারতবর্ষের সর্বসাধারণের সঙ্গে উচ্চশ্রেণীর লোকদের সাধারণ সংযোগ যে খদ্দর ব্যতীত ঘটিতে পারে না, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝি। ভারতবর্ষ বলিয়া নয়, কোনও দেশই জাতীয় সংহতি ছাড়া এবং সকলের একাত্মতার ধারণা ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না। ইহা আমি বেশ বুঝি যে যথেষ্টপরিমাণ খদ্দর উৎপাদন করিতে পারিলে বিদেশী বস্ত্রের আমদানি বন্ধ হইবে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে খদ্দরবিষয়ক কর্মতালিকা সাফল্যের সহিত অনুসরণ করিতে হইবে।

“কিন্তু আমার মতে আপনি উল্টা দিক হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুস্থ সবলকায় ব্যক্তিগণকে স্ত্রীলোকদের ন্যায় চরকা লইয়া বসিতে বলা অধিকাংশ লোকের নিকট অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। বর্তমানে যে আমরা নারীদের চেয়ে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নই এই অপবাদ আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করি। তথাপি ইহা সত্য, যে কাজ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল আমরা সকলেই সেই কাজে যোগ দিতে পারি না। পক্ষান্তরে, যদি আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম যে দেশের সকল স্ত্রীলোকই সুতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তৎসত্ত্বেও এই কাজে পুরুষদের সহায়তার প্রয়োজন তবে আমার পূর্বোক্ত ধারণা ত্যাগ করিতে পারিতাম। মেয়েরা বিলাতী শাড়ী পরিয়া গর্বের সহিত চলাফেরা করিবে আর পুরুষরা চরকায় সুতা কাটিবে—এ যেন ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুড়িবার ন্যায় একটি উদ্ভট ব্যাপার। পরন্তু ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্রের সমস্যা পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই বেশী

সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেইজন্য পুরুষদিগকে সুতা কাটিতে এবং খদ্দর বুনিতে, নারীদের ক্ষেত্রে যতটা তাহার চেয়ে বেশী চাপ দিয়া উল্টা দিক হইতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা আরম্ভ করা হইতেছে।

"আমার বিনীত মত এই যে, শুধু পুরুষদিগকে বহুমুখী রাজনৈতিক প্রচারকার্যে ব্যাপৃত রাখিয়া আপনার বাণী দেশের নারীদের নিকট সোজাসুজি প্রেরণ করা উচিত ছিল। বর্তমানে চরকা এবং খদ্দরের বৃহৎ কার্যতালিকা স্ত্রীলোকদের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিয়া পুরুষদিগকে পুরুষোচিত উপায়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে দিন।"

—চিঠিখানা বড় দীর্ঘ ছিল। ভাষার পরিবর্তন না করিয়া আমি যুক্তিটি সংক্ষেপে বলিয়াছি। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, এই সুপণ্ডিত অধ্যাপক ভারতবর্ষের নারীদের অবস্থা জানেন না। তাহা হইলে তাঁহার জানা থাকিত যে সাধারণতঃ পুরুষেরা মেয়েদের সম্মুখে কোন বক্তৃতা দিবার সুযোগ-সুবিধা পায় না। আমার সৌভাগ্য যে, আমার পক্ষে তাহা কিছুটা করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু এই সকল সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও আমি পুরুষদিগের যতটা নিকটে আসিতে পারিয়াছি, মেয়েদের নিকট ততটা পারি নাই। তাঁহার ইহাও জানা উচিত যে, পুরুষদের সম্মতি ছাড়া মেয়েরা কোন কাজ করিতেই পারে নাই। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি যেখানে পুরুষেরা নারীদিগকে চরকা এবং খদ্দর গ্রহণ করিতে বাধা দিয়াছে। তৃতীয়তঃ, পুরুষেরা যে সকল নূতন নূতন আবিষ্কার এবং পরিবর্তন উদ্ভাবন করিতে পারে নারীরা তাহা পারে না। সুতাকাটা আন্দোলন শুধু নারীদিগের মধ্যে নিবদ্ধ রাখিলে গত চার বৎসর চরকার কাঠামোয় যে সকল উন্নতি করা হইয়াছে তাহা অসম্ভব হইত এবং সুতাকাটা আন্দোলনকে যেরূপ সুনিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে তাহা হইতে পারিত না। চতুর্থতঃ, কোন বৃত্তি বা ব্যবসায় শুধু পুরুষ বা নারীর জন্য সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে নির্দিষ্ট থাকিবে, ইহা অভিজ্ঞতা-বিরুদ্ধ। রন্ধন প্রধানতঃ মেয়েদের কাজ; কিন্তু যে সৈনিক রাঁধিতে জানে না তাহাকে অকর্মণ্য বলা যায়। সৈন্যনিবাসের সমস্ত রন্ধনকার্য প্রয়োজনবশতঃ এবং স্বভাবতঃই পুরুষেরা করিয়া থাকে। পরন্তু মেয়েরা বাড়ীতে স্বভাবতঃই রান্নাবান্না করে। কিন্তু যখনই বৃহদাকারে রন্ধনকাজের সুব্যবস্থা করিতে হয়, সারা পৃথিবীময় সর্বদাই তাহা পুরুষের দ্বারা করানো হয়। যুদ্ধ করা প্রধানতঃ পুরুষের কাজ, কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক সংগ্রামগুলিতে আরব রমণীগণ তাহাদের স্বামিগণের পাশাপাশি যুদ্ধ করিয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঝান্সীর রাণী বীরত্বের জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। অতি অল্প পুরুষই সেরূপ সম্মানলাভ করিয়াছিল। বর্তমানে ইউরোপে আইনব্যবসায়ীরূপে, চিকিৎসকরূপে, রাজ্যশাসকরূপে নারীদিগের উজ্জ্বল প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। নারীগণ স্টেনোগ্রাফি এবং টাইপিস্ট-এর কাজ বা কেরাণীর কাজ প্রায় একচেটিয়া করিয়া তুলিতেছে। সুতাকাটা পুরুষের কাজ নয় কেন? অধ্যাপক মহাশয় স্বীকার করেন, সুতাকাটাতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ হইবে; যে কাজের এত মর্যাদা, তাহা পুরুষের পক্ষে উপযুক্ত বা উচিত হইবে না

কেন? অধ্যাপকমহাশয় কি জানেন না যে সূতা কাটিবার কল একজন পুরুষই আবিষ্কার করিয়াছিল? সেই আবিষ্কার তিনি না করিলে মানবজাতির ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত। সূচীশিল্প বস্তুতঃ নারীদিগেরই কাজ; কিন্তু পৃথিবীর খ্যাতনামা দর্জিরা সকলেই পুরুষ। সেলাইর কল একজন পুরুষই আবিষ্কার করেন। সিঙ্গার যদি সূচের কাজে ঘৃণাবোধ করিতেন তবে মানবজাতির জন্য তাঁহার দান রাখিয়া যাইতে পারিতেন না। যদি অতীতে পুরুষেরা ভারতের নারীগণের পাশাপাশি সূতা কাটিতে শিখিতেন তবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌরাত্ম্যে আমরা সম্ভবতঃ সূতাকাটা একেবারে ছাড়িয়া দিতাম না। রাজনীতিবিদ্ নিছক রাজনীতিতে যত খুশী আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু যদি লক্ষ লক্ষ লোকের সমবেত চেষ্টায় আমাদের বস্ত্রের সংস্থান করিতে হয় তবে দেশের রাজনীতি-বিদ্, কবি, রাজা, পণ্ডিত এবং দরিদ্র, পুরুষ হউক বা স্ত্রীই হউক, হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টান বা পার্শী অথবা ইহুদী হউক, সকলকেই অলঙ্ঘ্য কর্তব্য-রূপে প্রত্যহ অর্ধঘণ্টা সূতা কাটিতেই হইবে। মানবজাতির ধর্ম কোন শ্রেণী বা পুরুষ বা নারীজাতির একচেটিয়া বিশেষ অধিকার নয়। ইহাতে সকলের সমান অধিকার—ইহা সকলের পালনীয় কর্তব্য। যে সকল স্ত্রী বা পুরুষ নিজদিগকে ভারতবাসী বলিয়া অভিহিত করে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট ভারতীয় মানবধর্ম অন্ততঃ অর্ধ ঘণ্টার জন্য সূতাকাটা দাবী করে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৬-'২৫]

৬৬

নারীর সহায়তায় স্বরাজ

ওয়ার্কিং কমিটি সাব্যস্ত করিয়াছে, আইনভঙ্গ আন্দোলনের জন্য সূতাকাটা অপরিহার্য। ভারতবর্ষের নারীদের পক্ষে দেশমাতৃকার সেবার এই সুবর্ণসুযোগ। লবণ তৈয়ারী আন্দোলনের সময় লক্ষ লক্ষ নারী তাহাদের নিভৃত গৃহকোণ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখাইয়াছে যে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাহারা দেশের সেবা করিতে পারে। গ্রাম্য নারীদিগের মনে, এই সাহচর্য মর্যাদাজ্ঞান জাগ্রত করে। এই সম্ভ্রম তাহাদের পূর্বে ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের এই শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে সূতাকাটাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়া ভারতের নারীদিগকে মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। স্বভাবতঃই সূতাকাটা বিষয়ে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সুবিধা অধিক।

সৃষ্টির আদি হইতে স্ত্রী ও পুরুষের কাজের বিভাগ বিদ্যমান রহিয়াছে। কথিত আছে, ইভ সূতা কাটিত এবং আদম তাহা বুনিত। এই কাজের ভাগ আজ পর্যন্ত চলিতেছে। পুরুষ সূতাকাটনী সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। ১৯২০-২১ সালে আমি যখন পাঞ্জাবে পুরুষদিগকে সূতা কাটিতে বলি, তাহারা এই উত্তর

দিত যে সূতাকাটা শুধু স্ত্রীলোকদেরই কাজ এবং তাহাদের নিজেদের পক্ষে সূতাকাটা সম্মানজনক নয়। মর্যাদার দিক হইতে বর্তমানে পুরুষেরা কোন আপত্তি করে না। হাজার হাজার লোক ত্যাগের নিদর্শনস্বরূপ সূতা কাটে। যখন দেশহিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া পুরুষেরা সূতা কাটিতে আরম্ভ করে তখন ইহা একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও অনেক নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হয়। তাহা হইলেও অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, সূতাকাটা স্ত্রীলোকদেরই একটি বিশেষত্ব। এই অভিজ্ঞতার সমর্থনে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। সূতাকাটা বস্তুতঃ অত্যন্ত ধীর এবং অপেক্ষাকৃত নীরব কাজ। নারী ত্যাগের এবং সেইহেতু অহিংসার প্রতিমূর্তি। তাহাদের জীবনের কাজ সংগ্রাম অপেক্ষা শান্তিরই অধিক সহায়কারী। হিংসাত্মক যুদ্ধের আসরে নারীকে আজ টানিয়া লওয়া হইতেছে—ইহা বর্তমান সভ্যতার গৌরবের বিষয় নহে। হিংসা নারীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শীঘ্রই নারীসমাজ তাহার মৌলিক প্রকৃতির উপর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। আমি ইহাও মনে করি যে, পুরুষও তাহার নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতাপ করিবে। স্ত্রীজাতি এবং পুরুষজাতির সমান অধিকার বলিতে ইহা বুঝায় না যে তাহাদের কর্তব্যসমূহও একই প্রকারের হইবে। নারীর পক্ষে পশু শিকার করা বা বল্লম পরিচালনা করার বিরুদ্ধে আইনের কোন বাধা নাই। কিন্তু যে কাজ পুরুষের করণীয়, নারী তাহার স্বভাবজাত বুদ্ধির বশেই সে কাজ হইতে নিবৃত্ত হয়। প্রকৃতি পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের অনুপূরক-রূপে সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের আকৃতিগত বৈষম্যের ন্যায় তাহাদের কর্তব্যগত কাজগুলিও সুনির্দিষ্ট।

আমার উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য স্ত্রী ও পুরুষের বিভিন্ন কাজের প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ ভারতবর্ষে এই বিষয়টি সত্য যে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক সূতাকাটাকে তাহাদের স্বাভাবিক পেশা বলিয়া মনে করে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব স্বতঃই পুরুষের বোঝা নারীর উপর ফেলিয়াছে এবং তাহাদিগকে পারদর্শিতা দেখাইবার এই সুযোগ দিতেছে; আমার ভবিষ্যৎ সেনাদলে পুরুষ হইতে নারীর বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখিতে আমি ইচ্ছা করি। যদি যুদ্ধই করিতে হয় তবে আমি তাহাদিগকে লইয়া যে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিব, পুরুষের সংখ্যাধিক্য থাকিলে তাহা পারিব না। পুরুষের হিংসাবৃত্তিকে আমি অত্যন্ত ভয় করি। হিংসার এইরূপ অভিব্যক্তির প্রতিকূলে নারীগণ আমার প্রতিভূস্বরূপ হইবেন।

[হরিজন, ২-১২-'৩৯]

সেবাগ্রাম, ২৭-১১-'৩৯

৬৭

মদ্যপানের অভিশাপ

জনৈকা ভগিনী লিখিতেছেন—"গ্রামে গিয়া এই সকল লোকের ভিতর মদ্যপান কী সর্বনাশ করিতেছে তাহা জানিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হই। কয়েকজন স্ত্রীলোক কাঁদিতেছিল। তাহারা কী করিতে পারে? পারিবারিক দুঃখদুর্দশা, দারিদ্র্য, ভগ্ন-স্বাস্থ্য এবং দৈহিক অক্ষমতার একমাত্র কারণ পানদোষ। পুরুষের এই পানাসক্তির সকল দুর্গতি সাধারণতঃ নারীকেই ভুগিতে হয়। আমি নারীদিগকে কী উপদেশ দিতে পারি? ক্রোধ এবং নৃশংসতার সম্মুখীন হওয়া বড়ই কঠিন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অবিচারের বিরুদ্ধে সময়, শক্তি এবং বুদ্ধি না খাটাইয়া এই প্রদেশের নেতৃবৃন্দ পানদোষ দূরীভূত করিবার জন্য এই সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করুন, আমার তাই ইচ্ছা। প্রকৃতপক্ষে গুরুতর কাজগুলি আমরা অনেক সময় অবহেলা করিয়া সামান্য সামান্য বিষয়ে মনোযোগ দিই। লোকের নৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে এই সামান্য বিষয়গুলি আপনা আপনিই মিটিয়া যায়। মদ্যপান সম্বন্ধে আপনি কি কিছু লিখিতে পারেন না? এই পাপে অসংখ্য লোক বস্তুতঃ নরকের পথে যাইতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।"

-যাহারা মদ্যপায়ী তাহাদের নিকট আমার অনুনয়-বিনয়ে কিছু হইবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহারা 'হরিজন' কখনও পড়ে না। যদি বা পড়ে, তবে শুধু উপহাসের জন্য। মদ্য পানের কুফল অবগত হওয়ার জন্য তাহাদের কোনই আকর্ষণ থাকিতে পারে না। তাহারা এই কু-অভ্যাস আগ্রহের সহিত পোষণ করে। পত্রলেখিকা ভগিনীকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই এবং এইভাবে ভারতবর্ষের সকল নারীকে আমি জানাইয়া দিতে চাই যে, ডাণ্ডি অভিযানের সময় তাঁহারা আমার উপদেশ শুনিয়াছিলেন এবং মদ্যপানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং চরকায় সুতাকাটা তাঁহাদের বিশেষ করণীয় কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন। লেখিকা যেন স্মরণ করেন যে হাজার হাজার নারী নির্ভীক-চিত্তে মদের দোকানগুলি ঘিরিয়া থাকিতেন এবং অধিকাংশ স্থলে পানাসক্ত ব্যক্তিদের তাঁহাদের অনুনয়-বিনয় দ্বারা এই কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করাইতে তাঁহারা সফলকাম হইতেন। এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবাকার্য পরিচালনার সময় তাঁহাদিগকে মদ্যপায়ি-গণের গালিগালাজ, এমনকি আঘাতও সহ্য করিতে হইয়াছে। শত শত নারী মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য কারাগারে গিয়াছেন। সমগ্র দেশের উপর তাঁহাদের এই আন্তরিক আগ্রহপূর্ণ কাজ আশ্চর্যজনক ফল প্রসব করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, আইন অমান্য আন্দোলন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এমনকি তাহার আগেই, সেই কাজে শিথিলতা আসে। কী জন্য আন্দোলন শিথিল হইয়া যায় তাহার কারণ নির্দেশের প্রয়োজন নাই। কর্মীদের জন্য সেই পথ আজও উন্মুক্ত। নারীগণের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালিত হয় নাই। যে পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে মাদকদ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ না হয় সেই পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা পূরণ হইবে না। নারীর কাজ এখানে ছিল উন্নত স্তরের। পুরুষের মধ্যে যে সকল গুণ লুক্কায়িত আছে, অনুনয়-বিনয় দ্বারা তাহার

উন্মেষ ঘটাইয়া মদের দোকানগুলি তাঁহারা শূন্য করিয়া দিয়াছিলেন এবং এইভাবে তাঁহারা মাদকদ্রব্য সেবন নিবারণ করেন। যদি তাঁহাদের কাজ ক্রমাগত চালাইয়া যাইতে পারিতেন তবে তাঁহাদের বিনয়, নম্রতা এবং আন্তরিকতা নিশ্চয়ই মদ্যপায়িগণের এই কু-অভ্যাস দূর করিতে পারিত।

কিন্তু জগতে কিছুই বিনষ্ট হয় না। নারীগণ এখনও সেই আন্দোলন পুনরায় নিয়ম করিয়া আরম্ভ করিতে পারেন। লেখিকা যাহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের পত্নীগণ মনেপ্রাণে চেষ্টা করিলে তাঁহাদের স্বামীদের নিশ্চয়ই সুপথে আনিতে পারেন। সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বামীর উপর স্ত্রীর ক্ষমতা কতদূর তদ্বিষয়ে নারীগণ সচেতন নন। অবশ্য অজ্ঞাতসারে সর্বদাই তাঁহারা স্বামীদিগকে প্রভাবিত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়; সেই বোধ তাঁহাদের থাকা চাই এবং এই আত্মচেতনাই তাঁহাদিগকে শক্তি প্রদান করিবে এবং কোন্ পথে তাঁহাদের জীবন-সঙ্গীদিগকে চালাইতে হইবে তাহাও নির্দেশ করিয়া দিবে। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর অধিকাংশ পত্নীগণ তাঁহাদের স্বামীদের কার্যাকার্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন না বা তৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। তাঁহাদের ধারণা, তাহা করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। ইহা কখনও তাঁহাদের মনে উদিত হয় না যে, স্ত্রীর চরিত্ররক্ষা সম্বন্ধে স্বামীর যেরূপ কর্তব্য রহিয়াছে স্বামীর চরিত্ররক্ষা সম্বন্ধেও স্ত্রীর অনুরূপ দায়িত্ব রহিয়াছে। তথাপি ইহা অপেক্ষা সরল আর কিছুই নয় যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের পাপপুণ্যের সমান অংশীদার। নারী ব্যতীত আর কে পত্নীদিগকে তাঁহাদের শক্তি এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সাফল্যের সহিত সচেতন করিতে পারে? পানদোষ নিবারণকল্পে নারী-আন্দোলনের ইহা একদিক মাত্র।

মদ্যপায়ীর সংখ্যা, পানদোষের কারণ ও তাহা প্রতিকারের উপায়, পানদোষের জন্য প্রতি পরিবারের আর্থিক, নৈতিক অবনতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ ও লোকশিক্ষার্থ তাহার সদ্ব্যবহারের জন্য শিক্ষিতা বহু রমণীর প্রয়োজন। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদিগকে শিক্ষা লইতে হইবে এবং ইহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, মদ্যপায়ীদিগকে এই অভ্যাস পরিত্যাগ করাইবার জন্য শুধু অনুনয়-বিনয়ে কোনো স্থায়ী ফললাভ করা যাইবে না। অভ্যাসটিকে একটি রোগ বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে। অর্থাৎ কতিপয় নারীকে ছাত্রের ন্যায় নানা উপায়ে ও প্রণালীতে গবেষণায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। যে সকল বিষয়ে সংস্কার সাধন করিতে হইবে সেই সকল বিষয়ের অবিরাম অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা সেগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হইবে। ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে যে সকল সংস্কার বাঞ্ছনীয় মনে হয়, সে সব সম্বন্ধে সংস্কারকদিগের উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবই সেইগুলির আংশিক বা সম্পূর্ণ বিফলতার মূল কারণ। সেহেতু সংস্কারের নামে যে সকল প্রচেষ্টা আরম্ভ হয় তাহাদের অনেকগুলিই সংস্কার আখ্যা পাইবার যোগ্য নয়।

[হরিজন, ২৪-৪-'৩৭]

৬৮

দুঃখী ও আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ কর

জাফ্না উদিভিল বালিকা কলেজে ২৯।৯।১৯২৭ তারিখে প্রদত্ত গান্ধীজীর বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত: "আজ সকালে তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান তোমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে আসিয়াছে; সেইজন্য সাধারণ অর্থভাণ্ডারের সঙ্গে তাহা মিশাইয়া দেওয়া আমার ভাল লাগে নাই। যাহা হউক, এই ব্যাপারটি আমি যথাসম্ভব ভাল অর্থেই গ্রহণ করিতেছি। বালকদের চেয়ে তোমরা বেশী লাজুক; তাই আমাকে যে তোমরা কিছু দিয়াছ তাহা আমাকে জানিতে দিতে চাও নাই। আমি সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ বালিকার সঙ্গে মিশিয়াছি। এখন তাহারা যে সকল ভাল ভাল কাজ করে তাহা আর আমার নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিতে পারে না।

এমন কিছু বালিকা আছে যে তাহারা যে সকল মন্দ কাজ করে তাহাও আমাকে বলিতে দ্বিধা করে না। আমি আশা করি, আমার সম্মুখে এমন একটি বালিকাও নাই যে মন্দ কাজ করে। তোমাদিগকে জেরা করিবার সময় আমার নাই এবং তোমাদিগকে প্রশ্ন করিয়া ত্যক্ত করিতেও চাই না। কিন্তু এখানে যদি এমন বালিকা থাকিয়া থাকে যাহারা মন্দ কাজ করে তাহা হইলে আমি দ্বিধাশূন্যভাবে তাহাদিগকে বলিব, তাহাদের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

পিতামাতা তোমাদিগকে পুতুল বানাইবার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠান নাই। পক্ষান্তরে, তোমরা রুগ্ন এবং দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সেবার ব্রত গ্রহণ করিবে, ইহা আশা করা যায়। তোমরা কিন্তু এই ভুল করিও না যে যাহারা বিশিষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত তাহারাই কেবল দয়াব্রতী ভগিনীসংঘ বলিয়া অভিহিত হয়। যে নিজের বিষয় খুব কম ভাবে এবং যাহারা অপেক্ষাকৃত গরীব এবং দুঃস্থ তাহাদের কথাই অধিক চিন্তা করে, সেই নারী তখনই দয়াব্রত পালনের অধিকারিণী হয়। আমাকে যে অর্থভান্ড উপাহার দেওয়া হইয়াছে তাহা তোমাদের চেয়ে যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্গত তাহাদের জন্য; সেই অর্থকোষে তোমাদের যথাসাধ্য দান করিয়া সেবাব্রতী ভগিনীদের ন্যায় কাজ করিয়াছ।

সামান্য অর্থ দান করা সহজ ব্যাপার; নিজে একটি ক্ষুদ্র কাজ করা তদপেক্ষা কঠিন। যাহাদের জন্য অর্থ দান করিয়াছ, প্রকৃতই যদি তাহাদের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদে, তাহা হইলে তোমাদিগকে আরো এক ধাপ আগাইয়া যাইতে হইবে এবং এই সকল লোক যে খদ্দর প্রস্তুত করে তাহা তোমাদের পরিতে হইবে। তোমাদের সামনে খাদি আনিলে তোমরা যদি বল "খাদি একটু মোটা, আমরা উহা পরিতে পারি না" তবে বুঝিব যে তোমাদের ভিতর আত্মত্যাগের ভাব এখনও জাগে নাই।

ইহা এমন সুন্দর একটি জিনিস যে এখানে উচ্চনীচ শ্রেণীভেদ নাই; স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বালাই নাই। যদি তোমাদের মনের গতিও সেই দিকে গিয়া থাকে এবং

অন্য বালিকাদের চেয়ে নিজেদের উচ্চ বলিয়া মনে না কর তাহা হইলে সেটি প্রকৃতই অত্যন্ত শুভ লক্ষণ মনে করিব।

ভগবানের আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক।

৬৯

ছাত্রীদের প্রতি উপদেশ

জাফ্না রামনাথান বালিকা কলেজে ২৭।১১।১৯২৭ তারিখে প্রদত্ত গান্ধীজীর বক্তৃতা হইতে গৃহীত:

জাফ্নার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষায়তনগুলি পরিদর্শন করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে আজ সকালে আসিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। পরিভ্রমণের পটে ইহাই যেন শেষ তুলিকাস্পর্শ।

তোমাদের অভিনন্দনপত্রে তোমরা এই দিবসকে একটি সাংবৎসরিক উৎসবের ন্যায় পালন করিবে এবং খাদির সাহায্যের জন্য এই দিন অর্থসংগ্রহ করিবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। ইহা আমার হৃদয়ের অন্তস্থল স্পর্শ করিয়াছে। আমি জানি, এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের বৃথা বাগাড়ম্বর নয়, এবং অলঙ্ঘ্য নিয়মের মত এই প্রতিজ্ঞা তোমরা প্রতিপালন করিবে। অনশনক্লিষ্ট যে লক্ষ লক্ষ নিরন্নের জন্য আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি তাহাদের ভগিনীদের এই প্রতিজ্ঞার বিষয় যদি তাহারা বুঝিতে পারিত তবে বিশেষ আনন্দিত হইত, ইহা আমি জানি। কিন্তু আমার এই কথা শুনিয়া তোমরা দুঃখিত হইবে যে, আমি তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও সেই মূক জনসাধারণ এই সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে না, অথচ তাহাদের জন্যই তোমরা আমাকে টাকার থলি উপহার দিয়াছ এবং এরূপ উপহার সিংহলের অন্যান্য বহু স্থান হইতেও আমি পাইয়াছি। আমি তাহাদের দুর্দশার কাহিনী যতই বর্ণনা করি না কেন, সেই অবস্থা প্রকৃতপক্ষে কী ভয়ানক তাহার বাস্তব চিত্র তোমরা কল্পনা করিতে পারিবে না।

এর সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উঠে—তাহাদের জন্য এবং এইরূপ অন্যান্য দুঃস্থ লোকদের জন্য তোমরা কী করিতে পার? জীবনযাত্রা আর একটু সরল এবং সাদাসিধা কর এবং আর একটু বেশী মিতব্যয়ী হও, ইহা বলা সহজ, কিন্তু তাহা হইলে বাস্তব সমস্যা শুধু এড়াইয়া যাওয়া হইবে মাত্র।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি চরকার প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম। আমি নিজেকেও বলিয়াছি এবং তোমাদেরও এখন বলিতেছি যে, এই অনশনক্লিষ্ট জনসাধারণের সহিত যদি তোমরা একটি প্রাণসূত্রের যোগ স্থাপন করিতে পার তবে তোমাদের, তাহাদের এবং সমগ্র জগতের বাঁচিবার আশা আছে।

তোমাদের বিদ্যালয়ে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাও দেওয়া হয়,— ইহা খুবই যুক্তিসঙ্গত। তোমাদের একটি সুন্দর মন্দিরও আছে। তোমাদের সময়সূচী হইতে দেখা যায় যে তোমরা পূজা করিয়া দিনের কাজ আরম্ভ কর। ইহা ভাল এবং নৈতিক উন্নতির

সহায়; কিন্তু যদি দৈনন্দিন জীবনে এই পূজাকে আমরা বাস্তবে পরিণত না করি, ইহা নিছক একটি সুন্দর লৌকিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। সেইজন্য আমি বলি, পূজাকে অনুসরণ করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হও, চরকা গ্রহণ কর, আধঘণ্টা চরকায় সুতা কাট এবং যে জনসমাজের কথা আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি তাহাদের কথা ভাব এবং ভগবানের নাম লইয়া বল "আমি তাহাদের জন্যই সুতা কাটি।" যদি মনেপ্রাণে ইহা কর এবং এই জ্ঞান তোমাদের থাকে যে এই পূজা তোমাদিগকে অধিকতর বিনয়ী এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারিণী করিয়া তুলিতেছে, যদি বাহ্যিক শোভার জন্য পোশাক পরিচ্ছদ না পরিয়া শুধু দেহাচ্ছাদনের জন্য পর, তাহা হইলে খাদি পরিধান করিতে তোমাদের কোন দ্বিধা হইবে না এবং সেই অগণিত নিরন্নদের এবং তোমাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিবে।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে এই পর্যন্ত বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব না।

স্যর রামনাথান এবং তাঁহার পত্নী এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণ তোমাদের প্রতি যেরূপ যত্ন লইতেছেন এবং তোমাদের উপর যেরূপ স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি রাখিতেছেন, সেই সকলের উপযুক্ত হইতে হইলে তোমাদিগকে আরো অনেক কিছু করিতে হইবে। তোমাদের পত্রিকায় বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ছাত্রীরা কে কী করিতেছে এই বিষয় কতকটা গর্বের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে। অবশ্য এই গর্ব মার্জনীয়। এইরূপ চারি-পাঁচটি বিজ্ঞপ্তি দেখিলাম—অমুকের সহিত অমুকের বিবাহ হইয়াছে। কিংবা ২২ বা ২৫ বৎসরের প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের বিবাহ হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক; ইহার মধ্যে গর্বের কিছু নাই। কিন্তু এই সকল বিজ্ঞপ্তির মধ্যে একটি বালিকাও নিজেকে কেবল সেবাব্রতে উৎসর্গ করিয়াছে এরূপ কিছু দেখিতে পাই না। সেইজন্য আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই, এবং ইহা আমি বাঙ্গালোরের মহারাজার বালিকা কলেজের মেয়েদেরও বলিয়াছি যে, শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের পরিচালনায়, অপরিমিত দান ও প্রচেষ্টায় যে সকল মহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইতেছে তাহার তুলনায় আমরা নগণ্য ফল লাভ করিয়া থাকি, কারণ বিদ্যালয় হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা সকলেই পুতুলের মত হইয়া যাও এবং সমাজের জীবন হইতে সরিয়া পড়।

বালিকাদের বেশীর ভাগই স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইবার পরই জাতীয় জীবন হইতে দূরে চলিয়া যায়। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সেরূপ হইবার কোন কারণ নাই। মিস এমেরী এবং অন্যান্য যাঁহারা তত্ত্বাবধান করিতেছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদের সম্মুখে; ইহা আমার বলা বোধ হয় ভুল হইবে না যে তাঁহারা সকলেই অবিবাহিতা।

বালিকামাত্রই, বিশেষতঃ ভারতের প্রত্যেক বালিকাই, বিবাহ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি এমন অনেক বালিকা দেখাইতে পারি যাহারা একজনের সেবিকা না হইয়া জনকল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। এখনই সময়, যখন হিন্দু বালিকাদের সীতা এবং পার্বতীর আদর্শ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, কিংবা সম্ভব হইলে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তোমরা নিজেদের শৈব বলিয়া থাক। পার্বতী কী করিয়াছিলেন তাহা তোমরা জান। স্বামীলাভের জন্য তিনি অর্থব্যয় করেন নাই। অথবা তিনি নিজেকে বিক্রীত হইতেও দেন নাই। আজ তিনি সপ্ত "সতীর" একজন বলিয়া গণ্য হইয়া হিন্দুদের চিত্তাকাশে শোভা পাইতেছেন। শিক্ষায়তনের উপাধিলাভ করিয়া তিনি এ ঐশ্বর্য লাভ করেন নাই; তাঁহার অশ্রুতপূর্ব তপস্যাই তাঁহার এই গৌরবের কারণ।

আমি জানিতে পারিলাম, এখানে ঘৃণ্য পণপ্রথা বর্তমান। এই কারণে তরুণীদের উপযুক্ত বিবাহ অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। তোমাদের অনেকেই প্রাপ্তবয়স্কা, এই সকল প্রলোভন হইতে তোমরা নিজেদের রক্ষা করিতে পারিবে, আশা করা যায়। তোমরা যদি এই সকল কুপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াও তবে তোমাদের মধ্যে কয়েকজনকে হয় আজীবন অথবা অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য অবিবাহিতা থাকিতেই হইবে। তারপর যখন তোমাদের বিবাহ করিবার সময় আসিবে এবং বুঝিতে পারিবে কর্মক্ষেত্রে জীবনের সঙ্গী একজন চাই, তখন পার্বতীর ন্যায় অতুলনীয়গুণসম্পন্ন, চরিত্রবান বরের অনুসন্ধান করিবে; ধনবান বা বিশ্রুতকীর্তি বা সুন্দর পুরুষের জন্য ব্যগ্র হইবে না। নারদ পার্বতীর নিকট শিবের রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা তোমরা জান—পথের কাঙ্গাল, সর্বাঙ্গভস্মাচ্ছাদিত, সৌন্দর্যবিহীন এবং ব্রহ্মচারী। পার্বতী উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, তাঁহাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব।" তপস্যা না করিলে তোমরা শিবের মত পতি লাভ করিতে পারিবে না। তবে পার্বতীর ন্যায় সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী তপস্যার প্রয়োজন নাই; মানবজীবন ক্ষণভঙ্গুর—আমরা ততটা করিতে পারিব না। কিন্তু অন্ততঃ তোমাদের এই জীবনের মধ্যে সেরূপ তপস্যা করিতে পার।

যদি এই সকল নিয়ম মানিয়া চল তবে তোমরা পুতুলের রাজ্যে গিয়া অদৃশ্য হইতে অস্বীকার করিবে। পার্বতী, দময়ন্তী, সীতা এবং সাবিত্রীর মত "সতী" হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিও। যতদিন তাহা না করিতে পারিবে, এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের উপযুক্ত ছাত্রী বলিয়া তোমরা গণ্য হইতে পারিবে না,—ইহাই আমার মত।

ভগবানের কৃপায় এইরূপ অভীপ্সা তোমাদিগকে অনুপ্রাণিত করুক এবং তাহা হইলে তাঁহারই আশীর্বাদে তোমাদের এই অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

৭০

নারীর উপর অত্যাচার

আজ সমগ্র পৃথিবীর পরীক্ষা হইতেছে। যুদ্ধের প্রভাব কেহ এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। যদিও রামায়ণ এবং মহাভারত কবির কল্পনাপ্রসূত, তবু বলা যায় ইহাদের কবি কেবল কাব্যপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহারা ছিলেন সত্যদর্শী ঋষি। তাঁহারা যাহা চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন আজও আমাদের চোখের সামনে তাহা ঘটিতেছে।

রাবণেরা পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত। তাহারা অসীম শক্তি প্রদর্শন করিয়া আকাশ হইতে তাহাদের সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে কোনপ্রকার বীরত্বের কাজই তাহাদের শক্তি বা কল্পনার অতীত নয়।

মানুষ এইভাবে যুদ্ধ করিতে পারে না— দেবতাদের ত কথাই নাই। শুধু পশুরাই এরূপ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারে। শারীরিক বলে উন্মত্ত সৈনিক দোকান লুট এবং স্ত্রীলোকদের প্রতি আক্রমণ করিতেও লজ্জিত হয় না। যুদ্ধকালে রাষ্ট্র-পরিচালকগণ এই সকল অত্যাচার থামাইতে পারেন না। সৈন্যদল তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য—দেশরক্ষা—সাধন করে বটে; কিন্তু তাহাদের অত্যাচার, উৎপীড়ন প্রভৃতি অন্যায় কার্যগুলি রাষ্ট্রনায়কেরা দেখিয়াও দেখেন না। যখন কোন জাতি সমগ্রভাবে সমরলিপ্সায় মত্ত হইয়া পড়ে তখন সামরিক জীবনের রীতিনীতি সেই জাতির সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। সেইজন্যই সৈনিকদের এইরূপ বর্বরোচিত ব্যবহার নিন্দনীয় হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের সেইরূপ অবস্থায় নামিতে বহু পুরুষ অতীত হইয়া যাইবে।

সেইজন্য জনৈকা ভগিনীর প্রেরিত নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি আসিয়া পড়ে :—

"(১) কোন সৈনিক নারীর প্রতি অত্যাচার করিলে তাহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে বলা যায় কিনা?

(২) সমাজ এই প্রকারে ধর্ষিতা নারীকে দণ্ডিত বা সমাজবহির্ভূত করিবে কিনা?

(৩) এরূপ অবস্থায় নারীগণ এবং জনসাধারণ কী করিতে পারে?"

যদিও সেই নারী প্রকৃতপক্ষে তাহার সতীত্ব হারাইযাছে, তজন্য তাহাকে কোনরূপে দণ্ডিত বা সমাজচ্যুত করা যায় না। সে আমাদেব সহানুভূতির যোগ্য, কারণ তাহার প্রতি নির্দয়ভাবে অত্যাচার করা হইয়াছে। আমরা কোন আহত ব্যক্তিকে যেরূপভাবে সেবা করি, সেই নারীর বেদনাও আমরা সেইভাবে দূর করিব।

কেবল যখন কোন নারী স্বেচ্ছায় আপন সতীত্ব নষ্ট হইতে দেয়, সে নিন্দার যোগ্য। কোন ক্ষেত্রেই ব্যভিচার এবং বলাৎকার একপর্যায়ভুক্ত নহে। এইভাবে বিচার করিলে আমরা এই সকল অত্যাচারের কাহিনী, সমাজে পূর্বে যেমন গোপন রাখা হইত তেমন না করিয়া সমাজের গোচবীভূত করিতাম। নারীর প্রতি পুরুষের এইরূপ দুর্ব্যবহারের প্রতিকূলে এইভাবেই জনমত গঠিত হইত এবং তাহার শক্তি এই সকল অত্যাচার প্রতিরোধ করিত।

যদি সংবাদপত্রে ক্রমাগত আন্দোলন চালানো যায় তবে সাদা কিংবা কালো সকল সৈনিকই এইরূপ আচরণ করিতে বিরত হইবে। তাহাদের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ এইরূপ অন্যায় আচরণ থামাইতে বাধ্য হইবেন।

নারীদিগের প্রতি আমার উপদেশ এই—তাহারা শহর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে যাক; সেখানে সেবার বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তাহাদের জন্য রহিয়াছে। গ্রামে তাহাদের উপর অত্যাচারের সম্ভাবনা কম। তাহারা সহজ জীবন যাপন করিবে এবং গরীবদের সুখদুঃখের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। যদি তাহারা রেশমী শাড়ী এবং সাটিনে সজ্জিত হইয়া এবং বহুমূল্য অলঙ্কার পরিয়া তাহাদের ধনের অহঙ্কার করে তাহা হইলে

এক বিপদ এড়াইতে গিয়া তাহারা দ্বিগুণ বিপদের সম্মুখীন হইবে। অবশ্য যাহারা কর্তব্যানুরোধে শহরে বাস করিতে বাধ্য, এই উপদেশ তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।

কীভাবে সকল ভয় হইতে নির্মুক্ত হওয়া যায় তাহার বিষয় জানিয়া রাখা নারীদের প্রধান কর্তব্য। আমার দৃঢ় মত এই, যে নারী নির্ভীক এবং যাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে তাহার পবিত্রতা তাহার আত্মরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ বর্মাচ্ছাদন, সে কখনও ধর্ষিত হইতে পারে না। মানুষ যতবড় পশুপ্রকৃতিরই হউক না কেন, সেই নারীর পবিত্রতার জলন্ত শিখার সমানে লজ্জায় মাথা নোয়াইবে। বর্তমান যুগেও নারীগণ নিজেদের এইরূপে রক্ষা করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। লিখিতে লিখিতে আমার দুইটি ঘটনার বিষয় মনে পড়িল। কাজেই যে সকল নারী এই প্রবন্ধ পাঠ করিবে তাহাদের এই সৎসাহস অনুশীলন করিতে বলিব। আক্রমণের চিন্তাতেই আজ তাহারা ভয়ে কাঁপিতে থাকে। এই ভাবটি দূর করিতে পারিলেই তাহারা নির্ভীক হইবে। সাহসের পরীক্ষার জন্য নারীর পক্ষে কোন তিক্ত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া যাওয়ার প্রয়োজন অবশ্য নাই। এই সকল ঘটনার অভিজ্ঞতা ভগবানের কৃপায় সৌভাগ্যক্রমে লক্ষের বা হাজারের সামনেও আসে না। সৈনিকমাত্রই পশু নয়। তাহাদের অতি অল্প-সংখ্যকই শোভনতা, শালীনতা বোধ একেবারে হারাইয়া ফেলে। সর্পজাতির মাত্র শতকরা কুড়িভাগ বিষাক্ত এবং ইহাদের কতগুলি শুধু কামড়ায়। পদদলিত না হইলে ইহারা আক্রমণও করে না। যাহারা ভীতু এবং সর্প দেখিলেই কাঁপিতে থাকে, এই জ্ঞান তাহাদের কোন উপকারে আসে না। পিতামাতগণ এবং পতি ও অভিভাবকবর্গ নারীদের কী ভাবে নির্ভীক হইতে হয় সেই কৌশল শিক্ষা দেবেন, ইহাই প্রার্থিত। ভগবানের জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকিলে ইহা শিক্ষা করা যায়। তিনি অদৃশ্য হইয়াও সকলের রক্ষক—সর্ব কালে এবং সর্ব অবস্থায়,—এই জ্বলন্ত বিশ্বাস যাহার আছে সে সকলের চেয়ে নির্ভীক।

একদিনে এইরূপ বিশ্বাস বা সাহস অর্জন করা যায় না। ইতোমধ্যে আমাদের অন্য উপায়ও উদ্ভাবন করিতে হইবে। যখন কোন নারীর উপর আক্রমণ হয় তখন হিংসা-অহিংসার বিচারে তাহার আবশ্যক নাই। তাহার একমাত্র কর্তব্য আত্মরক্ষা। তাহার নিজ ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য তাহার মনে যে কোন উপায় বা প্রণালী উদিত হয়, সে তাহাই অবলম্বন করিতে পারে। ভগবান তাহাকে নখ এবং দাঁত দিয়াছেন। সে সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেগুলির ব্যবহার করিবে এবং আবশ্যক হইলে এই চেষ্টায় প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিবে। যে পুরুষ বা নারী মৃত্যুর ভয় দূর করিতে পারিয়াছে সে শুধু নিজেকে নয়, অন্যকেও নিজের জীবন দিয়া রক্ষা করিতে পারিবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা মৃত্যুকে সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় করি এবং সেইজন্য আমরা শেষ পর্যন্ত প্রবলতর শারীরিক শক্তির নিকট পরাভূত হই। কেহ আক্রমণকারীর নিকট নতজানু হইবে, কেহ তাহাকে ঘুষ দিতে চাহিবে, কেহ মাটিতে শুইয়া হামাগুড়ি দিবে অথবা অন্যান্য লাঞ্ছনা বরণ করিতে স্বীকৃত হইবে এবং কোন কোন স্ত্রীলোক মৃত্যুকে আলিঙ্গন না করিয়া এমনকি নিজের দেহই বিলাইয়া দিবে। আমি কূট সমালোচনার মনোভাব লইয়া ইহা লিখিতেছি না। আমি শুধু মানবপ্রকৃতির উদাহরণ দিতেছি।

আমরা মাটির উপর শুইয়া হামাগুড়িই দিই বা পুরুষের কামনা পূরণের জন্য নারী নিজেকে সমর্পণই করুক—ইহা আমাদের কোনমতে প্রাণরক্ষা করিবার ইচ্ছাই সূচিত করে এবং জীবনের প্রতি এই আসক্তিই আমাদের যে কোনপ্রকার গ্লানিকর লাঞ্ছনা সহ্য করিবার প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। কাজেই যে নিজের জীবন হারাইয়া ফেলে, সেই প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া থাকে (সত্যের জন্য, আত্মসম্মানের জন্য ত্যাগের মন্ত্রে যে জীবন উৎসর্গীকৃত হয সেই জীবনই অমরতা লাভ করে)।* "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"। জগতের সবই তিনি, এই উপলব্ধিতে ভোগবাঞ্ছা পূর্ণ কর অথবা তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ কর। প্রত্যেক পাঠক এই অতুলনীয় মন্ত্রটি কণ্ঠস্থ করিবেন। শুধু মুখে বলিলেই ইহার সার্থকতা ঘটে না। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে ইহা যেন গভীরভাবে প্রবেশ করে। জীবন উপভোগ করিতে হইলে জীবনের প্রতি আসক্তি পবিত্যাগ করিতে হইবে। এ সত্যোপলব্ধি আমাদের প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত থাকা চাই।

নাবীব কর্তব্য সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলিলাম। কিন্তু যে পুরুষ এইরূপ অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা? ইহার উত্তরও আগের কথার ভিতরই রহিযাছে। তিনি নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা হইতে পারিবেন না। সেই নারীকে তাঁহার রক্ষা করিতেই হইবে। তিনি পুলিশের সাহায্যেব জন্য দৌড়াইবেন না; গাড়ীতে বিপদসূচক শিকল টানিয়াই তুষ্ট থাকিতে পারিবেন না। যদি তিনি অহিংস-নীতি পালনে অভ্যস্ত থাকেন, তিনি নিজ প্রাণ বিসর্জন দিয়া সেই বিপন্না নারীকে রক্ষা করিবেন। যদি অহিংস-নীতিতে তাঁহার আস্থা না থাকে অথবা সেই নীতির ব্যবহার তিনি না জানেন, তাহা হইলে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ করিয়া সেই নাবীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

আমি অথর্ব এবং দন্তহীন বৃদ্ধ; আমি যদি অহিংস-নীতি প্রচাব করি এবং কোন ভগিনীব উপর অত্যাচারেব নিরুপায় সাক্ষীমাত্র হই, তবে আমার তথাকথিত মহাত্মাগিরি উপহাসের এবং অপমানের বিষয় হইবে এবং তাহা একেবারে ধূলিসাৎ হইবে। যদি আমি বা আমার মত সকলে মাঝে পড়িয়া আমাদের জীবন অহিংস-ভাবেই হউক বা হিংসভাবেই হউক বিসর্জন দিই, আমরা নিশ্চয়ই সেই বিপন্নাকে রক্ষা করিতে পারিব; আর যদি তাহা না পারি, তবুও জীবিত অবস্থায় তাহার অত্যাচারের সাক্ষী আমরা হইব না।

প্রত্যক্ষদর্শীদের জন্য এই সব কথা বলা হইল। যদি এই সৎসাহসের ভাব আমাদের দেশের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয় এবং যদি ইহা সকলের জানা থাকে যে এদেশের কোনও নারীর উপর অত্যাচার সহ্য করা হইবে না, আমি জোর করিয়া বলিতে পাবি, কোন সৈনিকই আর নারীদের স্পর্শ করিতেও সাহস করিবে না। এইরূপ ভাব-পরিবেশ যে আজ নাই, ইহা আমাদের লজ্জার বিষয়। যদি এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য লোক প্রস্তুত হইতে থাকে, তবেও কিছু কবা হইতেছে মনে করিব।

গভর্ণমেন্টের নিকট যাঁহাদের প্রতিপত্তি আছে তাঁহারা চেষ্টা করিবেন যেন উপযুক্ত

* বাইবেল—ঈশোপনিষৎ, ১ম মন্ত্রাংশ

প্রতিকারের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেন। কিন্তু আত্মনির্ভরতাই সবচেয়ে বড় সহায়। বর্তমান অবস্থায় আমাদের শুধু ভগবানের দয়া এবং আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

রেলগাড়ীতে ওয়ার্ধার পথে, ১৯-২-৪২

[হরিজন, ১-৩-'৪২]

৭১

দাম্পত্য জীবন

একটি নিপুণা ভগিনী-কর্মী সুচারুরূপে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য কুমারী জীবন যাপনের সংকল্প করিয়া, পরে তাঁহার মনোমত সঙ্গী পাইয়া সম্প্রতি বিবাহ করিয়াছেন। এখন তাঁহার মনে হইতেছে, কাজটা ভাল করেন নাই এবং তাঁহার জীবনের উচ্চ আদর্শ হইতে তিনি বিচ্যুত হইয়াছেন। এই ভ্রান্তি আমি তাঁহার মন হইতে দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেবার জন্য মেয়েদের অনূঢ়া থাকা অতি ভাল কথা, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেইরূপ মেয়ে লক্ষের মধ্যেও একজন পাওয়া যায় না। বিবাহ জীবনের একটি স্বাভাবিক অবস্থা এবং কোনভাবে ইহাকে হেয় মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। যখন কেহ কোন কাজকে অধঃপতন বলিয়া মনে করে, যতই চেষ্টা করুক না কেন তাহার পক্ষে সেই ধারণা দূর করা অত্যন্ত কঠিন। বিবাহকে একটি ধর্মানুগত সংস্কার মনে করিয়া দাম্পত্য জীবন আত্মসংযমশীল হইয়া যাপন করাই বিবাহের প্রকৃত আদর্শ। হিন্দুধর্মে বিবাহ চারটি আশ্রমের অন্যতম। অন্য তিনটি ইহার উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান যুগে বিবাহ কেবল শারীরিক সম্বন্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্য তিনটি আশ্রমের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়।

উক্ত ভগিনী এবং যাঁহাদের চিন্তার ধারা তাঁহার মত, তাঁহাদের কর্তব্য হইতেছে বিবাহকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিয়া উহা ধর্মজীবনের একটি অঙ্গ হিসাবে দেখিয়া বিবাহের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া। তাঁহারা উপযুক্ত আত্মসংযম অভ্যাস করিলে দেখিতে পাইবেন যে তাঁহাদের সেবার শক্তি বহুপরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে। সেবাই যাঁহার জীবনের ব্রত, তিনি স্বভাবতঃই সেইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন জীবনসঙ্গী বাছিয়া লইবেন এবং তাঁহাদের উভয়ের যুক্ত সেবা হইবে দেশের বিশেষ লাভ।

ইহা গভীর দুঃখের বিষয় যে, সাধারণতঃ আমাদের বালিকাদের মাতৃত্বের কর্তব্য সম্বন্ধে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় না। যদি বিবাহিত জীবন ধর্মানুমোদিত কর্তব্য হয় তবে মাতৃত্বও নিশ্চয়ই সেইরূপ হইবে। আদর্শমাতা হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। দায়িত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হইয়া সন্তানপ্রজননে অগ্রসর হইতে হইবে। গর্ভসঞ্চারের মুহূর্ত হইতে সন্তানের জন্মকাল পর্যন্ত তাঁহার কর্তব্য কী

তাহা মাতাকে জানিতে হইবে। যিনি বুদ্ধিমান, সুস্থ এবং সুশিক্ষিত সন্তান দেশকে উপহার দেন, তিনি নিশ্চয়ই দেশের সেবা করিতেছেন। এই সন্তানগণ যখন বড় হইবে, তাহারাও সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। প্রকৃত কথা এই, যাঁহারা সেবার মনোবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত, জীবনে তাঁহারা যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, তাঁহারা সর্বদাই সেবা করিয়া যাইবেন। সেবার কাজ ব্যাহত করে এমন ভাবের জীবন তাঁহারা কখনই যাপন করিবেন না।

[হরিজন, ২২-৩-'৪২] সেবাগ্রাম, ৩-৩-'৪২

৭২

ইন্দিরা নেহরুর বিবাহসম্বন্ধ

ফিরোজ গান্ধীর সহিত ইন্দিরার বিবাহসম্বন্ধ বিষয়ে কয়েকখানি ক্রুদ্ধ এবং অসংযত ভাষায় লিখিত নিন্দাপূর্ণ চিঠি পাইয়াছি এবং আর কয়েকটিতে যুক্তিরও অবতারণা করা হইয়াছে। সজ্জন হিসাবে ফিরোজ গান্ধীর বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তাঁহাদের মতে তাহার একমাত্র অপরাধ যে সে জাতিতে পার্শী। বিবাহের জন্য দুই পক্ষের কেহ ধর্ম পরিবর্তন করিবে, আমি সর্বদাই এই মতের ঘোর বিরোধী ছিলাম এবং বর্তমানেও আছি। ধর্ম এমন জিনিস নয় যে ইচ্ছা করিলেই পোশাকের মত তাহা ত্যাগ করা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে ধর্ম-পরিবর্তনের কোন প্রশ্ন উঠে নাই। ফিরোজ গান্ধী বহু বৎসর ধরিয়া নেহরু পরিবারের একজন বলিয়াই বিবেচিত ছিল। কমলা নেহরুর পীড়ার সময় সে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিয়াছে। তিনি তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। ইউরোপে ইন্দিরার পীড়ার সময় সে তাহার যথেষ্ট পরিচর্যা করিয়াছে। স্বভাবতঃই তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। এই বন্ধুত্ব সম্পূর্ণরূপে অনিন্দ্য ছিল। ইহা ক্রমে পরস্পরের প্রীতি-ভালবাসায় পরিণতি লাভ করে। কিন্তু জওহরলাল নেহরুর অনুমতি এবং আশীর্বাদ ব্যতীত কোন বিবাহের বিষয় চিন্তাতেই আসিতে পারিত না। উভয়ের এই ভালোবাসা যথার্থ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বিষয়ে নিশ্চিত হইবার পর তিনি সম্মতি দিয়াছেন। নেহরু পরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় সকলেই জানেন। উভয় পক্ষের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। এই বিবাহে অমত করিলে নির্মমতার কাজ হইত। সময়ের অগ্রগতিতে এইরূপ সম্বন্ধ ক্রমশঃ নিশ্চয়ই বাড়িয়া যাইবে এবং তাহাতে সমাজেরও উপকার হইবে। বর্তমানে সমাজ এমন অবস্থায় আসে নাই যেখানে পরস্পর পরস্পরের বিভিন্ন মতের প্রতি সম্পূর্ণ উদারতা পোষণ করিতে পারে। কিন্তু এই উদারতা যখন এক ধর্ম অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতে শিখাইবে, এইরূপ বিবাহ লোকে বাঞ্ছনীয় মনে করিবে। সে ধর্ম সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ, যাহা বিচারসহ নহে। অদূর ভবিষ্যতে সমাজের পুনর্গঠনের পর তেমন ধর্মের অস্তিত্ব থাকিবে না। কারণ তখন সামাজিক প্রথাদির মর্যাদার মান পরিবর্তিত হইবে। তখন গুণের

বিচার হইবে ধন, উপাধি, আভিজাত্য দ্বারা নহে, শুধু চরিত্রের উৎকর্ষ দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হইবে। আমি হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করি তাহা কোন সংকীর্ণ মতবাদ নয়। ইহা সামাজিক ক্রমোন্নতির একটি অপূর্ব সনাতন ধারা। জরওয়াস্টার, মোজেজ, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক এবং অন্যান্য যে সকল ধর্মগুরুর নাম করিতে পারি তাঁহাদের শিক্ষা ইহার মধ্যে নিহিত আছে। ইহার সংজ্ঞা এইরূপে দেওয়া হইয়াছে—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্মস্তং নিবোধত॥

উহাকেই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া জানিবে যাহা জ্ঞানিগণ এবং সন্তজন এবং সর্বদা রাগদ্বেষবর্জিত মহাত্মাগণ মানিয়া চলেন এবং যাহা হৃদয়ে অনুরাগের উদ্রেক করে।

যদি ইহা সেরূপ না হয়, ধ্বংস নিশ্চিত।

যাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন তাঁহাদের উত্তর না দেওয়ার অপরাধের জন্য তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি তাঁহাদের ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া আগামী বিবাহে আশীর্বাদ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদের চিঠি হইতে অজ্ঞানতা, পরমতসহনে অনুদারতা এবং স্বকীয় পূর্বসংস্কারপ্রিয়তা প্রভৃতি প্রকাশ পাইতেছে। এই সকলও একপ্রকার অস্পৃশ্যতার পর্যায়ভুক্ত, সুতরাং ভীতিজনক; কারণ সেগুলির কোন শ্রেণীবিভাগ করা সহজ নয়।

[হরিজন, ৮-৩-'৪২]

৭৩

নারীদের সম্বন্ধে কী করা কর্তব্য

"যথেষ্ট সংখ্যক নারীকে সরকারী চাকুরীর জন্য মনোনীত বা নির্বাচিত করা হয় না—এই অভিযোগের আপনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। আপনি উত্তরে বলিয়াছেন। প্রার্থীগণের মনোনয়নে যোগ্যতাই হইবে একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। আপনার এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং চিন্তাশীল নারী এবং পুরুষ সকলেই তাহা স্বীকার করিবে। একটা কথা আছে—'বয়স বা স্ত্রীপুরুষ ভেদ শ্রদ্ধার বস্তু নয়, যোগ্যতাই একমাত্র আদরণীয়।' বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি তার বিপরীত। ইহা আপনার অজানিত নয় যে উক্ত নীতিবাক্য বাস্তবক্ষেত্রে পালিত না হইয়া লঙ্ঘিতই হয় বেশী। প্রার্থীনির্বাচনে, মন্ত্রিমণ্ডলীতে বা ব্যবস্থাপক সভাতে বা স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে প্রথম স্থান দেওয়া হয় না। বর্ণ, সম্প্রদায় এবং প্রদেশের প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারাই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। এই কার্যের অনুকূলে বলা হয়, এই সব বিশেষ বিশেষ স্বার্থ উপেক্ষা করা যায় না। যদি এই যুক্তি সত্য হয় তবে নারীদের স্বার্থের কী হইবে? উক্ত নীতিবাক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া

নির্বাচনের মূলনীতিগুলি আরো পরিষ্কারভাবে বলা দরকার।"

—কোন শ্রদ্ধেয়া ভগিনীর চিঠি হইতে উপরের অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভগিনীর যুক্তি শেষ পর্যন্ত গিয়া এই দাঁড়ায়, যেখানে সব বিষয়ই ভ্রান্তপথে চলিয়াছে, আর একটি ভ্রম সেখানে করিলে কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি আমরা এইরূপ করিতে থাকি তবে অন্যায় বাড়িয়াই চলিবে এবং আমরা নিরুপায়ভাবে একটি কুটিল ধাঁধায় পড়িয়া ঘুরিতে থাকিব। কাজেই নারীদের প্রতি আমার নিবেদন এই তাঁহারা বুদ্ধিমত্তার সহিত ত্যাগের প্রতিমূর্তিস্বরূপ হইবেন এবং তাহা হইলে শুধু নারীজাতির নয়, সমগ্র জাতিরই তাহারা অলঙ্কারস্বরূপ হইবেন এবং নারী-সমাজ এবং জাতির মর্যাদাও বাড়াইয়া দিবেন। যতদিন জাতি ও সম্প্রদায় সংক্রান্ত বিষয়কে আমরা গুরুত্বপ্রদান করিব এবং সেইমত নির্বাচন পরিচালিত হইবে ততদিন নারীগণ এই সকল হইতে দূরে থাকিবেন এবং ইহাতে তাঁহাদের গৌরব এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে—তাঁহাদের প্রতি আমার এই উপদেশ। প্রশ্ন হইতেছে, ইহা করিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় কী? আজ অতি অল্পসংখ্যক নারীই রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগ দিতেছেন এবং তাঁহাদের অনেকেই নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করেন না। তাঁহাদের পিতামাতা বা স্বামীর আদেশ প্রতিপালন করিয়াই তাঁহারা নারীর অধিকারের জন্য চিৎকার করিতেছেন। এইরূপ না করিয়া নারীকর্মিগণ নারীদিগকে ভোটদাত্রীর তালিকাভুক্ত করিবেন, তাঁহাদের ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রদান করিবেন, তাঁহাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইবেন, জাতিবর্ণগত যে সব শৃঙ্খল তাঁহাদের বাধা দিতেছে তাহা হইতে তাঁহাদের মুক্ত করিবেন এবং এইভাবে নারীগণের মধ্যে এমন একটা পরিবর্তন ঘটাইবেন যাহা ত্যাগে এবং আত্মোৎসর্গে নারীর শক্তি এবং ক্ষমতা উপলব্ধি করিতে পুরুষকে বাধ্য করিবে এবং নারীকে তাঁহার সম্মানিত আসন দিতে তাহাকে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। তাঁহারা এইরূপ করিতে পারিলে বর্তমান সামাজিক অপবিত্র পরিবেশ বিশুদ্ধ করিতে পারিবেন। নারীদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা গেল।

পুরুষের সম্বন্ধে এই বলা যায়, অপবিত্র পরিবেশ হইতে বাহিরে চলিয়া আসা তাহাদের কর্তব্য। জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত সংস্কার তাহাদের মন হইতে নির্বাসিত হইলে এই সকল সংস্কারের দ্বারা তাহারা পরিচালিত হইবে না। যদি পুরুষ এবং নারী কর্মক্ষেত্রে জয়ী হইতে চায়, তাহাদের উভয়কেই সমাজের নিম্নতর স্তরে হরিজনদের মধ্যে, এমনকি ভাঙ্গি বা মেথরের সমাজে নামিয়া আসিতে হইবে। উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সহজ উপায় এই।

যদি যোগ্য, শক্তিমতী নারীগণ বাদ পড়িয়া যান, পুরুষ তাহার ভ্রম সংশোধন করিবে। নারীগণকে এইরূপ ভাবে উৎসাহিত করা কর্তব্য যেন তাঁহারা গৌরবে পুরুষকে নিষ্প্রভ করিতে পারেন। এই উপদেশমতে উভয় পক্ষ কাজ করিলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পবিত্র ও নির্মল হইয়া উঠিবে। পুরুষ করুক বা না করুক, আমার মতে নারীর কর্তব্য সুস্পষ্ট।

[হরিজন, ২১-৪-'৪৬] নূতন দিল্লী, ১২-৪-'৪৬

৭৪

নারীর অগ্নিপরীক্ষা

অন্য এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "মৃত্যুই বড় বিষয় নয়, কীভাবে মৃত্যুবরণ করা হয় তাহাই মুখ্য।" ভ্রাতার হস্তে জীবন বিসর্জন বিশেষ সৌভাগ্য, যদি সাহসের সহিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে পার। কিন্তু যে সকল নারীকে বলপূর্বক অপহরণ করা হইতেছে এবং জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করা হইতেছে তাহাদের সম্বন্ধে কী কর্তব্য? কাহাকেও জোর করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করানো যায়, এই প্রসঙ্গ এ স্থলে অবান্তর। "ভারতের নারীগণ নিজেদের এত অসহায় মনে করিবে কেন? সাহস কি শুধু পুরুষেরই একচেটিয়া? ঝান্সীর রাণী অস্ত্রধারণ করিয়া রণকৌশলে তাঁহার সমসাময়িক সকল যোদ্ধা হইতে অধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, যদিও নারীগণ সাধারণতঃ অস্ত্রধারণ করে না। তথাপি সকলেই ঝান্সীর রাণী হইতে পারে না। কিন্তু সকল নারীই সীতার আদর্শ অনুকরণ করিতে পারে। প্রবল পরাক্রান্ত রাবণ তাহাকে স্পর্শ করিতেও সাহস পায় নাই। কিন্তু ঝান্সীর রাণীর ন্যায় রমণীগণ পরাভূত হইতে পারে।" তৎপর তিনি আরো বলিলেন, "সীতার দৃষ্টান্ত যেন কেহ শুধু আষাঢ়ে গল্প বলিয়া মনে না করেন"। ওলিভ্ ডোকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তিনি কোন অত্যাচার অবমাননার জন্য ভীত না হইয়া মধ্য আফ্রিকার নগ্ন আদিম নিগ্রো অধিবাসিগণের নিকট যাইতে এবং তাহাদের সঙ্গে বাস করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ভারতের নারীজাতি এইরূপ উচ্চস্তরের সাহসের অনুশীলন করুক, এই তাঁহার ইচ্ছা। সৈন্যগণ ও পুলিশ তাঁহাদের অপহরণ হইতে রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যাঁহারা অপহৃত হইয়াছেন বা হইতে পারেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কী কর্তব্য? মাথার একটি চুল স্পর্শ করিবার পূর্বেই তাঁহাদের মৃত্যুবরণ করিবার শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। তিনি ইহাও বলেন যে, নারীর পক্ষে শ্বাসবন্ধ করিয়া বা জিহ্বা দংশন করিয়া প্রাণনাশ করা সম্ভবপর।

পরের দিন সন্ধ্যায় গান্ধীজীকে উল্লিখিত কৌশল সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করিতে হইয়াছিল। ডাক্তার সুশীলা নায়ার তাঁহার বক্তৃতা পূর্বদিন শুনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, নিজে নিজে শ্বাসরোধ করিয়া বা জিহ্বাদংশন করিয়া কেহ মরিতে পারে না। গান্ধীজীকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পরের দিন সকালে দেখিতে আসেন, তিনিও ডাক্তার সুশীলা নায়ারের মত সমর্থন করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে জানা যায়, সদ্য আত্মহত্যার একমাত্র উপায় এক দাগ উগ্র বিষপান। গান্ধীজী অতঃপর বলেন, যদি তাহাই হয় তবে যাহারা বিপন্ন, ধর্ষিত হইবার পূর্বেই তাহারা বিষপান করিবে। যাহারা যোগশাস্ত্রের প্রক্রিয়াসকল জানে তাহাদের নিকট তিনি শুনিয়াছেন যে, এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা জীবননাশ করা যায়। তিনি সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। এই বিষয়ে তাঁহার মত শুধু একটি ভাবমাত্রই নয়। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি কার্যে পরিণত করাইতে চান। ধর্ষিত হইবার পূর্বে

নিজের মৃত্যুর জন্য সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিলেই বাধাপ্রদান করিবার সাহস জন্মিবে।

(প্যারিলালের সাপ্তাহিক পত্র হইতে)

[হরিজন, ২৭-১০-'৪৬]

৭৫

নারীর সমস্যা

প্রশ্ন। দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নারীগণ কী করিবে? পলায়ন করিবে, না, বলপ্রয়োগ করিয়া বাধা দিবে? পলাইবার জন্য নৌকা তৈয়ারী রাখিবে, না, অস্ত্রদ্বারা আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিবে?

উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কোন বলপ্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হওয়া আমার মত নয়। অহিংসার জন্যই সকলপ্রকারে প্রস্তুত হইতে হইবে, যদি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরকমের সাহস সঞ্চয় করিতে চাও। কাপুরুষতার চেয়ে বলপ্রয়োগ সর্বদাই শ্রেয়ঃ এবং ভীরুতা বর্জন করিবার জন্য ইহার আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। কাজেই, বিপদ উপস্থিত হইলে পলাইবার জন্য আমার নৌকা তৈয়ারী রাখার দরকার হইবে না। অহিংস ব্যক্তি আকস্মিক বিপদ কী জানে না। পক্ষান্তরে, সে নীরবে গৌরবের সহিত মৃত্যুবরণে প্রস্তুত থাকে। সেইজন্য কোন অহিংস পুরুষ বা নারী সহায়হীন হইলেও মৃত্যুকে গ্রাহ্য করিবে না। ভগবানই প্রকৃত সহায়। আমি এর বেশী কিছু প্রচার করিতে পারি না এবং যাহা প্রচার করি তাহা কাজে পরিণত করিবার জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। এইরূপ কোন সুযোগ আমার আসিবে কিনা অথবা আমাকে দেওয়া হইবে কিনা তাহা আমি জানি না। যে সকল নারী দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অস্ত্রব্যবহার ব্যতীত আত্মরক্ষায় অসমর্থ তাহাদের অস্ত্র সঙ্গে রাখিবার উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা নিজেরাই তাহা করিবে। প্রায়ই এই প্রশ্ন করা হয়—অস্ত্র সঙ্গে রাখা উচিত কিনা। এই প্রশ্নের ভিতর কোথাও গোল আছে। স্বাভাবিক ভাবেই স্বাধীন হইতে লোকে চেষ্টা করিবে। অহিংসাই প্রকৃতপক্ষে কার্যকরভাবে বাধা দিতে সমর্থ—এই মূলনীতি স্মরণ রাখিলে তাহাদের চরিত্র সেইভাবে গঠিত হইবে। পৃথিবীর সকল লোক নিজেদের অজ্ঞাতসারেই উক্ত নীতি মানিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে। অহিংসা হইতে যে সাহস জন্মে তাহার স্থান সকলের উপরে; অস্ত্রাদি বহন করিলে যে সাহস জন্মে তাহা সেইরূপ নয় এবং এই সাহসের ফলে শেষ পর্যন্ত আণবিক বোমার সাহায্যও লইতে হয়। হিংসাবৃত্তি নিষ্ফল। যাহারা আণবিক বোমার নিষ্ফলতাও বুঝিবে না তাহারা স্বভাবতঃই তাহাদের শক্তি অনুসারে অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হইবে।

প্রশ্ন। আত্মসমর্পণ না করিয়া নারীকে নিজের প্রাণনাশ করিতে উপদেশ

দেওয়া যায় কি?

উত্তর। এই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। নোয়াখালী যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে দিল্লীতে আমি ইহার উত্তর দিয়াছি। নিশ্চয়ই নারী আত্মসমর্পণ না করিয়া নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবে। সহজ কথায়, আমার কল্পিত জীবনযাত্রার পথে আত্মসমর্পণের স্থান নাই। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কী উপায়ে প্রাণত্যাগ করা যায়। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, সে উপায় নির্দেশ করা আমার কাজ নয়। পূর্বোক্ত অবস্থায় আত্মহত্যা সমর্থন করার মূলে রহিয়াছে এই বিশ্বাস—যে ব্যক্তি আত্মহত্যা পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত তাহার বাধা দিবার মানসিক শক্তি এবং সাহস এবং অন্তরের পবিত্রতা এত বেশী যে তদ্দ্বারা সে আক্রমণকারীকে পরাভূত করিতে পারিবে। যুক্তিটিকে আর বাড়াইয়া বলিবার দরকার নাই, কারণ ইহার সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার নাই। ইহা বাস্তব প্রমাণের অপেক্ষা রাখে এবং আমি স্বীকার করি, সেই প্রমাণের অভাব রহিয়াছে।

প্রশ্ন। নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া অথবা আক্রমণকারীকে হত্যা করা, এর মধ্যে কোন্‌টি আপনার মতে শ্রেয়ঃ?

উত্তর। নিজেকে হত্যা করা অথবা আক্রমণকারীকে হত্যা করা, এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটিই যে গ্রহণীয় তাহাতে আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

[হরিজন, ৯-২-'৪৮]

পাল্লা, ২৭-১-'৪৭

পত্র-চয়ন

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শিব মুখোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্র দেবনাথ

টলস্টয়কে

ওয়েস্ট মিনিষ্টার প্যালেসহোটেল
৪, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট,
লণ্ডন. এস ডবলিউ
১লা, অক্টোবর, ১৯০৯

মহাশয়,

প্রায় তিন বছর ধরে ট্রান্সভালে (দক্ষিণ আফ্রিকা) যা চলছে তার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি।

ব্রিটিশ ভারতের প্রায় ১৩ হাজার মানুষ ঐ উপনিবেশে বসবাস করছেন। এই সব ভারতীয়রা নানারকম আইনগত অক্ষমতার জন্যে কয়েক বছর ধরে কষ্ট ভোগ করে আসছেন। উপনিবেশে বর্ণ-বৈষম্য বিদ্যমান ও কয়েকটি ক্ষেত্রে এশিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তীব্রতর। এশিয়াবাসীদের দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয় যে, প্রধানতঃ এর কারণ হচ্ছে বাণিজ্যের ব্যাপারে ঈর্ষা। একটা আইন নিয়ে তিন বছর আগে এটা চরমে উঠেছিল। আমি ও আরও অনেকে এটিকে অপমানজনক এবং যাদের ওপর প্রযোজ্য তাদের একেবারে অমানুষ করে তোলার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে গণ্য করি। আমি অনুভব করলাম যে, এধরনের আইনের কাছে নতি স্বীকার করা হলো ধর্মের প্রকৃত মর্ম যা, সে বিচারে সংগতিহীন। আমি ও আমার বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন আগেকার মত এখনও মন্দকে প্রতিরোধ না-করার নীতিতে* গভীর বিশ্বাসী। আপনার লেখাগুলি পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে; সেগুলি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

বৃটিশ ভারতীয়গণের কাছে অবস্থাটা পুরোপুরি তুলে ধরা হয়েছিল। তারাও এ পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন যে, আইনের কাছে মাথা নত করা উচিত নয়। বরং আইন অমান্য করার জন্যে কারদণ্ড বা যে কোন শাস্তি দেওয়া হোক না কেন তা ভোগ করাই কাম্য। এর ফল হল এই যে, প্রায় অর্ধেক ভারতীয়, যাঁরা সংগ্রামের তাপ ও কারাবরণের কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম. তাঁরা যে আইনকে অপমানজনক বলে মনে করেন, তার কাছে নতি স্বীকার করার চেয়ে ট্রান্সভাল ছেড়েই চলে গেলেন। বাকি অর্ধেকের মধ্যে প্রায় ২৫০০ ভারতীয় বিবেকের তাড়নায় কারাবরণ করলেন, কেউ কেউ বা পাঁচ বারও। কারাদণ্ড ভোগের মেয়াদ ছিল চারদিন থেকে ছ'মাস পর্যন্ত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। অনেকে নিঃস্ব হয়ে যান। বর্তমানে ট্রান্সভাল জেলে এক শ'রও বেশী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী* আছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে খুব গরীব. দিন আনেন, দিন খান।

---

* এখানে প্রতিরোধ বলতে গান্ধীজী অবশ্যই সহিংস প্রতিরোধ বুঝিয়েছেন।

* তখনো গান্ধীজী "সত্যাগ্রহী" শব্দ ব্যবহার করেননি; পরবর্তী কালে প্যাসিভ রেসিস্‌টান্স বলতে "সত্যাগ্রহ" উপযুক্ত শব্দ বলে গণ্য হয়—সম্পাদক।

ফল হয়েছে এই যে, এ'দের স্ত্রী পুত্রদের জনসাধারণের দানে, বিশেষ করে প্রতিরোধকারীদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। এতে বৃটিশ ভারতীয়দের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। তবে আমার মতে, তাঁরা সময়োপযোগী সাড়াই দিয়েছেন। সংগ্রাম এখনও চলছে এবং কেউ জানে না কবে শেষ হবে। যাহোক, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ততঃ, এটা সুস্পষ্টভাবে দেখেছেন যে, যেখানে পশু-শক্তি ব্যর্থ হতে বাধ্য, সেখানে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সফল হবে এবং হতে পারে। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি সংগ্রাম যে দীর্ঘায়িত হয়েছে, তা প্রধানত আমাদের দুর্বলতার জন্যই। এবং এ থেকে সরকারের মনেও একটা ধারণা জন্মে গিয়েছে যে, আমরা ক্রমাগত কষ্ট সহ্য করতে পারবো না।

প্রতিবিধানের জন্য, রাজকীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁহাদের কাছে সব ব্যাপারটি উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে আমার একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছি। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীরা মেনেই নিয়েছেন যে, সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন জানানো নিয়ে তাঁদের কিছু করার থাকতে পারে না। কিন্তু তবুও গোষ্ঠীর দুর্বল সদস্যদের অনুরোধে প্রতিনিধিদল এখানে এসেছে। কাজেই এই দল তাদের শক্তির চেয়ে তাদের দুর্বলতারই প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু এখানে আমার দেখেশুনে একথাই মনে হয়েছে যে, যদি নীতি ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কার্যকারিতা নিয়ে একটা রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হতো, তাহলে তা এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলতো এবং লোককে ভাবাতো। প্রস্তাবিত রচনা প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে এক বন্ধু নৈতিক প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি মনে করেন যে, এ ধরনের আমন্ত্রণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সত্যকার আদর্শের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং তা মতামত কিনে নেওয়ারই সামিল। ঐ নৈতিক প্রশ্নে আপনার মতামত জানিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করবেন কি? এ রকম প্রবন্ধের জন্যে আহ্বান জানানো যদি আপনি অন্যায় বলে মনে না করেন, তাহলে এ বিষয়ে লেখার জন্যে যাঁদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা যেতে পারে, তাদের নাম আমাকে জানাতে অনুরোধ করবো।

আরও একটা ব্যাপার আছে, যার জন্যে আমি আপনার সময়ের ওপর ভাগ বসাচ্ছি। ভারতে বর্তমান অশান্তি সম্পর্কে এক হিন্দুর কাছে লেখা আপনার চিঠির একটা অনুলিপি একজন বন্ধু আমাকে দিয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, এতে আপনার মতই প্রতিফলিত হয়েছে। আমার বন্ধুর ইচ্ছে যে, ওই চিঠি কুড়ি হাজার কপি নিজ খরচায় ছাপিয়ে জনসাধারণের মধ্যে তিনি বিতরণ করেন এবং অনুবাদও করান। যা হোক, আমরা মূল চিঠিটা জোগাড় করতে পারিনি। তাই প্রতিলিপিটির যথার্থতা সম্বন্ধে এবং চিঠিটা যে আপনি লিখেছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে, এটা ছাপানো উচিত হবে বলে আমরা মনে করি না। আমি এই সঙ্গে চিঠিটির প্রতিলিপির একটা প্রতিলিপি পাঠাচ্ছি। এখন, চিঠিটা সত্যই আপনার এবং প্রতিলিপিটিই বা সঠিক কিনা এবং যেভাবে বলেছি সেইভাবে এর প্রকাশনা আপনি অনুমোদন করেন নাকি, অনুগ্রহ করে আমায় তা জানালে বাধিত হবো। যদি চিঠিতে আরও কিছু সংযোজন করতে চান, তবে দয়া করে তা করবেন। সাহস করে আমি আর একটা প্রস্তাব রাখছি। চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে আপনি

পাঠককে অবতারবাদে বিশ্বাস করতে বারণ করেছেন বলে মনে হচ্ছে। প্রশ্নটি আপনি বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন কিনা জানি না (যদি এটা বলা আমার পক্ষে বেয়াদপি না হয়)। ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ অবতারবাদ ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস সযত্নে লালন করে আসছে; বস্তুতঃ চীনেও তাই। তবে, অনেকের পক্ষেই এটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার, আর পাঠগত স্বীকৃতির বিষয় নয়—এটা একরকম বলাই চলে। এর মাধ্যমে জীবনের বহু রহস্যের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারীদের কয়েকজনের কাছে—ট্রান্সভালে যাঁদের কারান্তরালে যেতে হয়েছে, এটা সান্ত্বনা-স্বরূপ। এই মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশ্বাস জন্মাবার জন্যে এসব লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো, আপনি আপনার পাঠককে যে সব বিষয় থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন, "অবতারবাদ" শব্দটি তা থেকে অনুগ্রহ করে যদি বাদ দেন, শুধু এইটুকুই বলার। আলোচ্য চিঠিতে আপনি বেশীর ভাগই কৃষ্ণের উক্তি থেকে উধৃতি দিয়েছেন এবং অংশ বিশেষের উল্লেখ করেছেন। আপনি যে বই থেকে উধৃতিগুলি নিয়েছেন সেই বইটির নাম জানালে বাধিত হ'বো।

এ চিঠি দিয়ে আপনার ক্লান্তি ঘটালাম। আমি জানি, যাঁরা আপনাকে সম্মান করেন ও আপনাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তাদের আপনার সময় নষ্ট করার কোন অধিকার নেই। বরং, যতদূর সম্ভব আপনাকে বিব্রত করা থেকে বিরত থাকাই তাদের উচিত। যে সমস্যাগুলির সমাধান করা আপনি আপনার জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন, সেগুলি সম্পর্কে আপনার উপদেশ লাভ করার জন্য এবং সত্যের খাতিরে, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও এ পত্র লেখার স্বাধীনতা নিয়েছি।

সম্মান প্রদর্শনান্তে
আপনার অনুগত সেবক
এম. কে. গান্ধী

শঙ্করলালকে[১]

সত্যাগ্রহের চিন্তাধারা সম্বন্ধে

সেপ্টেম্বর ২,১৯১৭

ভাই শ্রীশঙ্করলাল,

সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে আমার ধারণা কী তা জানতে চেয়েছ। সংক্ষেপে তা এই : আমি যে শক্তির কথা বলতে চাই, ইংরাজী বাক্যাংশ "প্যাসিভ রেসিসটান্স" ঠিক তা প্রকাশ করে না। উপযুক্ত শব্দ হলো "সত্যাগ্রহ"। সত্যাগ্রহ হলো আত্মিক শক্তি—

১ শঙ্করলাল ব্যাংকার—প্রসিদ্ধ গঠনকর্মী ও গান্ধী চিন্তাধারানুসারী শ্রমিক নেতা; বহু বছর ধরে গান্ধীজীর সহকর্মী ছিলেন।

শস্ত্র শক্তির বিপরীত। যেহেতু এ একান্তভাবেই নৈতিক অস্ত্র, কাজেই নৈতিক জীবনধারার দিকে যাঁদের প্রবণতা, তাঁরাই কেবল বিজ্ঞতার সঙ্গে এ 'অস্ত্র' ব্যবহার করতে পারেন। প্রহ্লাদ, মীরাবাঈ প্রভৃতি ছিলেন সত্যাগ্রহী। মরক্কোর যুদ্ধের সময় আরবেরা একেবারে ফরাসীদের কামানের তোপের মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু ধর্মের জন্যেই যুদ্ধ করছি, এ বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা লড়াইয়ে নেমেছিলেন। জীবনের পরোয়া না করে "ইয়া আল্লা"[২] ধ্বনি তুলে তাঁরা ফরাসীদের কামানের দিকে ছুটে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে হননের জন্য লড়াই করার আদৌ অবকাশই ছিল না। ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনী এই আরবদের ওপর গুলি ছুঁড়তে নারাজ হ'ল এবং মাথার টুপি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আনন্দ-ধ্বনি করতে করতে সাহসী আরবদের আলিঙ্গন করতে ছুটে গেল। এ হ'ল সত্যাগ্রহ কী ও তা কী সাফল্য লাভ করতে পারে, তার অন্যতম দৃষ্টান্ত। ইচ্ছা-পছন্দে আরবেরা সত্যাগ্রহী হননি। তীব্র হৃদয়াবেগের তাড়নায় তারা মৃত্যুর সম্মুখীন হতে প্রস্তুত হয়েছিল, তাদের অন্তরে কোনও প্রেম ছিল না। সত্যাগ্রহী কিন্তু কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না, ক্রোধে জীবনপাতও করে না, পক্ষান্তরে তার নিজের সহ্য করার শক্তি থাকার জন্যে সে বরং তার শত্রু বা নির্যাতনকারীর কাছে নতি জানাতে অস্বীকার করে। কাজেই তার নির্ভীকতার তেজ এবং ক্ষমাপরায়ণ ও দয়াদ্র প্রকৃতি থাকা চাই। ইমাম হাসান ও হোসেন[৩], ছিলেন দুটি নিছক বালক। তাঁরা অনুভব করলেন যে, তাঁদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাঁদের আত্ম-সমর্পণ করতে বলা হলে অস্বীকৃত হলেন তাঁরা। তাঁরা তখনই জানতেন যে, এর অর্থ হ'ল মৃত্যু। আর যদি অবিচারের কাছে শির নত করেন, সে হবে তাঁদের মনুষ্যত্বের অবমাননা ও ধর্মের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা। এ অবস্থায় তারা মৃত্যুর আলিঙ্গনে ধরা দিলেন। এই চমৎকার দুই তরুণের শির যুদ্ধক্ষেত্রে গড়িয়ে গেল। আমার মতে ইসলাম যে মহত্ত্ব অর্জন করেছে, তা তরবারির শক্তিতে নয়, সম্পূর্ণভাবে ফকিরদের আত্মাহুতির জন্যই। অপরের ওপর তরবারি না চালিয়ে অন্যের তরবারিতে নিজের শির খণ্ডিত হতে দেওয়াই হচ্ছে যোদ্ধার মত আচরণ। হত্যাকারী যখন বুঝবে যে সে হত্যাপরাধে অপরাধী এবং সে যদি অন্যায় করেই তা করে থাকে তাহলে সে চিরজীবন ধরে অনুশোচনা করবে। এমনকি মৃত্যুবরণ করে নিহত ব্যক্তি যদি ভুলও করে থাকে, তাহলেও তার জয়ই ঘটল, অন্য কিছু নয়। সত্যাগ্রহ অহিংসার পথ। কাজেই, সব সময় ও সব ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ যুক্তিসিদ্ধ—যথার্থই এটাই ঠিক পথ। অস্ত্রের শক্তি হিংসাশ্রয়ী ও সকল ধর্মে তা সমনিন্দনীয়। এমন কি যাঁরা অস্ত্র ব্যবহারের ওকালতি করেন, তাঁরাও এর ওপর নানারকম বিধিসীমা আরোপ করেন। সত্যাগ্রহের ওপর কোন বিধি-সীমা নেই; বা বরং বলা যায়, স্বেচ্ছায় কষ্ট স্বীকারের জন্য তপশ্চর্যার পক্ষে সত্যাগ্রহীর যে ক্ষমতা তা যেটুকু যা নিয়মবিধি আরোপ করে, তা ছাড়া আর কোন

[২] হে ভগবান

[৩] আলির পুত্রদ্বয়, পয়গম্বরের কন্যা ফাতিমার গর্ভজাত। ইয়াজিদের (খলিফ ৬৮০-৩) প্রভুত্ব অস্বীকার করেছিলেন। হোসেন বিদ্রোহ করেন, কিন্তু পরাজিত ও কারবালা প্রান্তরে হত হ'ন।

বাধ্যবাধকতা নেই।

স্পষ্টতঃই, এ রকম সত্যাগ্রহের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই অপ্রাসঙ্গিক। সত্যাগ্রহীই তা বিচার করবে। পর্যবেক্ষকরা সত্যাগ্রহ ঘটার পর তার মূল্যায়ন করতে পারেন। পৃথিবীর কোন অসন্তোষই সত্যাগ্রহীকে নিরস্ত করবে না। সত্যাগ্রহ করা হবে কি হবে না, তা কোন গাণিতিক সূত্র দ্বারা স্থির হয় না। জয়পরাজয়ের সম্ভাব্যতা তোল এবং সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়ার পরই কেবল সত্যাগ্রহ শুরু করা যেতে পারে বলে যিনি বিশ্বাস করেন, তিনি যথেষ্ট চতুর রাজনীতিক বা বুদ্ধিমান হতে পারেন, কিন্তু তিনি সত্যাগ্রহী নন। সত্যাগ্রহী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করে যান।

স্মরণাতীত কাল থেকে সত্যাগ্রহ ও অস্ত্র, দুই-ই প্রচলিত রয়েছে। প্রচলিত শাস্ত্রাদিতে তাদের প্রশংসা পেয়েছি। এদের একটি "দৈবী সম্পদের" প্রকাশ ও অপরটি "অসুরী সম্পদের।" আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে দৈবী সম্পদের অধিক শক্তি ছিল। এমন কি আজও আমরা সেই আদর্শ অন্তরে পোষণ করি। অসুরী সম্পদের প্রাবল্যের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ইউরোপে মেলে।

দুর্বলতার চেয়ে এই দুই ধরনের শক্তির যে-কোনটিই কাম্য; দুর্বলতা. সোজাভাষায় যাকে আমরা ভীরুতা বলি তাই এবং এটাই অনেকখানি সঠিক প্রতিশব্দ। যে দুই শক্তির কথা বলেছি, তার একটা না হলে, স্বরাজ বা প্রকৃত জন-জাগরণ অসম্ভব। অন্যভাবে স্বরাজ অর্জন করলে তা প্রকৃত স্বরাজ হবে না। সে স্বরাজে জনগণের উপর কোন প্রভাব পড়বে না। শক্তি ও পৌরুষ ছাড়া জন-জাগরণ আসতে পারে না। নেতারা বলুন কী চান এবং অন্যদিকে সরকারও সাধ্যমত চেষ্টা করুন—যদি তাঁরা ও আমরা, আমরা সবাই সত্যাগ্রহের শক্তি জোরদার না করি, তাহলে হিংসার প্রক্রিয়া-পন্থা স্বতঃই প্রসার লাভ করবে। ওগুলি আগাছার মত; যে কোন ধরনের মাটিতে যেমন আগাছা জন্মায়, ওরাও ঠিক যে কোন জায়গায় মাথা চাড়া দেবে। সত্যাগ্রহের ফসল তুলতে হলে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা ও অদম্য সাহসের সার দিতে হবে। আরও বলার হলো, আগাছা না তুললে যেমন তার ভিড়ে চারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তেমনি মনের জমিকে আগাছা মুক্ত করার জন্যে যদি না আমরা তপশ্চর্যার পথ ধরি এবং যে আগাছাগুলি ইতিপূর্বেই জন্মেছে যত্ন করে যদি না সেগুলি উপড়ে ফেলি, তাহলে হিংসার আগাছা বাড়তেই থাকবে। যে সব তরুণ, যাকে তারা সরকারের অত্যাচার বলে, তার ফলে নৈরাশ্য ও ক্রোধের কবলিত হয়ে পড়েছে তাদের আমরা সত্যাগ্রহের সাহায্যে জয় করতে পারি ও দৈবী সম্পদকে শক্তিশালী করতে তাদের সাহস ও উদ্দীপনা এবং ক্লেশভোগের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে পারি। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব সত্যাগ্রহের প্রচারই কাম্য। সেটা শাসক ও শাসিত উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল। সত্যাগ্রহী, সরকার বা অন্য কাউকেই বিড়ম্বিত করতে চায় না। সম্যক বিচার-বিবেচনা না করে সত্যাগ্রহী এক পা-ও বাড়ায় না। সে কখনই উদ্ধত হয় না। ফলে, সে 'বয়কট' আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকবে, কিন্তু কর্তব্য হিসাবে সর্বদাই স্বদেশীর পণ দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে চলবে। সে শুধু ভগবানকেই ভয় করে, যাতে অন্য কোন শক্তি তাকে ভয় দেখাতে

না পারে। শাস্তির ভয়ে সে কখনো কোন কর্তব্য অসমাপ্ত ফেলে রাখবে না।

একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, জ্ঞানী অ্যানিবেসান্ত ও তাঁর সহকর্মীদের মুক্ত করার জন্যে আমাদের সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেওয়া কর্তব্য। তাঁর প্রত্যেকটি কাজ বা কোন কাজ আমরা সমর্থন করি কিনা তা ভিন্ন প্রসঙ্গ। আমি,—একজন—নিশ্চয়ই সে কাজের অনেকগুলি অনুমোদন করি না। কিন্তু সে যাই হোক, সরকারের তাঁকে আটক করে রাখা একটা মস্ত ভুল এবং অবিচারের কাজ। অবশ্য আমি জানি যে, সরকার এটাকে ভুল বলে মনে করেন না। হতে পারে, জনগণ তাঁর মুক্তির কামনা করে ভুল করেছে। সরকার নিজের বিচারবুদ্ধি অনুসারে কাজ করছে। কিন্তু তাদের ক্ষোভ-উষ্মা জানাবার জন্যে লোকে কী করতে পারে? যখন কারোও কষ্ট-ক্লেশ সহ্যের সীমার মধ্যে থাকে তখন আবেদন-নিবেদন ইত্যাদি বেশ ভালই। যখন তা অসহনীয় হয়ে পড়ে তখন সত্যাগ্রহ ছাড়া গত্যন্তর নেই। যখন মানুষ অসহ্য মনে করবে এবং কেবল তাঁরাই—যাঁরা অসহনীয় ভাবছেন—তখন তনু মন ও সর্বস্ব সঁপে অ্যানিবেসান্তের মুক্তিলাভের প্রয়াস পাবেন। জনগণের মনে তীব্র অনুভূতির এটাই হবে শক্তিশালী প্রকাশভঙ্গী। আমার এ বিশ্বাস অবিচল যে, এ রকম মহান আত্মোৎসর্গের কাছে সম্রাটের দম্ভও নতি স্বীকার করবে। মিঃ মন্টেগুর আসন্ন পরিদর্শন উপলক্ষে জনগণ নিশ্চয়ই তাঁদের ভাবাবেগ সংযত করতে পারেন। তাঁর ন্যায়বোধের প্রতি আস্থার এটাই হবে প্রকাশ। তবে তাঁর আগমনের আগে যদি অ্যানিবেসান্ত মুক্ত না হন তাহলে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেওয়াই আমাদের কর্তব্য। আমরা সরকারকে প্ররোচিত করতে বা তার পথে বাধা ঘটাতে চাই না। সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হয়ে আমরা আমাদের আহত-হৃদয়ের তীব্রতাই প্রকাশ করবো এবং ঐ ভাবেই সরকারকে সেবাও করবো।

কস্তুরবা গান্ধীকে

নাদিয়াদ
জুলাই ২৯, ১৯১৮

স্নেহের কস্তুর,

আমি জানি আমার সঙ্গে থাকবার জন্যে আকুল তুমি। তাহলেও আমি মনে করি, আমাদের যে যার নিজের কাজ করে যেতে হবে। আপাততঃ, তুমি যেখানে রয়েছো সেখানে থাকাই ভালো। তুমি যদি ওখানকার সব শিশুদের তোমার নিজের সন্তান বলে মনে করো, তাহলে খুব শীঘ্রই তুমি নিজের সন্তানদের অনুপস্থিতি আর বুঝতে পারবে না। মানুষের বয়স বাড়লে ন্যূনতম যা সে করতে পারে, তা হলো এই। অন্যদের ভালবাসলে, তাদের সেবা করলে তোমার অন্তরের অন্তঃস্থলে আনন্দোচ্ছ্বাস জাগবে। দেখো, নিয়মিতভাবে প্রত্যুষে পীড়িতদের কাছে গিয়ে তাদের সেবা করো। কারো বিশেষ খাদ্যের দরকার হলে তার জন্যে তা তৈরী করে দেবে

বা আলাদা করে রাখবে। মহারাষ্ট্রীয় মেয়েদের কাছে যেও। তাদের শিশুদের আনন্দ দেবে, সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবে। তাঁরা যে পরদেশী নন, এটা যেন তাঁরা অনুভব করেন। তাঁদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়া দরকার।

দরকারী সব ব্যাপারে অর্থাৎ ধর্মীয় ও অনুরূপ বিষয়ে নির্মলার সঙ্গে কথা বলবে। তুমি তাকে ভাগবত পাঠ করে শোনাতে বলতে পার। তারও খুব ভাল লাগবে। এভাবে তুমি যদি অন্যের সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখো—আমায় বিশ্বাস করো তাহলে তোমার মন সর্বদা আনন্দে ভরপুর থাকবে। আর একটা কথা, পুত্র-ভাইয়ের খাওয়া-দাওয়া ও তার অন্য যা দরকার, সেদিকে নজর দিতে ভুলো না।

মোহনদাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

প্রিয় গুরুদেব,

আমরা যখন বিদায় নিই, আপনি যে মর্মস্পর্শী লিপিটি আমার হাতে দিয়েছিলেন তা সরাসরি আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। নিশ্চয়ই বিশ্বভারতী অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান। নিঃসন্দেহে এ সংস্থা আন্তর্জাতিকও। এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগপ্রয়াসে আমার সাধ্যমত সহযোগিতার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।

প্রতিদিন দুপুরবেলা একঘণ্টা নিয়ম করে ঘুমুবেন বলে আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা রক্ষা করবেন বলে আমি আশা করি।

যদিও আমি বরাবরই শান্তিনিকেতনকে আমার দ্বিতীয় আবাস বলে মনে করি, তবুও এবারের এই আসা আমাকে—আগের চেয়ে—শান্তিনিকেতনের আরও নিকটে টেনে এনেছে।

শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রইল।

আপনার
এম. কে. গান্ধী

ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেক ইংরাজের উদ্দেশ্যে

প্রিয় বন্ধু,

প্রত্যেক ইংরাজ আমার এই আবেদন পড়বেন এবং এ সম্পর্কে চিন্তা করবেন—এই আমার ইচ্ছা।

আপনাদের কাছে আমার নিজের পরিচয় দিতে চাই। সবিনয়ে বলতে চাই

একটানা ২৯ বছর ধরে আমি যে-ভাবে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি, অন্য কোন ভারতীয় তা করেন নি। এই দীর্ঘ সময়ে আমাকে এমন-সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে-অবস্থায় পড়লে অন্য যে-কোন মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। বিশ্বাস করুন, আপনাদের কাছ থেকে শাস্তি পাবার ভয়ে কিংবা কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমি এই সহযোগিতা করিনি; করেছি স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায়। কারণ আমি বিশ্বাস করতাম—ভারতের কল্যাণ সাধনই ব্রিটিশ সরকারের কার্যাবলীর সামগ্রিক লক্ষ্য।

(ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যের উপকারার্থে কাজ করতে গিয়ে চার বার আমার জীবন বিপন্ন হয়েছিল। বুয়োর যুদ্ধের সময় আমি অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর অধিকর্তা ছিলাম। জেনারেল বুলোরের চিঠিপত্রে ঐ বাহিনীর কাজের উল্লেখ আছে। নাটালে জুলু বিদ্রোহের সময়ও আমি অনুরূপ বাহিনীর পরিচালন ভার গ্রহণ করেছিলাম। শেষ পর্যায়ের যুদ্ধ সুরুর সময়ও আমি একটি অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী গড়ে তুলি। ঐ সময় কষ্টকর শিক্ষানবিশীর ফলে আমি প্লুরিসিতে আক্রান্ত হই। শেষবার, দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'ওয়র কনফারেন্সে' লর্ড চেমসফোর্ডকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রূপায়নের জন্য আমি কয়রা জেলায় বাহিনী গঠনের অভিযানে আত্মনিয়োগ করি। ঐ কাজে অনেক সুদীর্ঘ ও কষ্টকর পদযাত্রার প্রয়োজন হয়। শেষ পর্যন্ত আমি আমাশায় আক্রান্ত হই, যাতে আমার জীবন সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছিল। এই সব কাজ করার সময় আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে আমার কাজের ফলে আমার দেশ সাম্রাজ্যের মধ্যে (অন্যান্য অংশের সঙ্গে) সম মর্যাদা পাবে। গত ডিসেম্বর মাসেও আমি বিশ্বস্ত সহযোগিতার পক্ষে যথেষ্ট ওকালতি করেছি। আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাস করেছিলাম যে মিঃ লয়েড জর্জ মুসলমানদের যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তিনি পালন করবেন। বিশ্বাস করেছিলাম : পাঞ্জাবে সরকারী অত্যাচারের সংবাদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর পাঞ্জাবীদের জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু মিঃ লয়েড জর্জের বিশ্বাসঘাতকতা এবং আপনাদের দ্বারা তার অনুমোদন, পাঞ্জাবে অত্যাচারীদের ক্ষমা প্রদর্শন সরকারের শুভ বুদ্ধির প্রতি আমার আস্থা একেবারে চুরমার করে দিয়েছে। যে-জাতি ঐ সরকারকে সমর্থন করেছে তার উপরও আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছি।

আপনাদের শুভ চেতনার প্রতি আমার আস্থা নষ্ট হয়ে গেলেও আপনাদের সাহসিকতা আমি স্বীকার করি। জানি : ন্যায় ও যুক্তির কাছে যা আপনারা সমর্পণ করবেন না, সাহসিকতার কাছে তাকেই সানন্দে দিতে চাইবেন।

এই সাম্রাজ্য ভারতের কাছে কী অর্থ বহন করে তা একবার দেখুন—

(আমাদের কাছে সাম্রাজ্যের অর্থ হল) গ্রেট ব্রিটেনের উপকারার্থে ভারতের সম্পদ শোষণ; ক্রম বর্ধমান সামরিক ব্যয় এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিভিল সার্ভিস; ভারতের দারিদ্র্যের কথা সম্পূর্ণ অবহেলা করে প্রত্যেক দফতরের ব্যয়বহুল কাজের ধরন; পাছে একটি সশস্ত্র জাতির মধ্যে থেকে আপনাদের মুষ্টিমেয় ক'জনের জীবন বিপন্ন হয় সেই জন্য নিরস্ত্রীকরণ ও একটি জাতির নির্বীর্যকরণ; ভারিক্কী চালের প্রশাসন বজায় রাখার জন্য মাদক তরল দ্রব্য ও ঔষধাদির প্রশ্রয়;

একটি জাতির মর্মান্তিক যন্ত্রণা প্রকাশার্থ ক্রম-বর্ধিষ্ণু আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে কঠোর থেকে কঠোরতর দমনমূলক আইন; আপনাদের ডোমিনিয়মসমূহে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ।

এ ছাড়া আপনারা পাঞ্জাবের প্রশাসকদের গৌরবান্বিত করে এবং মুসলমানদের 'সেনটিমেনটকে' অবজ্ঞা করে আমাদের অনুভাবনাকে পুরোপুরি অবহেলা করেছেন।

লড়াই করে আপনাদের হাত থেকে আমরা রাজছত্র ছিনিয়ে নিতে পারলে আপনারা যে কিছু মনে করতেন না সে কথা আমি জানি। আপনারা জানেন : আমরা তা করতে অক্ষম। কারণ, প্রকাশ্য ও ন্যায় যুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি যাতে আমাদের না থাকে তার ব্যবস্থা আপনারা করেছেন। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস দেখানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আত্মার সাহস প্রদর্শনের ক্ষেত্র এখনও আমাদের কাছে উন্মুক্ত। আপনারা যে সে ক্ষেত্রেও সাড়া দেবেন তা জানি। আমি সাহস জাগানোর কাজে নিবদ্ধ। অসহযোগিতার অর্থ আত্মত্যাগে শিক্ষানবিশী, তার কম কিছু নয়। আমরা যখন জানি যে এই বিশাল দেশে আপনাদের শাসন চালু থাকায় আমরা ক্রমেই কঠিনতর দাসত্বের শৃংখলে বাঁধা পড়ছি, তখন আপনাদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করতে যাব কেন? আমার আবেদনে জনগণ যে এভাবে সাড়া দিচ্ছেন তা আমার ব্যক্তিত্বের জন্য নয়। আমি চাই—আপনারা আমার এবং আলি ভাইদের কথা বিবেচনা করা ছেড়ে দিন। আমি যদি বোকার মত কোন মুসলিম-বিরোধী জিগীর তুলতাম তাহলে আমার ব্যক্তিত্বও তাতে সাড়া জাগাতে সক্ষম হত না। তেমনি, আলি ভাইয়েরাও যদি উন্মত্তের মত হিন্দু-বিরোধী জিগীর তুলে মুসলমানদের তাতাতে চাইতেন তাহলে সে প্রয়াসে তাঁদের যাদুকরী ব্যক্তিত্বও ব্যর্থ হত। হাজার হাজার লোক যে আমাদের কথা শুনতে ভীড় করে তার কারণ আমরা আপনাদের শৃংখল-তলে আর্তনাদী জাতির কণ্ঠকেই তুলে ধরছি। আলি ভাইদের সঙ্গে আপনাদের বন্ধুত্ব ছিল; আমার সঙ্গেও, এখনও আছে। আপনাদের প্রতি কোন অসম্ভব পোষণে আমার ধর্মই আমাকে বিরত করে। তাই, ক্ষমতা থাকলেও আমি আপনাদের বিরুদ্ধে হাত তুলতাম না। আমি দুঃখভোগের দ্বারা আপনাদের জয় করব বলে আশা করি। আলি ভাইয়েরা নিজ ধর্ম ও মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য সম্ভব হলে নিশ্চয়ই অস্ত্র হাতে তুলে নিতেন। কিন্তু ভারতীয়দের অনুভাবনা প্রকাশ ও তাদের দুর্দশার প্রতিকার সন্ধানের কাজে আমি ও আলি ভাইয়েরা ভারতীয় জনগণের সঙ্গে একই ভাবনায় সংবদ্ধ হয়েছি।

জাতীয় চেতনার এই ক্রমোন্মেষ দমনের জন্য আপনারা প্রতিকার সন্ধান করছেন। আমি বলতে চাই—একে দমন করার একমাত্র উপায় এর কারণ দূর করা। এখনও আপনাদের হাতে উপায় আছে। ভারতীয়দের প্রতি যে সকল অন্যায় করা হয়েছে তার জন্য আপনারা অনুতাপ করতে পারেন। আপনারা মিঃ লয়েড জর্জকে তার প্রতিজ্ঞা পালনে বাধ্য করতে পারেন। তিনি 'পলায়নের' অনেক পথই খোলা রেখেছেন। যোগ্যতর ব্যক্তির জন্য আসন খালি করে আপনারা ভাইসরয়কে অবসর গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। স্যর মাইকেল ও' ডইয়ার এবং জেনারেল ডায়ার সম্পর্কে আপনারা আপনাদের মনোভাব পালটাতে পারেন। যথাযথভাবে নির্বাচিত এবং

সকল মতের প্রতিনিধিত্বকারী স্বীকৃত জননেতাদের বৈঠক ডাকার জন্য আপনারা সরকারকে বাধ্য করতে পারেন। ভারতীয় জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বরাজ দানের পদ্ধতি রিভাইজ করার জন্য এ ধরণের বৈঠক দরকার।

কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেক ভারতীয়কে আপনাদের সমান বলে গণ্য না করলে, আপনাদের ভাই বলে মেনে না নিলে ঐ কাজ আপনাদের পক্ষে অসম্ভব। আমি কোন দাক্ষিণ্য চাই না; শুধু বন্ধু হিসাবে একটি গভীর সমস্যার সম্মানজনক সমাধানের উপায় আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। অন্য সমাধানের—অর্থাৎ দমনের—পথও আপনাদের কাছে খোলা রয়েছে। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে সে পদ্ধতি ব্যর্থ হবে। তা ইতিমধ্যেই ব্যর্থ হতে সুরু করেছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই পানিপথের দুই বীর সন্তানকে কারাবরুদ্ধ করেছে। অনরূপ মত প্রকাশের জন্য আর এক জনের লাহোরে বিচার হচ্ছে। অযোধ্যা জেলায় ইতিমধ্যেই এক জনের জেল হয়েছে। আর এক জন বিচারে রায়ের অপেক্ষা করছেন। আপনাদের মাঝে কী ঘটছে তা আপনাদের জানা উচিত। দমনের আশংকা সামনে রেখেই আমাদের প্রচার চালানো হচ্ছে। মহত্তর পথ বেছে নিয়ে যে-ভারতীয়দের অস্ত্রে আপনাদের পুষ্টি ঘটছে তাদের সঙ্গে একাত্ম হবার জন্য আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তাদের আকাঙ্ক্ষা অবদমনের প্রয়াসের অর্থ দেশের প্রতি আপনাদের আনুগত্যের অভাব।

আপনাদের বিশ্বস্ত বন্ধু,
এম. কে. গান্ধী

জওহরলাল নেহেরুকে

অক্টোবর ৫, ১৯৪৫

প্রিয় জওহরলাল,

কয়েকদিন ধ'রে তোমাকে চিঠি লিখব লিখব করছি, কিন্তু মাত্র আজই লিখে উঠতে পারলাম। মনে এ প্রশ্নও জেগেছিল হিন্দিতে লিখবো না ইংরেজিতে লিখবো। যাহোক, অবশেষে হিন্দিতে লেখাই ভাল মনে করলাম।

তোমার আমার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর যে পার্থক্য রয়েছে তা প্রথমে লিখতে চাই। যদি সেই পার্থক্য মৌল হয়, তাহলে জনসাধারণকে তা জানানো উচিত বলে মনে করি। জনসাধারণকে অন্ধকারে রাখলে, আমরা স্বরাজের জন্যে যে কাজ করে যাচ্ছি তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। "হিন্দ-স্বরাজ" সরকারের যে রূপ আঁকা হয়েছে সেই পদ্ধতির আজও আমি দৃঢ় সমর্থক যে তা বলেইছি তো। ওগুলি শুধু কথা নয়। ১৯০৮ সাল থেকে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসছি—ঐ সনেই পুস্তিকাটি লিখেছিলাম—তা আমার বিশ্বাসের সত্যতাই সপ্রমাণ করেছে। তাই আমার এ বিশ্বাসের যদি কেউ সহভাগী না হয়, তাতে আমি কিছু মনে করবো না, কারণ

আমি সত্যকে যেভাবে উপলব্ধি করেছি, সে বিষয়ে সাক্ষ্য কেবল আমিই দিতে পারি। এখন লেখার সময় "হিন্দ-স্বরাজ" আমার সামনে নেই। ছবিটি আমার নিজের ভাষায় নতুন করে আঁকা যথার্থই ভাল হবে এবং তাই করা উচিত আমার। "হিন্দ-স্বরাজে" বর্ণিত ছবি, আর এ ছবি এক কি এক নয়, সে বিচার তোমার আমার উভয়ের পক্ষেই অহেতুক। তখন যে কথা বলেছিলাম তা সত্য কিনা তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। এখন আমি কী অনুভব করি তা জানাই কেবল জরুরী। আমার স্থির বিশ্বাস যে, ভারতকে যদি প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় ও তার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে, তাহলে আজ হোক বা কাল হোক, এই সত্য মেনে নিতেই হবে যে, জনগণকে গ্রামের কুটিরে বাস করতে হবে; শহরে ও প্রাসাদে নয়। কোটি কোটি মানুষ শহরে ও প্রাসাদে কিছুতেই পারস্পরিক শান্তিতে বাস করতে পারবে না। হিংসা ও অসত্যের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তাদের সামনে আর তখন অন্য কোন পথ থাকবে না। আমি মনে করি, সত্য ও অহিংসাকে বাদ দিলে মানব সমাজের বিনাশ ঘটবে। সত্য ও অহিংসার রূপ আমরা সাদা-মাটা গ্রাম্য জীবনের মধ্যেই কেবল দেখতে পাই এবং সেই সারল্য চরখায় ও চরখা যা কিছুর প্রতীক তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল প্রতিফলিত। পৃথিবী যদি আজ ভুল পথে যায় আমার ভয় পেলে চলবে না। এমন হতে পারে যে ভারতও সেই পথে যাবে এবং প্রবাদ-খ্যাত পতঙ্গ যেমন, যে অগ্নিশিখাকে ঘিরে এমন উন্মত্ত হয়ে নাচতে থাকে, সেই আগুনেই শেষ পর্যন্ত পুড়ে মরে, ভারতের পরিণামও তাই হতে পারে। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমার কর্তব্য হবে ভারতবর্ষ ও তার মাধ্যমে সারা পৃথিবীকে সেই বিনষ্টি থেকে রক্ষা করা। আমি যা বলছি তার মর্মার্থ হল, মানুষকে তার যা প্রকৃত প্রয়োজন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং তার স্বাবলম্বী হওয়াই উচিত। এ সংযম না থাকলে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে পারবে না। মোটের ওপর, বহু ব্যষ্টির সমন্বয়েই এ পৃথিবীর সৃষ্টি; যেমন বিন্দু বিন্দু জলে সাগর। নতুন কিছু আমি বলিনি। এ সত্য সকলে জানে।

একথা আমি "হিন্দ্-স্বরাজে" বলেছি বলে মনে হয় না। আমি যখন আধুনিক বিজ্ঞানের প্রশংসা করি, তখন আমি একথাই বলতে চাই যে, পুরাতন সত্যকে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে নতুন করে যাচাই করে তাকে নব সাজে উপস্থিত করতে হবে। আমার স্বপ্নের গ্রাম এখনও আমার মনেই রয়েছে। বলতে কি, প্রত্যেক মানুষই তার স্বপ্নরাজ্যে বাস করে। আমার আদর্শ গ্রামে থাকবেন বুদ্ধিমান মানুষ সব। পশুর মত ময়লা আবর্জনায় ও অন্ধকারে বাস করবেন না। নর-নারী সবাই হবেন স্বাধীন এবং বিশ্বের যে কারোও বিরুদ্ধে আত্মবলে দাঁড়াতে পারবেন। সেখানে প্লেগ, কলেরা, বসন্ত থাকবে না। অলস হবে না কেউ সেখানে। বিলাসীও হবে না কেউ। প্রত্যেককেই নির্দিষ্ট-পরিমাণ কায়িক-শ্রমদান করতে হবে। বিশদ-ভাবে সে ছবি আমি আঁকতে চাই না। রেলপথ, ডাক ও তার অফিস যে থাকবে তা কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে। যদি আসল জিনিস ছেড়ে দিই, তাহলে সব কিছু চলে যাবে।

ওয়ার্কিং কমিটির শেষদিনের বৈঠকে স্থির হয়েছিল যে, দুই বা তিন দিনের

এক অধিবেশনে এব্যাপারটা নিয়ে পুরো আলোচনায় সব পরিষ্কার স্পষ্ট করে নেওয়া হবে। আমিও তাই চাই। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি বসুক বা না বসুক দুটো কারণে আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটা পরিষ্কার করে আমাদের বুঝতে হবে বলে মনে করি। প্রথমতঃ তুমি ও আমি যে বাঁধনে বাঁধা সে বাঁধন শুধু রাজনৈতিক কাজকর্ম নয়। এ বাঁধন সুগভীর ও ছিন্ন হবার নয়। তাই আমার আন্তরিক বাসনা হলো, রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা পরস্পরকে সঠিক বুঝবো। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দুজনের কেউই নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে করি না। আমরা দুজনেই ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বেঁচে রয়েছি ও উভয়েই আমরা সেজন্য হাসি-মুখে মরতেও প্রস্তুত। বিশ্বের প্রশংসার আমাদের কোন দরকার নেই। তাছাড়া কেউ আমাদের প্রশংসা করলো, কী দোষ ছিল, তা আমাদের কাছে নিরর্থক। সেবায় প্রশংসার স্থান নেই। ভারতবর্ষকে সেবা করার জন্যে আমি ১২৫ বছর বাঁচতে চাই; অবশ্য, আমি এখনই বৃদ্ধ, আর তা নিশ্চয়ই স্বীকার করি। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তাই তোমাকেই আমার উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছি। নিশ্চয়ই আমাকে আমার উত্তরাধিকারীকে বুঝতে হবে; তেমনি আমাকেও আমার উত্তরাধিকারীর বোঝা উচিত। তা হলেই কেবল আমি সন্তুষ্ট হবো।

আর একটা কথা। তোমাকে কস্তুরবা ট্রাস্ট ও হিন্দুস্থানী প্রচার সভায় যোগ দিতে বলেছিলাম আমি। চিন্তা করে আমাকে জানাবে বলেছিলে তুমি। ইতিমধ্যেই হিন্দুস্থানী প্রচাব সভায় তোমার নাম উঠে গেছে, দেখছি। নানাবতী স্মরণ করিয়ে দিলেন, তিনি তোমার ও মৌলানা সাহেবের কাছে এ ব্যাপারের জন্যে ১৯৪২ সালে গিয়ে তোমাদের স্বাক্ষর নিয়েছিলেন। তা অবশ্য অতীত ইতিহাস। হিন্দুস্থানীর বর্তমান অবস্থা জানো তুমি। যদি তোমার সেদিনের সেই সইয়ে আজও বিশ্বাস থাকে তাহলে তোমার কাছ থেকে এ সভায় কিছু কাজ আশা করবো। খুব বেশী কাজ নয়, আব সেজন্যে তোমাকে ঘুরতেও হবে না।

আর একটা ব্যাপার, কস্তুরবা তহবিলের কাজকর্ম। এ চিঠিতে আগের দিকে যে সব কথা লিখেছি, তা যদি তোমার মনে না ধরে. তাহলে আমার ভয় হয় যে, ট্রাস্টে তোমার ভাল না লাগতেও পারে। আর সে কথা আমি বুঝবোও।

সবশেষে, তোমার ও শরৎবাবুর মধ্যে যে মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছে, সে কথাটা বলতে চাই। এর জন্যে আমি ব্যথিত। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি যা বলেছ. তা ছাড়া কি আরও কিছু ভিতরের ব্যাপার আছে? যদি থাকে, তা অবশ্য আমাকে জানাবে।

যদি মনে কর, যে সব কথা লিখেছি সে বিষয়ে সামনাসামনি কথা বলার জন্য আমার সঙ্গে দেখা করা দরকার. তাহলে অবশ্যই একসঙ্গে বসার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

তোমার খুব খাটুনি যাচ্ছে। আশা করি তুমি ভাল আছ। ইন্দুও নিশ্চয়ই ভাল।

আশীর্বাদ নিও

বাপু



পত্ররচনারত (১৯৩০)

*জওহরলাল নেহেরুকে

পুণা
নভেম্বর ১৩, ১৯৪৫

প্রিয় জওহরলাল,

গত কালের আলোচনা আমাকে আনন্দ দিয়েছে। তা বেশিক্ষণ চালানো সম্ভব হয়নি বলে আমি দুঃখিত। আমার মনে হয়, একটা বৈঠকে কথা শেষ হবার নয়, আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। আমার প্রকৃতিটাই এমন যে, ছোটাছুটি করার পক্ষে কেবল শারীরিক দিক দিয়েই যদি আমি উপযুক্ত থাকতাম, তাহলে তুমি যেখানেই থাক-না-কেন তোমাকে ধরে ফেলতাম ও দু'চারদিন তোমার সঙ্গে মনের কথা বলে আবার ফিরে আসতাম। আগেও এ রকম করেছি। আমরা পরস্পর যাতে পরস্পরকে ভালভাবে বুঝি, তা দরকার এবং আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, তাও অন্যদের স্পষ্টভাবে জানা থাকা চাই। আজকের মতই, যতদিন আমরা একাত্ম থাকবো, আমরা যদি শেষ পর্যন্ত স্বীকারও করে নিই যে আমাদের মধ্যে মত-পার্থক্য ঘটছে, তাহলেও কিছু আসে যায় না। গতকালের আলোচনায় আমার এই ধারণাই হয়েছে যে, আমাদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। তার প্রমাণ হিসাবে, আমি যা বুঝেছি তার সারাংশ জানাচ্ছি। যদি কোনও ভুল থাকে তাহলে আমায় সংশোধন করে দিও।

(১) তোমার মতে আসল প্রশ্ন হলো, কীভাবে মানুষের বুদ্ধিগত, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সর্বোচ্চ বিকাশ সাধন করা যায়। আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি একমত।

(২) এক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার ও সুযোগ থাকা উচিত।

(৩) অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, খাদ্য ও পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রার অন্যান্য ব্যবস্থার মানের ব্যাপারে শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যে সমতা থাকা উচিত। আজ এই সমতা অর্জন করতে হলে জনসাধারণকে নিজেদের বস্ত্র, খাদ্য, বাসস্থান, জল-আলো প্রভৃতি জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করতে হবে।

(৪) বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার জন্য মানুষ জন্মায়নি; মানুষ মূলতঃ সামাজিক জীব—স্বাধীন, আবার পারস্পরিক নির্ভরশীলও। কেউই অন্যের স্কন্ধে নির্ভর করে চলতে পারে না, আর তা উচিতও নয়। এ রকম জীবনযাত্রার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হলে আমাদের এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছোতে হয় যে, সমাজের একক (ইউনিট) হওয়া উচিত এক একটি গ্রাম বা বলতে পার ক্ষুদ্র ও আয়ত্তাধীন একদল মানুষ যাদের আদর্শ হল ইউনিট হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ (অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভারের ব্যাপারে) হয়ে পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকা।

* মূল হিন্দি থেকে।

যদি দেখি, এ পর্যন্ত তোমাকে ঠিক বুঝেছি, তাহলে পরের চিঠিতে প্রশ্নটির দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করবো।

তোমাকে যে প্রথম চিঠিটা দিয়েছি রাজকুমারীকে দিয়ে তা অনুবাদ করিয়ে নিয়েছি। তা আমার কাছে এখনও রয়েছে। সেটার একটা ইংরাজী অনুবাদ তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। এতে দুটো কাজ হবে। ইংরাজী অনুবাদে হয়তো আমি তোমাকে আমার বক্তব্য আরো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো। তাছাড়া তুমিও আমাকে ঠিক ও পুরো বুঝতে পেরেছ কিনা তাও বিচার করতে পারবো।

ইন্দুকে আশীষ দিও।

আশীর্বাদ রইল।

বাপু

রোমা রোল্যাঁকে

সবরমতী আশ্রম

ফেব্রুয়ারী ১৫,১৯২৮

প্রিয় বন্ধু,

আমাকে লেখা আপনার সর্বশেষ পত্রখানা মীরা অনুবাদ করে দিয়েছে। আপনার বেদনায় আমার সারা অন্তরাত্মা মর্মাহত, বিশেষ করে যেহেতু আমার একটি চিঠিকে উপলক্ষ্য করে এর সৃষ্টি—এবং যে চিঠি থেকে আমার হৃদয় কঠোর বলে আপনার মনে সন্দেহ জেগেছে। কাজ-কর্মে এবং চিন্তায় আমি নির্ভুল থাকছি, তা দেখবার জন্য আপনার শুভ কামনার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। বাস্তবিকই আমি আপনার সঙ্গে মানিয়ে চলতে চাই, কিন্তু আপনার আন্তরিক বন্ধুত্বের স্বাদ যদি আমি বরাবর পাবার অভিলাষী হই, তা'হলে অবশ্যই আমাকে নিজের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে।

আগেই আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে, মীরার চিঠিতে তার নিজের মতামতই প্রতিফলিত, যদিও তা আমার মতের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। মীরাকে আমি যতদূর জানি তা থেকে বলতে পারি, মীরার কিংবা আমারও—কারোরই ঐ দুজন সৎ কৃষকের[৪] বিচার করবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না। নিঃসন্দেহে তারা বীরত্বের কাজ করেছিল। আমাদের মনে ছিল যুদ্ধ-প্রতিরোধকারীর বীরত্ব এবং আপনার পাঠানো নথিপত্র থেকে ও মীরা যেভাবে সেগুলি আমার কাছে ব্যাখ্যা করে দিয়েছিল, তাতে ঐ বিশেষ ধরনের বীরত্ব যা একজন যুদ্ধ-প্রতিরোধকারী নিজের জীবনে প্রদর্শন করেন, সেটা আমার মনোযোগ এড়িয়ে গিয়েছিল। জোয়ান-অব-আর্ক ছিলেন এক বীর রমণী। লিওনিডাস এবং হোরাটিয়াসও তাই। কিন্তু এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বীরত্বের ধরণ ভিন্ন; আবার স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিটিই মহৎ ও প্রশংসার্হ।

কৃষকরা যে উত্তর দেন তার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধ বিতৃষ্ণা বা যুদ্ধকে প্রতিরোধ করবার জন্যে চরমতম কষ্টবরণ করবার দৃঢ়-সংকল্প আমি লক্ষ্য করছি না। যদি

আমার স্মরণশক্তি ঠিক মত কাজ করে থাকে তাহলে বলতে পারি এই সব কৃষক বন্ধুরা বীর—তাঁরা সরল গ্রাম্য জীবনের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তা সংরক্ষণ করছেন। এইসব বীর, গোঁড়া যুদ্ধ-প্রতিরোধকারীদের চেয়ে কম দামী নন। আমরা এইসব বীরত্বই সযত্নে রক্ষা করতে চাই, কিন্তু আমি মনে করি যে, যদি আমরা বীরত্বের প্রতিটি ধরণকে আলাদা-আলাদা গ্রহণ করি তাহলেই আমরা বীরদের ও সত্য-ধর্মের অধিকতর সেবা করতে পারব।

আপনি বিস্ময়জনকভাবে গত যুদ্ধে আমার অংশ গ্রহণের প্রশ্ন তুলেছেন। এটা সংগত প্রশ্ন। আপনি এই প্রশ্ন তুলবেন একথা আগে থেকে মনে করেই যেন আমি আত্মজীবনীর শেষ অধ্যায়ে এর উত্তর দিয়েছি। অনুগ্রহ করে মনোযোগের সংগে ওটা পড়ে আমার যুক্তিটা[৫] সম্পর্কে আপনার মতামত কী অবসরমত আমাকে জানাবেন। আমি এ বিষয়ে আপনার অভিমত মূল্যবান বলে মনে করবো।

সর্বশেষে এ কথাটাই বলবার, আমি পূর্ণত্বে পেঁাছোতে চাই, কিন্তু আমি আমার সীমা জানি এবং নিজের ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে আমার এই জ্ঞান দিন দিন স্বচ্ছতর হয়ে পড়েছে। কে জানে, কত জায়গায়ই না হৃদয়-কাঠিন্যের দায়-ভাগী হচ্ছি আমি এবং আপনি যদি আমার লেখার একাধিক স্থানে আমার বদান্যতার অভাব লক্ষ্য করে থাকেন তাহলেও আমি বিস্মিত হবো না। ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়াবার প্রার্থনা-প্রয়াস সত্ত্বেও আমার লেখায় অনেক স্খলন রয়ে যাচ্ছে এইটুকুই শুধু আমি বলতে পারি। আমার মনে হয়, প্রাচীন খ্রীষ্টানরা যে শয়তানকে কেবলমাত্র কু-নীতি বলে মনে না করে মূর্তিমান পাপ বলে মনে করতেন, তা অহেতুক নয়। শয়তান আমাদের জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই আধিপত্য করতে চায় বলে মনে হয় এবং মানুষের ব্রতই হলো তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা।

মীরার কাছে লেখা আপনার এই পত্রখানা আপনাকে সশরীরে দর্শন করবার জন্যে আমাকে অধিকতর আকুল করে তুলেছে। আমার স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, আর তাছাড়া অন্তরের ডাক যদি আমাকে ইউরোপের দিকে চালিত করে তাহলে এ বছরই আপনাকে দর্শন করবার একটা ক্ষীণ আশা আমার রয়েছে। দুটো নিমন্ত্রণ সম্পর্কে আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি এবং আপনার দর্শন-আকাঙ্ক্ষা ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণে আমাকে শেষ পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করতেও পারে।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে. গান্ধী

[৪] রোমারোল্যাঁ তাঁর উত্তরে ৭ই মার্চ লেখেন—স্যাভয়ের দুই ভক্ত কৃষকের বিষয়ে আপনি যা বলেছেন তা বুঝেছি। আপনার যুক্তির কাছে মাথা নত করছি আমি; যদিও একই সংগে আমি এই বিশ্বাসও করছি যে, খুব কম স্ত্রীপুরুষই (অন্তত ইউরোপে) আছেন যাঁরা অন্য চিন্তাধারার সংগে "যুদ্ধ প্রতিরোধকে" সর্বদা মিশিয়ে ফেলেন না। কারণ মানুষের প্রায় প্রত্যেক চিন্তাই, তা যতই তীব্র হোক-না-কেন, একেবারে বিশুদ্ধ থাকে না।

[৫] রোমারোল্যাঁ উত্তরে লেখেন—"আমি যদি একথা বলি যে—আমায় সেজন্য ক্ষমা করুন—আপনার চিন্তাধারা অনুধাবন ও তা সমর্থন করার চেষ্টা সত্ত্বেও আমি তা পারিনি না..."

লর্ড আরউইনের প্রতি*

প্রিয় বন্ধু,

ঈশ্বর করলে আমার সংগীদের নিয়ে ধারাসনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ইচ্ছ আছে। সেখানে পেঁাছে আমরা লবণ কারখানাগুলির অধিকার দাবি করব জনগণকে বলা হয়েছে—ধারাসনা 'প্রাইভেট' সম্পত্তি। এটাই নেহাৎই ধোঁকাবাজি ভাইসরয়ের বাড়িটি সরকারের যতটা নিয়ন্ত্রণাধীন, ধারাসনাও ততটাই সরকারে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ছাড়া এক কণা লবণও সরানো সম্ভ নয়।

খেলাচ্ছলে এবং দুষ্টামি করে একে (আমাদের অভিযানকে) লুণ্ঠন আখ দেওয়া হয়েছে। তিন ভাবে আপনার পক্ষে এই 'লুণ্ঠন' রোধ করা সম্ভব। এক, লব কর রহিত করে; দুই, আমাকে এবং আমার দলবলকে গ্রেফতার করে। অবশ্য, য জনকে গ্রেফতার করা হবে, আমার দেশ আবার তত জনকেই এগিয়ে দিতে পারে বলে আশা করি। তিন, নিছক গুণ্ডবাজি চালিয়ে। কিন্তু আমি আশা করি—য জনের মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে, আবার ঠিক তত জন মাথা দিতে এগিয়ে আসবে

বিনা দ্বিধায় এই ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। আমি আশ করেছিলাম যে সরকার ভদ্রভাবে প্রতিরোধকারীদের সঙ্গে লড়বেন। প্রতিরোধকারীদে বিরুদ্ধে সরকার সাধারণ আইনগত পদ্ধতি গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকলে আমার কিছু বলার থাকত না। কিন্তু, সুপরিচিত নেতাদের বিরুদ্ধে মোটামুটিভাবে আইনে আশ্রয় নেওয়া হলেও সাধারণ কর্মীদের প্রায়শই বর্বরোচিত ঢঙে, কখনো কখনে অশোভন ভঙ্গিতে অপমান করা হয়েছে। এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলে হয়ত এড়িয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু গুজরাটে যে-ধরনের অভিজ্ঞতার অসংখ্য নজির আমার হাতে আছে তারই সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে বাংলা, বিহার, উৎকল, ইউপি, দিল্লী এব বোম্বাইয়ের ঘটনাবলী থেকে। করাচী, পেশোয়ার এবং মাদ্রাজে বিনা প্ররোচনা অনর্থক গুলি চালানো হয়েছে বলে মনে হয়। সরকারের কাছে মূল্যহীন কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে মূল্যবান যে লবণ সেই লবণ স্বেচ্ছাসেবকরা যাতে ছেড়ে আসে তার জন্য হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, গোপন অঙ্গে মোচড় দেওয়া হয়েছে মথুরায় একটি দশ বছরের বালকের কাছ থেকে এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জনতা অন্যায়ভাবে কেড়ে-নেওয় পতাকা প্রত্যর্পণের দাবি জানালে তাদের নাকি নির্দয় প্রহার করে হটিয়ে দেওয়া হয় পরে যে পতাকাটি ফেরৎ দেওয়া হয় তাতে দোষী বিবেকের পরিচয় পাওয়া যায় বাংলাদেশে লবণের ব্যাপারে অভিযুক্ত করা বা অপমানের ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পতাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে অচিন্তনীয় নৃশংসতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। ধান ক্ষেত নাকি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে

---

* ১৯৩০ সালের ৪ঠা মে গ্রেপ্তার হওয়ার প্রাক্কালে গান্ধীজী এই চিঠির খসড়া তৈরি করেছিলেন।

খাদ্যবস্তু জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীরা অফিসারদের কাছে তরকারি বেচতে রাজি না হওয়ায় গুজরাটে একটি তরকারি বাজার লুঠ করা হয়েছে। এক বিরাট জনতার সামনেই এই ঘটনা ঘটেছে; কিন্তু কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে জনতা প্রতিশোধ গ্রহণে এগিয়ে যায়নি। সত্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্যক্তিদের প্রদত্ত এই সব বিবরণ আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে বলব। বরদৌলি ঘটনার মত উচ্চ পদস্থ অফিসারদের এই সব ঘটনা অস্বীকার মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয়েছে। বলতে অনুশোচনা হচ্ছে যে গত পাঁচ সপ্তাহেও অফিসাররা জনগণের কাছে মিথ্যা কথা প্রচার করতে দ্বিধা করেনি। গুজরাটের কালেকটরদের অফিস থেকে প্রচারিত সরকারী নোটিশ থেকে আমি নিম্নোক্ত নমুনাগুলি গ্রহণ করছি :

"১। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিরা বছরে পাঁচ পাউন্ড লবণ গ্রহণ করে, সুতরাং কর হিসাবে বছরে মাত্র তিন আনা দেয়। সরকার যদি একচেটিয়া কারবার তুলে দেয় তাহলে জনগণ অতিরিক্ত দাম দিতে এবং একচেটিয়া কারবার বন্ধের ফলে সরকারের যে ক্ষতি হবে তা পূরণে বাধ্য হবে। সমুদ্র তীর থেকে আপনারা যে লবণ সংগ্রহ করেন তা অখাদ্য; তাই সরকার তা নষ্ট করে দেয়।"

"২। মিঃ গান্ধী বলেছেন যে সরকার এদেশে হাতে সুতা কাটার প্রথা ধ্বংস করে দিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন যে এ কথা সত্য নয়; কারণ সারা দেশে একটি গ্রামও নেই যেখানে হাতে সুতো কাটা চালু নেই। পরন্তু, প্রত্যেক প্রদেশে যারা সুতা কাটে তাদের উন্নততর পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে এবং কম দামে উন্নততর যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। এভাবে সরকার তাদের সাহায্য করছে।"

"৩। সরকার কর্তৃক সংগৃহীত প্রতি পাঁচ টাকা ঋণের মধ্যে চার টাকা কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হয়েছে।"

তিনটি পৃথক পুস্তিকা থেকে আমি এই তিন সেট বিবৃতি সংগ্রহ করেছি। আমি বলতে চাই : এর প্রতিটি বিবৃতি নির্জলা মিথ্যা। বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে তার তুলনায় প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক লবণ গ্রহণের পরিমাণ তিন গুণ বেশি। সুতরাং বছরে মাথা পিছু অন্তত নয় আনা লোক-পিছু কর (পোল ট্যাক্স) ও লবণ কর দিতে হয়। এই কর বয়স ও স্বাস্থ্য নির্বিশেষে নর, নারী, শিশু, গৃহপালিত পশু—সকলের উপরেই চাপান হয়।

প্রত্যেক গ্রামেই সুতা কাটা চরকা আছে এবং সরকার কোন ভাবে তাকে উৎসাহ দেন কিংবা সমর্থন করেন—এটা চালাকিভর্তি মিথ্যা ভাষণ। সরকারী ঋণের প্রতি পাঁচ টাকার মধ্যে চার টাকা জনকল্যাণে ব্যয়িত হয়—এ কথা যে কত মিথ্যা অর্থের কারবারীরাই তা প্রকৃষ্ট রূপে দেখিয়ে দিতে পারবেন। সরকারের সঙ্গে দৈনন্দিন কাজকর্মের ব্যাপারে যা ঘটে উপরোক্ত মিথ্যা ভাষণগুলি তারই নমুনা মাত্র। এই সেদিন এক জন গুজরাটী কবিকে সাজানো সরকারী সাক্ষ্যের ভিত্তিতে অভিযুক্ত করা হয়। কবি কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন—উল্লিখিত সময়ে তিনি অন্য এক জায়গায় গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিলেন।

এবার সরকারী অকর্মণ্যতার কথা। অফিসাররা যাদের শান্তিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন এমন পিকেটারদের উপর মদ বিক্রেতারা আক্রমণ চালিয়েছে এবং নিয়ম

বিরুদ্ধভাবে মদ বিক্রয় করেছে। অফিসাররা কিন্তু ঐ আক্রমণ কিংবা বেআইনীভাবে মদ বিক্রয়—কোনটিই আমল দেননি। আক্রমণের কথা সকলেই জানে; কিন্তু কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি—এই ছলের আড়ালে অফিসাররা আশ্রয় নিতে পারেন।

ভারতে আগে চালু থাকা সব বিধি-বিধানকে রদ করে আপনারা এবার একটি প্রেস অর্ডিন্যান্স চাপিয়ে দিয়েছেন। ভগৎ সিং এবং অন্যান্যদের বিচারের ব্যাপারে সাধারণ নিয়ম-নীতি বাতিল করে দিয়ে আপনারা আইনের বিলম্বকে এড়াবার সোজা পথ বের করে নিয়েছেন। আমি যদি এই সব সরকারী অতি তৎপরতা ও অকর্মণ্যতাকে ছদ্ম সামরিক আইন বলি তাহলে বিস্মিত হবার কোন কারণ আছে কি? সংগ্রামের সবে তো মাত্র পঞ্চম সপ্তাহ।

ভারতের সর্বত্র আপনারা যে ত্রাসের রাজত্ব সুরু করেছেন তা পূর্ণ হবার আগেই আমার মনে হয় আমার পক্ষে দৃঢ়তর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সম্ভব হলে আপনাদের ক্রোধকে পরিচ্ছন্নতর পথে চালিত করার চেষ্টা করা উচিত। যে-সব ঘটনা আমি বিবৃত করেছি সে-গুলির কথা আপনারা না জানতেও পারেন। এখনো আপনারা ঐগুলি বিশ্বাস না করতে পারেন। আমি এ বিষয়ে আপনাদের গভীর মনোযোগ দিতে বলব।

যাই হোক, আমি মনে করি যে আপনাদের কর্তৃপক্ষীয় সিংহ-থাবা পরিপূর্ণ প্রদর্শনের সুযোগ না দিলে আমার পক্ষে কাপুরুষোচিত আচরণ করা হবে। জনগণের যে কাজের ফলে সরকারের প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে সম্ভবত মুখ্যত আমিই জনগণকে সেই কাজে অনুপ্রাণিত করেছি। জনগণ অত্যাচার ও সম্পত্তির ক্ষতি সহ্য করেছেন। তাই, বিশেষ অবস্থায় সত্যাগ্রহ কার্যসূচীর পূর্ণ রূপায়নে আমি চেষ্টার ত্রুটি করেছি—এমন ধারণা আমি জনগণের মনে গড়ে উঠতে দিতে পারি না।

সত্যাগ্রহের নীতি হল: কর্তৃপক্ষ যত বেশি করে দমন ও নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দেবে, সত্যাগ্রহীরা তত বেশি করে দুঃখ বরণ করবেন। স্বেচ্ছাকৃত চরম দুঃখ-ভোগের নিশ্চিত ফল—সাফল্য।

আমি যে-সব পদ্ধতি গ্রহণ করেছি তার বিপদের কথা জানি। কিন্তু দেশ সম্ভবত আমাকে ভুল বুঝবে না। আমি যা ভাবি, তাই বলি। খাঁটি এবং অবিকৃত অহিংসাই আঘাত-সংঘাতকে জয় করার একমাত্র পথ। ভারতে গত পনেরো বছর ধরে, বাইরে আরো কুড়ি বছর ধরে আমি এই কথাই বলে এসেছি। এখন তারই পুনরুক্তি করতে চাই। আমি আরো বলেছি—প্রতিটি হিংস্র কাজ, কথা এমন কী হিংস্র চিন্তা অহিংসার প্রগতির প্রতিবন্ধক। পুনঃ পুনঃ সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও জনগণ যদি হিংসার আশ্রয় নেয়, তাহলে নেহাৎ মানুষ হিসাবে অন্য মানুষের জন্য যে-টুকু অবশ্য করণীয় সে-টুকু ছাড়া আমি অন্য সব দায়িত্বভার ত্যাগ করব। পৃথিবীর জ্ঞানী ব্যক্তিরা অহিংসাকেই পরম শক্তি বলে আখ্যা দিয়ে গিয়েছেন। আমিও নিজ জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতায় এর কার্যকারিতা দেখেছি। তাই, দায়িত্ববোধের কথা ছেড়ে দিলেও, আমি অন্য কোন কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ বন্ধ করতে সাহস পাচ্ছি না।

কিন্তু আমি অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ এড়িয়ে চলতেই চাই। তাই, আপনার দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিরা নির্দ্বিধ কণ্ঠে যার নিন্দা করেছেন এবং আইন অমান্যের মাধ্যমে যে-বিষয়টি সর্বজনীন প্রতিবাদ ও ক্রোধে ধিক্কৃত হয়েছে, আমি আপনাকে সেই কর তুলে দেবার জন্য বলছি। আপনার যত খুশি আইন অমান্যকে নিন্দা করতে পারেন। কিন্তু আপনি কি আইন অমান্যের তুলনায় সহিংস বিদ্রোহ বেশি পছন্দ করবেন? আপনি বলেছেন—আইন অমান্য হিংসার মধ্যে শেষ হতে বাধ্য। কিন্তু ইতিহাসের রায় বলে দেবে যে ব্রিটিশ সরকার অহিংসার মর্মোপলব্ধি করতে পারেননি বলে মানুষকে হিংসার পথে চালিত করেছেন, কারণ তারা হিংসাই বোঝেন এবং হিংসাকেই কায়দা করতে পারেন। এই হিংসাশ্রয়ী প্ররোচনা সত্ত্বেও ঈশ্বর ভারতের জনগণকে সব রকম প্রলোভন ও প্ররোচনা জয়ের জ্ঞান ও শক্তি দেবেন বলে আমি আশা করি।

তাই, আপনি যদি লবণ কর রদ করার এবং বেসরকারীভাবে লবণ তৈয়ারির উপর বিধি নিষেধ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারেন তাহলে আমি আমার চিঠির প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অভিযান অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুরু করতে বাধ্য হব।

আপনার অকৃত্রিম বন্ধু,
এম. কে. গান্ধী

স্যার স্যামুয়েল হোরের কাছে

এরোড়া সেণ্ট্রাল জেল
১১ই মার্চ, ১৯৩২

প্রিয় স্যার স্যামুয়েল,

আপনার বোধহয় মনে আছে যে গোল টেবিল বৈঠকে আমার ভাষণের শেষে সংখ্যালঘুদের দাবি পেশ করা হলে আমি বলেছিলাম—নিপীড়িত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের ব্যবস্থা হলে আমি জীবন পণ করে তা রোধ করার চেষ্টা করব। মুহূর্তের উত্তেজনায় কিংবা ভাষায় আলংকারিক আমেজ আনার জন্য আমি ঐ কথা বলিনি। ওটি ছিল একটি ধর্মীয় বিবৃতি।

ঐ বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে আমি ভারতে ফিরে আসার পর নিপীড়িত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার আশা পোষণ করেছিলাম। কিন্তু তা হবার নয়।

যে-সব সংবাদপত্র আমাকে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয় সেগুলি থেকে দেখতে পাচ্ছি: 'হিজ ম্যাজেস্টির' সরকার যে-কোন মুহূর্তে তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে যদি নিপীড়িত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ই তাহলে আমি আমার শপথ রক্ষার

জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব। কিন্তু মনে হচ্ছে—আগে থেকে নোটিশ না দিয়ে কোন পক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অশোভন আচরণ করা হবে। স্বভাবতই, আমার বিবৃতির তাৎপর্যকে তারা গুরুত্ব দিতে পারেননি।

নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের বিরুদ্ধে আমার আপত্তি কী কী তার পুনরুল্লেখের তেমন কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেকে ওদের একজন বলেই মনে করি। অন্যদের তুলনায় ওদের অবস্থাটা ভিন্নতর। আমি আইনসভাগুলিতে ওদের প্রতিনিধিত্বের বিরোধী নই। ঐ সব শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী শিক্ষা কিংবা সম্পত্তির মানদণ্ড নিরপেক্ষভাবেই ভোটার হিসাবে নথিবদ্ধ হোক, আমি তাই চাই। এমন কী ওদের তুলনায় অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ভোটাধিকারের মানদণ্ড কঠোরতরও হতে পারে। নিছক রাজনীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা যেমনই প্রতিভাত হোক না কেন, আমি মনে করি পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী ওদের পক্ষে তথা হিন্দু ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ওদের কী ক্ষতি করতে পারে তা বুঝতে হলে তথাকথিত বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ওরা কীভাবে ছড়িয়ে রয়েছে এবং বর্ণ হিন্দুদের উপর ওরা কতটা নির্ভরশীল তা জানা দরকার। হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ঐ ধর্মকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, তাকে (বিন্যাস-রীতিকে) বিশ্লিষ্ট করে ফেলবে। আমার কাছে এই সব শ্রেণীর প্রশ্ন প্রধানত নীতিগত এবং ধর্মগত। রাজনীতিক দিকটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও নীতি ও ধর্মগত প্রশ্নের তুলনায় তা অনেক নগণ্য।

এ বিষয়ে আমার ভাবনা বুঝতে হলে আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। আমি বাল্যকাল থেকেই এই সব শ্রেণীর প্রতি আগ্রহ পোষণ করেছি এবং একাধিক বার ওদের কল্যাণের জন্য আমার সর্বস্ব বিপন্ন করেছি। নিজের গর্ব জাহির করার জন্য এ কথা বলছি না। আমি অনুভব করি যে বহু শতাব্দী ধরে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির প্রতি যে-অবমাননা স্তূপীকৃত করা হয়েছে হিন্দুরা কোন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই তার সংশোধন করতে পারবে না। কিন্তু আমি জানি—পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হবে না; কিংবা ঐ সব শ্রেণী যে অবমাননার নিষ্পেষণে আর্তনাদ করছে তারও প্রতিকার হবে না।

আমি তাই শ্রদ্ধাসহকারে 'হিজ ম্যাজেস্টির' সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই যে তারা যদি নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন, আমি তাহলে আমরণ অনশন সুরু করতে বাধ্য হব।

আমি এ বিষয়ে সচেতন—বেদনাভরে সচেতন—যে, বন্দীদশায় আমি এ রকম কাজ করলে তা 'হিজ ম্যাজেস্টি'র সরকারের পক্ষে গভীর বিড়ম্বনার কারণ হবে। এ কথাও জানি যে আমার মত লোকের পক্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে এ রকম পদ্ধতি আমদানি করাকে অনেকে ক্ষ্যাপামি কিংবা আরও খারাপ কিছু বলবেন; বলবেন—আমার পক্ষে এটা করা ঠিক নয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে আমি শুধু বলতে পারি: আমার পরিকল্পিত ব্যবস্থা আমার কাছে একটি পদ্ধতি মাত্র নয়; তা আমার অস্তিত্বের অঙ্গ। আমি আমার চেতনার আহ্বান উপেক্ষা করতে সাহস পাচ্ছি না।

অবশ্য এর জন্য অনেকে আমার মস্তিষ্কের সুস্থতায় সন্দিহান হতে পারেন। এখন যতদূর দেখতে পাচ্ছি তাতে বলতে পারি যে আমাকে জেল থেকে ছেড়ে দিলেও আমার অনশন ব্রতের গুরুত্ব মোটেই হ্রাস পাবে না। আমি অবশ্য আশা করছি যে আমার সকল আশংকাই নিরর্থক; নিপীড়িত শ্রেণীগুলির জন্য পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী গঠনের ইচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের নিশ্চয়ই নেই।

আর একটি বিষয় যা আমাকে ক্লেশ দিচ্ছে এবং যা আমাকে অনুরূপ অনশনের পথে ঠেলে দিতে পারে তা বোধহয় আমার উল্লেখ করা উচিত। বিষয়টি নির্যাতনের পদ্ধতি। জানিনা কবে আমি সেই 'শক্' পাব যা আমাকে ঐ ত্যাগের পথ বেছে নিতে বাধ্য করবে। আমার মনে হয় : নির্যাতন বৈধতার সকল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দেশে সরকারী সন্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে পড়ছে। ইংরাজ এবং ভারতীয় অফিসারগণ পাশবিক হয়ে উঠছে। (একদিকে) সরকার তাদের 'মেরিটোরিয়াস'—প্রতিভবান বলে বিবেচনা করায়, (অন্যদিকে) জনগণের প্রতি আনুগত্যের অভাব ও নিজের আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অমানবিক ব্যবহারের ফলে বড়-ছোট সকল ভারতীয় অফিসারেরই নৈতিক অধঃপতন ঘটছে। আত্মীয়-স্বজনদের দমিয়ে রাখা হচ্ছে। স্পষ্ট ভাষণের কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। আইন-শৃংখলার নাম করে গুণ্ডাবাজিকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। যে-সব নারী জনসেবামূলক কাজে বেরিয়ে এসেছেন তারা সম্মান নাশের আশংকায় সন্ত্রস্ত।

আমার মনে হয় কংগ্রেস যার ধারক সেই স্বাধীনতার 'স্পিরিটকে' গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এসব করা হচ্ছে। সাধারণ আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তি দানের ক্ষেত্রেই নির্যতান সীমাবদ্ধ নয়। মুখ্যত জনসাধারণকে হেনস্থা করার জন্য যে-সব নতুন নতুন স্বৈরতান্ত্রিক আদেশ জারি করা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রেও নির্যাতনের হস্ত প্রসারিত।

এসব সংবাদ পড়ার সময় আমি এই সব কাজের মধ্যে কোন গণতান্ত্রিক অনুপ্রেরণা দেখতে পাই না। আপনাদের গণতন্ত্র যে একটি নিঃসার, সীমাবদ্ধ বস্তু সাম্প্রতিক ইংল্যান্ড সফরকালে আমার এই ধারণাটি দৃঢ়তর হয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পার্লামেণ্টে প্রেরণ না করে সে সম্পর্কে কয়েকজন ব্যক্তি বা কোন কোন গোষ্ঠীই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন; (পরে) পার্লামেণ্টের সদস্যরা কী করছেন সে সম্পর্কে স্রেফ ভাসাভাসা ধারণা নিয়েই ঐ সব সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। মিশরের ক্ষেত্রে, ১৯১৪ সালের যুদ্ধের ব্যাপারে ঠিক এমনটিই ঘটেছিল; ভারতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে। গণতন্ত্র বলে পরিচিত শাসন ব্যবস্থায় যখন দেখি যে মাত্র একজন ব্যক্তির হাতে তিরিশ কোটি মানুষের একটি প্রাচীন জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অসীম ক্ষমতা রয়েছে এবং ঐ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক পন্থায় কার্যকর করা হয়, তখন আমার সমগ্র অস্তিত্ব বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমার কাছে এ সবের অর্থ গণতন্ত্রের অনস্তিত্ব।

স্পষ্টতই, দুটি জাতির মধ্যে যে-তিক্ত সম্পর্ক বিরাজ করছে তাকে তিক্ততর না করে এই নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া চলতে পারে না। আমাব দায়িত্বের প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় : আমি কী করে এ অবস্থা রোধ করব? 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স'—

আইন অমান্য পদ্ধতি পরিহার করে নিশ্চয়ই নয়। আমার কাছে এটি নিষ্ঠার বস্তু। আমি নিজেকে প্রকৃতিগতভাবে গণতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী বলে মনে করি। গণতন্ত্র সম্পর্কে আমার যে-ধারণা তাতে গণতন্ত্র রূপায়ণের জন্য বল প্রয়োগের স্থান নেই। তাই আইন অমান্যকে শারীরিক শক্তি প্রয়োগের একটি যথার্থ বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যে ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজনীয় বা সমর্থনযোগ্য বলে মনে হতে পারে সে ক্ষেত্রেই ঐ প্রতিরোধ আন্দোলন প্রয়োগ করা হবে। এটি হল দুঃখ-ভোগের পদ্ধতি। এই পরিকল্পনার একটি দিক হল : প্রয়োজনবোধে প্রতিরোধকারী আমৃত্যু অনশন করে নিজেকে শেষ করে দেবেন। সেই সময় আমার এখনও আসেনি। ঐ রকম ব্যবস্থা নেবার জন্য মনের গভীর থেকে আমি অপ্রতিরোধ্য আহ্বান পাইনি। কিন্তু বাইরে যা ঘটে চলেছে তাতে আমার মৌলিক চেতনা নাড়া খাচ্ছে। তাই নিপীড়িত শ্রেণীদের ব্যাপারে অনশনের সম্ভাবনার কথা আপনাকে জানাতে গিয়ে আর একটি বিষয়েও যে আমার অনশন করার সম্ভাবনা আছে সে কথা আপনাকে না জানিয়ে পারলাম না।

বলাবাহুল্য, আপনার সঙ্গে পত্রালাপের ব্যাপারে আমার তরফ থেকে পূর্ণ গোপনতা রক্ষা করা হয়েছে। অবশ্য, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং মহাদেব দেশাই, যারা সম্প্রতি জেলে এসেছেন, তারা এ বিষয়ে সব কথাই জানেন। কিন্তু আপনি নিঃসন্দেহে আপনার ইচ্ছামত এ চিঠিকে কাজে লাগাবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে. গান্ধী

র‍্যামসে ম্যাকডোনালডের* কাছে

এরোড়া জেল
১৮ই আগস্ট, ১৯৩২

প্রিয় বন্ধু,

নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে ১১ই মার্চ স্যার স্যামুয়েল হোরকে আমি যে চিঠি লিখেছি স্যার হোর আপনাকে এবং মন্ত্রিসভাকে সে চিঠি নিশ্চয়ই দেখিয়েছেন। সেই চিঠিকে এই চিঠির অংশ বলে গণ্য করতে হবে এবং এই চিঠির সঙ্গে সেই চিঠি পড়তে হবে।

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আমি ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত পড়েছি এবং সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রেখেছি। স্যার স্যামুয়েল হোরকে আমি

* জেমস র‍্যামসে ম্যাকডোনালড (১৮৬৬-১৯৩৭) ব্রিটেনের শ্রমিক পার্টি কর্তৃক গঠিত প্রথম সরকারের (নভেম্বর, ১৯২৪) প্রধানমন্ত্রী ও ফরেন সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৩৫-৩৭ সালে মিঃ বলডুইনের অধীনে তিনি লর্ড প্রেসিডেন্ট পদে আসীন ছিলেন।

যে-চিঠি লিখেছি এবং সেণ্ট জেমস প্যালেসে ১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর গোল টেবিল বৈঠকের সংখ্যালঘু কমিটির মিটিং-এ আমি যে ঘোষণা করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার জীবন পণ করেও আপনাদের সিদ্ধান্ত আমাকে প্রতিরোধ করতে হবে। একমাত্র যে উপায়ে আমি তা করতে পারি তা হলো জল ছাড়া সব রকম খাদ্য গ্রহণে বিরত থেকে আমৃত্যু একটানা অনশন শুরু করা। জলে লবণ এবং সোডা থাকতে পারে কিংবা না থাকতেও পারে। ব্রিটিশ সরকার নিজের প্রস্তাবের দ্বারা কিংবা জনমতের চাপে নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের জন্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করলে তবেই এই অনশন বন্ধ হবে। নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের প্রতিনিধি সাধারণ ভোটাধিকার দ্বারা সাধারণ নির্বাচক-মণ্ডলীর দ্বারাই নির্বাচিত হওয়া উচিত।

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত উপরে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে পরিবর্তিত না হলে প্রস্তাবিত অনশন আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে দ্বিপ্রহরে শুরু হবে। আপনাকে যাতে যথেষ্ট সময় থাকতে নোটিশ দেওয়া হয় তার জন্য এখানকার কর্তৃপক্ষকে এই চিঠির বক্তব্য 'কেবল' (তার) করে আপনাকে জানাতে বলেছি। তবে, সবচেয়ে মন্থর পথে গেলেও এই চিঠি যাতে সময় মত আপনার হাতে পৌঁছায় তার জন্য আমি যথেষ্ট সময় রেখেই চিঠি দিচ্ছি।

আমার এই চিঠি এবং পূর্বে উল্লিখিত স্যার স্যামুয়েল হোরের কাছে লেখা চিঠি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করার জন্যও আমি অনুরোধ করছি। আমি জেলের নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আমার দুই সঙ্গী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই ছাড়া আর কেউ আমার অভিপ্রায় বা এই চিঠি দুখানির বক্তব্য জানে না। কিন্তু আমি চাই—আমার চিঠির দ্বারা জনমত তৈরি হোক। আপনারাই তা সম্ভব করতে পারেন। সেজন্যই আমি অবিলম্বে চিঠি দুখানা প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি।

যে-সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি তার জন্য দুঃখ বোধ করছি। কিন্তু যেহেতু আমি নিজেকে ধর্মপরায়ণ মানুষ বলে মনে করি সেহেতু আমার কাছে অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। 'হিজ ম্যাজেস্টি'র সরকার বিড়ম্বনা এড়াবার জন্য আমাকে মুক্তি দিলেও আমার অনশন চলতে থাকবে। স্যার স্যামুয়েল হোরের কাছে লিখিত চিঠিতেও আমি এ কথা জানিয়ে দিয়েছি। কারণ, এখন আমি অন্য কোন উপায়ে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার আশা করতে পারি না। সম্মানজনক ছাড়া অন্য কোন নিরিখে আমার মুক্তি বিবেচনা করা হোক, এরকম কোন ইচ্ছা আমার নেই।

হয়ত আমার বিচার অভ্রান্ত নয়; নিপীড়িত শ্রেণীসমূহের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠন তাদের পক্ষে তথা হিন্দু ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকর—আমার এই সিদ্ধান্তে আমি হয়ত পুরোপুরি ভুল করেছি। তা যদি হয়, তাহলে আমার জীবন দর্শনের অন্যান্য দিকেও আমি নিশ্চয়ই ঠিক পথে চলিনি। সেক্ষেত্রে অনশনের দ্বারা আমার মৃত্যুর ফলে আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করা হবে। যে অসংখ্য নরনারী আমার জ্ঞানের উপর শিশুর মত আস্থা রাখেন তাদের উপর থেকেও একটি ভার নামিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু আমার বিচার যে ঠিক সে সম্পর্কে আমার সংশয় নেই। তা

যদি হয়, তাহলে মোটামুটি সফলতা সহ গত পঁচিশ বছরেরও বেশি কাল ধরে আমি যে জীবন-ধারা যাচাই করে এসেছি প্রস্তাবিত পদক্ষেপ হবে তারই যোগ্য পূর্ণায়ন।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. কে. গান্ধী

এম এ জিন্নার কাছে

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

প্রিয় কোয়াদে-ই-আজম,

আমার ২২ ও ২৩ তারিখের চিঠির জবাবে আপনার ২৩শে সেপ্টেম্বরের দু খানা চিঠি পেয়েছি।

লাহোরে মুসলিম লীগের সভায় গৃহীত প্রস্তাবে যে-দাবি উত্থাপন করা হয়েছে তার যুক্তিসংগত সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আমি আপনার সহায়তায় একটি চুক্তিতে আসার সম্ভাবনা সন্ধান করছি। সুতরাং আগস্ট প্রস্তাব আমাদের চুক্তিতে পৌঁছানোর পথে বাধা সৃষ্টি করবে—এমন কোন আশংকা আপনার পোষণ করা উচিত নয়। সেই প্রস্তাবে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বার্থের প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে: তা আমাদের মিটমাটের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

আমি এই অনুমানের ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছি যে, ভারতকে দুই বা ততোধিক জাতি হিসাবে নয়, বহু সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার বলে গণ্য করতে হবে। (ঐ পরিবারে) মুসলমানদের বাস উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল গুলিতে অর্থাৎ বেলুচিস্থান, সিন্ধু প্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন অংশেও তাদের বাস। পাঞ্জাবের ঐ অংশে অন্য সকলের তুলনায় তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ; পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের অংশ বিশেষেও তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তারা (মুসলমানরা) ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক হয়ে বাস করতে ইচ্ছুক।

সাধারণ ভিত্তিতে আপনার সঙ্গে আমার দৃষ্টিকোণ ভিন্ন। তবু, আমার ভিত্তি এবং নিম্নোক্ত সর্তাবলী অনুযায়ী ১৯৪০ সালে লাহোরে গৃহীত মুসলিম লীগের প্রস্তাবে উল্লিখিত পৃথক হওয়ার দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আমি এখনও কংগ্রেস এবং দেশের কাছে সুপারিশ করতে পারি।

(আমার সর্তাবলী হল)—কংগ্রেস এবং লীগ কর্তৃক অনুমোদিত একটি কমিশন সীমানা নির্ধারণ করবে। চিহ্নিত এলাকাগুলির জনগণের ইচ্ছা ঐ সব এলাকার প্রাপ্ত বয়স্ক জনগণের ভোটের দ্বারা কিংবা অনুরূপ কোন পদ্ধতির দ্বারা জেনে নিতে হবে।

ভোটের রায় যদি পৃথক হওয়ার পক্ষেই যায় তাহলে ভারত বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সম্মতি দেওয়া হবে, অর্থাৎ (ভারত) দুটি সার্বভৌম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারবে।

পৃথকীকরণের একটি চুক্তি (ট্রিটি) সম্পাদিত হবে। তাতে পররাষ্ট্র, বিষয়, প্রতিরক্ষা, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, অন্তঃশুল্ক, বাণিজ্য এবং অনুরূপ বিষয় সমূহের দক্ষ ও সন্তোষজনক প্রশাসনের ব্যবস্থা থাকবে। চুক্তির 'পার্টি'গুলির মধ্যে এই গুলি অবশ্যই যৌথ স্বার্থের বিষয় বলে গণ্য হবে।

দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের অধিকাব সংরক্ষণের জন্য চুক্তিতে বিভিন্ন সর্তের উল্লেখ থাকবে।

কংগ্রেস এবং লীগ কর্তৃক এই চুক্তি (এগ্রিমেণ্ট) গৃহীত হবার অব্যবহিত পবেই উভয়ে মিলিত ভাবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের কর্মপন্থা ঠিক করবে।

অবশ্য কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থায়—'ডিরেকট্ অ্যাকশনে' লীগ যদি অংশ গ্রহণে অনিচ্ছুক হয়, তবে লীগ তার বাইরে থাকার স্বাধীনতা ভোগ করবে।

এইসব সর্ত যদি আপনি মেনে না নেন তাহলে লাহোর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে আপনি কী করতে বলেন, কংগ্রেসের কাছেই বা কী সুপারিশ করতে বলেন, তা স্পষ্ট ভাষায় জানাবেন কি? আপনি যদি অনুগ্রহ করে তা করেন তাহলে দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য সত্বেও কোন কোন নির্দিষ্ট সর্তে আমি রাজি হতে পারি, তা বুঝতে পারব। আপনার তেইশে সেপ্টেম্বরের চিঠিতে আপনি "লাহোর প্রস্তাবের মৌলিক ও অন্তর্নিহিত নীতিসমূহের" প্রসঙ্গ টেনেছেন এবং আমাকে ঐগুলি মেনে নিতে বলেছেন। এটা নিশ্চয়ই অনাবশ্যক; কারণ আমার মনে হচ্ছে যে এটা মেনে নিলে যে সুস্পষ্ট ফলাফল দেখা দেবে তাকেই মেনে নিয়েছি।

আপনার বিশ্বস্ত,
এম. কে. গান্ধী

সুভাষচন্দ্র বসুকে

বিড়লা বাড়ি
নয়া দিল্লী
২-৪-১৯৩৯

প্রিয় সুভাষ,

তুমি ৩১শে মার্চ যে-চিঠি লিখেছ সেখানা এবং আগের চিঠি খানাও আমি পেয়েছি। তোমার বক্তব্য বেশ স্পষ্ট। স্পষ্ট করে নিজের মতামত তুলে ধরো বলে আমি তোমার চিঠি পছন্দ করি।

তুমি যে মত ব্যক্ত করেছ তা আমার এবং অন্যান্যদের মতের এত বিপরীত যে আমি দুই মতের ব্যবধান ঘোচানোর কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে

হয়—কোন রকম মিশ্রণ না ঘটিয়ে এই ধরনের চিন্তাধারা দেশের সামনে তুলে ধরা উচিত। সততার সঙ্গে তা করা হলে কোন রকম তিক্ততা দানা বাঁধবেই বা কেন, আর তা গৃহযুদ্ধেই পর্যবসিত হবে কেন—আমি বুঝতে পারছি না।

আমাদের মধ্যে অনৈক্যে কোন দোষ নেই, ত্রুটি পারস্পরিক শ্রদ্ধা' ও বিশ্বাসের অবসানে। তবে সময়ে তার প্রতিকার ঘটবে, কারণ সময়ই শ্রেষ্ঠ প্রলেপ। আমাদের মধ্যে যদি হিংসা না থাকে, তাহলে গৃহযুদ্ধ হতে পারে না; তিক্ততার তো প্রশ্নই ওঠে না।

সকল বিষয় বিবেচনা করে আমার মনে হয়—তোমার মতামতের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করবে এমন একটি 'ক্যাবিনেট' তোমার অবিলম্বে গঠন করা উচিত। তুমি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী তৈরী করে আসন্ন এ আই সি সি-তে তা পেশ কর। কমিটি যদি ঐ কর্মসূচী গ্রহণ করে তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে; সংখ্যালঘুরা যাতে তা রূপায়ণে বিঘ্ন না ঘটায় তার ব্যবস্থা হবে। অন্য দিকে, তোমার কর্মসূচী যদি গৃহীত না হয় তাহলে তোমার পদত্যাগ করা এবং কমিটিকে নিজের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে নিতে দেওয়া উচিত। তুমি বিনা বাধায় তোমার মতে দেশকে দীক্ষিত করার সুযোগ পাবে। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব নিরপেক্ষভাবেই আমি এই উপদেশ দিচ্ছি।

আমার সম্মান বড় কথা নয়। তার একটা স্বতন্ত্র স্বকীয় মূল্য আছে। যখন আমার উদ্দেশ্য (মোটিভ) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হবে কিংবা দেশ আমার নীতি বা কার্যসূচীকে বাতিল করে দেবে তখন সম্মানও যেতে বাধ্য। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর যৌথ গুণাগুণের দ্বারাই ভারতের উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রিত হবে। ব্যক্তি বিশেষ, নিজে যত বড়ই হোন না কেন, ঐ লক্ষ লক্ষ জনের প্রতিনিধি হিসাবে তার পৃথক মূল্য কিছুই নেই। সুতরাং ঐ বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করা যাক।

তুমি বলেছ দেশ এখন যতটা অহিংস এমন আর কোন দিন ছিল না। এ সম্পর্কে আমার মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে বায়ুতে আমি শ্বাস গ্রহণ করি, তাতে আমি হিংসার গন্ধ পাচ্ছি। তবে হিংসা একটি সূক্ষ্ম রূপ নিয়েছে। আমাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস হিংসার একটি মন্দ দিক। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বর্ধমান ব্যবধান ঐ দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করছে। আমি আরও উদাহরণ দিতে পারি।

কংগ্রেসে কতটা দুর্নীতি আছে সে সম্পর্কে মনে হয় আমাদের মত ভিন্ন রকম। আমার ধারণা—তা বেড়েই চলেছে। গত কয়েক মাস ধরে আমি ভালোরকম বিশ্লেষণের কথা বলে আসছি।

এই অবস্থায় আমি অহিংস গণসংগ্রামের পরিবেশ, হাওয়া দেখতে পাচ্ছি না।

কিন্তু আমি তো তোমায় বলেছি যে আমি বৃদ্ধ মানুষ; বোধহয় (ধীরে ধীরে) কমজোরী ও অতি সাবধানী হয়ে পড়ছি। কিন্তু তোমার সামনে রয়েছে যৌবন তথা যৌবনজাত নির্বিচারী আশাবাদিতা। আশা করি—তোমার পথই ঠিক। আমি ভ্রান্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস: কংগ্রেস তার বর্তমান চেহারা নিয়ে মঙ্গল করতে পারবে না, উপযুক্তভাবে আইন অমান্য করতেও পারবে না। সুতরাং তোমার ভবিষ্যদ্বাণী যদি ঠিক হয়, তাহলে আমি এখন 'ব্যাক নাম্বার' এবং সত্যাগ্রহের সেনাপতি হিসাবে পরাভূত।৮

রাজকোটের ছোট্ট ঘটনাটির বিষয় তুমি উল্লেখ করায় খুশী হয়েছি। এর ফলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি সে সম্পর্কে আমার অনুশোচনা করার কিছুই নেই। আমার মনে হয়—বিষয়টিতে যথেষ্ট জাতীয় গুরুত্ব রয়েছে। রাজকোটের জন্য আমি অন্যান্য রাজ্যে আইন অমান্য বন্ধ করিনি। কিন্তু রাজকোট আমার চোখ খুলে দিয়েছে। রাজকোট আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে। স্বাস্থ্যের কারণে আমি দিল্লীতে বসে নেই। প্রধান বিচারপতির সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি দিল্লীতে রয়েছি। আমার কাছে প্রেরিত শেষতম তারবার্তায় ভাইসরয় যে ঘোষণা করেছেন তা যথাযোগ্য কার্যকর করার ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত দিল্লীতে থাকা আমি কর্তব্য বলে মনে করি। আমি ঝুঁকি নাও নিতে পারি। আমি যেহেতু সর্বময় শক্তিকে—'প্যারামাউন্ট পাওয়ার'কে—তার কর্তব্য পালনে আহ্বান জানিয়েছি সেহেতু সেই কর্তব্য যাতে ঠিকভাবে সম্পাদিত হয় তা দেখার জন্য আমি দিল্লীতে থাকতে বাধ্য। ঠাকুর সাহেব যে-দলিলের অর্থ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন তার ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রধান বিচারপতির নিয়োগে আমি কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। প্রসঙ্গত বলা দরকার, প্রধান বিচারপতি হিসাবে নয়, ভাইসরয় কর্তৃক নিযুক্ত বিচক্ষণ জুরি হিসাবেই মিঃ মরিস ঐ দলের পরীক্ষা করবেন। ভাইসরয়ের মনোনীত ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে মেনে নিয়ে আমার মনে হয় আমি জ্ঞানবত্তা ও হৃদয়বত্তা উভয়েরই পরিচয় দিয়েছি; সবচেয়ে বড় কথা : আমি এ ব্যাপারে ভাইস-রয়ের দায়িত্ব বাড়িয়ে দিয়েছি।

আমাদের তীব্র মতানৈক্যের কথা আমরা আলোচনা করেছি; কিন্তু এতে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত বলেই আমি মনে করি। তা যদি হয়, তাহলে সেই সম্পর্ক এই সব অনৈক্যের কণ্টক উত্তীর্ণ হতে পারবে।

ভালবাসা সহ,
বাপু

হের হিটলারকে

ওয়ার্ধা, মধ্যপ্রদেশ
ভারতবর্ষ
২৩.৭.৩৯

প্রিয় বন্ধু,

মানবতার খাতিরে আপনাকে চিঠি লেখার জন্যে বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করছেন। কিন্তু আমি তাঁদের অনুরোধ এতদিন এড়িয়ে আসছি, কারণ আমার মনে হয়েছে যে আমার দিক থেকে চিঠি লেখা ঔদ্ধত্য হবে। এখন আমার মনের মধ্যে কে যেন

এই বলে তাগিদ দিচ্ছে যে, আমার হিসাব করবার দরকার নেই, সে যে দামই দেওয়া হোক-না-কেন আমার দিক থেকে আবেদন করা উচিত।

এটা সুস্পষ্ট যে, আজকের পৃথিবীতে আপনি এমন একজন মানুষ, যিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন—যে যুদ্ধ মানবতাকে বর্বরতার স্তরে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আপনার উদ্দেশ্য আপনার কাছে যতই মূল্যবান হোক-না-কেন তার জন্যে এ দাম আপনাকে দিতেই হবে! যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে না হলেও, যিনি স্বেচ্ছায় যুদ্ধের পন্থা পরিহার করেছেন, তাঁর আবেদনে সাড়া দেবেন কি? যাহোক, যদি আপনাকে চিঠি লিখে ভুল করে থাকি সেজন্য আমায় মার্জনা করবেন ধরে নিচ্ছি।

আপনার একান্ত সুহৃদ
এম. কে. গান্ধী

প্রত্যেক ব্রিটেনবাসীর উদ্দেশ্যে*

প্রত্যেক ব্রিটেনবাসী সমীপেষু,

শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও তাদের সহকারী হিসাবে আমার দেশের যে-সব লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় রয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে আমি ১৮৯৬ সালে প্রত্যেক ব্রিটেনবাসীদের কাছে একটি আবেদন করেছিলাম। তাতে ফল হয়েছিল। আমার দৃষ্টিকোণ থেকে সে আবেদন যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, আজকের এই আবেদনের পিছনে যে-কারণ রয়েছে তার তুলনায় সে দিনের আবেদনের কারণ অনেক তুচ্ছ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বোঝাপড়া এবং অন্যান্য বিষয়ে যুদ্ধের পরিবর্তে অহিংসার পথ গ্রহণ করার জন্য প্রত্যেক ব্রিটেনবাসীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আপনাদের দেশের রাজনীতি-বিদরা গণতন্ত্রের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যুদ্ধের পক্ষে অন্যান্য যুক্তিও উপস্থিত করা যেতে পারে। আপনারা মনে মনে তা জানেন। আমার কিন্তু মনে হয় যে এই যুদ্ধ যে-ভাবেই শেষ হোক না কেন, যুদ্ধ-শেষে গণতন্ত্রের নজির দেবার মত কোন গণতন্ত্রই অবশিষ্ট থাকবে না। এই যুদ্ধ মানুষের কাছে অভিশাপ তথা সতর্ক-চিহ্ন—ওয়ারনিং—হিসাবে হাজির হয়েছে। এটা অভিশাপ, কারণ এই যুদ্ধ এমন পশুত্বের দিকে নিয়ে যাচ্ছে যা আগে কোন দিন দেখা যায়নি। যুযুধান ও শান্তিকামী মানুষের মধ্যে সব বিভেদ মুছে গিয়েছে। কোন লোক বা কোন জিনিসকে রেহাই দেওয়া হচ্ছে না। মিথ্যাভাষণ প্রায় শিল্পকলায় রূপান্তরিত হয়েছে। ছোট জাতিগুলিকে রক্ষা করাই ছিল ব্রিটেনের দায়িত্ব। কিন্তু অন্তত সাময়িকভাবে সে সব জাতি একের পর এক অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই যুদ্ধ 'ওয়ারনিং'ও বটে। এই যুদ্ধ ওয়ারনিং দিচ্ছে যে কেউ যদি দেওয়ালের লিখন না পড়ে তাহলে মানুষ পশুত্বের পর্যায়ে নেমে যাবে, কারণ নিজের কাজের দ্বারা সে পশুকেও লজ্জা

* ১৯৪০ সালের ৩রা জুলাই গান্ধীজী তাঁর এই বিখ্যাত আবেদন প্রচার করেন।

দিচ্ছে। যুদ্ধের শুরুতেই আমি ঐ লিখন পড়েছিলাম। কিন্তু তখন সে কথা বলার সাহস আমার ছিল না। তবে, খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ঈশ্বর আমাকে কথাটি বলার সাহস দিয়েছেন।

আপনারা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে অতি বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মনে করে নয়, যুদ্ধ খারাপ বলেই আমি হানাহানি বন্ধ করার আবেদন জানাচ্ছি। আপনারা নাৎসিবাদ ধ্বংস করতে চান। কিন্তু পরোক্ষে তাকেই গ্রহণ করে আপনারা নাৎসিবাদ কখনই ধ্বংস করতে পারবেন না। জার্মানদের মত আপনাদের সৈন্যরাও একই ধরনের ধ্বংস কার্যে মত্ত। একমাত্র পার্থক্য বোধহয় এই যে জার্মানদের মত আপনারা তত বেশি ব্যাপক নন। তবে, এ রকম চলতে থাকলে আপনাদের ধ্বংস কার্য জার্মানদের মতই ব্যাপক, এমন কী ব্যাপকতর হয়ে উঠতে পারে। অন্য কোন ভাবে আপনারা এ যুদ্ধ জিততে পারবেন না। অন্য কথায়, আপনাদের নাৎসীদের চেয়েও নির্মম হতে হবে। যত ন্যায়সঙ্গতই হোক না কেন, কোন কারণেই মিনিটে মিনিটে এই যে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চলেছে তাকে সমর্থন করা যায় না। আমার মনে হয়—যে কারণের সঙ্গে অমানবিকতা জড়িত তাকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না।

ব্রিটেন পরাস্ত হোক আমি তা চাই না। আবার, শারীরিক বা মানসিক যে কোন রকমের পাশব শক্তির লড়াইয়ে ব্রিটেনের জয়ও আমার কাম্য নয়। আপনাদের দৈহিক সাহসিকতার কথা সর্বত্র স্বীকৃত। আপনাদের বুদ্ধিও যে আপনাদের শরীরের মতই ধ্বংস কার্যে সমান ভাবে তুলনারহিত তা কি আপনাদের প্রদর্শনের প্রয়োজন আছে? আমি আশা করি যে আপনারা নাৎসীদের সঙ্গে এ ধরনের গৌরব হানিকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে ইচ্ছুক নন। আমি আপনাদের কাছে এমন একটি মহত্তর ও অধিকতর সাহসিকতাপূর্ণ পথ তুলে ধরতে চাই যা সবচেয়ে সাহসী সৈনিকের কাছেও গৌরবের। আমি চাই: নাৎসীদের সঙ্গে আপনারা বিনা অস্ত্রে লড়ুন। সামরিক কেতায় বলতে গেলে বলা যায় 'নন্-ভায়োলেণ্ট আর্মস' অর্থাৎ অহিংস অস্ত্র নিয়ে লড়ুন। আমি চাই—যে অস্ত্র আপনাদের হাতে আছে তা আপনারা ত্যাগ করুন; কারণ ঐ অস্ত্র দিয়ে তো আপনারা নিজেদের বা মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করতে পারছেন না। আপনারা হের হিটলার এবং সিনর মুসোলিনীকে আমন্ত্রণ করুন: যে-সব দেশ আপনারা বলেন আপনাদের অধিকারে সে-সব দেশ থেকে ওরা যা নিতে চায় তা ওদের নিতে দিন। সুন্দর সুন্দর সব ঘর-বাড়ি সমেত আপনাদের সুন্দর দ্বীপটির দখলও ওদের নিতে দিন। আপনারা এ সব কিছুই দেবেন, কিন্তু যা দেবেন না তা হল আপনাদের আত্মা, আপনাদের মন। ঐ ভদ্রলোকগণ যদি আপনাদের ঘর-বাড়ি দখল করতে চান তো আপনারা সেগুলি খালি করে দিন। ওরা যদি আপনাদের বিনা বাধায় যেতে না দেয়, তাহলে আপনারা—নর, নারী, শিশু—আপনাদের হত্যা করতে দিন; কিন্তু কিছুতেই ওদের অধীনতা স্বীকার করবেন না।

এই কর্ম-রীতি বা পদ্ধতিকে নাম দিয়েছি অহিংস অসহযোগিতা। ভারতে এই পদ্ধতি প্রয়োগে নেহাৎ কম সাফল্য পাওয়া যায়নি। ভারতে আপনাদের যে-সব প্রতিনিধি আছেন তারা আমার দাবি অস্বীকার করতে পারেন। তা করলে আমি

তাদের জন্য দুঃখ বোধ করব। তারা আপনাদের হয়ত বলবেন—অসহযোগিতা পুরোপুরি অহিংস থাকেনি; হয়ত বলবেন: এর জন্ম ঘৃণা থেকে। তারা এ রকম কিছু বললে আমি তা অস্বীকার করব না। এটা যদি পুরোপুরি অহিংস হত, যদি সব অসহযোগীর মনে আপনাদের প্রতি শুভ কামনা থাকত, তাহলে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে আপনারা আজ আর আমাদের প্রভু না থেকে ছাত্রে পরিণত হতেন। আর সে ক্ষেত্রে আপনারা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দরভাবে এই অতুলনীয় অস্ত্র ব্যবহার করে জার্মান ও ইতালীয়ান বন্ধুদের হুমকির সম্মুখীন হতে পারতেন। বস্তুতপক্ষে, তা যদি ঘটত তাহলে ইউরোপের গত কয়েক মাসের ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হত; অসংখ্য নিরপরাধ লোকের রক্ত স্রোত, ছোট ছোট জাতিগুলিকে ধর্ষণ ও পারস্পরিক ঘৃণার হাত থেকে ইউরোপ মুক্তি পেত।

নিজের দৌড় কতটা তা যে বোঝে না—তেমন কোন লোক এই আবেদন পেশ করছে না। একটানা গত পঞ্চাশ বছর ধরে আমি বৈজ্ঞানিক যথার্থতা সহ অহিংসা প্রয়োগ ও তার সম্ভাবনা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে আসছি। পারিবারিক ও প্রতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে, রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে—এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমি তা প্রয়োগ করেছি। এ পদ্ধতি ব্যর্থ হয়েছে এমন একটি ক্ষেত্রও আমার জানা নেই। কখনও তা ব্যর্থ মনে হলে আমার নিজের অসম্পূর্ণতার জন্যই তা হয়েছে বলে মনে করেছি। আমি সম্পূর্ণতার দাবি করি না। সত্য ঈশ্বরেরই ভিন্ন নাম; আমি নিজেকে একান্তভাবে সত্যানুসন্ধানী বলে দাবি করি। ঐ অনুসন্ধানের সূত্রেই আমি অহিংসার পদ্ধতি আবিষ্কার করি। অহিংসা প্রচারই আমার জীবনের লক্ষ্য। ঐ লক্ষ্য সাধন ভিন্ন আমার বেঁচে থাকার অন্য কোন স্বার্থ নেই।

আজীবন ব্রিটিশ জনগণের নিঃস্বার্থ বন্ধু বলে আমি নিজেকে দাবি করি। এক সময় আমি আপনাদের সাম্রাজ্যের প্রতিও প্রীতি পোষণ করেছি। আমি ভেবেছিলাম যে ঐ সাম্রাজ্য ভারতের মঙ্গল করছে। কিন্তু যখন দেখলাম যে তা অবস্থার গতিকে ভারতের কোন মঙ্গল করতে পারে না, তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অহিংসার পদ্ধতি গ্রহণ করেছি এবং এখনও ঐ পদ্ধতিকেই আশ্রয় করে আছি। আমার দেশের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত যাই থাকুক না কেন, আপনাদে প্রতি প্রীতি অক্ষয় রয়েছে, অক্ষয়ই থাকবে। আমার অহিংসার বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বজনীন প্রীতি। সে বিশ্বে আপনারা মোটেই নগণ্য নন। সেই প্রীতি বশতই আমি আপনাদের কাছে এই আবেদন পেশ করতে বসেছি।

ঈশ্বর যেন আমার প্রতিটি শব্দকে শক্তি-মণ্ডিত করেন। ঈশ্বরের নাম করেই আমি এই আবেদন লিখতে শুরু করেছি; তাঁর নাম করেই আমি এটি শেষ করছি। আমার আবেদনে সাড়া দেবার মত জ্ঞান ও সাহস আপনাদের দেশের রাজনীতিবিদরা যেন অর্জন করেন। আমার এই আবেদন রূপায়নে 'হিজ ম্যাজেস্টি'র সরকার যদি কোন ভাবে আমার সেবা বাস্তবিক প্রয়োজন বলে মনে করেন তবে তারা তা সবসময়েই পাবেন। মহামান্য ভাইসরয়কে আমি এ মর্মে জানিয়ে দিচ্ছি।

এম. কে. গান্ধী

লর্ড লিনলিথগোকে*

আগা খাঁর প্রাসাদ
এরোড়া
১৪।৮।১৯৪২

প্রিয় লর্ড লিনলিথগো,

সংকট ত্বরান্বিত করে ভারত সরকার ভুল করেছেন। নিজের কাজকে সমর্থন করে সরকার যে প্রস্তাব—যে রেজোলিউশন—গ্রহণ করেছেন তা বিকৃতি ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। আপনারা যে আপনাদের ভারতীয় "কোলিগদের" (সহকর্মীদের) অনুমোদন পেয়েছেন তার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই। এতে বড় জোর এই কথাই বোঝাচ্ছে যে ভারতে এ ধরনের 'সার্ভিস' আপনারা সব সময়েই পেতে পারেন। লোকে বা বিভিন্ন দল কী বলে সে কথা ছেড়ে দিলেও ঐ সহযোগিতাই (ব্রিটিশ রাজ) প্রত্যাহার দাবির পক্ষে একটি অতিরিক্ত যুক্তি।

আমি গণ সংগ্রাম শুরু করা পর্যন্ত অন্তত ভারত সরকারের অপেক্ষা করা উচিত ছিল। আমি প্রকাশ্যেই জানিয়েছি যে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের আগে আমি আপনাকে একখানা চিঠি দেব বলে স্থির করেছি। কংগ্রেসের বিষয়টি নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার আবেদন হিসাবেই ঐ চিঠি যেত। আপনি তো জানেন যে কংগ্রেসের দাবি সম্পর্কিত ধারণায় কোন ফাঁক—কোন 'অমিশন' চোখে পড়লে তখনি তা পূরণ করা হয়েছে। সুতরাং আপনি আমাকে সুযোগ দিলে আমি প্রতিটি অভাব (ডেফিসিয়েন্সি) নিয়ে আলোচনা করতাম। সরকার যেরকম তাড়াহুড়া করে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তাতে মনে হয়—কংগ্রেস যে চূড়ান্ত সতর্কতা ও ধীরতা সহকারে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাতে সরকার ভয় পেয়েছেন; ভেবেছেন—বিশ্বজনমত আরো বেশি করে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকবে এবং কংগ্রেসের দাবি বাতিল করার জন্য সরকার যে-সব যুক্তি দেখিয়েছেন তার ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবটি পাশ করার পর আমি গত শুক্রবার এবং শনিবার রাত্রে যে-ভাষণ দিয়েছি তার নির্ভেজাল রিপোর্টের জন্য তাদের (সরকারের) অপেক্ষা করা উচিত ছিল। ঐ ভাষণের রিপোর্টে আপনি দেখতে পেতেন আমি তাড়াহুড়া করে সংগ্রাম শুরু করতে চাইনি। তাতে যে অন্তর্বর্তীকালের ইঙ্গিত আছে আপনি তার সুযোগ নিতে পারতেন এবং কংগ্রেসের দাবি পূরণের সকল সম্ভাবনা সন্ধান করতে পারতেন।

* [১৯৪২-এর আগস্ট মাস। সারা ভারত অভূতপূর্ব গণ-বিদ্রোহের ধ্বনিতে কল্লোলিত। ইংরাজ সরকার যেনতেন প্রকারেণ ঐ আন্দোলন গুঁড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। ইংরাজ সরকার দেশ-বিদেশে প্রচার চালাচ্ছেন যে বিয়াল্লিশের গোলযোগের জন্য কংগ্রেস নেতারাই দায়ী। লর্ড লিনলিথগো তখন ভাইসরয়। গান্ধীজী লর্ড লিনলিথগোর কাছে বেশ কয়েকখানা চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিতে কংগ্রেসের আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের প্রস্তাবকে গান্ধীজী সমালোচনা করেছেন।]

প্রস্তাবে বলা হয়েছে : "অধিকতর বিচার-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে—এই আশায় ভারত সরকার ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করেছেন। সেই আশায় তারা নিরাশ হয়েছেন।" আমার ধারণা—এখানে 'অধিকতর বিচার-বুদ্ধি' বলতে কংগ্রেস কর্তৃক তার দাবিগুলি বর্জনকেই বোঝানো হয়েছে। যে সরকার ভারতের স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেই সরকার ন্যায্য দাবির প্রত্যাহার আশা করবেন কেন? এটা কি এমনই একটা চ্যালেঞ্জ যে দাবি উত্থাপনকারীদের সঙ্গে স্থির আলোচনার পথে না গিয়ে অবিলম্বে নির্যাতনের দ্বারা তার মোকাবিলা করতে হবে? এই দাবি মেনে নিলে "ভারত বিশৃংখলতায় ডুবে যাবে"—আমার মতে এরকম কথা বলার অর্থ মানবধর্মের উপর আস্থা হারানো। দেখা যাচ্ছে তড়িঘড়ি দাবিটি বাতিল করার ফলেই সমগ্র জাতি তথা সরকার বিশৃংখলতায় ডুবতে বসেছে। মিত্র শক্তির উদ্দেশ্যের সঙ্গে ভারতকে একাত্ম করার সব রকম চেষ্টাই কংগ্রেস চালিয়ে যাচ্ছিল।

সরকারী প্রস্তাবে বলা হয়েছে : "কংগ্রেস দল যে বেআইনী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসাত্মক কাজের বিপজ্জনক প্রস্তুতি নিচ্ছে গভর্ণর জেনারেলও তা বিগত কিছুকাল ধরে অবগত আছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনসেবামূলক কাজকর্ম বিপর্যস্ত করা, ধর্মঘট ডাকা, সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্য ক্ষুণ্ণ করা এবং সেনাদলে নিয়োগ সমেত অন্যান্য প্রতিরক্ষার কাজে বাধা সৃষ্টি করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।" এটা প্রকৃত তথ্যের পুরোপুরি বিকৃত চেহারা। কোন পর্যায়েই হিংসার আশ্রয় নেবার কথা ভাবা হয় নি। অহিংসাত্মক সংগ্রাম বলতে কী বোঝায় তার সংজ্ঞার্থকে এমন দুরভিসন্ধিপূর্ণ ও সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে মনে হতে পারে যে কংগ্রেস হিংসাত্মক কাজের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে। কংগ্রেসে সব কিছুই খোলাখুলি আলোচিত হয়েছে; গোপনে করার মত কিছুই নেই। যে-কাজ ব্রিটিশ জনগণের ক্ষতি করছে তা ত্যাগ করতে বললে আনুগত্য ক্ষুণ্ণ করা হবে কেন? প্রধান কংগ্রেস নেতাদের আড়ালে রেখে ভারত সরকার বিভ্রান্তকর অনুচ্ছেদটি প্রচার না করে "প্রস্তুতি" সম্পর্কে যারা দায়ী তাদের শাস্তি দিলেই পারতেন। সেটাই হত ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা। কিন্তু তারা ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে নিজেরাই অশোভন কাজ করার অভিযোগে পড়ছেন।

জনগণের মধ্যে যাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত ত্যাগ ব্রত জাগিয়ে তোলা যায় সেটাই কংগ্রেস-আন্দোলনের লক্ষ্য। এই আন্দোলনের পিছনে কতটা গণ সমর্থন আছে কংগ্রেস তাই দেখাতে চেয়েছে। এহেন সময়ে স্পষ্টতই অহিংসা নীতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ একটি জনপ্রিয় আন্দোলনকে দমনের চেষ্টা করা ঠিক কাজ হয়েছে কি?

সরকারী প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে : "কংগ্রেস ভারতের মুখপাত্র নয়। তবু নিজেদের প্রভাব বিস্তার ও স্বীয় স্বৈরতান্ত্রিক পলিসি বজায় রাখার জন্য কংগ্রেসী নেতারা ভারতকে পূর্ণ জাতীয়তার পথে নিয়ে যাবার প্রয়াসে বারবার বাধা সৃষ্টি করেছেন।" ভারতের প্রাচীনতম জাতীয় সংগঠনকে এভাবে অভিযুক্ত করার চেষ্টা মিথ্যাশ্রয়ী ও মানহানিকর। যে সরকার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রত্যেকটি জাতীয় প্রয়াসকে বারবার গুঁড়িয়ে দিয়েছেন, যে সরকার সৎ-অসৎ যে কোন উপায়ে কংগ্রেসকে পদানত করে রাখতে চেয়েছেন তার মুখে এ ধরনের ভাষা শোভা পায় না।

কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে ভারত সরকার যদি ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার সময় স্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে সে দলের উপর আস্থা রাখতে না পারেন তাহলে তারা মুসলিম লীগকে সরকার গঠনের জন্য ডাকতে পারেন। লীগ কর্তৃক গঠিত যে-কোন জাতীয় সরকারকে কংগ্রেস আনুগত্য সহকারে মেনে নেবে। ভারত সরকার কিন্তু কংগ্রেসের এই 'অফার' বিবেচনা করতে রাজি হয়নি। এই 'অফারের' সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রের অভিযোগ আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

এবার সরকারী 'অফারটি' বিবেচনা করা যাক। "যুদ্ধ শেষে একটি নয়, সকল দলকে নিয়ে ভারত তার অবস্থার পক্ষে কোন্ ধরনের শাসন ব্যবস্থা সবচেয়ে উপযোগী তা স্থির করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে।" এই 'অফার' কি আদৌ বাস্তবসম্মত? এখন সকল দল এক মত হতে পারছে না। যুদ্ধ-শেষে তা সম্ভব হওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা আছে কি? আর দলগুলি যদি আগেই ব্যবস্থা নিতে চায়, তা তারা নিতে পারবে কি? ব্যাঙের ছাতার মত নানা দল গজিয়ে ওঠে। সরকার অতীতে যা করেছেন সে ভাবে কোন দলের প্রতিনিধিমূলক চরিত্র বিচার না করেই তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসবেন। মুখে স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েও কোন কোন দল হয়ত কংগ্রেস এবং তার কার্যধারার বিরোধিতা প্রকাশ করে বসবেন। তেমনটি হলে বলতে হবে—সরকারী 'অফারের' মধ্যে হতাশার বীজ সংযুক্ত রয়েছে। সে-জন্যই প্রথমে (ব্রিটিশ শাসন) প্রত্যাহারের সঙ্গত দাবি তোলা হচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায় ভারতের রাজনীতিক চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তনের পরেই স্থায়ী-অস্থায়ী যে কোন ধরনের প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠন সম্ভব। দাবি-প্রণেতাদের জীবন্ত কবর রচনার দ্বারা অচল অবস্থার অবসান হয়নি, তা জটিলতর হয়েছে মাত্র।

অতঃপর ঐ প্রস্তাবে বলা হয়েছে : "কংগ্রেস বলেছে--ভারতের কোটি কোটি মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধকারে রয়েছেন। তাই বহু শহীদ দেশের উদাহরণ সামনে থাকা সত্ত্বেও তারা আক্রমণকারীদের অস্ত্রের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। কংগ্রেসের এই বক্তব্যকে এই মহান দেশের জনগণের চিন্তাধারার প্রকৃত প্রকাশ হিসাবে ভারত সরকার মেনে নিতে পারেন না।" কোটি কোটি জনের কথা আমি জানি না। কিন্তু কংগ্রেসের বিবৃতির সমর্থনে আমি নিজের সাক্ষ্য পেশ করতে পারি। কংগ্রেসের সাক্ষ্য মানা-না-মানা সরকারের হাতে। কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই শুনতে চায় না যে সে বিপদে পড়েছে। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ভাগ্যে যা ঘটেছে কংগ্রেস চায় গ্রেট ব্রিটেন তা এড়িয়ে চলুক। সে জন্যই স্বেচ্ছায় ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করে কংগ্রেস গ্রেট ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ত্যাগ করতে বলেছে। বন্ধুত্বপূর্ণ ছাড়া অন্যতর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেস আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়নি। যতটা ভারতের জন্য ঠিক ততটা ব্রিটিশ জনগণ তথা মনুষ্যজাতির কল্যাণার্থে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করতে চায়। সমগ্র ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের লক্ষ্য ছাড়া কংগ্রেসের নিজের কোন স্বার্থ নেই বলেই আমি মনে করি।

সরকারী প্রস্তাবের সমাপ্তিসূচক নিম্নোক্ত আলংকারিক অনুচ্ছেদটি আমার কাছে বেশ মজাদার বলে মনে হয়েছে : "ভারতকে রক্ষা করা, ভারতের যুদ্ধ করার

শক্তি বজায় রাখা, ভারতের স্বার্থ রক্ষা এবং ভয় কিংবা আনুকূল্য না দেখিয়ে ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্ব তাদের (অর্থাৎ সরকারের) উপর ন্যস্ত।" মালয়, সিঙ্গাপুর এবং বর্মার অভিজ্ঞতার পর একে আমি ভাঁড়ামি বলতে বাধ্য। যে সব দলের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের জন্য ভারত সরকার নিজে পুরোপুরি দায়ী, সরকার যে তাদের মধ্যে "ভারসাম্য" বজায় রাখার দাবি করছেন—তা দুঃখের বিষয়।

আর একটা কথা। ভারত সরকার এবং আমাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য একই। স্পষ্ট করে বলতে গেলে উদ্দেশ্যটি হল চীন এবং রাশিয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষণ। ভারত সরকার মনে করেন—ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজনীয় নয়। আমি ঠিক উল্টোটাই মনে করি। এ বিষয়ে মানদণ্ড হিসাবে আমি জহওরলাল নেহরুকে গ্রহণ করেছি। ব্যক্তিগত সংস্রবের ফলে নেহরু আমার তুলনায়, এমন কী আপনাদের তুলনায়ও চীন ও রাশিয়ার আসন্ন ধ্বংসের বেদনা অনেক বেশি অনুভব করতে পারছে। সেই বেদনার অভিঘাতে সে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার পুরানো বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছে। নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের সাফল্য সম্পর্কে সে আমার চেয়েও বেশি শঙ্কিত। দিনের পর দিন আমি ওর সঙ্গে তর্ক করেছি। নেহরু এমন গভীর আবেগ সহকারে আমার যুক্তি খণ্ডন করেছে যা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ঘটনা-নিঃসৃত যুক্তিধারার কাছে সে নতি স্বীকার করেছে। যখন সে বুঝতে পেরেছে যে ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া ঐ দুই দেশের ভাগ্যও বিপন্ন, তখনই সে নতি স্বীকার করেছে। এ ধরনের একজন শক্তিশালী বন্ধুকে জেলে পুরে আপনারা নিঃসন্দেহে ভুল করেছেন।

উভয়ের একই লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার কংগ্রেসের দাবির জবাবে তাড়াতাড়ি নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছেন। সুতরাং আমি এমন অনুমান না করে পারছি না যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে মিত্র শক্তির স্বার্থটাই বড় প্রশ্ন নয়; সাম্রাজ্যবাদী নীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতে তার আধিপত্য বজায় রাখার অঘোষিত অভিপ্রায়ই তার কাছে আসল ব্যাপার। ঐ অভিপ্রায়ের ফলেই কংগ্রেসের দাবি বাতিল করা এবং তাড়াতাড়ি নির্যাতনের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে যে হারে অজ্ঞাতপূর্ব পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড চলেছে তাতে দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা দেখা দিয়েছে। কিন্তু নরহত্যার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে হত্যা এবং মিথ্যাশ্রয়ী সরকারী বিবৃতির ফলে কংগ্রেসেরই শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে।

আপনাকে এই দীর্ঘ চিঠি লিখতে আমি গভীর বেদনা বোধ করছি। কিন্তু আপনার কাজ আমার যত অপছন্দই হোক না কেন, আপনি আমাকে যে রকম বন্ধু বলে জানেন আমি সে রকম বন্ধুই থাকব। আমি এখনও 'ভারত সরকারের সমগ্র নীতি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। ব্রিটিশ জনগণের এই অকৃত্রিম বন্ধুর আবেদনটি অগ্রাহ্য করবেন না। ঈশ্বর যেন আপনাদের পথ দেখান।

আপনার অকৃত্রিম

এম. কে. গান্ধী

উইনস্টন চার্চিলকে

দিলখুসা
পঞ্চগণি
১৭ই জুলাই, ১৯৪৪

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনি 'ন্যাংটা ফকিরকে'—যা বলে আপনি আমাকে বর্ণনা করেছেন বলে বিদিত—চূর্ণ করার অভিপ্রায় জানিয়েছেন বলে প্রকাশ। আমি অনেক দিন থেকেই ফকির হবার চেষ্টা করছি, তার ওপর আবার ন্যাংটা সে তো আরও কঠিন ব্যাপার। কাজেই আপনার বর্ণনাটি প্রশংসা—যদিও তা উদ্দেশ্য ছিল না—বলে গ্রহণ করছি। আমি তাহলে সেই ভাবেই আপনার কাছে আর্জি জানাচ্ছি এবং আপনার জাতির ও আমার জাতির এবং তাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর জনগণের স্বার্থে আমাকে বিশ্বাস করতে ও আমাকে কাজে লাগাতে অনুরোধ করছি।

আপনার একান্ত সুহৃদ
এম. কে. গান্ধী

লর্ড পেথিক লরেন্সকে

বাল্মীকি মন্দির,
রিডিং রোড
নয়াদিল্লী
২রা এপ্রিল, ১৯৪৬

প্রিয় লর্ড লরেন্স,

আমাদের পরস্পরের বন্ধু সুধীর ঘোষ আমাকে বললেন যে, আপনার ও স্যার স্ট্যাফোর্ডের সঙ্গে যে বিষয়গুলি নিয়ে তাঁকে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করতে বলেছিলাম, আপনার ইচ্ছা আমি যেন সেগুলি লিখে দিই।

লক্ষ লক্ষ, মূকব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র—তা তাঁরা কংগ্রেসী হোন-বা-না হোন, স্বাধীন-চেতা সব মানুষের কাছে একটা বিষয় তো সর্বজনীন। সেটা হচ্ছে, হিংসাত্মক বা অহিংস কার্যকলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক বন্দীদেরই অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। এখন তো স্বাধীনতার চাহিদা সর্বসাধারণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, কাজেই তাঁরা আর এ সময় রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারেন না। ধরুন, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডঃ লোহিয়া—উভয়েই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি, যাঁদের জন্যে যে কোন সমাজ গর্ব অনুভব করবে—এঁদের বন্দী করে রাখা

হাস্যাস্পদ ব্যাপার বলে মনে হয়; কিংবা যে কোন ব্যক্তিকেই আত্মগোপনকারী কর্মী বলে গণ্য করার কোনও হেতুই নেই। আর, মুক্তি দেওয়ার প্রশ্নটি আগামী জাতীয় সরকারের নিষ্পত্তির জন্য রেখে দেওয়া এমন এক পদক্ষেপ হবে, যা কেউ বুঝবেও না, প্রশংসাও করবে না। স্বাধীনতা নিজের সৌন্দর্য্য হারাবে।

অপরটির প্রভাব জনগণের উপর গিয়ে পড়বে। লবণ করের কথাই বলি। রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যম হিসাবে তা অকিঞ্চিৎকর। জনগণকে হয়রান করার ব্যবস্থা হিসাবে এর ক্ষতি করার ক্ষমতা অবর্ণনীয়। লবণের একচেটিয়া ব্যবসায়ের বোঝা যদি জনগণকে পীড়িতই করতে থাকে, সেক্ষেত্রে তাঁরা স্বাধীনতার মূল্য বুঝবেন না বললেই চলে। যুক্তি দিয়ে আপনাকে ক্লান্ত করতে চাই না। স্বাধীনতার জন্যে ভারতীয়দের মানসিক প্রস্তুতির ব্যবস্থা হিসাবে আমি এই দুটি বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ করছি। এর দ্বারা মনঃস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

প্রসঙ্গতঃ আমি উল্লেখ করতে চাই যে, দুটি বিষয় নিয়ে ভিন্ন পটক্ষেপে মিঃ কেসির সঙ্গে আমি আলোচনা করেছিলাম। এবং বাংলার বর্তমান গভর্ণরের সঙ্গেও চিঠি-পত্র লেখালিখি করছি। আজ মিঃ অ্যাবেলের কাছ থেকে শুনলাম, লবণ করের ব্যাপারে সরকারের কাছে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল 'সরকার তা গ্রহণ করতে সক্ষম নন।'

আপনার একান্ত
এম. কে. গান্ধী

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে

শ্রীরামপুর
২৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৬

চিরঞ্জীব বল্লভভাই,

প্যারীলালকে তুমি যে-চিঠি দিয়েছ গতকাল তা সরাসরি আমার কাছে এসেছে। প্যারীলাল ও অন্য সবাই যে যার কাজে নিমগ্ন; তারা জীবন পণ করেছেন...তাই প্যারীলাল এ চিঠির কথা জানে না। কখনো কখনো সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে; পরের বার যখন আসবে, তখন এই চিঠি পড়বে।

এখন ভোর তিনটে। আমি বলে যাচ্ছি, আর একজন লিখছে। চারটের সময় হাত-মুখ ধোব, তারপর প্রার্থনায় বসব। বর্তমানে এই রুটিন চলছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি তাই হয়, তাহলে এভাবেই চলব। যাই হোক, তুমি উদ্বিগ্ন হতে পারো, আমার স্বাস্থ্যের তেমন কিছু ঘটেনি। শরীরের কাছে যা চাওয়া হচ্ছে, তাতেই সে সাড়া দিচ্ছে; কিন্তু এটা আমার সত্যিকারের অগ্নিপরীক্ষা। রত্ন ব্যবসায়ী যে ভাবে নিক্তিতে মুক্তা মাপে, আমি তার চেয়েও সূক্ষ্মভাবে আমার সত্য ও অহিংসাকে

মেপে দেখছি। অণুতম পরিবর্তনও ঐ পরিমাণে ধরা পড়বে। সত্য ও অহিংসার মধ্যে কোন খাদ নেই। যদি কোন গলতি ধরা পড়ে তাহলে তার দায় আমারই। তা যদি হয়, তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব—তিনি যেন আমাকে কাছে টেনে নিয়ে যোগ্যতর প্রতিনিধির হাতে এ কাজের ভার দেন। দুঃখের বিষয়, প্যারীলাল আমার যে-সব কাজ করে দিত, সেগুলি আমি নিজে করে উঠতে পারছি না। আমার কাছে যে-দুজন লোক রয়েছে তাদের এখনো শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারিনি। তবে, দুজনেই বুদ্ধিমান : আশা করছি কাজ চালাবার ব্যবস্থা করে নিতে পারব। তিন-চার দিন আগে মানুর ইচ্ছা অনুযায়ী জয়সুখলাল তাকে রেখে গিয়েছে। মানু আমার কাছে থাকতে চায়; দরকার হলে মৃত্যুবরণেও রাজি; তাই তাকে আসতে দিয়েছি। যাতে সবচেয়ে কম কষ্ট হয় তার জন্য শুয়ে, চোখ বন্ধ করে আমি বলে যাচ্ছি; মানু লিখে নিচ্ছে। সুচেতাও (কৃপালনী) এ ঘরেই আছে। সে এখনও ঘুমে......

যে টেলিগ্রামখানা তুমি আমার কাছে পাঠিয়েছ বাজে কাগজের ঝুড়িতেই তার স্থান হতে পারে। ওতে অত্যুক্তি সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। লোকে যে ইচ্ছা করে অত্যুক্তি করে তা নয়; তারা জানে না অত্যুক্তির অর্থ কী। আগাছা যেমন চারিদিক ছেয়ে যায়, লোকের কল্পনাও তেমনি সর্বব্যাপী। (এখানে) আমাদের চারিদিকে রয়েছে বড় বড় নারিকেল ও সুপারির গাছ; তার তলায় সবুজের মেলা। এখানকার নদীগুলি সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রেরই মত। তারা সব গঙ্গোপসাগরে পড়েছে। যে লোকটি টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছে তাকে যদি জবাব না দিয়ে থাক, তাহলে আমার উপদেশ হল—ওকে ওর বিবৃতি প্রমাণ করতে বল যাতে "কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে কিছু করার চেষ্টা করতে পারে; যদিও সংবিধান অনুসারে তাদের হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতা নেই।" আরো বলো : "গান্ধীজী আপনাদের সকলের মাঝেই আছেন। তিনি আপনার কথা শুনবেননা—তা অসম্ভব। কিন্তু তিনি সত্য ও অহিংসার পূজারী; তাই তিনি আপনাকে হতাশ করতে পারেন। আমাদের শিক্ষা তো ওঁরই কাছে। তাই তিনি যদি আপনাকে হতাশ করেন, আমরা কী করে আপনাকে সন্তুষ্ট করব বলুন?" গান্ধী রয়েছেন, সুতরাং তোমাদের কাছে কেউ যেন কোন সমস্যা নিয়ে না আসে—এমন কথা কাউকে বলো না। লোকে তোমাদের কাছেও লিখুক। তোমরা দরকার হলে আমার বিরুদ্ধে গিয়েও তাদের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে চেষ্টা কর। সেটাই তোমাদের কর্তব্য। আমি তো তোমাদের সে শিক্ষাই দিয়েছি। অবস্থা (এখন) বেশ সংকটজনক। সত্য কোথাও নেই। হিংসা অহিংসার রূপ ধরে এবং অধর্ম ধর্মের রূপ ধরে হাজির হচ্ছে। অবশ্য এ অবস্থাতেই সত্য ও অহিংসার পরীক্ষা হতে পারে। আমি তা জানি। আর সে জন্যই এখানে রয়েছি। আমাকে অন্যত্র ডেকে নিওনা। আমি যদি ভয়ে পালিয়ে যাই, তা আমার কাছে দুর্ভাগ্যের কারণ হবে; কিন্তু ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ততটা অভাগী নয়। করবো, না হয় মরবো—এই সংকল্প নিয়েই এখানে আছি। গতকাল রেডিওতে শুনলাম—জওহরলাল, কৃপালনী এবং দেও আমার সঙ্গে আলোচনা করতে আসছে। তা বেশ। কিন্তু সকলের সঙ্গে আলোচনা করে কী লাভ? যাই হোক, তোমাদের কেউ যদি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা

করতে চাও, তা করতে পারো।

আসাম সম্পর্কে যা লিখেছি তা এখনি প্রকাশের জন্য নয়। তবে এ বিষয়ে আমার বক্তব্য যে ঠিক তাতে যেন সংশয় না থাকে।

বিহারের [মুসলিম] লীগের রিপোর্ট হয়ত দেখেছ। এ বিষয়ে আমি রাজেন্দ্রবাবুকে লিখেছি। তাকে বলেছি—তিনি যেন তোমাদের সবাইকে এ বিষয়ে আমার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অবহিত করেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি দিয়েছি। রিপোর্টের অর্ধাংশও যদি সত্য হয়, তাহলে ব্যাপার খারাপ। একটি দিনও দেরি না করে যে একটা নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন বসানো উচিত সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই। কমিশনের কেউ দোষ ধরতে পারবে না। অভিযোগে যদি সত্যতা কিছু থাকে, তাহলে তা সরাসরি স্বীকার করা উচিত। বাকি অংশ কমিশনের কাছে পেশ করতে হবে। মন্ত্রিসভায় তোমার যে-সব মুসলিম লীগের সহকর্মী আছেন, তাদের সঙ্গেও এ বিষয়ে তোমার আলোচনা করা উচিত। আমি সুরাবর্দীর সঙ্গে এখনও চিঠিপত্র চালিয়ে যাচ্ছি। শেষ হলে সেগুলি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। আমাদের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছে জওহরলাল তা দেখবে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমার প্রার্থনান্তিক ভাষণ যদি পড়ে না থাকো, তাহলে দয়া করে তা পড়বে। আর না হয় কাগজ-কাটিং পড়ো। মণির কাছে কাটিং আছে। তোমার কাজের চাপ যে খুব বেশি তা জানি; কিন্তু চাপ সত্ত্বেও কিছু করতেই হবে। আমি কী বলি তার সঙ্গে পরিচয় রাখা—সে সব করণীয়ের অন্যতম।

তোমার শরীর খুব ভালো আছে—এমন আশা নিশ্চয়ই করতে পারি না; তবে যে-টুকু আছে তা কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট—এ বিশ্বাস রেখো। আমার মনে হয়—তোমার শরীরের যথেষ্ট উন্নতি করা সম্ভব। এখনও বলছি—দিনশাকে (মেটা) একবার দেখিয়ে নাও। সে লোক ভালো; তার মধ্যে যে আন্তরিকতা ও মহানুভবতা আছে তাতে সন্দেহ নেই। তাই. সে খুব পারদর্শী না হলে তাতে কী আসে যায়? সুশীলার কথা জিজ্ঞাসা করেছো। সে ভালো আছে—এমন কথা বলতে পারি না। সে গ্রামে রয়েছে; ভালো কাজ করছে। এসব এলাকায় হাতুড়েও জোটানো ভার। তাই ওর মত এক জনকে পেয়ে লোকে যথেষ্ট কাজ আদায় করে নেবে—সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এখানে যারা আছে তাদের কারো সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ো না। সকলেই মৃত্যুপণ করেছে। তাই কারো অসুখ-বিসুখ করল কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাবার হেতু নেই। তাদের যদি মৃত্যু ঘটে, তবে সে-মৃত্যু হবে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তার জন্য তাদের পবিত্রভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

আশীর্বাদসহ
বাপু

ভাইসরয়কে (লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে)

পাটনাগামী ট্রেন
৮মে, ১৯৪৭

প্রিয় বন্ধু,

আমাদের গত রবিবারের বৈঠকে আমি যে-সব কথা বলেছি এবং যে-সব কথা বলতে চেয়েছি, কিন্তু সময়ের অভাবে শেষ করতে পারিনি, আমার মনে হয় সেগুলি সংক্ষেপে লিপিবন্ধ করা উচিত।

॥ এক ॥

১। বিপরীতে যাই বলা হোক না কেন, ভারত বিভাগের প্রশ্নে ব্রিটিশ পক্ষের অংশ গ্রহণ একটা বিরাট ভুল হবে। ভারত বিভাগ যদি অপরিহার্য হয়, তাহলে দু পক্ষের বোঝাপড়ার মাধ্যমে কিংবা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে—ব্রিটিশ শক্তির প্রত্যাহারের পরেই—তা আসুক। কোয়াদে-ই-আজম জিন্নার মতে অবশ্য সশস্ত্র সংগ্রাম নিষিদ্ধ। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষণের প্রশ্নে বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে সালিশী গঠন করে তা রক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২। ইতিমধ্যে কংগ্রেসীদের নিয়ে বা মুসলিম লীগের সদস্যদের নিয়ে কিংবা কংগ্রেস বা লীগের পছন্দ-করা লোকদের নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা উচিত। আজকের দ্বৈত শাসনে না আছে 'টীম ওয়ার্ক,' না আছে 'টীম স্পিরিট'। এটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। নিজেদের আসন বজায় রাখা এবং আপনাদের তুষ্ট রাখার প্রয়াসেই দলগুলির শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। 'টীম স্পিরিট' না থাকায় সরকারের নৈতিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; উত্তম ও দক্ষ প্রশাসনের জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয় সেই কৃত্যকগুলির সততাও বিপন্ন হচ্ছে।

৩। সীমান্ত অঞ্চলে (বা অন্য কোন প্রদেশে) বর্তমানে গণভোট গ্রহণ বিপজ্জনক। আপনি যেমন অবস্থার সম্মুখীন আপনাকে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী (সে সময় প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীকে 'প্রিমিয়ার' বা প্রধানমন্ত্রী বলা হত) ডঃ খান সাহেবকে ডিঙিয়ে কোন কিছু করা উচিত হবে না, সম্ভবও হবে না। যদি দেশ বিভাগের প্রশ্ন ওঠে তাহলেই কেবল এই অনুচ্ছেদটির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

৪। পাঞ্জাব ও বাংলার দ্বিখণ্ডন যে সর্বতোভাবে ভুল এবং লীগের পক্ষে নিরর্থক বিরক্তির বিষয় হবে—সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত। এই দ্বিখণ্ডন তথা অন্য যে কোন উদ্ভাবনামূলক বিষয় ব্রিটিশ প্রত্যাহারের পরেই আসতে পারে, আগে নয়। তবে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য যে কোন বিষয়ই উত্থাপিত হতে পারে। ব্রিটিশ শক্তি যতদিন ভারতে কার্যকর রয়েছে ততদিন এ দেশে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। এখন যে ধকল চলছে তার ফলে ঐ 'মেসিন' গুঁড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। পূর্ণ করা সম্ভব নয়, পূর্ণ করা উচিতও নয়—এ সব বহুমুখী আশা

মাথা তুলছে বলেই এমনটি ঘটছে। অবশিষ্ট তেরো মাসে এসব বিষয় কোন স্থানই পাবে না। (ব্রিটিশ শক্তি) প্রত্যাহারের একমাত্র কাজে সকলের মন সুনিবদ্ধ করা গেলে ঐ সময় অনেক কমিয়ে আনা যেতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য সব কাজ সরিয়ে রেখে আপনি—একমাত্র আপনিই এই কাজটি করতে পারেন।

৫। নৌ যুদ্ধে আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। কিন্তু বর্তমানে আপনাকে যে কাজের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে তার তুলনায় নৌ যুদ্ধের কাজটি কিছুই নয়। যে একাগ্রতা ও উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা আপনাদের সাফল্য এনে দিয়েছে, এই কাজে তার প্রয়োজন অনেক গুণ বেশি।

৬। আপনারা যদি বিশৃংখল অবস্থা রেখে যেতে না চান তাহলে একটি দলকে বেছে নিয়ে তার হাতেই রাজ্যগুলি সমেত সমগ্র ভারতের শাসনভার তুলে দিয়ে যেতে হবে। মুসলিম লীগ ভারতের যে অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছে না তেমন অঞ্চল বা কয়েকটি রাজ্যের প্রশাসনের ব্যবস্থাও গণপরিষদকে করতে হবে।

৭। পাঞ্জাব এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডন করার অর্থ এই নয় যে এই দুই প্রদেশের সংখ্যালঘুদের অবহেলা করতে হবে। দুই প্রদেশেই তারা সংখ্যায় অনেক এবং মনোযোগ আকর্ষণের মত শক্তিধর। জনপ্রিয় সরকার যদি ওদের তুষ্ট করতে না পারেন, তাহলে পরবর্তী সরকার গঠনের অন্তর্বর্তী সময়ে রাজ্যপাল ওদের ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করবেন।

৮। চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুপযোগী—এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, রাজ্যগুলি সার্বভৌম হয়ে উঠে স্বাধীন ভারতের পথে কণ্টক হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে ঐ নীতি 'ভিসিয়াস'—দুরভিসন্ধিপূর্ণ। ভারতে যেখানে যত রকমভাবে ব্রিটিশ রাজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন তার সবই তার উত্তরাধিকারীর হাতে স্বতঃই বর্তাবে। এভাবে বিভিন্ন রাজ্যের জনগণ যেভাবে ব্রিটিশ ভারতের জনগণ বলে পরিচিত, ঠিক সেভাবে স্বাধীন ভারতের জনগণ বলে পরিচিত হবেন। ব্রিটিশ শক্তি বজায় রাখা ও তার সম্মানার্থেই বর্তমান প্রিন্সরূপী ক্রীড়ণকগুলিকে তৈরী করা হয়েছে কিংবা সহ্য করা হচ্ছে। ঐ প্রিন্সগণ তাদের জনগণের উপর যে অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন তা বোধহয় ব্রিটিশ রাজমুকুটের সবচেয়ে গভীর কলঙ্ক। নতুন শাসন ব্যবস্থায় প্রিন্সগণ আছিরা যে-জাতীয় ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন সে জাতীয় ক্ষমতা এবং কেবল গণপরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাই ভোগ করতে পারবেন। তার অর্থ হল—তারা 'প্রাইভেট' সৈন্যদল কিংবা অস্ত্র তৈয়ারির কারখানা রাখতে পারবেন না। তাদের হাতে যে সব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আছে সেগুলি প্রজাতন্ত্রের হাতে চলে যাবে। ঐ ক্ষমতা ঐসব প্রিন্সদের অধীনস্থ জনগণ এবং সাধারণভাবে সকল জনগণের কল্যাণার্থ প্রয়োগ করতে হবে। রাজ্যগুলির ব্যাপারে কী করণীয় আমি তারই বর্ণনা দিলাম মাত্র। কীভাবে তা করা যেতে পারে, এ চিঠিতে তা দেখানোর দায়িত্ব আমার নয়।

৯। সিভিল সার্ভিসের প্রশ্নটিও অনুরূপ দুরূহ, তবে ততটা বিভ্রান্তিকর নয়। সিভিল সার্ভিসের সদস্যরা যাতে নতুন শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন তার জন্য এখন তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। তারা দলীয়

মনোভাবাপন্ন হতে পারবেন না। তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন দেখা গেলেই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সিভিল সার্ভিসে যে-সব ইংরাজ আছেন তাদের জানা উচিত যে তারা আর পুরোনো প্রশাসন অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনের অনুগত নন, নতুন প্রশাসনের প্রতিই তাদের আনুগত্য দেখাতে হবে। ওরা নিজেদের শাসক এবং সে হিসাবে 'সুপিরিয়র' ভাবতে অভ্যস্ত। জন-সেবার মনোভাব গ্রহণ করে তাদের ঐ মনোভাবকে দূর করতে হবে।

॥ দুই ॥

১০। গত মঙ্গলবার কোয়াদে-ই-আজম জিন্নার সঙ্গে আমি খুব আনন্দের সঙ্গে দু ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আলোচনা করেছি। অহিংসা (নন্-ভায়োলেন্স) সম্পর্কে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। তিনি (জিন্না) অহিংসায় তাঁর আস্থার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি সংবাদপত্রে দেবার জন্য যে-বিবৃতি তৈরি করেছেন তাতে তার পুনরুক্তি করেছেন।

১১। আমরা পাকিস্তান এবং দেশ বিভাগের প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করেছি। আমি তাঁকে বলেছি—পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি আমার বিরোধিতা আগের মতই রয়েছে। আরো বলেছি—অহিংসায় আস্থা দেখিয়ে উনি যে ঘোষণা করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে শক্তি নয়, যুক্তির দ্বারা ওঁর বিরোধীদের মত পরিবর্তনের চেষ্টা করা উচিত। উনি অবশ্য বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে পাকিস্তান সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চলবে না। যুক্তির বিচারে কিন্তু অহিংসায় বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নও আলোচনার বাইরে থাকতে পারে না।

রাজকুমারী অমৃত কাউর প্রথম আট অনুচ্ছেদ দেখেছেন। পণ্ডিত নেহরুকে তিনি তার সারমর্ম বলবেন। নেহরুর হাত দিয়েই এই চিঠি আপনাকে পাঠাবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু নতুন দিল্লীতে বসে চিঠিটি শেষ করতে পারিনি, শেষ করেছি রেলগাড়িতে বসে।

আশা করি আপনি এবং 'হার একসেলেন্সি' (আপনার স্ত্রী) আপনাদের কষ্টার্জিত বিশ্রাম উপভোগ করছেন।

আপনার অকৃত্রিম,
এম. কে. গান্ধী

অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শিশিরকুমার সান্ন্যাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

অহিংসাই মানবধর্ম

আমি কল্পনাবিলাসী নই, নিজেকে বাস্তব আদর্শবাদী বলে বিশ্বাস করি। অহিংসা কেবলমাত্র মুনিঋষিদের ধর্ম নয়, সাধারণ মানুষেরও। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি যেমন অহিংসা, তেমনি পশুরও সহজাত হিংসা। পশুর মধ্যে আত্মা ঘুমিয়ে থাকে, দৈহিক শক্তি ভিন্ন অপর শক্তির সন্ধান সে পায় না। মানুষের মর্যাদাবোধ ও উচ্চাদর্শ তাকে আত্মশক্তির কাছে সমর্পিত হতে উদ্বুদ্ধ করে।

আত্মাহুতির সেই প্রাচীন আদর্শ অসঙ্কোচে তাই আমি ভারতবর্ষের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি। কারণ সত্যাগ্রহ এবং তার আনুষঙ্গিক অসহযোগ আইন অমান্য সেই আত্মনিগ্রহেরই নব নামকরণ মাত্র। হিংসাবিক্ষুব্ধ পরিবেশেও অহিংসার মন্ত্র যে ঋষিকুল উদ্ভাবন করেছিলেন নিউটন অপেক্ষাও তাঁরা অধিক প্রতিভাধর এবং উইলিংডন অপেক্ষাও বীর যোদ্ধা ছিলেন। অস্ত্রে পারদর্শী হয়ে তাঁরা অনুভব করেছিলেন অস্ত্রের অকর্মণ্যতা এবং ক্ষতবিক্ষত পৃথিবীকে শুনিয়েছিলেন মুক্তির পথ হিংসায় নয়, অহিংসায়।

অহিংসার সক্রিয়রূপ হচ্ছে জ্ঞানপূর্বক ক্লেশবরণ করা। দুষ্কৃতকারীর কাছে ভীরু আত্মসমর্পণ নয়, স্বেচ্ছাচারীর প্রতিরোধে সমগ্র সত্তাকে প্রয়োগ করা। সত্তার এই স্বধর্মের অনুবর্তী হয়ে কাজ করলে একক হয়েও অন্যায়কারী একটি সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তিকে উপেক্ষা করে নিজের সম্মান, ধর্ম ও আত্মাকে রক্ষা করা সম্ভব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-'২০]

অহিংসা আমার দৃষ্টিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী ও কার্যকর সংগ্রাম। কারণ প্রতিহিংসাপরায়ণতার স্বাভাবিক ধর্মই অ-নীতিকে বাড়িয়ে তোলা। অনৈতিকতার বিরুদ্ধে মানসিক, অতএব অপরিহার্যরূপে নৈতিক এক প্রতিরোধ আমি গড়ে তুলতে চাই। অত্যাচারীর খড়্গ আমি সম্পূর্ণরূপে ভোঁতা করে দিতে চাই, খরতর আর একটি খড়্গ তুলে নয়—সশস্ত্র প্রতিরোধ করব তার এই প্রত্যাশাকেই নিরাশ করে দিয়ে। তার বদলে নৈতিক যে প্রতিরোধ গড়ে তুলব তা-ই তাকে বিমূঢ় করবে। প্রথমে সে হকচকিয়ে যাবে কিন্তু পরিশেষে মেনে নিতে বাধ্য হবে। এই মেনে নেওয়া তাকে খর্ব করবে না, তাকে গৌরবান্বিত করবে। বলা যেতে পারে, এও এক আদর্শ অবস্থা এবং বাস্তবিক তাই। আমার যুক্তির ভিত্তি ইউক্লিডের সংজ্ঞার ন্যায় সত্য, ব্লাকবোর্ডে আঁকা যায় না বলেই কখনও তা সত্য নয় বলা চলে না। ইউক্লিডের সংজ্ঞা স্মরণে না রেখে কোন জ্যামিতিকই জ্যামিতিক কোনও বিষয়ে অগ্রসর হতে পারেন না। যে মৌলিক

সত্য সমূহের উপর সত্যাগ্রহ দর্শন প্রতিষ্ঠিত আমরাও তাকে ত্যাগ করে চলতে পারি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১০-'২৫]

অহিংসা ভীরুতা ঢাকবার আবরণ নয়; বীরের সর্বোত্তম ধর্ম। অস্ত্রের প্রয়োগ অপেক্ষা অহিংসার প্রয়োগে বেশী বীরত্বের প্রয়োজন। অহিংসার পথে কাপুরুষতা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। হিংসা, অহিংসায় রূপান্তরিত করা সম্ভব এবং কখন কখন তা খুবই সহজসাধ্য। আঘাত করার সামর্থ্য থাকা অহিংসার পূর্বসর্ত। এ হল সজ্ঞানে সযত্নে প্রতিহিংসা বৃত্তিকে সংযত করা; কিন্তু নিষ্ক্রিয়, দুর্বল ও অসহায় আত্মসমর্পণ অপেক্ষা প্রতিহিংসাপরায়ণতাও সর্বাবস্থাতেই শ্রেয়ঃ। ক্ষমাপরায়ণতা আরও উত্তম। প্রতিহিংসাপরায়ণতাও দুর্বলতা। ক্ষতিগ্রস্ত হবার কাল্পনিক অথবা বাস্তব আশংকা থেকে প্রতিহিংসার উদ্ভব। ভয় পেয়েই কুকুর চিৎকার করে ও কামড়ায়। পৃথিবীতে কাউকেই যে ভয় পায় না তার অনিষ্টসাধনে বৃথা লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি রাগ করাও সে নিরর্থক মনে করে। ছোট ছোট শিশুরা মুঠি মুঠি ধূলি নিক্ষেপ করে বলে সূর্য তাদের উপর রোষবহ্নি নিক্ষেপ করেন না। নিজেদের কাজে নিজেরাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-৮-'২৬]

১। অহিংসা মানবধর্ম: পশুশক্তি অপেক্ষা অনন্তগুণ শক্তিসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ।

২। প্রেমের ঈশ্বরে যাদের জ্বলন্ত বিশ্বাস নেই, এই ধর্ম পরিণামে তাদের কোনও উপকারে আসে না।

৩। অহিংসা ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্ভ্রমকে সর্বদা পূর্ণভাবে রক্ষা করে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানাকে রক্ষা না করতে পারে। যদিও নিরাপত্তার কাজে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সশস্ত্র বাহিনী অপেক্ষাও অধিক কার্যকর। অহিংসা স্বভাববশেই অন্যায়ভাবে সম্পদ আহরণে অথবা দুষ্কর্মে কোনরূপ সহায়তা করে না।

৪। ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্র অহিংসার প্রয়োগে যিনিই অভিলাষী হোন, একমাত্র সম্ভ্রম ছাড়া বাকী সকল কিছু ত্যাগের জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে (রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তার শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত)। সুতরাং পররাজ্য দখল করা অর্থাৎ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ, যা অধিকার কায়েম রাখবার জন্য প্রকাশ্যভাবে হিংসাশক্তির উপরই নির্ভরশীল, তা স্বভাবতঃই অহিংসার পরিপন্থী।

৫। অহিংসা এমন একটি শক্তি যা ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস তথা সর্বমানুষে সমপ্রেম থাকলে ছেলে, বুড়ো, যুবক, যুবতী সকলেই প্রয়োগ করতে পারেন। অহিংসা জীবনের ধর্ম বলে গ্রহণ করলে সমগ্র সত্তাকেই তা দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে হয়, কেবলমাত্র ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করলে চলে না।

৬। ব্যক্তির জন্যই এই বিধি পরম কল্যাণকর কিন্তু আপামর জনসাধারণের জন্য নয়—এরূপ কল্পনা করাও মস্ত ভুল।

[হরিজন, ৫-৯-'৩৬]

নিরবচ্ছিন্ন পঞ্চাশবছরেরও বেশী সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসহকারে অহিংসা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আমি অভ্যাস করছি ও তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে আসছি। গার্হস্থ্য, সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাকে আমি প্রয়োগ করেছি। কোন ক্ষেত্রেই তাকে নিষ্ফল হতে দেখিনি। কোথাও নিষ্ফল হয়েছে বলে মনে হলে নিজের অসম্পূর্ণতা তার জন্য দায়ী বলে জেনেছি। আমি সম্পূর্ণতার অধিকারী জ্ঞানী ব্যক্তি বলে দাবী করি না, কিন্তু সত্য—যা ভগবানেরই অপরনাম মাত্র—তার নিরলস অনুসন্ধানী বলে অবশ্যই দাবী করি। এই অনুসন্ধানের পথেই অহিংসা আমার কাছে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার সম্প্রসারণই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। সেই আদর্শের রূপায়ণ ব্যতীত আমার জীবনের আর কোনও বাসনা নাই।

[হরিজন, ৬-৭-'৪০]

অহিংসার সংকীর্ণ ও ঋজু পথ ভিন্ন বেদনাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীর আর কোনই ভরসা নেই। আমার মত আরও বহুজন এই সত্যকে নিজেদের জীবনে রূপ দিতে অসমর্থ হতে পারেন। সেটা তাদেরই অসামর্থ্য, কখনই এই শ্বাশ্বত বিধির ত্রুটি নয়।

[হরিজন, ২৯-৬-'৪৭]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেমের ধর্ম

অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে, হাজার হাজার বছর ধরে পশুশক্তি পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে আসছে আর সর্বদা মানবজাতি তার তিক্তফল ভোগ করছে। এই পথে ভবিষ্যতে কল্যাণ আসবে সে ভরসাও কম। অন্ধকার থেকে আলোর প্রকাশ যেমন সম্ভব নয়, বিদ্বেষ থেকেও তেমনি প্রেমের প্রকাশ হতে পারে না।

[দক্ষিণ আফ্রিকা সত্যাগ্রহ, ১৯৫০ সংস্করণ]

আত্মা অথবা সত্যের শক্তি ও প্রেমের শক্তি একই বস্তু। প্রতি পদক্ষেপে আমরা তার অস্তিত্ব অনুভব করি। এই শক্তি না থাকলে সৃষ্টিই লোপ পেত। একে অবলম্বন করে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ জীবন বেঁচে আছে। এর প্রকাশ মাত্র লক্ষ লক্ষ পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব নিমেষে নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।

শত শত জাতি শান্তিতে বসবাস করছে। ইতিহাস এই সত্য লিপিবদ্ধ করে না—করা সম্ভবও নয়। ইতিহাস প্রেমশক্তি অথবা আত্মশক্তির নিরবচ্ছিন্ন কর্মধারায় ছন্দপতনের বিবরণী মাত্র। দুই ভাইয়ে ঝগড়া হয়, একজন অনুতপ্ত হয়ে তার অন্তরের সুপ্ত ভালবাসাকে উদ্দীপ্ত করে, দুজনে পুনরায় শান্তিতে বসবাস করেও থাকে; কেউ এ তথ্য নথিবদ্ধ করে না। কিন্তু দুই ভাই আইনসংঘের পরামর্শে যদি আদালতের দ্বারে উপস্থিত হয় অথবা পশুশক্তিরই অন্যতম অভিব্যক্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়—পত্রিকাগুলি তৎক্ষণাৎ তার প্রচারে লেগে যায়। প্রতিবেশীরা আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং সম্ভবতঃ ইতিহাসেও তা স্থান পায়। পরিবার ও গোষ্ঠীসমূহের ক্ষেত্রে যা সত্য, রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রেও তা অবশ্যই সত্য। পারিবারিক বিধি এক, রাষ্ট্রীয় বিধি আর এক, এরূপ বিশ্বাস করবার কোনই হেতু নেই। অতএব ইতিহাস স্বধর্মের স্বাভাবিক যাত্রাপথের প্রতিবন্ধ সমূহের একটি নথি মাত্র। আত্মার শক্তি সহজাত বলে ইতিহাসে তার স্থান নেই।

[হিন্দ্ স্বরাজ, ১৯৫৮ সংস্করণ]

আমার ধারণা, মনুষ্যজাতির প্রেরণাসমূহের সমষ্টি আমাদের অধঃপতিত করতে চায় না—আমাদের উন্নীত করতেই চায়। অজ্ঞাতসারে হলেও, এটাই প্রেমের সুনির্দিষ্ট কাজ। ধরাপৃষ্ঠে মনুষ্যজাতি টি'কে যে আছে তাতেই প্রমাণিত হয় সংহতি শক্তি বিভেদকারী শক্তি অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপেক্ষা বলশালী।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-'৩১]

পথপ্রদর্শক যাঁদেরই আবির্ভাব হয়েছে কমবেশী জোর দিয়ে বিভিন্নভাবে এই একই সত্য সকলে ব্যক্ত করে গেছেন। প্রেম যদি জীবনের ধর্ম না হত মৃত্যুর বিভীষিকায় নির্মজ্জিত জীবের অস্তিত্বই থাকত না। প্রাণ চিরমৃত্যুঞ্জয়ী। মানুষ ও পশুর মধ্যে মৌলিক প্রভেদই হল—মানুষ এই সত্যকে উত্তরোত্তর স্বীকৃতি দান করেছে, স্বীয় জীবনে ও কর্মে প্রয়োগ করেছে। পৃথিবীর প্রাচীন ও নব্য সকল মনীষীই নিজ নিজ জ্ঞান ও ক্ষমতার অনুপাতে সত্তার এই শাশ্বত বিধির এক একজন জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন। আমাদের অন্তরের নিহিত পশু যে অনায়াসে পুনঃ পুনঃ আমাদের পরাভূত করে এ কথাও অতীব সত্য। কিন্তু তা থেকে এই সত্যের অসারতা প্রমাণিত হয় না। প্রতিপালন করা কষ্টসাধ্য তাই বোঝায় মাত্র। যে বিধি সত্যের সমান মহৎ তা কষ্টসাধ্য না হয়েই পারে না। এই বিধি যখন সর্বজনীনরূপে প্রতিপালিত হবে তখন ভগবান যেমন স্বয়ং স্বর্গের ভার বহন করেন তেমনি পৃথিবী পালনের ভারও গ্রহণ করবেন। আমি জানি স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়েরই অবস্থান আমাদের অন্তরে। আমরা মর্ত্যকে জানি, অন্তর্লোকে অবস্থিত স্বর্গ আমাদের অপরিচিত। কিছুসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে প্রেমিক হওয়া সম্ভব বলে যদি বিশ্বাস করি, আর অপর সকলের পক্ষে কোনক্রমেই তা সম্ভব নয় বলে ধরে নিই যদি তবে সেটা ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক হবে। আমাদের অনতিদূরবর্তী আদিম পূর্বপুরুষগণও

নরখাদক ছিলেন এবং আরও বহুকিছুতেই অভ্যস্ত ছিলেন। আজ সে সকল আমরা ঘৃণ্য বলে মনে করি। কোনই সন্দেহ নেই সে যুগেও ডিক্ সেপার্ডের মত লোক ছিলেন, সহচর মানুষের মাংস ভক্ষণ থেকে নিবৃত্ত হবার অদ্ভুত উপদেশ শোনাতেন বলে যাঁরা লাঞ্ছিত ও উপহসিত হতেন।

[হরিজন,২৬-৯-'৩৬]

ইতিহাস নিত্য যুদ্ধবিগ্রহের একটি নথি মাত্র। কিন্তু আমরা নূতন ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। অহিংসায় বিশ্বাসী জাতীয় মানসের প্রতিভূরূপে আমি এ কথা বলছি। বিচার দ্বারা হিংসা শক্তিকে আমি পরাভূত করেছি, তার সম্ভাবনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যত্নসহকারে "প্রেমের ধর্মকে" "জঙ্গলের ধর্মের" স্থলাভিষিক্ত করাই মানবজীবনের একমাত্র অভীষ্ট।

[হরিজন, ৩-৭-'৩৭]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর শান্তি

স্থায়ী শান্তির সম্ভাবনায় আস্থাশীল না হওয়ার অর্থ মানবপ্রকৃতিতে দেবত্বের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হওয়া। ইতঃপূর্বে সকল প্রচেষ্টাই বিফল হয়েছে কারণ প্রচেষ্টাকারীদিগের নিষ্ঠায় দৃঢ়তার অভাব ছিল। তাঁরা এই অভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না তা নয়। আংশিক শর্ত পূরণে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না, পূর্ণ শর্ত পূরণ ব্যতিরেকে যেমন পূর্ণাঙ্গ রাসায়নিক মিশ্রণ সম্ভব নয়। মানবসমাজের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ যাঁরা বিধ্বংসী শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা যদি পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে সেই শক্তি প্রয়োগ থেকে সর্বতোভাবে বিরত হন তবেই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তি পরিহার না করলে স্পষ্টই এটা অসম্ভব। ঠিক তেমনি আত্মঘাতী প্রতিযোগিতা, ক্রমবর্ধমান অভাববোধ এবং তার পরিতৃপ্তির জন্য উত্তরোত্তর পার্থিব সম্পদ আহরণের প্রবৃত্তি থেকে যদি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি নিবৃত্ত না হয় তবে স্থায়ী শান্তি কখনই প্রতিষ্ঠিত হবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জাগ্রত ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাসের অভাবই সকল অনিষ্টের মূল। পৃথিবীতে যে-সকল মানুষ যীশুখৃষ্টের বাণীতে বিশ্বাসী বলে দাবী করেন এবং তাঁকে শান্তির দূত বলে অভিহিত করেন, কার্যক্ষেত্রে সে বিশ্বাসের প্রতি তাঁরা সামান্যতম শ্রদ্ধাও প্রদর্শন করেন না এটাই হল মানবেতিহাসের চরমতম কলঙ্ক। নিকৃষ্টতম ব্যক্তির পক্ষেও মানবীয় প্রাথমিক গুণাবলী আয়ত্ত করা যে সম্ভব শৈশব থেকেই আমি তা শিক্ষা লাভ করেছি; অভিজ্ঞতার দ্বারাই এই সত্য উপলব্ধি করেছি। অবিসম্বাদী সীমাহীন এই সম্ভাবনাই মানুষকে ভগবানের

সৃষ্ট অপরাপর জীব থেকে পৃথক্ করেছে। একটি দেশও যদি কোনওরূপ শর্তের অপেক্ষা না করে সর্বোত্তম এই ত্যাগের আদর্শ রূপায়ণ করে তবে আমাদের জীবদ্দশাতেই আমরা প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারব।

[হরিজন, ১৬-৫-'৩৬]

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যে-কোন দিন একে (অহিংসাকে) গ্রহণ করতে পারেন—গৌরবান্বিত ও ভাবী বংশধরদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হতে পারেন। তাঁরা কিম্বা তাঁদের মধ্যে কেউ যদি ধ্বংসের ভয় ঝেড়ে ফেলেন, নিজেদের নিরস্ত্র করেন, তা হলে অপরের মস্তিষ্কেও সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে তাঁরা সাহায্য করবেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে, পৃথিবীর তথাকথিত অসভ্য ও অর্ধসভ্য জাতিগুলিকে শোষণ বন্ধ করতে হবে এবং জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। তার অর্থ একটি সর্বাত্মক বিপ্লব। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই যে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি এযাবৎ কাল তাদের অনুসৃত পথ—তাদের নিজস্ব মূল্যায়নে যা একের পর এক তাদের জয়মাল্য এনে দিয়েছে—ছেড়ে বিপরীত আর এক পথ অবলম্বন করবে এরূপ আশা করা খুবই শক্ত। কিন্তু অলৌকিক ঘটনা চিরকালই ঘটে, এই একান্ত গদ্যময় যুগে আজও ঘটতে পারে, দুষ্কৃতির বিনাশে ঈশ্বরের অসীম শক্তিকে কে সীমিত করতে পারে? এ কথা নিশ্চিত, সমরোপকরণের এই ক্ষিপ্ত প্রতিযোগিতা যদি অব্যাহত থাকে তবে অবশ্যম্ভাবীরূপে এমন এক ধ্বংসকাণ্ড ঘটবে ইতঃপূর্বে ইতিহাসে যেমনটা আর কখনও ঘটেনি। এই ধ্বংসকাণ্ডে রক্ষা পেয়ে বিজয়ী যদি কেউ হয়ই তবে সে বিজয় বিজয়ী দেশের পক্ষে মৃত্যুতুল্য হবে। অহিংসা ও সংশ্লিষ্ট মহৎ আদর্শ সাহসের সহিত বিনা শর্তে গ্রহণ না করলে আসন্ন এই বিপর্যয় থেকে অব্যাহতি নেই। গণতন্ত্র ও হিংসা এক সঙ্গে চলতে পারে না। যে রাষ্ট্রগুলি মাত্র নামে গণতান্ত্রিক তাদের হয় স্পষ্টতঃই স্বৈরতন্ত্রী হতে হবে অথবা প্রকৃত গণতন্ত্রী থাকতে হলে সাহসিকতার সঙ্গে অহিংসাকে গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তি অহিংস হতে পারে কিন্তু সেই ব্যক্তি নিয়ে গর্বিত সমগ্র জাতি অহিংস হতে পারে না—এ কথা বলা পাপ।

[হরিজন, ১২-১১-'৩৮]

ইউরোপ আত্মঘাতী হতে না চাইলে একদিন না একদিন তাকে সর্বজনীন নিরস্ত্রীকরণ গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু প্রারম্ভে একটি দেশকে তেজস্বিতাপূর্বক অগ্রণী হতে হবে, সকল ঝুঁকি মাথায় নিয়ে অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে তা যদি ঘটেই তবে অহিংসার মান সে দেশে এতই উন্নীত হবে যে সমগ্র বিশ্বের সে শ্রদ্ধা অর্জন করবে। তার বিচার হবে নির্ভুল, সিদ্ধান্ত হবে দৃঢ়, বীরোচিত আত্মত্যাগের ক্ষমতা প্যাবে বৃদ্ধি এবং সে নিজের এবং অপর রাষ্ট্রসমূহের কল্যাণ সাধনে সমভাবে আত্মনিয়োগ করবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১০-'২৫]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র

বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রতা বিশ্বরাষ্ট্র সমূহের লক্ষ্য নয়—স্বেচ্ছাকৃত পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই তাদের আদর্শ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৭-৭-'২৪]

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ আজ আর কতকগুলি পরস্পর বিবদমান সার্বভৌম রাষ্ট্র চান না, সখ্যে আবদ্ধ পরস্পর নির্ভরশীল এক যুক্তরাষ্ট্র চান। সেদিন হয়ত বহু দূরে। আমার দেশের স্বপক্ষে জোর করে আমি কিছু বলতে চাই না। কিন্তু আমরা যে স্বাধীনতার চাইতেও সর্বজনীন সহযোগিতায় অধিক আগ্রহশীল সে কথা প্রকাশ করা আমি কিছুমাত্র বাহাদুরী বা অসম্ভব বলে মনে করি না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৬-১২-'৩১]

রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত সীমান্তের অপর পারে আমাদের প্রতিবেশীর সেবা করায় আমাদের কোনই বাধা নেই। সীমান্তগুলি ভগবান সৃষ্টি করেন নি।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-১২-'২৪]

স্বাধীনতার স্পৃহাই ইউরোপের জাতিগুলির মধ্যে উদ্দীপনা সঞ্চারকারী শক্তি, কিন্তু সে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাকৃত অংশীদারিত্বকে অস্বীকার করে না। সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা অংশীদারিত্বের পরিপন্থী।

[হরিজন, ৩-৭-'৩৭]

বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের সৌধ কেবলমাত্র অহিংসার ভিত্তিতেই নির্মিত হতে পারে। বিশ্বের বিষয়কর্ম থেকে হিংসাকে সর্বতোভাবে বাদ দেওয়া দরকার।

[সরকারের সহিত গান্ধীজীর পত্রালাপ, ১৯৪৫ সংস্করণ]

বর্তমানকালে নাগরিকত্বের সংরক্ষণ মানেই জাতীয় বাণিজ্যের সংরক্ষণ অর্থাৎ শোষণ। অনিচ্ছুক জাতির উপর জবরদস্তিমূলক সেই বাণিজ্যিক স্বার্থ চাপিয়ে দিতে বলপ্রয়োগ এই শোষণের পূর্বশর্ত। সুতরাং এক দিক দিয়ে রাষ্ট্রগুলি প্রায় দস্যুদলে পরিণত হয়েছে, যদিও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধনে একতাবদ্ধ শান্তিপূর্ণ নরনারীর সম্মিলন হওয়া উচিত ছিল তাদের। সেক্ষেত্রে তাদের প্রতিপত্তি গোলাবারুদ ব্যবহারে দক্ষতায় নিবদ্ধ থাকবে না—উন্নততর নৈতিক গুণাবলী আয়ত্ত করবার উপর নির্ভরশীল হবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২১-১০-'২৬]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আক্রমণ প্রতিরোধ

প্রশ্ন : একটি নিরপেক্ষ নিরস্ত্র দেশ (সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায়) আর একটি দেশকে কীরূপে বিনষ্ট হতে দিতে পারে? গত যুদ্ধে আমাদের সীমান্তে আমাদের সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত যদি না থাকত তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।

উত্তর : একজন কল্পনাবিলাসী অথবা একজন আহাম্মক বলে পরিচিত হবার ঝুঁকি নিয়েই আমার স্বকীয় পদ্ধতিতেই এই প্রশ্নের আমি উত্তর দেব। প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রকে কোন সামরিক বাহিনী কর্তৃক লুণ্ঠিত হতে দেওয়া নিরপেক্ষ একটি দেশের পক্ষে কাপুরুষতা। অহিংসার সৈনিক ও যুদ্ধের সৈনিক —এদের মধ্যে দুটি বিষয়ে মিল আছে। আমি যদি সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং সে দেশের রাষ্ট্রপতি হতাম তবে কোনও আক্রমণকারী সামরিক বাহিনীকে আমার দেশের ভিতর দিয়ে যাবার পথ দিতাম না, যাবতীয় রসদ সরবরাহ বন্ধ করে তাদের আমি বাধা দিতাম। দ্বিতীয়তঃ, সুইজারল্যাণ্ডকে আর একটা থার্মোপলীতে রূপান্তরিত করতাম। নরনারী-শিশুনির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে জীবন্ত এক প্রাচীর গড়ে দাঁড়াতাম এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে আহবান জানাতাম সকলের মৃতদেহ পদদলিত করে অগ্রসর হতে। এইরূপ এক পরিকল্পনা মানুষের অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার অতীত বলে হয়ত মনে হবে। কিন্তু আমি বলছি তা ঠিক নয়। এটা সম্পূর্ণ সম্ভব। গত বছর গুজরাটে মহিলারা পুলিশের লাঠিচার্জ বিচলিত না হয়েই সহ্য করেছেন; পেশোয়ারে হাজার হাজার লোক হিংসার আশ্রয় না নিয়ে নির্ভীকভাবে গুলির মুখে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। এইসব স্ত্রী-পুরুষ যদি পররাজ্য আক্রমণকারী এক সামরিক বাহিনীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ান তবে কী হবে কল্পনা করুন। হয়ত বলতে পারেন যে, সৈনিকরা নির্মমভাবে তাদের বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে; সে ক্ষেত্রেও আমি বলব যে, ওই আত্মাহুতির মধ্য দিয়েই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন। যে সেনাবাহিনী নিরপরাধ নরনারীর মৃতদেহের উপর দিয়ে পথ করে অগ্রসর হবে সে আর কোনও দিনই সেই ভয়ংকর পরীক্ষার পুনরাবৃত্তিতে সাহসী হবে না। সাধাবণ নরনারীও এতখানি সাহসী হবেন এ কথা অনেকে বিশ্বাস নাও করতে পারেন। কিন্তু তা হলে ত' তাঁরা স্বীকার করছেনই যে, কেবলমাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়েই অহিংসা সম্ভব। অহিংসাকে দুর্বলের অস্ত্র হিসাবে কখনই কল্পনা করা হয়নি। অহিংসা সবলের অস্ত্র।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৩১-১২-'৩১]

সর্বপ্রকার হিংসাই নিন্দার্হ এবং সর্বতোভাবে ধিক্কারযোগ্য। কিন্তু তবুও অহিংসার পূজারীর আক্রমণকারী ও আক্রান্তের মধ্যে প্রভেদ করবার অধিকার আছে। এমনকি, কর্তব্যের অঙ্গ হিসাবেই তিনি তা করবেন এবং অহিংস পন্থায়, আক্রান্তের সাহায্যার্থ অগ্রণী হবেন। অর্থাৎ, তাকে বিপন্মুক্ত করতে নিজের জীবন সমর্পণ

করবেন। সম্ভবতঃ তাঁর হস্তক্ষেপেই বিবাদের নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে এবং বিবদমান ব্যক্তিদের মধ্যে শান্তি ফিরে আসবে।

[হরিজন, ২১-১০-'৩৯]

যুদ্ধ যদি সর্বথা অবৈধ কাজ হয় তবে নৈতিক সমর্থন বা আশীর্বাদ পাবার যোগ্যতা তার কোথায়? আমি বিশ্বাস করি, সর্বপ্রকার যুদ্ধই সর্বতোভাবে অবৈধ, কিন্তু বিবদমান পক্ষ দুইটির অভিসন্ধি বিশ্লেষণ করলে আমরা একজনকে ঠিক এবং অপরকে বেঠিক দেখতে পাব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, "ক" যদি "খ"-এর দেশ দখল করতে তোড়জোড় করে তবে স্পষ্টতঃ "খ"-ই উৎপীড়িত। উভয়েই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে। আমি সশস্ত্র যুদ্ধবিগ্রহে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তবুও "খ"—ন্যায় যার পক্ষে —সে আমার নৈতিক সমর্থন ও আশীর্বাদ পাবার যোগ্য।

[হরিজন, ১৮-৮-'৪০]

সমালোচকগণ বলতে পারেন যে, মিত্রপক্ষকে এভাবে সাহায্য করবার ফলে আমারও হিংসায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। তাঁদের এ সমালোচনা যুক্তিসঙ্গত হত যদি সাহায্যের ধরন ভিন্নপ্রকার হত, কিন্তু বৃটেন অতিরিক্ত যে সহায়তা কংগ্রেস থেকে লাভ করবে সে হবে সম্পূর্ণরূপে নৈতিক সহায়তা। কংগ্রেস ধনও দেবে না, জনও দেবে না, তার নৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করবে শান্তির স্বপক্ষে। আমি আগেই বলেছি, আক্রমণ এবং প্রতিরোধ—হিংসার এই শ্রেণীভেদ আমার অহিংসা স্বীকার করে। এ কথা খুবই সত্য যে, এই আপাত-শ্রেণীভেদ পরিণামে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। কিন্তু প্রাথমিক গুণাবলী তবুও সজীব থাকে। ন্যায় কোন্ পক্ষে, একজন অহিংসাবাদী প্রয়োজনের সময় সে কথা স্পষ্ট করে বলতে বাধ্য। সুতরাং আবিসিনিয়া, স্পেন, চেক্, চীন এবং পোলাণ্ডবাসীর সফলতা আমি কামনা করি, যদিও অহিংস প্রতিরোধ সংগঠন করতে তারা সমর্থ হোক, এই আমার কামনা। বর্তমান ক্ষেত্রে মিঃ চেম্বারলেনের যুক্তির ভিত্তিতে বৃটেনের আচরণ যদি কংগ্রেস ন্যায়সঙ্গত মনে করে, তা'হলে স্বাধীনতা লাভ করলে ভারতবর্ষ তার সকল নৈতিক শক্তি শান্তির স্বপক্ষে প্রয়োগ করবে। এতে আমি যে অংশগ্রহণ করেছি, আমার দৃষ্টিতে তা সর্বতোভাবেই অহিংস।

[হরিজন, ৯-১২-'৩৯]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অহিংস সেনাবাহিনী

কি শান্তির সময়, কি দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়—কোনও অবস্থাতেই অহিংস সেনা-বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীর পদ্ধতি অনুকরণ করে না। তাঁরা নিরন্তর গঠনমূলক কাজে লেগে থাকেন, ফলে দাঙ্গাহাঙ্গমা বাধবারই সুযোগ থাকে না। তাঁদের কাজ হল সুযোগ

পেলেই বিবদমান পক্ষগুলিকে একত্র করা, শান্তির বাণী প্রচার করা, মহল্লা এবং পল্লীর প্রত্যেকটি নরনারী, যুবা বৃদ্ধ এবং শিশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এমন কল্যাণকর কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকা। এরূপ সেনাবাহিনী সর্বরকম জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকবে এবং উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করতে পরাঙ্মুখ হবেন না। কয়েক শত, হয়তো বা কয়েক হাজার প্রাণের এই নির্বিকার আত্মবলিদান চিরতরে দাঙ্গাহাঙ্গামার অবসান ঘটাবে। পুলিস ও সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা উন্মত্ত জনতার মুখে কয়েকশত যুবকযুবতীর স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান এই ধরনের উন্মত্ততাকে শান্ত করবার সহজতর ও বীরোচিত পন্থা বলে একদিন অতি অবশ্য স্বীকৃতি পাবে।

[হরিজন, ২৬-৩-'৩৮]

প্রশ্ন : এই আদর্শ রাষ্ট্র (আদর্শ রাষ্ট্র যে তাতে কোনই সন্দেহ নেই) বহিরাক্রমণ যে এড়াতে পারবে সে বিষয়ে কী নিশ্চয়তা আছে? যন্ত্রযুগের উপযোগী আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত আধুনিক সৈন্যবাহিনী যদি রাষ্ট্রের না থাকে তবে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আক্রমণকারী যে-কোনও বাহিনী এই রাষ্ট্রকে দখল করে তার অধিবাসীদের পদানত করবে না কি?

উত্তর : প্রশ্নকারী সামরিক বাহিনীর একজন সদস্য, বলছেন আমার প্রবন্ধটি তিনি সতর্কতার সঙ্গে বারবার পড়েছেন এবং তাঁর ভালও লেগেছে। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্যটি তিনি ধরতে পারেন নি। অর্থাৎ একটি জাতি অথবা একটি গোষ্ঠী যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, এমনকি একক ব্যক্তিও, যদি একপ্রাণ একমন ও একনিষ্ঠ হয়, তবে উদ্যতঅস্ত্র সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধেও নিজের গৌরব, নিজের সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। নিরস্ত্রের অতুলনীয় শৌর্য এবং বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে এরই মধ্যে। এটাই অহিংস প্রতিরোধ, কোন অবস্থাতেই যা পরাজয় জানে না বা স্বীকার করে না। সুতরাং অহিংসাকে চূড়ান্তনীতিরূপে গ্রহণ করেছেন এমন কোনও জাতি বা গোষ্ঠী কোন অবস্থাতেই পরাজিত ও পদানত হতে পারে না—এটম বোমা দ্বারাও না।

[হরিজন, ১৮-৮-'৪৬]

প্রশ্ন : আধুনিক একটি রাষ্ট্রের পক্ষে (সামরিক বলের উপরেই মূলতঃ যা প্রতিষ্ঠিত) অহিংস প্রতিরোধ সংগঠন করে বিশৃংখলাসৃষ্টিকারী আভ্যন্তরীণ অথবা বহিঃরাষ্ট্রীয় শক্তি প্রতিহত করা সম্ভব কি?

উত্তর : না। আধুনিক রাষ্ট্র, যার স্থায়িত্ব হিংসার উপরই নির্ভরশীল, অহিংস পদ্ধতিতে বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী শক্তিকে প্রতিহত করতে পারবে না, তা সে শক্তি আভ্যন্তরীণই হোক অথবা বহিঃরাষ্ট্রীয়ই হোক। কোন ব্যক্তিই ঈশ্বর এবং দানব উভয়কেই যুগপৎ পূজা করতে পারে না—একইসঙ্গে সংযত ও ক্রোধান্ধ হতে পারে না।

প্রশ্ন : প্রতিপক্ষ অহিংসার পূজারী, এই সংবাদ উৎপীড়ককে কি উৎসাহিত করে না?

উত্তর : দুর্বলের অহিংসার সম্মুখীন হয়ে উৎপীড়নকারী সুবিধা পেতে পারে, কিন্তু বলবানের অহিংসা সকল অবস্থাতেই সমরাস্ত্রে নিপুণভাবে সজ্জিত যে কোন সাহসী সৈনিক এমনকি পুরা একটি সৈন্যদল অপেক্ষাও অধিক বলশালী।

প্রশ্ন : সামরিক শক্তিতে দুর্বলের চাইতে সামরিক বলে বলীয়ানের অহিংস প্রতিরোধ অধিক কার্যকর নয় কি?

উত্তর : শব্দগত ভাবেই এটা পরস্পরবিরোধী। সামরিক শক্তিতে শক্তিমানের পক্ষে অহিংসার প্রয়োগই সম্ভব নয়। তাই রাশিয়া অহিংসার প্রসার করতে চাইলে তার হিংসা করবার সকল ক্ষমতা তাকে বর্জন করতে হবে। আসল কথা হল, যাঁরা আজ সামরিক বলে বলীয়ান তাঁরা যদি নিজেদের মনের পরিবর্তন করেন তবেই তাঁরা সুন্দরভাবে জগতের সামনে এবং তাঁদের প্রতিপক্ষের কাছেও অহিংসার উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন।

[হরিজন, ১২-৫-'৪৬]

"পোড়ামাটী নীতি"

আক্রমণ অথবা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস করবার মধ্যে আমি বীরত্ব অথবা ত্যাগের কোনই নিদর্শন খুঁজে পাই না। আমার গৃহ, আমার শস্য-ভাণ্ডার যদি আমাকে ছেড়ে যেতেই হয় শত্রুর ভোগের জন্যই তা ছেড়ে যাব, তবুও সে সবের ভোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে সেগুলো ধ্বংস করে যাব না। এইভাবে আমার গৃহ ও শস্যভাণ্ডার ছেড়ে যাওয়া যুক্তি, ত্যাগ, এমনকি সাহসেরও পরিচায়ক হবে যদি কাউকেই শত্রু ভাবতে আমি রাজি নই, এই মনোভাব থেকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানবীয় প্রবৃত্তি থেকে এ কাজ করি, ভয়বশতঃ নয়!

[হরিজন, ২২-৩-'৪২]

কুয়োর জলে বিষ মিশিয়ে অথবা কুয়োটাকে বুজিয়ে আমার যে ভাই আমার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তাকে জল ব্যবহার না করতে দেবার মধ্যে কোনই বীরত্ব নেই। ধরা যাক, চিরাচরিত পদ্ধতিতেই আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করছি। এর মধ্যে ত্যাগ বৃত্তির কোনই স্থান নেই। কারণ এই যুদ্ধ আমার হৃদয় পরিশুদ্ধ করে না, আর পরিশুদ্ধিই ত্যাগবৃত্তির মূল কথা। এরূপ ধ্বংসকার্য নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের সমতুল। পুরাকালের যোদ্ধাদের একটা সুস্থ সমরনীতি ছিল। কুয়োতে বিষ মেশানো কিংবা খাদ্যশস্য ধ্বংস করা নীতিবহির্ভূত ছিল। কিন্তু আমার কুয়ো, শস্যভাণ্ডার এবং আমার বাড়ি অক্ষত অবস্থায় রেখে যাওয়া আমার পক্ষে অবশ্যই সাহস এবং ত্যাগের পরিচায়ক বলে আমি বিশ্বাস করি। সাহসের পরিচায়ক এইজন্য যে, আমারই খেয়ে আমার পশ্চাদ্ধাবন করবার সুযোগ আমি শত্রুকে জেনে-শুনেই করে দিচ্ছি। এবং ত্যাগের পরিচায়ক এই কারণে যে, শত্রুর জন্য কিছু রেখে

যাওয়ার মধ্যে যে সংবেদনশীল চিত্তবৃত্তির প্রকাশ তা আমার মনকে পরিশুদ্ধ করে, আমাকে মহৎ করে।

[হরিজন, ১২-৪-'৪২]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আন্তঃরাষ্ট্রীয় দস্যুবৃত্তি

দস্যুভাবাপন্ন দেশগুলিকে নিয়ে কী করা যায়? দস্যুভাবাপন্ন বলছি এই কারণে যে, এই রীতিতেই সচরাচর তাদের অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমেরিকায় ব্যক্তিগত দস্যুবৃত্তি ছিল। তাকে স্থানীয় এবং জাতীয় কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা দিয়ে দমন করা সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও কি আমরা অনুরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি না? যেমন, মাঞ্চুরিয়ার ঘটনায় জঘন্য আফিম প্রয়োগের ব্যাপারে আবিসিনিয়ার, স্পেনে, আকস্মিক বলপূর্বক অস্ট্রিয়া দখলের ব্যাপারে এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনায়? পৃথিবীর ভাল লোকেরা যদি অহিংসার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হন তবে প্রচলিত পদ্ধতিতেই তাঁদের দস্যুবৃত্তির মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু তাতে প্রমাণিত হবে যে, বন্য নিয়মকে অতিক্রম করে আমরা এখনও বেশী দূর অগ্রসর হতে পারিনি; আমরা যে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী তা এখনও উপলব্ধি করিনি। যীশুখৃষ্টের শিক্ষা ১৯০০ বছরের প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও ততোধিক প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা, এমনকি ইসলামের শিক্ষা (সঠিকভাবে যদি আমি অধ্যয়ন করে থাকি) সত্ত্বেও মানুষ হিসাবে উল্লেখযোগ্য কোনই অগ্রগতি এখনো আমাদের হয়নি। অহিংসায় যাদের আস্থা নেই হিংসার পথই যে তারা বেছে নেবে সে আমি বুঝি, কিন্তু অহিংসায় আস্থাশীল যাঁরা, আমি চাই সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে তাঁরা প্রমাণ করুন দস্যুবৃত্তির অবসানও অহিংসার দ্বারা ঘটানো সম্ভব। কারণ হিংসার প্রয়োগ যত ন্যায়সঙ্গত কারণেই হোক না কেন, হিটলার ও মুসোলিনীকে তা যে আবর্তে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পরিণামে আমাদেরও সেইখানে নিয়ে যেতে বাধ্য; পার্থক্য যেটুকু থাকবে তা কেবল পরিমাণের। আমরা যাঁরা অহিংসায় বিশ্বাসী, সংকটকালে অবশ্যই আমরা তা প্রয়োগ করে দেখব। দর্বৃত্তের হৃদয় স্পর্শ করতে না পারলেও আমরা নিরাশ হব না, এমনকি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের গায়ে বৃথাই মাথা খুঁড়ে মরছি মনে হলেও না।

[হরিজন, ১০-১২-'৩৮]

অহিংস দৃষ্টিকোণ থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আমি অবশ্যই বলব, চীনের ন্যায় বিরাট্ ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ, লোকসংখ্যাও যার চল্লিশ কোটি, তার পক্ষে জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করতে সেই একই জাপানী পদ্ধতি অনুকরণ করা অসংগত। আমার কল্পিত অহিংসায় চীন বিশ্বাস স্থাপন করলে জাপানের সর্বাধুনিক

মারণাস্ত্রগুলিও অকেজো হয়ে পড়বে, তখন চীন জাপানকে বলতে পারবে "নিয়ে এসো তোমার সমস্ত মারণাস্ত্র, আমাদের অর্ধেক লোকবল তোমাদের উপঢৌকন দিচ্ছি, কিন্তু বাকী বিশ কোটি দেশবাসী তোমাদের কাছে কখনই নতি স্বীকার করবে না।" চীন যদি তা করে জাপানই তবে চীনের পদানত হবে।

[হরিজন, ২৪-১২-'৩৮]

সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে, শক্তিতে এবং সংখ্যায় জার্মান আক্রমণকারীদের বিপুল প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও পোলাণ্ডের অধিবাসীরা যেরূপ বীরত্বসহকারে তাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা প্রায় অহিংসারই সামিল। বার বার এ কথা বলতেও আমি দ্বিধাবোধ করি না। "প্রায়" শব্দটিকে সঠিক অর্থেই আপনারা গ্রহণ করবেন আশা করি। ভারতবর্ষে আমরা চল্লিশ কোটী লোক বাস করি। বিপুল এক সামরিক বাহিনী গঠন করে আমরা যদি বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য প্রস্তুত হই তবে সম্পূর্ণ অহিংসা ত দূরের কথা প্রায়-অহিংস বলেও আমরা নিজেদের কোনমতেই অভিহিত করতে পারব না। পোলাণ্ডের অধিবাসীরা অপ্রস্তুত ছিল। আক্রমণকারী বাহিনী অতর্কিতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সশস্ত্র প্রস্তুতি অর্থে এক হিংসাকে তার চেয়ে আর এক বড় হিংসা দিয়ে পর্যুদস্ত করবার কথাই আমরা বুঝি। এই পদ্ধতিতে ভারতবর্ষ নিজেকে প্রস্তুত করতে চাইলে বিশ্বশান্তির পথে সে এক চরম বিঘ্নস্বরূপ হবে। কারণ এই পথ নিতে হলে ইউরোপের দেশগুলির ন্যায় আমাদেরও শোষণের পথই বেছে নিতে হবে।

[হরিজন, ২৫-৮-'৪০]

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অহিংসার সাধনা

ব্যক্তি এবং জাতিকে কী পদ্ধতিতে এই কঠিন কৌশল শেখানো যায়? একটি জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ স্বীয় জীবনকে আদর্শমণ্ডিত করে তোলা ব্যতীত অন্য বাঁধাধরা সুনির্দিষ্ট পথ নেই। আদর্শ স্বীয় জীবনে মূর্ত করে তুলতে হলেই সর্বপ্রথম আবশ্যক নিরন্তর অনুশীলন, কঠোর অধ্যবসায়, সর্বতোভাবে মনকে ক্লেদমুক্ত করা। বস্তুবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করতে যদি একটা সমগ্র জীবন কেটে যায় তবে মনুষ্যজীবনের এই পরম আকাঙ্ক্ষিত অধ্যাত্মজ্ঞান অর্জন করতে জন্ম-জন্মান্তরের কত না তপস্যার দরকার! যদি কয়েক জন্মেরই দরকার হয় তাতেই বা দুঃখ কী? কারণ এই অধ্যাত্মজ্ঞানই যদি জীবনের একমাত্র অভীষ্ট চিরসত্য হয় তবে তাকে লাভ করতে যত শক্তিই নিয়োজিত করা যাক না কেন তা সার্থক। "স্বর্গরাজ্যের অনুসন্ধান কর তাহলে সব কিছুই তুমি পেয়ে যাবে।" অহিংসাই এই স্বর্গরাজ্য।

[হরিজন, ১৪-৩-'৩৬]

অহিংসার সাধনায় অস্ত্রের কোন আবশ্যকতাই নেই, বস্তুতঃ অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকলে সেগুলোকে ফেলে দিতে হবে, সীমান্ত প্রদেশে যেমন খান সাহেব করেছেন। যাঁরা মনে করেন অহিংসায় ক্ষমতা অর্জন করতে হলে আগে হিংসার সাধনা দরকার তাঁদের মানতে হবে যে পাপীরাই কেবলমাত্র ধার্মিক হতে পারে। হিংসায় শিক্ষানবিশী যেমন মারতে শেখায় অহিংসায় শিক্ষানবিশী তেমনি মরতে শেখায়। হিংসা মানুষকে ভয়মুক্ত করে না, ভীতির কারণ দূর করবার উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করে মাত্র। পক্ষান্তরে অহিংসায় ভীতির কোন কারণ থাকতে পারে না। অহিংসার পূজারীকে ভয়মুক্ত হবার জন্য অপরিসীম আত্মত্যাগের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। তাকে যদি ভূসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়, সম্পদ্ খোয়াতে হয়, জীবন হারাতে হয়, সে গাহ্যই করে না। সর্বপ্রকার ভয়কে যে জয় করেনি সে কখনও অহিংসার যথার্থ প্রয়োগ করতে সক্ষম নয়। অহিংসার পূজারীর ভয় করবার একটি মাত্রই স্থান আছে—সে হচ্ছেন ভগবান। যিনি ভগবানে আশ্রয় নিতে চান দেহাতীত আত্মায় তাঁর সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং অবিনশ্বর এই আত্মার দর্শন যে মুহূর্তে তিনি লাভ করেন সেই মুহূর্তেই নশ্বর এই দেহের প্রতি তাঁর সকল আসক্তির অবসান ঘটে। অহিংসার সাধনপথ এইজন্য হিংসার সাধনপথের সম্পূর্ণ বিপরীত। হিংসার আবশ্যকতা বাহ্যবস্তুর সংরক্ষণে, কিন্তু আত্মা তথা আত্মসম্ভ্রমের সংরক্ষণ হয় অহিংসায়।

ঘরে বসে থেকে অহিংসার সাধনা হয় না, এর জন্য প্রয়োজন উদ্যমের। প্রয়োজন মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে বিপদসঙ্কুলতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, কঠোর দৈহিক সংযম অভ্যাস করা এবং সর্বপ্রকার ক্লেশ সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করে নিজেদের যাচাই করে নেওয়া। দুজনকে মারামারি করতে দেখেই যে ভয়ে কাঁপে অথবা পালিয়ে যায় সে অহিংস নয়—কাপুরুষ। অহিংসার পূজারী যিনি তিনি এই ধরনের মারামারি থামিয়ে দিতে প্রাণপাত করেন। অহিংস ব্যক্তির সাহসিকতা হিংস্র ব্যক্তির সাহসিকতা অপেক্ষা বহুগুণ শ্রেয়ঃ। হিংসাশ্রয়ীর অবলম্বন তার অস্ত্র, বল্লম, তরবারি অথবা বন্দুক; অহিংসের ধর্ম তার ভগবান।

উপরে যে সব কথা বলা হল তা অহিংসা শিক্ষার্থীর কোন শিক্ষাক্রম নয়। তবে যে নীতিগুলোর উল্লেখ করলাম তা থেকে সহজেই একটি শিক্ষাক্রম তৈরী করা সম্ভব।

[হরিজন, ১-৯-'৪০]

নবম পরিচ্ছেদ

অহিংস প্রতিরোধ

প্রেসিডেণ্ট বেনেসের উদ্দেশে পরামর্শ

[মিউনিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি গ্রেট বৃটেন ও ফরাসী দেশের কলঙ্কজনক বিশ্বাসঘাতকতার পরেই ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের শেষার্ধে হিটলারের নাৎসী বাহিনী যখন সেই অসহায় দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে পদানত করে, গান্ধীজী তখন হরিজনে "আমি যদি একজন চেক্ হতাম" শীর্ষক এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন।]

বৃটিশ অথবা ফরাসীদেশের নেতৃবৃন্দের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ করবার উদ্দেশ্যে হিটলারের সঙ্গে তাঁদের এই বন্দোবস্তকে আমি "সম্ভ্রমহীন শান্তি" বলে আখ্যা দিইনি। আমার কোনই সন্দেহ নেই যে মিঃ চেম্বারলেনের এর চাইতে উৎকৃষ্টতর আর কিছু করণীয় ছিল না। তিনি তাঁর জাতির সীমিত ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কোনক্রমে যুদ্ধকে এড়ানো সম্ভব হলে, তিনি তা এড়াতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধে জড়িয়ে পরা ছাড়া বাকী সবকিছুতেই সর্বান্তঃকরণে চেক্‌দের তিনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও যে মর্যাদা রক্ষা পেল না সে তাঁর দোষ নয়; হের হিটলার অথবা সিনর মুসোলিনীর সঙ্গে যতবারই বিবাদ হবে বরাবর এমনিই হবে।

এ না হয়েই পারে না। রক্তপাতে গণতন্ত্র ভয় পায় কিন্তু এই একনায়কদ্বয় যে দর্শনের অনুগামী সেখানে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকাই কাপুরুষতা। সম্মিলিত হত্যাকাণ্ডের গৌরবগাথায় কাব্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করাই তাদের রীতি। তাদের কথা ও কাজে ছলনা নেই। যুদ্ধের জন্য তারা সর্বদাই প্রস্তুত। সমগ্র জার্মানীতে ও ইতালীতে তাদের প্রতিবাদ করতে পারে এমন একজনও নেই; তাদের কথাই আইন।

মিঃ চেম্বারলেন অথবা মিঃ ডালাডিয়ারের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব নয়। সেখানে পার্লামেণ্ট আছে, বিভিন্ন সমিতি আছে, সে-সবের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে যাদের পরামর্শ নিতে হয়। এই গণতান্ত্রিক ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে সর্বক্ষণ যুদ্ধপ্রস্তুতিতে তাঁরা লিপ্ত থাকতে পারেন না।

যুদ্ধবিজ্ঞান নিরঙ্কুশ একনায়কতন্ত্রের পথে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র অহিংস বিজ্ঞানই প্রকৃত গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকাকে তাদের পথ বেছে নিতে হবে। এই একনায়কদ্বয়ও তাদের কাছে সেই আহ্বানই জানাচ্ছে।

রাশিয়া এখনও রঙ্গমঞ্চে অনুপস্থিত। সেখানেও একনায়ক আছেন। তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং মনে করেন রক্তসমুদ্রে পথ কেটে তিনি তা রূপায়িত করবেন। রাশিয়ার একনায়কত্ব পৃথিবীতে কিসের সূচনা করবে এখনই তা বলা শক্ত।

চেক্ এবং তাদের উপলক্ষ করে ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিরূপে অভিহিত সকল রাষ্ট্রের কাছে আমার বক্তব্য উত্থাপনের পূর্বে এই প্রস্তাবনার প্রয়োজন ছিল।

চেক্‌দের আমি বলতে চাই, কারণ তাদের ভাগ্যবিপর্যয় আমাকে দৈহিক ও মানসিক বিপর্যয়ের স্তরে নিয়ে এসেছে এবং আমার বিশ্বাস আমার মধ্যে যে চিন্তাগুলো জন্ম নিচ্ছে তাদের সঙ্গে সেগুলোর বিচারবিনিময় না করলে আমার পক্ষে কাপুরুষতা হবে। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলিকে একনায়কগণের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতেই হবে নতুবা তারা ইউরোপের শান্তির স্থায়ী প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়াবে। সমগ্র রাশিয়ার শুভেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইংলন্ড এবং ফ্রান্স তাদের রক্ষা করতে পারবে না। তাদের হস্তক্ষেপ পৃথিবীর বুকে এযাবৎ-অভূতপূর্ব রক্তপাত আর ধ্বংসই কেবল ডেকে আনবে। আমি যদি চেক্‌ হতাম তবে আমার দেশকে রক্ষা করাবার দায়িত্ব থেকে এই দুই দেশকে অব্যাহতি দিতাম, নিজের শক্তিতে বেঁচে থাকতে উদ্যোগী হতাম। কোনও দেশ বা জাতিরই দাসত্ব বরণ করতাম না। হয় পূর্ণ স্বাধীন হতাম, না হয় নিজেকে নিঃশেষ করে দিতাম। অস্ত্রের সংঘাতে বিজয়লাভের বাসনা নিছক দম্ভের পরিচায়ক।...

কিন্তু একজন প্রশ্ন করেছেন, "করুণা যে কী বস্তু হিটলার তা জানে না। আপনার আধ্যাত্মিকতা হিটলারের সম্মুখে কোন কাজেই লাগবে না।"

আমার উত্তর হল: "সম্ভবতঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। কোনও দেশ অহিংস প্রতিরোধ সংগঠন করেছে বলে ইতিহাসে কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। আমার দুঃখভোগে হিটলার যদি বিচলিত না হয় তাতে কিছুই যায় আসে না, কারণ তার ফলে অমূল্য কিছুই হারাব না। আমার আত্মসম্ভ্রমই একমাত্র সংরক্ষণযোগ্য সম্পদ্‌। সেটা হিটলারের করুণার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অহিংসার পূজারী হয়ে অহিংসার সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকা উচিত নয়। হিটলার এবং তার সতীর্থেরা তাদের অকাট্য অভিজ্ঞতা থেকে জেনে এসেছে যে, মানুষ জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করে। অস্ত্রহীন নর-নারী-শিশু মনে কোনওরূপ বিদ্বেষ না নিয়ে অহিংস প্রতিরোধ সংগঠন করলে তা থেকে তারা আর এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করবে। আরও সূক্ষ্মতর ও মহত্তর কোন শক্তির প্রতিক্রিয়া তাদের উপর যে হবেই না, কে সে কথা জোর করে বলতে পারে? আমারই ন্যায় তাদেরও আত্মা আছে।"

আর একজন প্রশ্নকর্তা বলেছেন, "যা আপনি বলেছেন তা আপনার ক্ষেত্রে খাটে। কিন্তু আপনি কোন্‌ আশায় আপনার দেশবাসীর কাছ থেকে এই অভিনব আহ্বানে সাড়া পাবার প্রত্যাশা করেন? যুদ্ধবিদ্যায় তারা পারদর্শিতা অর্জন করেছে, ব্যক্তিগত শৌর্যে তারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। এই অবস্থায় তাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে এখন অহিংস প্রতিরোধে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলা আমার মনে হয় আপনার ব্যর্থ প্রয়াস।"

"আপনি হয়ত ঠিকই বলেছেন, কিন্তু আমার অন্তরের আহ্বানে আমাকে সাড়া দিতেই হবে। আমার বক্তব্য আমার দেশবাসীকে আমায় বলতেই হবে। এই অপমানকর পরিস্থিতি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে, চুপ করে থাকা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। যে আলো আমি দেখতে পাচ্ছি আর কেউ তাতে সাড়া না দিলেও অন্ততঃ আমি তাকে অনুসরণ করবই।

"আমি চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসী হলে আমার বিশ্বাস এই আমি করতাম।



বোম্বাইয়ে প্রার্থনাসভায় (১৯৪৪)

প্রথম যখন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করি তখন আমার কোন সাথী ছিল না। আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব মুছে দিতে সক্ষম একটি সমগ্র রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমরা স্ত্রী পুরুষ ও শিশু মিলিয়ে সংখ্যায় ছিলাম মাত্র তের হাজার। আমি জানতাম না কারা আমার অনুসরণ করবেন। সব কিছুই আকস্মিক তাড়িৎপ্রবাহের মত ঘটে গেল। এই তের হাজার লোকই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল এমন নয়। অনেকে পিছিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জাতীয় গৌরব রক্ষিত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ এক নূতন ইতিহাস রচনা করেছিল।

"খান আবদুল গফ্ফর খান—নিজেকে যিনি ঈশ্বরের দাস বলে জানেন, পাঠানরা যাঁকে আদর করে "পাঠান-গৌরব" বলে ডাকেন—তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা সম্ভবতঃ আরও গৌরবোজ্জ্বল। আমি যখন এই কথা লিখছি তিনি তখন আমার সামনেই বসে রয়েছেন। তিনি তাঁর অনেক সশস্ত্র অনুচরদের অস্ত্রত্যাগ করিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন তিনি অহিংসায় দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর অনুচরদের সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। আমি সীমান্ত প্রদেশে এসেছি। তিনি আমায় ডেকে এনেছেন এখানে তাঁর অনুচরবৃন্দ কী করছেন স্বচক্ষে দেখবার জন্য। আমি এখনই অগ্রিম বলতে পারি অহিংসা সম্বন্ধে এদের জ্ঞান খুবই পরিমিত। তাদের একমাত্র সম্পদ্ নেতার প্রতি তাদের গভীর আস্থা। এই শান্তি-সেনাদলকে আমি শান্তি-সৈনিকের একটি নিখুঁত নিদর্শনস্বরূপ উপস্থাপিত করছি না, একজন সৈনিকের তার সহযোগী সৈন্যদের পরিবর্তিত করে শান্তির পথে নিয়ে যাবার এক সাধু প্রচেষ্টা হিসাবে উপস্থাপিত করছি মাত্র। আমি জোর করে বলতে পারি যে, এ এক মহৎ প্রচেষ্টা এবং পরিণামে সফলতা বিফলতা যাই আসুক না কেন ভবিষ্যৎ-কালের সত্যাগ্রহীদের জন্য এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে যাবে। আমার উদ্দেশ্য তখনই সফল হবে যখন আমি এই মানুষগুলির অন্তর স্পর্শ করতে পারব এবং বোঝাতে পারব যে, অস্ত্রের অধিকার এবং তা ব্যবহারের ক্ষমতা তাদের যত সাহস যোগায়, তাদের অহিংসা তাদের তার চেয়েও যদি বেশী নির্ভীক না করে থাকে তবে এই অহিংসা তাঁরা যেন পরিত্যাগ করেন। কারণ এই অহিংসা কাপুরুষতারই নামান্তর। তারা যেন পুনরায় অস্ত্র ধারণ করেন। তাদের নিজেদের ইচ্ছা ছাড়া কেউ তাদের বাধা দেবার নেই।

"ডাঃ বেনেসকে আমি এক বলবানের অস্ত্র উপহার দিচ্ছি, দুর্বলের নয়। মনে কোনওরূপ বিদ্বেষ না নিয়ে, একমাত্র আত্মাই অমর এই পূর্ণ বিশ্বাসসহকারে পার্থিব শক্তি, তা যত ক্ষমতসম্পন্নই হোক না কেন, তার কাছে নতজানু হতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করার চাইতে বড় সাহসিকতা আর কিছু নেই।"

[হরিজন, ১৫-১০-'৩৮]

খোদাই খিদমদগারের নিষ্ঠাপত্র

ভর্তি হবার আগে প্রত্যেক খোদাই খিদমদগার যে নিষ্ঠাপত্রে স্বাক্ষর করেন এখানে তার সরল অনুবাদ দেওয়া গেল :

ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি সর্বান্তঃকরণে প্রতিজ্ঞা করছি যে :—

১। এতদ্দ্বারা আমি খোদাই খিদমদগারে ভর্তি হবার জন্য সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেকে উৎসর্গ করছি।

২। জাতির সেবায় ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনে আমি সর্বদাই ব্যক্তিগত সুখ, সম্পদ্ ত্যাগ করতে, এমনকি জীবনপাত করতেও প্রস্তুত থাকব।

৩। আমি দলাদলিতে অংশগ্রহণ করব না। কারও সঙ্গে বিবাদ করব না, কারও প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হব না। অত্যাচারীর কবল থেকে সর্বদাই অত্যাচারিতকে রক্ষা করব।

৪। আমি অপর কোন সংগঠনের সভ্য হব না এবং অহিংস আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছি বলে কখনই জামিন দেব না অথবা ক্ষমা চাইব না।

৫। আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ন্যায়সঙ্গত আদেশ আমি সর্বদা পালন করব।

৬। আমি সর্বদা অহিংসার আদর্শে জীবনযাপন করব।

৭। আমি সকল মানুষকে সমভাবে সেবা করব, পূর্ণ স্বরাজ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করাই হবে আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৮। আমার সকল কর্মে আমি সর্বদা সত্য ও শুদ্ধতাকে বজায় রাখব।

৯। সেবার বিনিময়ে আমি কোন মূল্যের প্রত্যাশা করব না।

১০। আমার সকল কর্ম ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করব। পদমর্যাদা অথবা বাহবা পাবার লোভে কোন কাজ করব না।

[হরিজন, ১৫-১০-'৩৮]

হিংসা বনাম কাপুরুষতা

আমার অহিংসা বিপদের সময় প্রিয়জনদের অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে পলায়ন করতে বলে না। হিংসা এবং কাপুরুষের মত পলায়নের মধ্যে কাপুরুষতার চাইতে হিংসাকে বরং আমি বরণ করব। মনোরম দৃশ্য দেখতে অন্ধকে প্রলুব্ধ করা যেমন অসম্ভব তেমনি কাপুরুষের কাছে অহিংসার কথা বলাও নিরর্থক। অহিংসাই সাহসিকতার সর্বোত্তম প্রকাশ। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও আমি দেখেছি হিংসায় দীক্ষিত ব্যক্তিদের সামনে অহিংসার উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা করতে কোনই বেগ পেতে হয়নি। বহু বছর ধরে আমি কাপুরুষ ছিলাম, সে সময় মনে হিংসা পোষণ করতাম। কাপুরুষতা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অহিংসার মূল্যও বুঝতে শিখেছি। বিপদের সম্ভাবনায় যে সকল হিন্দু কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করে পলায়ন করেছেন তাঁরা অহিংস অথবা প্রতিহিংসাপরাঙ্মুখ বলে তা করেননি—মৃত্যুকে তাঁরা ভয় পান, এমনকি আঘাত সহ্য করতেও তারা পরাঙ্মুখ তাই পলায়ন করেন। খরগোস বুলটেরিয়ার কুকুরের তাড়া খেয়ে যখন পালায়, অহিংস বলে পালায় না। কুকুরকে দেখেই সে ভয়ে কেঁপে ওঠে এবং প্রাণভয়ে দৌড়োয়।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৯-৫-'২৪]

দশম পরিচ্ছেদ

সত্যাগ্রহের প্রক্রিয়া

বিজেতার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, এই অনুজ্ঞার অর্থ বিবেকবিরোধী কাজ করতে তুমি অস্বীকার করবে। ধর, তোমার শত্রু তোমাকে আদেশ করল—নাকে খত দিতে বা কানমলা খেতে অথবা ওই ধরনের আরও নানা অপমানকর কাজ করতে। তুমি কখনই সে সব অপমানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না। কিন্তু সে যদি তোমার সম্পদ্ আত্মসাৎ করে তুমি তার বিরোধ করবে না কারণ অহিংসার পূজারী হয়ে প্রারম্ভেই তুমি স্থির জেনেছ যে, তোমার আত্মা তোমার পার্থিব সম্পদের প্রভাবমুক্ত। তোমার নিজস্ব যা কিছু, ততদিনই তোমার নিজের যতদিন সমাজ সেগুলি তোমাকে ভোগ করতে দেয়।

মনকে বশ্যতা স্বীকার করতে দেবে না,—তার অর্থ লোভের বশবর্তী হবে না। মানুষ স্বভাবতঃই দুর্বলচিত্ত, সহজেই মিষ্ট কথা এবং লোভের ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমাদের সামাজিক জীবনে অহরহ আমরা এরূপ ঘটতে দেখেছি। দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি কখনও সত্যাগ্রহী হতে পারে না। সত্যাগ্রহীর "না" অপরিবর্তনীয়রূপেই "না" এবং "হাঁ" সর্বতোভাবেই "হাঁ"। এইরূপ ব্যক্তিই কেবল সত্য ও অহিংসার পূজারী হবার যোগ্য। কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের এবং একগুঁয়েমির মধ্যে যে প্রভেদ আছে সে কথা স্মরণ রাখতে হবে। "হাঁ" অথবা "না" বলা হয়ে গেছে বলেই ভুল জেনেও তাকেই আঁকড়ে থাকা একগুঁয়েমি ও নির্বুদ্ধিতা। কোনও নির্ণয়ে পৌঁছোবার পূর্বেই সযত্নে খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিষয়েই বিচার করে দেখা দরকার।

আনুগত্য অস্বীকার করবার অর্থ সুস্পষ্ট। বিজেতার আধিপত্যের কাছে নতি স্বীকার না করা, তাকে অভীষ্টলাভে সাহায্য না করা। হের হিটলার বৃটেন দখলের কল্পনাও কখনো করেনি। বৃটেনকে পরাজয় স্বীকার করাতে চেয়েছে। বিজিতের কাছে বিজয়ী যা-খুশী দাবি করতে পারে এবং বিজিত তা পূরণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রতিপক্ষ পরাজয় মেনে না নিলে তাকে সম্পূর্ণ নিধন না করা অবধি শত্রুপক্ষ ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু একজন সত্যাগ্রহী তো দৈহিক অর্থে মরবার পূর্বেই মৃত, কারণ দেহের প্রতি তার আসক্তি নাই, আত্মাই তার সর্বস্ব। সুতরাং, এই দৃষ্টিতে—আগেই যখন সে 'মৃত' তখন অপরকে কেন তার মারবার প্রবৃত্তি হবে? মেরে মরা প্রকৃতপক্ষে পরাজয় বরণ করেই মরা। কারণ জীবন্ত অবস্থায় শত্রু যদি তোমার কাছে তার দাবি পূরণ করিয়ে নিতে না পারে তবে তোমাকে হত্যা করে সে তা পূরণ করবে। কিন্তু সে যদি বুঝতে পারে যে জীবন গেলেও তার বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করবার সামন্যতম বাসনাও তোমার নেই তবে তোমাকে হত্যা করবার উৎসাহই আর তার থাকবে না। প্রত্যেক শিকারীরই এই অভিজ্ঞতা আছে। কেউ গরু শিকার করে এমন কথা কেউ কোন কালেই শোনেনি।

[হরিজন, ১৮-৮-'৪০]

একাদশ পরিচ্ছেদ

আণবিক বোমা

পৃথিবী আজ এক দারুন বিপর্যয়ের মধ্যে এসে পৌঁছেছে। আমার সত্য ও অহিংসায় কি আমি এখনও বিশ্বাস রাখি? আণবিক বোমাও কি সে বিশ্বাস ধূলিসাৎ করেনি? তা তো করেই নি উপরন্তু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছে যে সত্য ও অহিংসা, এই দুই শক্তিই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ শক্তি। তার সামনে আণবিক বোমাও কিছু নয়। সত্য ও অহিংসা এবং আণবিক বোমা দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি—মৌলিক প্রভেদ রয়েছে উভয়ের মধ্যে। একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক; অপরটি বাহ্যিক ও ভৌতিক। বাহ্যিক ও ভৌতিক যা, তা স্বভাবতঃই ক্ষণস্থায়ী। অপরটি এদের চাইতে সহস্র-গুনে শ্রেষ্ঠ। আত্মশক্তি শাশ্বত ও নিরন্তর প্রগতিশীল। তার পূর্ণাংগ বিকাশ পৃথিবীতে তাকে অজেয় করে। আমি জানি নূতন কথা আমি কিছুই বলছি না। কেবলমাত্র যা-সত্য তাই-ই বলছি। এর আরও বৈশিষ্ট্য হল, স্ত্রী পুরুষ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই এই শক্তি নিহিত রয়েছে। যদিও অধিকাংশের মধ্যেই তা ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু তপস্যায় তাকে জাগানো যেতে পারে।
আরও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই সত্যকে গ্রহণ না করলে এবং তাকে রূপায়ণে সচেষ্ট না হলে আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। প্রতিকারের একমাত্র পথ হল প্রতিবেশীর সাড়া না পেলেও স্বীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আত্ম-উন্নয়নে সচেষ্ট হওয়া।

[হরিজন, ১০-২-'৪৬]

আমেরিকান বন্ধুগণ বলেছেন যে, আণবিক বোমাই পৃথিবীতে অহিংসার প্রতিষ্ঠা করবে---- আর কিছুতেই তা সম্ভব নয়। তা করবে, যদি তাঁরা বোঝাতে চেয়ে থাকেন যে আণবিক বোমার বিধ্বংসকারী ক্ষমতা পৃথিবীকে এতই বিপন্ন করে তুলবে যে সাময়িকভাবে পৃথিবীকে সে হিংসা ত্যাগে বাধ্য করবে। যেমন ভোজনবিলাসী ব্যক্তি সুস্বাদু খাদ্য আকণ্ঠ ভোজন করে ভোজনে সাময়িক বিরতি দেন, পরে অগ্নিমান্দ্য কেটে গেলে দ্বিগুণ উৎসাহে ভোজনে প্রবৃত্ত হন. ঠিক তেমনি ভাবে পৃথিবীত বিরতভাব কিছুটা কেটে গেলে পুনরায় দ্বিগুণ উদ্যমে পৃথিবী হিংসার পথে প্রত্যাবর্তন করবে।

অশুভ থেকে কদাচিৎ কখনও শুভের জন্ম হয়। কিন্তু সে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়, মানুষের তাতে হাত নেই। মানুষ শুধু এইটুকুই জানে যে, অশুভ থেকে অশুভের জন্ম হয়, শুভ থেকে শুভের। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও সামরিক ব্যক্তিরা আণবিক শক্তিকে ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত করলেও অপর বৈজ্ঞানিকরা যে তাকে মানব-কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন তার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমেরিকান বন্ধুগণ সে কথা বলতে চাননি। একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে উদ্ঘাটন করবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করবার মত নির্বোধ ব্যক্তি তাঁরা নন। দুষ্কৃতকারী আগুন

জ্বালে পাপ উদ্দেশ্যে; গৃহবধূ আগুন জ্বালেন নিত্যদিন গৃহস্থের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি করতে।

আমি দেখতে পাচ্ছি সুন্দরতম যে অনুভূতিগুলি মানবসমাজকে ধারণ করে আসছে, আণবিক বোমা সেগুলিকেই অসাড় করে দিয়েছে। পূর্বে যুদ্ধেরও কতকগুলি বিধিবদ্ধ নীতি ছিল। ফলে তা কিছুটা সহনীয় ছিল। এখন নগ্ন সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বলই যুদ্ধের একমাত্র যুক্তি। অন্য কোনও যুক্তির সে পরোয়া করে না। আণবিক বোমা মিত্রশক্তিকে এক শূন্যগর্ভ জয়ে জয়ী করেছে। এবং জাপানের জীবনীশক্তিকে সাময়িকভাবে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হয়েছে, আর বিধ্বংসকারী শক্তিগুলির কী ক্ষতি হয়েছে এখনই তা বলা অবশ্য শক্ত। প্রকৃতির নিয়ম বড়ই রহস্যজনক। কিন্তু আমরা এই রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারি একই রূপ ঘটনার ফলাফল বিচার করে। ক্রীতদাসকে যে অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছে তার ভিতরে প্রবেশ না করে ক্রীতদাসের মালিক অথবা তার প্রতিনিধি ক্রীতদাসদের দাস করে রাখতে পারে না। অনুচিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে জাপান যে দুষ্কর্মের অবতারণা করেছে আমি তার সমর্থন জানাচ্ছি এরূপ ধারণা কেউ যেন না করেন। জাপানও অপরাধী. পার্থক্য যেটুকু সে শুধু পরিমাণে মাত্র। আমার বিশ্বাস জাপানের লোভ আরও জঘন্য। কিন্তু তাই বলে জাপানের অধিক অপরাধ এক কম অপরাধীকে নির্দয়ভাবে জাপানের একটি সমগ্র এলাকা জুড়ে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করবার অধিকার দিতে পারে না।

এই চরম বিপর্যয় থেকে স্বভাবতঃই এই শিক্ষা আমরা লাভ করি যে, বোমাকে পাল্টা বোমা দিয়ে ধ্বংস করা যাবে না, হিংসাকে যেমন প্রতিহিংসা দিয়ে জয় করা যায় না। মানবজাতিকে হিংসা থেকে অব্যাহতি পেতে হলে অহিংসার মাধ্যমেই তা পেতে হবে। ঘৃণাকে কেবলমাত্র প্রেম দিয়েই জয় করা যায়। প্রতিহিংসা হিংসাকে ব্যাপকতর ও গভীরতর করে মাত্র। আমি জানি এর আগেও এই এক কথাই আমি বহুবার বলেছি এবং আমার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুসারে তা অভ্যাসও করেছি। প্রকৃতপক্ষে আগে নূতন আমি কিছুই বলিনি। পাহাড়ের মতনই এগুলি অতি প্রাচীন। তবে এটা পাঠ্যপুস্তক থেকে কেবলমাত্র মুখস্থের বুলি নয়, আমার সমগ্র সত্তা দিয়ে আমি যা বিশ্বাস করেছি তাকেই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেছি। দীর্ঘ ষাট বছর ধরে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হয়েছে; বন্ধুদের অভিজ্ঞতা তাকে দৃঢ়তর করেছে। এটাই মূল সত্য, যা অবলম্বন করে একলাও দ্বিধাহীন চিত্তে চলা সম্ভব। মোক্ষমূলার বহু পূর্বে যা বলেছিলেন আজও আমি তা বিশ্বাস করি। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে যতদিন অবিশ্বাসীরা থাকবে ততদিন সত্যও পুনঃপুনঃ বলার প্রয়োজন থাকবে।

[হরিজন, ৭-৭-'৪৬]

নারী, পুরুষ, শিশুর সামগ্রিক ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আণবিক বোমার ব্যবহারকে আমি বিজ্ঞানের চরম পৈশাচিক প্রয়োগ বলে মনে করি।

[হরিজন, ২৯-৯-'৪৬]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শান্তিসেনা

কিছুদিন আগে আমি একটি শান্তিসেনা বাহিনী সংগঠন করবার পরামর্শ দিয়েছিলাম। এই বাহিনীর সভ্যদের কাজ হত নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ করা। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই বাহিনী পুলিশ, এমনকি সামরিক বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হবে, এই ছিল আমার পরিকল্পনা। এটা খুবই উচ্চাভিলাষ সন্দেহ নেই। একে রূপদান করা সম্ভবতঃ অসম্ভব। কিন্তু তবুও, কংগ্রেসকে যদি তার অহিংস বিপ্লবে সাফল্যলাভ করতে হয় তবে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে এই সকল পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার ক্ষমতা তাকে অর্জন করতেই হবে। সুতরাং ভেবে দেখা যাক এই পরিকল্পিত শান্তিবাহিনীর সভ্যদের কী কী যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

১। শান্তি বাহিনীর প্রত্যেক সভ্যকেই অহিংসায় জ্বলন্ত বিশ্বাস রাখতে হবে। ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে এ অসম্ভব। ভগবৎপ্রদত্ত শক্তি ও কৃপা ব্যতিরেকে অহিংসার পূজারী কিছুই করতে পারে না। ভগবানের কৃপা ছাড়া দ্বেষ, ভয় অথবা প্রতিহিংসার কথা না ভেবে মৃত্যুবরণ করতে কেউ সাহসী হতে পারে না। সর্বভূতে ভগবান এই বিশ্বাস থেকেই সে সাহস জন্মাতে পারে। যেখানে ভগবান আছেন সেখানে ভয় কিসের? ভগবানের এই সর্বব্যাপকত্বে বিশ্বাসী হওয়ার অর্থ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া--প্রতিপক্ষ বা গুন্ডা যাদের ভাবি তাদের জীবনের প্রতিও। মানুষের ভিতরের পশুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়ে যখন তাকে গ্রাস করে তখন তার উন্মত্ততা শান্ত করবার জন্যই প্রতিরোধের এই পদ্ধতি পবিকল্পিত হয়েছে।

২। এই শান্তির দূতগণকে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সমশ্রদ্ধাশীল হতে হবে। সুতরাং তিনি হিন্দু হলে ভারতের প্রচলিত অন্যান্য ধর্মকেও শ্রদ্ধা করবেন। দেশের যাবতীয় ধর্মমতের মূলসূত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত থাকতে হবে।

৩। সাধারণতঃ স্থানীয় লোকেরাই কেবলমাত্র নিজ নিজ পল্লীতে শান্তির এই কাজ করতে পারেন।

৪। এই কাজ দল বেঁধেও করা যেতে পারে আবার একলাও করা যেতে পারে। সুতরাং সঙ্গী পাবার অপেক্ষায় থাকবার দরকার করে না। তবুও স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকে আপন আপন ক্ষেত্রে সহকর্মী সংগ্রহ করে স্থানীয় শান্তিবাহিনী সংগঠন করতে পারেন।

৫। শান্তির এই দূত স্থানীয় অথবা একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অধিবাসীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সেবার মাধ্যমে সখ্যের সম্পর্ক স্থাপন করবেন যাতে করে বিসদৃশ কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে উত্তেজিত জনতার কেউই তাকে সন্দেহ করবে না অথবা অবাঞ্ছিত আগন্তুক বলে ভাববে না।

৬। বলাই বাহুল্য শান্তিপ্রতিষ্ঠাকারীর চরিত্র সন্দেহাতীতরূপে নিষ্কলুষ হবে এবং নিরপেক্ষ বলে তিনি সুবিদিত থাকবেন।

৭। সাধারণতঃ আসন্ন দুর্যোগের সংকেত পূর্ব থেকেই পাওয়া যায়। তা পাওয়া গেলে কালবিলম্ব না করে, অশান্তি আত্মপ্রকাশ করবার পূর্বেই, শান্তিবাহিনীকে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার কাজে লেগে পড়তে হবে।

৮। শান্তির আন্দোলন ব্যাপক ক্ষেত্রে সংগঠন করতে হলে কিছুসংখ্যক সর্বক্ষণের কর্মী সম্ভবতঃ দরকার হবে। কিন্তু তা না হলেই চলবে না এমন নয়। উদ্দেশ্য হল সত্যনিষ্ঠ ও উন্নতমনা নরনারী যত অধিক সংখ্যক সম্ভব সংগ্রহ করবার চেষ্টা করা। তা হতে পারে যদি প্রতিবেশীর সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করবার মত যথেষ্ট অবসর আছে এমন বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকদের মধ্য থেকেই শান্তিবাহিনীর সভ্য সংগ্রহ করা যায়। শান্তিবাহিনীর সভ্য হবার অপরাপর যোগ্যতাও অবশ্যই তাদের থাকা দরকার।

৯। এই পরিকল্পিত বাহিনীর সভ্যরা একধরনের বিশেষ পরিচ্ছদ ব্যবহার করতে পারেন যাতে কিছুকাল বাদে তাদের চিনতে সামান্যতম অসুবিধাও না হয়। এগুলি সাধারণ পরামর্শ মাত্র। এর ভিত্তিতে প্রত্যেক কেন্দ্রই তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন।

[হরিজন, ১৮-৬-'৩৮]

শস্ত্রশক্তিকেন্দ্রিক বৃহৎ স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নিয়মানুবর্তিতার খেলাপের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা থেকেই যায়। এ সমস্ত সংগঠনে মানুষের চরিত্র পারতপক্ষে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় না। মুখ্যস্থান দেওয়া হয় শারীরিক যোগ্যতাকে। কিন্তু অহিংস সংগঠনে ঠিক তার উল্টো। এখানে চরিত্র এবং আত্মিক শক্তিই মুখ্য। দৈহিক যোগ্যতা এখানে গৌণ। এই ধরনের বেশী লোক পাওয়া খুবই মুশকিল। এইজন্যই কর্মকুশল হতে হলে অহিংস সংগঠনগুলিকে আকারে ক্ষুদ্র হতে হবে; সারা দেশ জুড়ে এগুলি ছড়িয়ে থাকবে। প্রতি গ্রামে বা মহল্লায়ও এক একটি থাকতে পারে। সভ্যগণ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবেন। প্রতিটি দল নিজেদের দলপতি নির্বাচন করবেন। বাহিনীর প্রত্যেকের মর্যাদাই সমান হবে। কিন্তু যেখানে একই কাজ সকলে মিলে করবেন সেখানে সকলেই একজনের নেতৃত্বে চলবেন। নতুবা কাজের ক্ষতি হবে। একাধিক বাহিনী থাকলে প্রত্যেকটির দলপতি পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করবেন এবং সকলের গ্রহণযোগ্য এক কর্মসূচী নিয়ে কাজ করবেন। কেবলমাত্র এই পথেই সাফল্য আসতে পারে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অহিংস বাহিনী গঠিত হলে তারা সহজেই সর্বপ্রকার গোলযোগ বন্ধ করতে পারবেন। আখড়ায় যে শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস করানো হয় এই বাহিনীর সেগুলির দরকার নেই—কয়েকটির মাত্র দরকার হতে পারে।

একটি বিষয়ে এইধরনের প্রত্যেক সংগঠনের প্রত্যেক সভ্যকে অবশ্যই একমত হতে হবে। সে হল ভগবানের প্রগাঢ় বিশ্বাস। তিনিই কর্তা এবং প্রকৃত সাথী। তাঁর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া শান্তিবাহিনীগুলি প্রাণহীন হয়ে পড়বে।

ভগবানকে যে নামেই আমরা ডাকি না কেন একই ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আমরা কাজ করি, আমাদের এ কথা উপলব্ধি করতেই হবে। এরকম লোক কখনও অপরের প্রাণ হরণ করতে পারেন না। প্রয়োজন হলে নিজে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হন।

যে ব্যক্তি জীবনে এই মহান্ আদর্শ জীবন্ত রূপ নিয়েছে তিনি সংকটকালে কখনই বিভ্রান্ত হন না—স্বভাবজাত প্রবৃত্তি বশেই সঠিক পথের সন্ধান পান।

উপরে যা কিছু বলা হয়েছে তা ছাড়াও আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি সূত্র আমি এখানে উল্লেখ করছি।

(১) শান্তিবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবক কখনও অস্ত্র বহন করবেন না।

(২) বাহিনীর সভ্যদের যেন সহজেই চেনা যায়।

(৩) প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকই প্রাথমিক শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যান্ডেজের কাপড় ও তুলো, কাঁচি, সূচ, সুতো ডাক্তারী ছুরি ইত্যাদি সঙ্গে রাখবেন।

(৪) আহতদের স্থানান্তরিত ও বহন করবার পদ্ধতি তার জানা থাকা চাই।

(৫) তিনি আগুন নেভাবার কৌশল এবং দেহ অক্ষত রেখে আগুনের মধ্যে ঢুকে কাজ করবার পদ্ধতি জানবেন। উদ্ধারকার্যের জন্য উঁচু জায়গায় উঠতে এবং বিপদগ্রস্তকে নিয়ে অথবা একলা নেমে আসবার যোগ্যতা রাখবেন।

(৬) নিজের এলাকার সমস্ত অধিবাসীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকবে। এই পরিচিতিই এক ধরনের সেবা ।

(৭) অন্তরে তিনি নিরন্তর রাম নাম জপ করবেন এবং বিশ্বাসী অপর সকলকেও এই কাজে উৎসাহ দেবেন।

সাধারণতঃ তোতা পাখীর মত ভগবানের নামোচ্চারণ করেই মানুষ ফলপ্রাপ্তির আশা করে। কিন্তু প্রকৃত সত্যানুসন্ধানীর বিশ্বাস এমন জ্বলন্ত হবে যে তোতা-পাখীর বুলি আওড়ানোর অসারতা থেকে নিজেকে তো তিনি মুক্ত করবেনই, অপরকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবেন।

[হরিজন, ৫-৫-'৪৬]

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান চাই

যুদ্ধের মূল কারণসমূহ যতদিন উদঘাটিত না হবে এবং সমূলে উৎপাটিত না করা যাবে ততদিন যুদ্ধরোধের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পৃথিবীর তথাকথিত দুর্বল জাতিদের শোষণের উদ্দেশ্যে অমানুষিক প্রতিযোগিতাই আধুনিক কালের যুদ্ধসমূহের মূল কারণ নয় কি?

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৫-'২৯]

সর্বত্রই আজ অহিংসা পরিত্যাগ করে হিংসাকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছে—যেন এটাই স্বাভাবিক, চিরাচরিত বিধি। সুতরাং ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের যে গণতন্ত্র আমরা দেখছি সে কেবল নামেই গণতন্ত্র। কারণ সেগুলিও নাৎসী জার্মানী, ফাসিস্ট ইতালী, এমনকি সোভিয়েট রাশিয়ার মত হিংসার উপরেই প্রতিষ্ঠিত—কোনও অংশেই কম নয়। ব্যতিক্রম শুধু এই যে, শেষোক্ত রাষ্ট্র তিনটির হিংসা গণতন্ত্রী রাষ্ট্র তিনটির হিংসা অপেক্ষা অধিক সুসংগঠিত। ফলে, অস্ত্রসজ্জায় পরস্পরকে অতিক্রম করতে সবাই উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে সংঘর্ষ যেদিন বাধবে সেদিন গণতন্ত্র জয়ী হলে জনগণের সমর্থনের জোরেই সে জয়ী হবে। কারণ, সেখানকার সরকারকে জনসাধারণ নিজেদের দ্বারা গঠিত সরকার বলে মনে করে। কিন্তু অপর রাষ্ট্র তিনটিতে জনগণ তাদের একনায়কগণের বিরুদ্ধেই হয়তো বিদ্রোহ করতে পারে।

[হরিজন, ১১-২-'৩৯]

আমি পুনরায় বলছি, যুদ্ধের প্রতি আস্থা এবং তার আনুষঙ্গিক ছলচাতুরী সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে সকল জাতি ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে প্রকৃত শান্তির জন্য সচেষ্ট না হলে মিত্রশক্তিগণের অথবা পৃথিবীর কোথাও কখনই শান্তি অব্যাহত থাকবে না। সকল প্রকার যুদ্ধকে চিরতরে বিদায় দিতে চায় যে পৃথিবী সে পৃথিবীতে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের শোষণ অথবা শাসনের কোনই স্থান নেই। কেবলমাত্র এইরূপ এক পৃথিবীতেই সামরিক শক্তিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রসমূহও শোষিত ও শাসিত হবার আশঙ্কামুক্ত হতে পারে।

(সানফ্রানসিসকোতে অনুষ্ঠিত মিত্রশক্তির রাজনীতিজ্ঞদের সম্মেলনের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী কর্তৃক প্রচারিত ১৭-৪-'৪৫ তারিখের বিবৃতি।)

[বম্বে ক্রনিকল, ১৮-৪-'৪৫]

সভ্যতাকে সংকটমুক্ত করতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক সহযোগিতা আপনারা চান। আমিও তাই চাই। কিন্তু সহযোগিতার পূর্ব শর্ত জাতীয় সার্বভৌমত্ব—কেবলমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলিই সহযোগিতা করতে সমর্থ। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদী নীতি ও পররাজ্য শোষণ অপরাপর রাষ্ট্রগুলি আজ প্রশ্রয় দিলেও নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় মনে করে না এবং ইংলণ্ডকে উত্তরোত্তর বিপজ্জনক হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে তারা সকলেই সানন্দে সাহায্য করবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১১-'৩১]

আমি ইংলণ্ড, অথবা একই দৃষ্টিতে, আমেরিকাকে স্বাধীন দেশ বলে গণ্য করি না। তারা স্বাধীন তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে—দাসত্বশৃঙ্খলে পৃথিবীর যাবতীয় কৃষ্ণকায় জাতিসমূহকে আবদ্ধ রাখতে। এই জাতিগুলির মুক্তির জন্য কি আজ ইংলণ্ড ও আমেরিকা যুদ্ধ করছে? স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার ধারণাকে আশা করি সংকীর্ণ করবেন না। ইংলণ্ড ও আমেরিকার জ্ঞানী গুণীজন, তাঁদের ইতিহাস, তাঁদের

মনোরম কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদি কোথাও স্বাধীনতার সংজ্ঞাকে ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয় নি। স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার নিজের যে ধারণা তাতে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমাকে বলতেই হচ্ছে যে, তাঁদের কবি, তাঁদের দার্শনিক স্বাধীনতার যে স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, ইংলন্ড ও আমেরিকাবাসী সে স্বাধীনতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রকৃত স্বাধীনতা কী তা জানতে হলে তাঁদের ভারতবর্ষে আসতে হবে।' গর্ব ও উদ্ধত মন নিয়ে এলে হবে না, সর্বান্তঃকরণে সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসতে হবে।

[বোম্বাইয়ে ৮-৮-'৪২ তারিখে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত গান্ধীজীর ভাষণ।]

বৃটিশ শান্তিবাদীদের "পর্বতে প্রভুর উপদেশ" অনুসারে জীবনযাপন করতে হবে। সব চাইতে মূল্যবান যা তাঁদের বর্জন করতে হবে সে হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের ফসল। বর্তমান লন্ডনবাসীর জটিল ও উন্নত জীবনযাত্রা এশিয়া, আফ্রিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে আহৃত ধনভান্ডারের দৌলতে সম্ভব হয়েছে।

[হরিজন, ১৫-৩-'৪২]

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ভারত কোন্ পথ বেছে নেবে

ভারতবর্ষকে পথ বেছে নিতে হবে। ইচ্ছে করলে যুদ্ধের পথ সে নিতে পারে এবং নিজেকে আরও অধঃপতিত করতে পারে। যুদ্ধের পথে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেও তার অবস্থা ইংলন্ড অথবা ফ্রান্স অপেক্ষা ভাল ত হবেই না, সম্ভবতঃ আরও খারাপই হবে।

কিন্তু শান্তির পথ তার সামনে খোলাই আছে। ধৈর্য ধারণ করতে পারলে এ পথেই স্বরাজ লাভ সুনিশ্চিত। আমাদের ধৈর্যহীন স্বভাবের কাছে এটা দীর্ঘতম পথ বলে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই সংক্ষিপ্ততম পথ। শান্তির পথ আভ্যন্তরীণ বিকাশ ও স্থায়িত্বকে নিরাপদ করে। আমরা একে বর্জন করে চলি কারণ আমাদের ধারণা এ পথে স্বৈরাচারী শাসকের জবরদস্তির কাছে আত্ম-সমর্পণ করা হবে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা বুঝতে পারি এই জবরদস্তি নামে মাত্র এবং আমাদের জীবন ও ধনসম্পত্তির মায়াতেই এই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিচ্ছি সেই মুহূর্তে আমাদের করণীয় হচ্ছে এই নেতিবাচক মনোভাবটাই বদলে ফেলা—পরোক্ষভাবে যা অন্যায়কে সমর্থন করছে। যুদ্ধের পথে যে পরিমাণ বৈষয়িক ক্ষতি ও নৈতিক অধঃপতন স্বীকার করতে হয় সে তুলনায় এই পরিবর্তিত পথে ক্ষতির আশঙ্কা কিছু নয় বললেই হয়। তাছাড়া, যুদ্ধ উভয় পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। শান্তির পথ অনুসরণে যে কষ্টভোগ তা উভপক্ষকেই লাভবান করে। এই কষ্টভোগ, প্রসবব্যথার ন্যায় নবজাতকের আবির্ভাবে আনন্দমুখর।

শান্তির পথ হল সত্যের পথ। সত্যবাদিতা শান্তিবাদিতার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ, হিংসাই মিথ্যার প্রসূতি। শান্তিবাদী লোকের পক্ষে বেশীদিন হিংসাবাদী থাকা সম্ভব নয়। সত্যানুসন্ধানের পথেই সে অনুভব করে হিংসাশ্রয়ী হবার তার কোনই আবশ্যকতা নেই এবং আরও বোঝে যে, মনে লেশমাত্র হিংসা থাকলে যার অনুসন্ধানে সে ব্রতী হয়েছে সে সত্যের সন্ধান মেলে না।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২০-৫-'২৬]

আমার বিশ্বাস অহিংসার পথে স্বরাজ লাভ করলে ভারতবর্ষ কখনই এক বৃহৎ স্থলবাহিনী, অনুরূপ শক্তিশালী এক নৌবাহিনী এবং তদপেক্ষা শক্তিশালী এক বিমানবাহিনী পালন করবার গুরুভার বহন করতে চাইবে না। তার জাগ্রত আত্মশক্তি স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে যদি অহিংস বিজয়লাভে সমর্থ হয় তবে পৃথিবীর প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে তা পরিবর্তন ঘটাবে এবং সকল সমরোপকরণই নিরর্থক হয়ে পড়বে। এরূপ এক ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করাও সম্ভবতঃ অলীক কল্পনা, শিশুসুলভ মূঢ়তা। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অহিংস পদ্ধতিতে ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ করলে এ যে ঘটবেই তাতে সন্দেহ নেই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৯-৫-'২৯]

ইংলণ্ড এবং আমেরিকা যা কিছু করছে তার সব কিছুই আমাদের জন্যও ভাল এরূপ মেনে নেওয়াই আজকালের রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিধ্বংসী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদ্ থাকাটাই আজ যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট বলে ধরা হচ্ছে। ব্যক্তিগত সাহস ও সহনশীলতা এখন আর যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে গণ্য নয়। এক সেকেণ্ডে মাত্র একটি বোতাম টিপেই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেই হত্যা করতে পারা যায়। আত্মরক্ষার জন্য আমরা কি এই পদ্ধতিই অনুকরণ করতে চাই? যদি তাই চাই, আমাদের সে আর্থিক সঙ্গতি আছে কি? ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধে আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু আমেরিকা অথবা ইংলণ্ডের অনুকরণ করতে চাইলে সামরিক খাতে আমাদের ব্যয় আরও দশ গুণ বাড়াতে হবে।

হিংসা দিয়ে জাতিকে অহিংসার পথে ধরে রাখা যায় না। জাতি যা হতে চায় সেটা তার অন্তর থেকেই বিকশিত করে তুলতে হয়। সুতরাং আমাদের এখন ভেবে দেখতে হবে আমরা কী চাই। আমরা কি প্রথমে পশ্চিমের দেশগুলির অনুসরণ করব এবং পরে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করে অন্ধকারাচ্ছন্ন কোনও এক সুদূর ভবিষ্যতে পুনরায় সুস্থ পথে প্রত্যাবর্তন করব অথবা কোনও এক মৌলিক পথের উদ্ভাবন করব কিংবা আমার দৃষ্টিতে আমাদের নিজস্ব যে শান্তির পথ তাই অবলম্বন করে তারই মাধ্যমে স্বরাজ সুনিশ্চিতভাবে অর্জন করব?

কাপুরুষতার সঙ্গে আপোষের কোন প্রশ্নই এখানে ওঠে না। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই হয় আমাদের ধ্বংস করবার জন্য সংগঠিত ও অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হতে হবে এবং ফলস্বরূপ ক্লেশভোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে অথবা আমাদের দেশের স্বাধীনতা

রক্ষার জন্য পরাধীনতার পাশ থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র স্বেচ্ছায় ক্লেশবরণের জন্যেই প্রস্তুত হতে হবে। এই উভয় ক্ষেত্রেই সাহসিকতা অপরিহার্য। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাহসিকতার স্থান দ্বিতীয়ের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও সম্ভবতঃ হিংসাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পারব না। কিন্তু হিংসা এক্ষেত্রে অহিংসার ভাবে থাকবে এবং জাতীয় জীবনে উত্তরোত্তর ক্ষীয়মাণ হতে থাকবে।

বর্তমানে জাতীয় নীতি অহিংসা হলেও অন্ততঃ চিন্তায় ও কথায় আমরা হিংসার পথেই তাড়িত হয়ে চলেছি বলেই মনে হয়। অসহিষ্ণুতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। হিংসা থেকে যে আমরা বিরত রয়েছি তা আমাদের দুর্বলতার জন্য। যেটা দরকার সে হল শক্তিমান হয়ে ও ইচ্ছাপূর্বক হিংসাকে পরিত্যাগ করা। সে করতে হলে উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে বিশ্বের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পশ্চিমের বাহ্যিক চমৎকারিতা আজ আমাদের চোখ ঝলসিয়ে দিচ্ছে, এই তাণ্ডবকেই আমরা প্রগতি বলে ভুল করছি এবং নিরন্তর তাই নিয়েই থাকছি। এটা যে আমাদের বিনাশের পথে এগিয়ে দিচ্ছে সে কথা আমরা বুঝতে চাইছি না। সর্বোপরি স্বীকার করতেই হবে যে, পশ্চিমী দেশগুলির অনুকরণে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া আমাদের পক্ষে আত্মহত্যারই সামিল।

তাই হিংসার এই আপাতসার্থকতা সত্ত্বেও নৈতিক শক্তিই জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করছে সে কথা বুঝে আমাদের উচিত অহিংসার এই সীমাহীন সম্ভাবনার পথে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে সংগঠিত হওয়া। প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন ১৯২২ সালে অহিংসার আবহাওয়া অব্যাহত থাকলে এক্টিলাভে আমরা সম্পূর্ণ সক্ষম হতাম। তবুও অপরিণত হওয়া সত্ত্বেও, অহিংসার কার্যকরী ক্ষমতার এক আশ্চর্য নিদর্শন তখন আমরা পেয়েছিলাম এবং স্বরাজের যে সারবস্তু সেদিন লাভ হয়েছিল সে আজও আমরা হারাইনি। পূর্বের সরকারী ভীতি সমগ্র দেশকে যা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সত্যাগ্রহ উদ্ভাবিত হবার পর চিরতরে তার অবসান ঘটেছে। সুতরাং আমার দৃষ্টিতে অহিংসা অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষণীয় একটি বিষয়। আমরা যদি নিষ্কৃতি পেতে চাই এবং পৃথিবীর অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য কোন অবদান রেখে যেতে চাই তবে দ্বিধাহীন সুস্পষ্ট শান্তির পথই হচ্ছে আমাদের পথ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২২-৮-'২৯]

জাতীয় সরকার কী নীতি গ্রহণ করবেন আমি বলতে পারি না। সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ততদিন হয়ত আমি বাঁচব না। যদি আমি বেঁচে থাকি সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই অহিংসাকে গ্রহণের পরামর্শই আমি দেব। সেই হবে বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বরাষ্ট্র পত্তনে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ অবদান। আমার ধারণা ভারতবর্ষে যে পরিমাণ বিভিন্ন সামরিক জাতির বাস তাতে ভারতের শাসনব্যবস্থায় তাদের সকলেরই যথেষ্ট আধিপত্য থাকবে, ফলে ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে কিছু পরিমাণে নতুন ধরনের এক সামরিক প্রবণতা আসবেই। আমার ঐকান্তিক আশা, রাজনৈতিক শক্তিরূপে অহিংসার

কার্যকারিতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এযাবৎ কালের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ যাবে না; অহিংসার যথার্থ প্রতিভূরূপে শক্তিশালী কোনও দল দেশে অবশ্যই থাকবে।

[হরিজন, ২১-৬-'৪২]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভারতের আদর্শ

যুদ্ধবিগ্রহের মতবাদ গ্রহণ করে ভারতবর্ষ সাময়িকভাবে লাভবান হতে পারে। তাহলে সে ভারত আর আমার গৌরবের ভারত থাকবে না। ভারতবর্ষের সঙ্গে আমি নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা, কারণ আমার সব কিছুর জন্যেই আমি তার কাছে ঋণী। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, পৃথিবীকে সে এক নতুন আদর্শ দিয়ে যাবে। ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ সে করবে না। ভারতবর্ষ যেদিন অস্ত্রের মতবাদ গ্রহণ করবে আমার জীবনে সেদিন এক চরম পরীক্ষার সূচনা হবে। আমার বিশ্বাস, সেদিন আমি পিছিয়ে থাকব না। আমার ধর্ম ভৌগোলিক সীমায় নিবদ্ধ নয়। এতে আমার জ্বলন্ত বিশ্বাস থাকলে ভারতবর্ষের প্রতি আমার যে ভালবাসা তাকেও এ ধর্ম অতিক্রম করবে। অহিংসাধর্ম অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সেবায় আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-'২০]

পশ্চিমের অনুসৃত রক্তাক্ত পথ ভারতের জন্য নয়।... অহিংসার শান্তিপূর্ণ পথই ভারতের পথ। ভারতবর্ষ তার অন্তরাত্মাকে খোয়াতে বসেছে। অন্তরাত্মাকে খুইয়ে সে বাঁচতে পারে না।... নিজের তথা পৃথিবীর কল্যাণে একে রোধ করবার মত সামর্থ্য তাকে অর্জন করতেই হবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৭-১০-'২৬]

পশ্চিমের বহু কিছু আছে যেগুলি গ্রহণ করে আমরা লাভবান হতে পারি। এ কথা স্বীকার করবার মত যথেষ্ট বিনয় আমার আছে। জ্ঞান কোনও দেশের বা জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। পশ্চিমের সকল কিছু এশিয়াবাসীর অনুকরণযোগ্য এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে বিবেচনাহীন পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণকে আমি বাধা দিতে চাই। পশ্চিমী সভ্যতার সঙ্গে আমার বিরোধ কেবলমাত্র এইখানেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতবর্ষ যদি আত্মনিগ্রহের কঠিন পরীক্ষায় ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহকারে উত্তীর্ণ হতে পারে এবং নিঃসন্দেহে ত্রুটিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তার নিজস্ব সভ্যতা, যা কালজয়ী হয়ে আজও টিঁকে আছে, তার উপর অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে পারে, তবে সে বিশ্বের শান্তি ও প্রগতিতে স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৮-'২৭]

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রগুলিই আজ উৎকণ্ঠিত; ভারতবর্ষ সত্য ও অহিংসার পথে অভীষ্টলাভে সক্ষম হলে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে তার অবদান অকিঞ্চিৎকর হবে না; এবং তার প্রতি এই রাষ্ট্রগুলির নিঃস্বার্থ সহযোগিতার ঋণও সে এইভাবেই কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিশোধ করতে পারবে—বিনয়ের সঙ্গে এই কথাই আমি বলতে চাই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১১-৬-'৩১]

যেদিন ভারতবর্ষ স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভর, লোভ ও শোষণ প্রতিরোধে সমর্থ হবে সেদিন পশ্চিম কিংবা পূর্বের কোন রাষ্ট্রেরই সে আর লালসার সামগ্রী থাকবে না। তখন সে ব্যয়সাপেক্ষ অস্ত্রসজ্জার বাহুল্য ব্যতিরেকেই নিরাপত্তা বোধ করবে। ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিই হবে তার প্রতিরক্ষার দুর্ভেদ্য দুর্গ।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২-৭-'৩১]

আমি আমার জন্মভূমির স্বাধীনতা চাই কিন্তু বিশ্বাস করুন, সমগ্র পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসীর মাতৃভূমি আমার দেশের সেই স্বাধীনতা পৃথিবীর কোথাও কোনও জাতিকে কিংবা কোন ব্যক্তিকেও শোষণ করবে না। এইরূপ স্বাধীনতা লাভে আমার অধিকারই জন্মাবে না যদি আমি পৃথিবীর বলবান কিংবা বলহীন সমস্ত জাতির সম অধিকারে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান না হই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১০-'৩১]

আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের আদর্শ অপরের আদর্শ থেকে ভিন্ন। ভারতবর্ষ পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত। এই দেশ স্বেচ্ছায় আত্মশুদ্ধির যে পথ বেছে নিয়েছে পৃথিবীতে তা বিরল। ভারতবর্ষের লৌহনির্মিত অস্ত্রের আবশ্যকতা নেই, চিরকাল সে আধ্যাত্মিক অস্ত্রে সংগ্রাম করেছে, আজও তা করতে পারে। অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি পশুশক্তিতে আস্থাবান। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে সর্বজয়ী হতে পারে। পশুশক্তি আত্মশক্তির কাছে যে কত দুর্বল ইতিহাস তার অজস্র নিদর্শন বহন করছে, কবিগণ তার বিজয়গাথা গেয়েছেন, দার্শনিকগণ জানিয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা।

[স্পীচেস এ্যান্ড রাইটিংস অব মহাত্মা গান্ধী, ১৯৩৩ সংস্করণ]

স্মরণাতীত কাল থেকে অহিংসা ভারতবর্ষে পরম্পরাগতভাবে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। কিন্তু আমার যতদূর জানা আছে, তার অতীত ইতিহাসের কোন অধ্যায়েই পূর্ণ অহিংসা সমগ্র দেশে সম্পূর্ণ কার্যকর রূপ কখনই নিতে পারেনি। তবুও আমার অবিচলিত বিশ্বাস, মানবসমাজের দ্বারে অহিংসার বাণী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ভারতবর্ষেরই। হতে পারে এর বাস্তব রূপায়ণ যুগ যুগ সাধনাসাপেক্ষ। কিন্তু আমার বিচার-বুদ্ধিতে অপর কোন দেশই দেখছি না যে এই ব্রত পালনে ভারতবর্ষের অগ্রগামী হতে পারে।

[হরিজন, ১২-১০-'৩৫]

আমার লক্ষ্য স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাকেও অতিক্রম করে। ভারতবর্ষের মুক্তির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর দুর্বল জাতিগুলিকে আমি পশ্চিমী শোষণের গুরুনিষ্পেষণ থেকে মুক্ত করতে চাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ সকল জাতিকে স্বাধীনতা লাভে উদ্বুদ্ধ করবে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১২-১-'২৮]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতীয়তাবাদ

আমার কাছে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম একই বস্তু। আমি দেশপ্রেমিক কারণ আমি মানবপ্রেমিক—করুণা আমার ধর্ম। এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। ভারতের স্বার্থ পূরণ করতে গিয়ে আমি ইংলণ্ড বা জার্মানীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করব না। আমার জীবনপরিকল্পনার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের কোন স্থান নেই। দেশপ্রেমিকের আদর্শ নাগরিকের আদর্শ থেকে ভিন্ন নয়। মানবতা বোধ সম্বন্ধে দেশপ্রেমিক যত বেশী উদাসীন তার দেশভক্তিও তত কম বুঝতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক জীবনাদর্শের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৩-'২১]

জাতীয়তাবাদী না হয়ে আন্তর্জাতীয়তাবাদী হওয়া অসম্ভব। আন্তর্জাতীয়তাবাদ তখনই সম্ভব যখন জাতীয়তাবাদ বাস্তব রূপ নেয়, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের জনগণ একতাসূত্রে আবদ্ধ হয়ে সমবেতভাবে একক ব্যক্তির ন্যায় কাজ করে। জাতীয়তাবাদ কখনই ক্ষতিকারক নয়। ক্ষতিকর হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা জড়িয়ে আছে সেগুলি। একের ক্ষতি করে অপরে লাভবান হতে চায়, একের ধ্বংসস্তূপে অন্যে বিজয় নিশান উড়ায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এক ভিন্ন পথের সন্ধান এনেছে। সমগ্র মানবজাতীর কল্যাণ ও সেবার উদ্দেশ্যে নিজেকে সে সংগঠিত করতে চাইছে; আত্মবিকাশের পথ অনুসন্ধান করছে।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৮-৬-'২৫]

শুধু ভারতীয় জনগণের ভ্রাতৃত্বই আমার আদর্শ নয়। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই আমার কাম্য নয়। যদিও বর্তমানে সেই আকাঙ্ক্ষাই নিঃসন্দেহে আমার জীবনের বাকী সকল আকাঙ্ক্ষাকেই ছাপিয়ে উঠেছে, আমাকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করে রেখেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়েই আমি বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে কাজ করে যেতে চাই। আমার দেশপ্রেম সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট নয়। সে সর্বব্যাপী। যে দেশপ্রেম অপর দেশকে শোষণ করতে চায়, তার দুরবস্থার সুযোগ

গ্রহণ করে, সে দেশপ্রেমকে আমি সর্বতোভাবে বর্জন করি। আমার দেশপ্রেম সর্বসময়ে, কোন ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমের অবকাশ না রেখে, যদি বিশ্বমানবের কল্যাণের অনুগামী না হয় তবে সে অসাড়। শুধু তাই নয়, আমার ধর্ম এবং সেই ধর্মজ্ঞান থেকে উদ্ভূত আমার দেশপ্রেম জীবমাত্রকেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে। কেবলমাত্র মানুষনামধারী জীবের সঙ্গেই আমি সেই ভ্রাতৃত্ব এবং একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী নই, সকল জীবের সঙ্গেই আমি একাত্ম হতে চাই—সরীসৃপ, যারা বুকে ভর দিয়ে চলে তাদের সঙ্গেও। আমি সরীসৃপের সঙ্গেও একাত্ম হতে চাই, হয়তো চমকে উঠবেন; কারণ একই ঈশ্বরের সন্তান আমরা এবং তাই যদি সত্য হয় তবে সকল জীবই বৈচিত্র্য থাকা সত্বেও মূলতঃ এক।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪-৪-’২৯]

আমাদের জাতীয়তাবাদ অপর জাতির সর্বনাশ করবে না। আমরা যেমন অপরকে শোষণ করব না তেমনি অপরের দ্বারাও শোষিত হব না। স্বরাজের মাধ্যমে আমরা সমগ্র পৃথিবীর সেবা করব।

[ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৬-৪-’৩১]

দেশাত্মবোধের আদর্শ আমাদের যেমন শিক্ষা দেয় ব্যক্তি পরিবারের কল্যাণে, পরিবার গ্রামের কল্যাণে, গ্রাম জেলার কল্যাণে, জেলা প্রদেশের কল্যাণে এবং প্রদেশ সমগ্র দেশের কল্যাণে সর্বস্ব বিসর্জন দেবে, ঠিক তেমনি দেশও যাতে পৃথিবীর কল্যাণে প্রয়োজন হলে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে তারই জন্য তার স্বাধীনতার প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদের প্রতি আমার অনুরাগ অথবা আমার জাতীয়তাবাদী আদর্শ আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা চায়, যাতে প্রয়োজন হলে মানবজাতির অস্তিত্বকে নিরাপদ করবার জন্য আমার দেশ সামগ্রিকভাবে আত্মোৎসর্গ করতে পারে। জাতিবিদ্বেষের সেখানে কোনই স্থান নেই। আমাদের জাতীয়তাবাদ এইরূপ হোক—এই আমার কামনা।

[গান্ধীজী ইন ইণ্ডিয়ান ভিলেজেস, পৃঃ ১৭০]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রাচ্যের বাণী

আমার হৃদয়ের অন্তরতম দেশেও আমি অনুভব করি রক্তপাতে পৃথিবী আজ সম্পূর্ণরূপে বিতৃষ্ণ। সে আজ মুক্তির পথ অন্বেষণে রত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রাচীন ভূমি ভারতবর্ষই সম্ভবতঃ অন্বেষণরত পৃথিবীকে সে-পথের সন্ধান দেবার গৌরব অর্জন করবে।

[ইণ্ডিয়াস্ কেস ফর স্বরাজ, পৃঃ ২০৯]

যদি ভারতবর্ষ অকৃতকার্য হয় তবে এশিয়ার সর্বনাশ। যথার্থই বহু সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমন্বয়ের লীলাভূমি এই ভারতবর্ষ। এশিয়া, আফ্রিকা অথবা পৃথিবীর অপর সকল প্রান্তের সকল শোষিত জনের আশাভরসার স্থল হোক ভারতবর্ষ। তাদের জন্যই সে বেঁচে থাকুক।

[দিল্লী ডায়েরী, পৃঃ ৩১]

২-৪-৪৭ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তঃ-এশীয় সম্পর্ক সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণদান প্রসঙ্গে গান্ধীজী "জ্ঞানের আলোক প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে এসেছে" বলে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন—

জরথুষ্ট্র ছিলেন এই মনীষীদের পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন প্রাচ্যভূমির। তাঁকে অনুসরণ করে এলেন বুদ্ধ—যিনি প্রাচ্যের, ভারতবর্ষের। বুদ্ধদেবের পর কার আবির্ভাব হল? যীশু খৃষ্ট—তিনি এলেন প্রাচ্য থেকেই। যীশুরও পূর্বে ছিলেন মোজেস্. তিনি প্যালেস্টাইনের অধিবাসী, যদিও ভূমিষ্ট হয়েছিলেন মিশরে। যীশুর পরে এলেন মহম্মদ। আমি কৃষ্ণ, রাম এবং আরও বহু অনন্যসাধারণ প্রতিভাধরের নাম উল্লেখই করছি না। তাঁদের আমি কোন অংশেই ন্যূন মনে করি না, কিন্তু তাঁদের পৃথিবীব্যাপি পরিচিতি নেই। তা সত্ত্বেও এশিয়ার এই মনীষীদের সমকক্ষ একটি ব্যক্তিও সমগ্র পৃথিবীতে আমি খুঁজে পাই না। যাই হোক, পববর্তী কালে কী ঘটল? খৃষ্টধর্ম পাশ্চাত্যে উপনীত হয়ে বিকৃত হয়ে পড়ল। এ কথা বলতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আমি আর বলব না। আপনারা প্রাচ্যের বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করুন—আপনাদের কাছে এই আমার বক্তব্য। পাশ্চাত্যের চশমা পরে তাকে জানা যাবে না। এটম বোমার অনুকরণ করেও নয়। পশ্চিমকে যদি কিছু আপনাদের দেবার থাকে সে হচ্ছে প্রেম ও সত্যের আদর্শ। গণতন্ত্রের এই যুগে, দরিদ্রতম ব্যক্তিরও জাগৃতির এই মুহূর্তে সর্বশক্তি দিয়ে সেই আদর্শকেই পুনর্বার আপনারা ঘোষণা করুন। প্রতিহিংসাপরায়ণতার পথে নয়, কারণ এ যাবৎ আপনারা শোষিত হয়েছেন, পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথেই আপনাদের পাশ্চাত্যকে জয় করা সম্ভব। প্রাচ্যের এই মনীষী-কুল আমাদের জন্য যে সম্পদ্ গচ্ছিত রেখে গেছেন, শুধু মুখে নয়, সর্বান্তঃকরণে সমবেতভাবে আমরা যদি তার অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি, এই মহত্তম ঐতিহ্যের উপযুক্ত ধারক ও বাহক হতে পারি তবেই, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, পাশ্চাত্যে আমাদের জয়যাত্রা সফল হবেই। পাশ্চাত্যবাসীও সেই জয়কে গ্রহণ করবে। পশ্চিম আজ জ্ঞানালোকের জন্য উন্মুখ। আণবিক বোমার সংখ্যাধিক্য তাকে নিরাশ্বাস করে তুলেছে, কারণ আণবিক বোমার অর্থই সর্বাত্মক ধ্বংস। কেবলমাত্র পাশ্চাত্যেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস। যেন বাইবেলের ভবিষ্যৎবাণী ফলতে চলেছে,—সর্বব্যাপী প্লাবন পৃথিবীকে গ্রাস করতে আসছে। এই পাপ ও দুরাচারের স্বরূপকে পৃথিবীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করে দেওয়া আপনাদেরই দায়িত্ব। উত্তরাধিকার সূত্রে এই শিক্ষাই আমরা লাভ করেছি। আমার এবং আপনাদের পূর্ববর্তী মনীষীরা এশিয়াকে এ কথাই শিখিয়ে গেছেন।

[হরিজন, ২০-৪-'৪৭]

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আগামী দিনের পৃথিবী

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বর্তমান কালে যেরূপ জল্পনাকল্পনা হচ্ছে ইতঃপূর্বে সম্ভবতঃ কখনই এরূপ হয়নি। আমাদের পৃথিবী চিরকালই কি হিংসাশ্রয়ী থাকবে? সর্ব-কালেই কি সেখানে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, দুঃখকষ্ট থাকবেই? আমাদের ধর্মবিশ্বাস আরও গভীর ও ব্যাপক হবে, না, পৃথিবী ধর্মহীন হবে? সমাজের যদি বিপুল পরিবর্তন আনতে হয়—কী উপায়ে তা সম্ভব হবে? যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের পথে? না, শান্তিপূর্ণ পথে?

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাবে এই প্রশ্নগুলির জবাব দেন। আগামী কালের পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে তাঁরা এ প্রশ্নগুলির উত্তর করেন। আমি শুধু বিশ্বাসই নয় দৃঢ়প্রত্যয় থেকেই এর জবাব দিয়ে থাকি। আগামী দিনের পৃথিবী অবশ্যই, নিশ্চিতরূপে, অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত এক সমাজব্যবস্থা রূপে গড়ে উঠবে। এই হল প্রথম সূত্র। এর থেকেই পরবর্তী আর সবকিছু স্বতঃস্ফূর্তরূপে বিকশিত হবে। এটা অদূরদর্শী, অবাস্তব উচ্চাদর্শ বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু অসম্ভব এ কখনই নয়, যেহেতু আজ, এখনিই, একে রূপায়িত করা যেতে পারে। যে কোন ব্যক্তি অপর কারও অপেক্ষা না করেই আগামী দিনের জীবনাদর্শ অহিংসার পথ অবলম্বন করতে পারেন। একজনের পক্ষে যা সম্ভব সমষ্টির পক্ষেও তা সম্ভব হবে না কেন? সমগ্র জাতির পক্ষেই বা সম্ভব হবে না কেন? প্রারম্ভেই মানুষের যত দ্বিধাবোধ। কারণ পরিপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয় বলেই সে ধরে নেয়। এই মানসিক প্রবণতাই অগ্রগতির পথে আমাদের সর্বপ্রধান অন্তরায়। কিন্তু এমন একটি অন্তরায়, যা প্রত্যেকেই কেবলমাত্র ইচ্ছা থাকলেই অপসারিত করতে পারে।

সম-বিভাজন—আমার দৃষ্টিতে আগামীদিনের কল্পিত পৃথিবীর দ্বিতীয় মহৎ অনুশাসন অহিংসা থেকেই তার উৎপত্তি। এর অর্থ পৃথিবীর সম্পদ্ যথেচ্ছ ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়া নয়। প্রত্যেকেই স্বাভাবিক প্রয়োজন অনুপাতে চাহিদা পূরণ করবেন, তার বেশী নেবেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সপ্তাহে একজনের সিকি পাউন্ড এবং আর একজনের পাঁচ পাউন্ড ময়দার দরকার হতে পারে। নির্বিচার সমাহারের সূত্রে উভয়কেই সিকি পাউন্ড বা পাঁচ পাউন্ড দেওয়া হবে না, উভয়েই প্রয়োজন অনুপাতে পাবে।

এবার আগামী দিনের পৃথিবী রচনার সম্ভবতঃ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আমরা সম্মুখীন হচ্ছি। কী করে সমবণ্টনের এই আদর্শকে রূপায়ণ করা যাবে? ধনসম্পদ থেকে ধনবানদের কি বঞ্চিত করা হবে? জবাবে অহিংসা বলে, নিশ্চয়ই নয়। হিংসা কোনরূপেই মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করে না, বলপূর্বক অধিকারচ্যুত করলে সমাজকে বহু গুণীর গুণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। ধনবান জানেন কী করে ধন উৎপাদন করতে হয়, সংগঠন করতে হয়। তার কর্মক্ষমতাকে নিষ্ফল হতে দেওয়া যায় না। তা না চাইলে তাকেই তার সম্পদের অধিকারী রাখতে হবে; যুক্তি-

সঙ্গতভাবে যতটুকু ব্যক্তিগত প্রয়োজন ততটুকুই তিনি ভোগ করবেন আর উদ্‌বৃত্ত অংশের হবেন অছি এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে তা নিয়োজিত করবেন। অতীতে এরূপ বহুলোক ছিলেন। বর্তমানেও আছেন। আমার দৃষ্টিতে মানুষ যখন নিজেকে সমাজের সেবক ভাবেন, সমাজের জন্যই উপার্জ্জন করেন, তখন তাঁর উপার্জ্জন সৎ এবং তাঁর ব্যবসায় প্রচেষ্টা গঠনমূলক হয়।

কিন্তু অহিংসার এই সামগ্রিক কল্পনা মানুষের স্বভাবের পরিবর্তনসাপেক্ষ নয় কি? ইতিহাসে কি কোথাও এর নিদর্শন মেলে? অবশ্যই মেলে এমন বহু লোক আছেন যাঁরা ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সম্পদ্ আহরণের প্রবৃত্তি পরিহার করে সমাজকেই সামগ্রিকভাবে আপন বলে গ্রহণ করেছেন, তার কল্যাণে কাজ করে গেছেন। একজনের ক্ষেত্রে যখন এই পরিবর্তন সম্ভব তখন বহুজনের ক্ষেত্রেও তা অবশ্যই সম্ভব। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি আগামী দিনের পৃথিবীতে দারিদ্র্য নেই, যুদ্ধ নেই, বিপ্লব নেই, রক্তপাত নেই। সেই পৃথিবীতে ভগবৎবিশ্বাস হবে অতীতের যে কোনও সময়ের চেয়ে ব্যাপক ও গভীরতর। পৃথিবীর অস্তিত্বই ব্যাপকতর অর্থে ধর্মের উপর নির্ভরশীল। তার মূল উৎপাটনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

['লিবার্টি' থেকে সংক্ষেপিত]



গান্ধী-রচনাসম্ভার ॥ তৃতীয় খণ্ড

হিন্দ স্বরাজ—অনুবাদক : সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
স্বাস্থ্য নির্দেশিকা—অনুবাদিকা : বাসন্তী দেবী
আমার অহিংসা—অনুবাদক : প্রণবেশ সেন
য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা—অনুবাদক : সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত
নারী ও সামাজিক অবিচার—অনুবাদক : উপেন্দ্রকুমার রায়
পত্র-চয়ন—অনুবাদক : শিব মুখোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্র দেবনাথ
অহিংসার পথে বিশ্বশান্তি—অনুবাদক : শিশিরকুমার সান্ন্যাল